মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ

মো: আবদুল হালিম

'মুসলিম দর্শন: চেতনা ও প্রবাহ' মূলত একটি গবেষণাধর্মী রচনা। এ গ্রন্থে মুসলিম দর্শনের চেতনা এবং এর কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার এক বাস্তবচিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং সাম্প্রতিক মুসলিম দার্শনিকগণের দর্শন এতে পরিচ্ছন্নভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। আল-গাযালী ও ইবনে রুশদ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা এ গ্রন্থের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরিশিষ্টে আল-গাযালী ও ইবনে রুশদের বাদ-প্রতিবাদমূলক আলোচনা উচ্চ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তকারে পরিভাষায় সংযোজন এ গ্রন্থের আরেক বৈশিষ্ট্য। মুসলিম দর্শনের ব্যবহৃত শব্দাবলী ও এর তাৎপর্য বোধগম্য করে তোলাই এর প্রধান লক্ষ্য। গবেষণাধর্মী কর্মের জন্য পুস্তকটি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমরা আশা করি।

www.pathagar.com

মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ

মোঃ আবদুল হালিম
প্রাক্তন অধ্যক্ষ
এম. সি. কলেজ, সিলেট

দিব্য প্রকাশ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জীবনের যে মুহূর্তে যাকে সবচেয়ে প্রয়োজন
সেই প্রয়াত স্ত্রী
অধ্যাপিকা সাহওয়ার আহমেদ চৌধুরী (সেবু)-এর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক কথা

১৯৭৫ সনে আমার রচিত *গ্রীক দর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার* প্রকাশিত হবার পর অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী মুসলিম দর্শন-এর উপর লেখার জন্য অনুরোধ জানায়। বর্তমান গ্রন্থটির অনেকগুলো রচনাই বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধাকারে লেখা। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার চিন্তা মনে উদয় হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বিএ পাস, বিএ অনার্স ও এম.এ প্রথম পর্বের পাঠক্রম তালিকাকে অনুসরণ করে সাজানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী পাঠক্রমের বাইরে আরো অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলা ভাষায় রচিত 'মুসলিম দর্শন' আমাদের দেশে হাতে গোনা কয়েকটি। আমার গ্রন্থটি তার-ই একটা সংযোজন মাত্র। বিষয় ও ভাষার উপর দক্ষতা গ্রন্থরচনার অপরিহার্য অঙ্গ। বিষয়ের উপর অপরিপক্বতা ও ভাষার উপর অদক্ষতার কারণে মাঝে মধ্যে দুর্বলতা পরিদৃষ্ট হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এ-ক্ষেত্রে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি একান্তভাবে কাম্য।

গ্রন্থটি মৌলিক নয়—বহু মনীষী লেখকের গ্রন্থ থেকে এর উপাদান আহরণ করা হয়েছে অকৃপণভাবে। কৃতজ্ঞচিত্তে সে-ই প্রাজ্ঞ-দার্শনিকদের আমি শ্রদ্ধা জানাই। বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ ড. আমিনুল ইসলাম-এর পরামর্শগুলো গৃহীত হয়েছে সাদরে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। অভিনন্দন জানাই বিভাগীয় সকল সহকর্মী অধ্যাপক প্রশান্তকুমার সাহা, অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ এবং অধ্যাপিকা নাসিমা আক্তার চৌধুরী, অধ্যাপিকা সুফিয়া চৌধুরী ও অধ্যাপিকা হাবিবা আক্তারকে।

গ্রন্থের অগ্রগতি বিষয়ে দূর ও আড়ালে থেকে যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে সে-ই সুপ্রিয় সতীর্থ অধ্যাপিকা হোসনে আরা বেগমের প্রতি রইলো অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

যাদের আন্তরিক পরিশ্রম ও উৎসাহে গ্রন্থটির ভিত রচিত তারা হচ্ছে রাজনীতি বিজ্ঞান, এম. এস. এস-এর শেষবর্ষের ছাত্র মীর মোশারফ হোসেন। স্নেহাস্পদ ছাত্র হুমায়ুন কবির এবং ছাত্রী রায়হানা হক রানা। তারা উভয়েই দর্শনে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত। দর্শন এম. এ. দ্বিতীয় পর্বের ছাত্রী ফারেহা সিদ্দিকার পরিশ্রম ভুলবার নয়। তাদের প্রতি রইলো আমার অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা। রচনায় যে বেশি উৎফুল্ল সে-ই হচ্ছে মেয়ে 'তোনামি'। তার প্রতি রইলো আনন্দ-ঘন মুহূর্তের নিঃসৃত পিতৃ-স্নেহ।

পরিশেষে, যাদের উদ্দেশ্য-কে সামনে রেখে গ্রন্থটি রচিত, তাদের উপকারে আসলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

মোঃ আবদুল হালিম
অধ্যক্ষ
এম. সি. কলেজ, সিলেট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ' পুস্তকটি ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রচুর চাহিদা থাকার কারণে এর মুদ্রণ কপি অচিরেই শেষ হয়ে যায়। পুনঃমুদ্রণের জন্য বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে তা বাধাগ্রস্থ হতে থাকে। গ্রন্থটির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অনেকেই আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেন। বাংলা একাডেমীর দীর্ঘসূত্রিতার ফলে অবশেষে বাধ্য হয়েই বাইরের প্রকাশনা থেকে পুস্তকটি ছাপার ব্যবস্থা করা হয়। প্রকাশনা সংস্থা 'দিব্যপ্রকাশ' এই দায়ভার গ্রহণ করে এবং অতি অল্প সময়ের ভেতরেই ২০০২ সালে তারা এর প্রথম প্রকাশ করে। কয়েক বছর পর এর মুদ্রণ কপিও শেষ হয়ে যায় এবং পুনঃমুদ্রণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। নানাবিধ কারণে আবারও তা বিলম্বিত হয়। মাত্র কিছুদিন পূর্বে পুস্তকটির সংশোধনী কাজ সম্পন্ন করে জমা দিয়েছি–আশা করি খুব শীঘ্রই তা প্রকাশ পাবে।

সংশোধনী বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ছোট একটি ঘটনা আমার লেখক জীবনকে গৌরবান্বিত করে রেখেছে। 'দিব্যপ্রকাশ' কর্তৃক পুস্তকটি প্রথম প্রকাশনার পর জানতে পারি কলেজ জীবনে দর্শন-শিক্ষা গুরু শ্রদ্ধেয় রাজীউদ্দীন আহমেদ স্যার বর্তমানে সাভারে অবস্থান করছেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে এবং চাকুরি জীবনও শেষ করে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর স্যারের সন্ধান পাই। প্রখর ধী-সম্পন্ন এবং অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী স্যার শুধু আমার প্রিয় শিক্ষকই নন একজন আদর্শবান ও অনুকরণীয় শিক্ষকও বটে। জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অবাধ-বিচরণ এমনকি নাটক ও সংগীত বিদ্যায়ও। সর্ব বিষয়ে পারদর্শী এমন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব জীবনে খুব কম দেখেছি। যাক স্যারের খবর পেয়ে অতি সত্বর গিয়ে সাক্ষাৎ করি। পদধূলি নিতেই তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে থাকেন : তোমার কথা শুনে যে প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছিল সেই হাসি হাসি মুখ হালকা-পাতলা গড়নের ছাত্রটি—এখন দেখছি তা-ই। আমার আবছা ধারণা তা হলে ভুল হয়নি। কৃতজ্ঞতার ভাষা হারিয়ে ফেলছিলাম। স্যারের ছোট ভাই অধ্যাপক রুকন-উদ্দীন যার মাধ্যমে স্যারের সংবাদ পাই হয়তো তার নিকট থেকে স্যার আমার কথা শুনে থাকবেন। দীর্ঘ আলাপচারিতায় এক পর্যায়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত আমার চারটি গ্রন্থ স্যারকে শুভেচ্ছা স্বরূপ প্রদান করি-এর মধ্যে ছিল বর্তমান গ্রন্থ 'মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ'। স্যার খুবই খুশি হলেন এবং আমার সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এবার বিদায়ের পালা। আমি উদ্যোগ নিতেই স্যার আমায় কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন; দুপুরের খাবার খেয়ে যেতে হবে। দুপুরের খাবার না খেয়ে যেতে পারবেনা—কোন অজুহাত দেখানোর অবকাশ হয়নি—এ এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। স্যার এবং তদীয় কন্যার স্ব-হস্তে পরিবেশিত মধ্যাহ্ন ভোজের পর সহযাত্রী ও সহকর্মী অধ্যাপক রুকন-উদ্দীনকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ।

www.pathagar.com

দু-চারদিন পর স্যার টেলিফোন করেন এবং জানান যে তিনি 'মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ' গ্রন্থটি পড়া শুরু করেছেন—এতে যে ভুল-ত্রুটি রয়েছে পড়া শেষ করে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। বলি : স্যার আপনি আমার শিক্ষক—পুস্তকটি ত্রুটিমুক্ত করতে যা কিছু প্রয়োজন তা করে দেবেন এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার স্পর্শে বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও বিশুদ্ধরূপ ধারণ করুক এই আমার প্রত্যাশা ও একান্ত কামনা।

বেশ কিছুদিন পর স্যার আমাকে জানান যে, পাঠ সমাপ্ত হয়েছে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামীকাল সকালে আমার এখানে আসছেন। তিনি যথারীতি এলেন। স্বাগত জানিয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর তিনি এবার বইটি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। আশ্চর্য ঠেকল : স্যার এই বয়সে (৮৫/৮৭ বৎসর) চারশত পৃষ্ঠার পুস্তকটি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পাঠ করেছেন অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং এর মধ্যে ভুল-ত্রুটি নির্ণয় করে সংশোধন করেছেন। স্যারের ধৈর্য দেখে অবাক হই। আলোচনাকালে তিনি এত গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েন যে আমি নিজেই ধৈর্যচ্যুত হয়ে যাই। 'ভাবি ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।'

দু-একটি জায়গাতে শব্দ ও বানান সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে স্যারের নিকট বিনীতভাবে ওজর পেশ করি। যেমন 'Authority' বাংলা করেছি 'প্রাধিকার' হিসেবে। স্যার বলেন—এ শব্দ কোথায় পেলে? তাৎক্ষণিকভাবে সূত্র নির্দেশ করতে না পারায় বিব্রতবোধ করি—তবে ভাগ্যক্রমে দর্শন পরিভাষা-কোষ-এ শব্দটি পেয়ে যাই। 'শ্রেণি' বানান করেছি 'ি'-কার দিয়ে স্যার করেন 'ী' ঈ-কার দিয়ে। বলি স্যার এখন আর ঈকার ব্যবহার করা হয় না। যেমন : বাড়ী নয় বাড়ি, পাখী নয় পাখি ইত্যাদি। সময়ের পরিবর্তনের সাথে শব্দ প্রয়োগ ও বানানেরও ক্রম-বিবর্তন হয়েছে। স্যার বিষয়টি অনুধাবন করেন। সমগ্র গ্রন্থটিতে রয়েছে স্যারের সংশোধনীর ছোঁয়া। বলি স্যার : আপনার সংশোধনের কপিটি রেখে যান—পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেব। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান সংস্করণ স্যারেরই সংশোধনীর স্পর্শে রঞ্জিত।

আল্লাহর নিকট স্যারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মোঃ আবদুল হালিম
অধ্যক্ষ
এম. সি. কলেজ, সিলেট

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : মুসলিম দর্শনের স্বরূপ ১৩-৪৪

১. ভূমিকা ১৩
২. মুসলিম দর্শনের স্বরূপ : চেতনা ও প্রবাহ ১৪
৩. মুসলিম দর্শনের পরিসর ও পরিধি ২২
৪. মুসলিম দর্শন ও ইসলামি দর্শন ২৪
৫. মুসলিম দর্শন ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ২৪
৬. মুসলিম দর্শনের উৎসসমূহ এবং এর ক্রমবিকাশে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপ্রভাব ২৭
৭. মুসলিম দর্শনের সম্ভাব্যতা ৩৬
৮. মুসলিম দর্শন পাঠের গুরুত্ব ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় ৪৫-৪৮

১. পূর্বাভাষ ৪৫
২. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেণীবিন্যাস ৪৮

তৃতীয় অধ্যায় : বিভিন্ন ধর্মীয়—রাজনৈতিক সম্প্রদায় ৪৯-৫৩

১. খারিজি সম্প্রদায় ৪৯
২. সুন্নি সম্প্রদায় ৫০
৩. শিয়া সম্প্রদায় ৫০
৪. যায়েদি ও ইমামি সম্প্রদায় ৫২
৫. বারোপন্থী ও সাতপন্থী সম্প্রদায় (ইসনা আ-শারিয়া, সাবিয়া) ৫৩

চতুর্থ অধ্যায় : পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ ৪৯-৫৩

ইখওয়ানুস সাফা বা পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ ৪৯
ধর্ম, সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, ৫৫/৫৬
সৃষ্টিতত্ত্ব বা বিকিরণবাদ, মনোবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ৫৬/৫৭
রক্ষণশীল সম্প্রদায়, ওহাবি সম্প্রদায়, বাবিবাদ। ৫৮/৬১

পঞ্চম অধ্যায় : ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় ৬২-৬৯

মুরজিয়া সম্প্রদায় ৬২
জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায় ৬৪
সেফাতিয়া সম্প্রদায় ৬৮/৬৯

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : মুতাযিলা সম্প্রদায় ৭০-৮৬

ক. ভূমিকা ৭০
খ. মূলনীতি ও মতবাদসমূহ ৭৩
গ. আল্লাহ্‌র দর্শনের সম্ভাব্যতা ৭৫
ঘ. কোরআনে দেহমূলক আয়াতের ব্যাখ্যা ৭৭
ঙ. মুতাযিলা ও সুন্নি মতবাদের পার্থক্য ৮১

কয়েকজন বিখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ ও তাদের মতবাদ ৮২

১. ওয়াসিল বিন আতা ৮২
২. আবুল হুদায়েল আল-আল্লাফ ৮৩
৩. ইব্রাহিম বিন সাইয়ার আল নাজ্জাম ৮৩
৪. জাহিজ ৮৪
৫. বিশার বিন মুতামির ৮৪
৬. মুয়াখার বিন আবদাদ আল-সোলামি ৮৪
৭. থুমামাহ ইবনে আল আশরাস ৮৫
৮. আল-জুবাই ৮৫
৯. আবু-হাশিম ৮৫
১০. আল-যামাকসারি ৮৫

সপ্তম অধ্যায় : আ'শারীয় সম্প্রদায় ৮৭-১০৪

ক. ভূমিকা ৮৭
খ. মূলনীতি ও মতবাদসমূহ ৮৯
১. আল্লাহ্‌র গুণাবলি এবং আল্লাহ্‌র সারসত্তার সাথে তাদের সম্পর্ক ৮৯
২. পবিত্র কোরআনে নিত্যতা বা অনিত্যতা ৯১
৩. কোরআনের ভাষা আল্লাহ্‌র ভাষা ৯২
৪. দিব্য দর্শনের সম্ভাব্যতা ৯২
৫. ইচ্ছার স্বাধীনতা ৯৪
গ. আ'শারীয়দের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৯৫
১. পরমাণু মতবাদ ৯৫
২. আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা ৯৬
৩. আত্মা-সম্পর্কে ধারণা ৯৭
৪. কল্যাণ ও অকল্যাণ ৯৭
৫. আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার ও সুপারিশ ৯৮

কয়েকজন খ্যাতিমান আ'শারীয় ব্যক্তিত্ব ৯৯-১০৪

১. আল-আ'শরী ৯৯
ক. আল্লাহ্‌র গুণাবলি ১০০
খ. পবিত্র কোরআন ১০০
গ. দিব্য দর্শন ১০০
ঘ. ইচ্ছার স্বাধীনতা ১০০

www.pathagar.com

ঙ. প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ ১০০
২. আল-বাকিল্লানি ১০০
৩. আল-শাহরাস্তানী ১০১
৪. ইমাম আল-হারমায়েন ১০১১
৫. ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাজী ১০১
৬. আল মাতরুদি ১০১

অষ্টম অধ্যায় : সুফিবাদ ১০৫-১৩২
ক. ভূমিকা ১০৫
খ. সুফি শব্দের ব্যুৎপত্তি ১০৭
গ. সুফিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১০৭
ঘ. সুফিবাদের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদসমূহ ১১৫
ঙ. সুফি পথ পরিক্রমা ১২২
চ. সুফিবাদের মূলনীতিসমূহ ১২৩

নবম অধ্যায় : মুসলিম প্রাচ্যের দার্শনিকবৃন্দ ১৩৩-১৬৯
আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবনে মিসকাওয়াহ, ইবনে সিনা

দশম অধ্যায় : মুসলিম পাশ্চাত্যের দার্শনিকবৃন্দ ১৭০-২০৭
ইবনে হাজম, ইবনে আল-হায়সাম
ইবনে বাজ্জা, ইবনে তোফায়েল, ইবনে রুশদ

একাদশ অধ্যায় : আল-গাযালী ২০৮-৩০৬
ক. ভূমিকা ২০৮
খ. জীবনী ২০৯
গ. পদ্ধতি ও জ্ঞানতত্ত্ব ২১৩
ঘ. দার্শনিকগণের উপর আক্রমণ ২১৭
ঙ. কার্যকারণ তত্ত্ব ২২৭
চ. সুফিবাদ ২৩০
ছ. গুরুত্ব ও প্রভাব ২৩৪
চতুর্থ সমস্যা, পঞ্চম সমস্যা, ষষ্ঠ সমস্যা, নবম সমস্যা,
দশম সমস্যা, একাদশ সমস্যা, উনবিংশ সমস্যা ও বিংশ সমস্যা ২৪০/৩০৬

দ্বাদশ অধ্যায় : মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানি ৩০৭-৩১৬
ক. জীবনী ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ৩০৭
খ. ধর্ম ও দর্শনের একত্ব প্রসঙ্গ ৩০৮
গ. মরমি অভিজ্ঞতার স্বরূপ ৩১০
ঘ. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ৩১২
ঙ. আল্লাহ্‌র গুণাবলী ৩১৪
চ. আত্মা ৩১৫

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায় : ইবনে খালদুন ৩১৭-৩২৮

ক. ভূমিকা ৩১৭
খ. ইতিহাস দর্শন ৩১৯
গ. সমাজ দর্শন ৩২০
ঘ. রাষ্ট্র দর্শন ৩২২
ঙ. দার্শনিক মতবাদ ৩২৪
চ. অধিবিদ্যা ৩২৬

চতুর্দশ অধ্যায় : সমসাময়িক চিন্তাধারা ৩২৯-৩৪১

ইসলামের মূল শিক্ষা, ওহাবি আন্দোলন, জামালউদ্দিন আফগানি ৩২৯/৩৩৫
মুসলমানদের মধ্যে তিন শ্রেণী
প্রগতিশীল শ্রেণী ৩৩৬
রক্ষণশীল শ্রেণী ৩৩৭
উদার শ্রেণী ৩৩৮

পঞ্চদশ অধ্যায় : ইকবাল ৩৪২-৩৭০

ক. ভূমিকা ৩৪২
খ. ইকবালের দর্শনের রূপরেখা ৩৪৩
গ. স্বজ্ঞা ৩৪৫
ঘ. অহম বা আত্মসত্তা অথবা খুদী ৩৪৬
ঙ. জড় জগৎ ৩৫০
চ. আল্লাহ্ ৩৫২
ছ. ইকবালের শিক্ষাদর্শন বা সমাজ ও নীতিদর্শন ৩৫৬

গ্রন্থপঞ্জি ৩৭১-৩৭২

পরিশিষ্ট ৩৭৩-৪০০

ক. আল-গাযালী
খ. ইবনে রুশদ

পরিভাষা ৪০১-৪১৬

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম দর্শনের স্বরূপ

১. ভূমিকা

মানব জাতির পথপরিক্রমা ও অগ্রযাত্রার ইতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যময়, বড়ই বিস্ময়কর। অজানাকে জানার জন্য মানুষের রয়েছে এক দুর্বার স্পৃহা এবং সেই থেকে জন্মলাভ করেছে অনুসন্ধিৎসা। চেতনার লগ্ন থেকেই মানুষ যুগে যুগে এ অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে আসছে। কৌতূহলী মানব মনে রয়েছে কতকগুলো সার্বজনীন প্রশ্ন, কতকগুলো সার্বজনীন জিজ্ঞাসা : কে আমি? কোথায় থেকে এলাম? কোথায় আমার গন্তব্য? জগৎ কি? কি তার স্বরূপ? কে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন? তাঁর প্রকৃতিই বা কি? জগতের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক কি? জগৎ পরিকল্পনায় মানুষের স্থান, দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? কৌতূহলী মনের এ জ্ঞানপিপাসা মেটাতে গিয়ে মানুষ সন্ধান করেছে সত্যের এবং এর থেকে উদ্ভব ঘটেছে জীবন ও জগৎদর্শন। সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা এবং সত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের প্রয়াসই হচ্ছে দর্শন।

মানব জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও জাতীয় জীবনে এ সার্বজনীন জীবন-জিজ্ঞাসা ও চেতনাবোধ আবর্তিত হয়েছে বার বার। প্রতিটি গোষ্ঠী ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে এসব ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। ফলে উদ্ভব ঘটেছে গোষ্ঠীয় ও জাতীয় চিন্তাধারা।

মুসলিম দর্শন হলো মুসলিম জাতির চিন্তা ও চেতনার ধারা। মুসলিম দর্শন হচ্ছে সামগ্রিকভাবে জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস। মুসলমানগণ আদি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাঁদের চিন্তাধারার এক অব্যাহত স্রোত রক্ষা করে চলেছেন। প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় ও যোগসূত্র স্থাপন করে তাঁরা বিশ্ব ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। মুসলমানদের রয়েছে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, রয়েছে স্বকীয় চিন্তা ও চেতনার অনুভূতি—রয়েছে নিজস্ব শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। এসবের আলোকে জীবন ও জগতকে ব্যাখ্যা করে মুসলিম মনীষীগণ মানব জীবনের দিক ও পথনির্দেশনা দিচ্ছেন। মুসলমানগণ তাঁদের স্বকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও ইতিহাসকে। ফলে উদ্ভব হয়েছে অন্যান্য জাতির সাথে তাদের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ। কাল ও যুগোপযোগী সমস্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনধারা পরিচালনার মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে তাদের চিন্তাধারা। জাতির জীবন যেমন ক্রমবর্ধমান জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে, মানব চেতনাও তেমনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করে।

www.pathagar.com

অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর চিন্তাধারা যেমন ধর্মীয় চেতনার দ্বারা প্রভাবিত, মুসলিম জাতির জীবন ও দর্শনও তেমনি ধর্মীয় চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। মুসলিম দর্শন তার ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় চেতনাবোধ থেকে স্বতঃউৎসারিত। ইসলাম হচ্ছে এক স্বভাবধর্ম—একে বলা হয় দ্বীন-ই-ফিতরাত।

জীবন ও জগতের এমন কিছু নেই যা ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। জন্মের উষালগ্ন থেকে শুরু করে এর পরিণতি পর্যন্ত মানব জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই পরিব্যক্ত হয়েছে ইসলাম ধর্মে। জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকণা থেকে শুরু করে সমগ্র পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি এর অন্তর্ভুক্ত। যুগ ও কালের অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে মুসলিম চিন্তার অভিব্যক্তি ও বিকাশ ঘটেছে অব্যাহতভাবে। কালের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারার মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য ও মতবিরোধ দেখা গেলেও মহাগ্রন্থ কোরআনকে কেন্দ্র করেই তাঁদের সকল চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে হাদিস বা মহানবি (দঃ)-এর বাস্তব আদর্শিক আচরণ ও নির্দেশনাবলি। মুসলিম চিন্তাবিদদের চিন্তাধারার বিভিন্নতা সত্ত্বেও পবিত্র কোরআন ও মহানবির আদর্শিক জীবনধারা সকল চিন্তাবিদকে আবার একই সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে।

২. মুসলিম দর্শনের স্বরূপ : চেতনা ও প্রবাহ

খ্রিষ্টান যুগের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে বিশ্বসভ্যতার চারটি বিভিন্ন কেন্দ্রে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব ঘটে : চীন, পারস্য, ভারত ও গ্রিস। চিন্তার এ চারটি উৎসের মধ্যে ভারতীয় ও গ্রিকচিন্তা বেগবান স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে। ভারতীয় চিন্তার বিকাশ কিছুটা সংকুচিত হওয়ার পর পুনরায় প্রবাহিত হয় এবং এর ভবিষ্যৎ বর্তমানে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। কিন্তু গ্রিক চিন্তাধারা প্রায় পনের শতাব্দীর অধিক গ্রিস, আলেকজান্দ্রিয়া, রোম ও সিরিয়াকে উর্বর করার পর কম-বেশি মুসলিম চিন্তায় মিশে যায়। ফলে, দশম শতাব্দীতে বিশ্বে অবশিষ্ট থাকে দুটো চিন্তাপ্রবাহ : ভারতীয় ও মুসলিম। পানি স্বভাবতই উঁচু থেকে নিচুতে প্রবাহিত হয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহ ইসলামি দেশের সাথে ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে এবং মধ্যযুগে তাদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা নিম্নমান হওয়ার ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সপ্তম শতাব্দীর (A.D) প্রারম্ভে আরবের মরুভূমিতে এক নবচিন্তার উদ্ভব ঘটে। এটা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এ নব-ভাবধারা হচ্ছে ইসলাম। এ ভাবধারা মানুষের মনে এমন এক প্রভাব সৃষ্টি করে যার ইতিহাস পূর্বে জানা ছিল না। সে সময়ের দুই বৃহৎ রাজ্য পারস্য ও বাইজেনটাইন এ স্রোতধারাকে প্রতিহত করার প্রয়াস চালায়; কিন্তু পরিণামে তারা নিজেরাই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ ভাবধারা প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর প্রথম শতবর্ষেই এটা বিস্কে উপসাগর থেকে শুরু করে সিন্ধু ও চীনা সীমান্ত পর্যন্ত এবং অ্যারল সমুদ্র থেকে নীলনদের উচ্চ-

www.pathagar.com

জলপ্রপাত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি এর অন্তর্ভুক্ত হয়—রোমান সাম্রাজ্যের চেয়েও বৃহত্তর ছিল এর পরিধি।

মুসলমানগণ সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রাখেন এবং এমন এক সংস্কৃতির জন্ম দেন যা যে কোনো জাতির জন্য গৌরবজনক। বিশ্বে অন্য জাতিসমূহ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন তাঁরা জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে আসেন। বহু শতাব্দী যাবৎ তাঁরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির দ্বারা বিশ্বসভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহের অনেক পূর্বে তাঁরা তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। করডোভা ও গ্রানাডা নগরীতে অবস্থিত দুটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটে। শিক্ষার্থীগণ মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে তা ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।

মুসলিম পণ্ডিতদের রচিত সব সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের মূলে রয়েছে তাঁদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। সকলের প্রতি রয়েছে এর বন্ধুত্ব—কারোর প্রতি এর শত্রুতা বা বৈরিতা নেই। ইসলাম তার নিজের মধ্যে বর্ধন ও বিকাশের বীজ বহন করে আছে। ইসলাম তার আওতার মধ্যে সকল প্রকার জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে—এ জ্ঞান মানুষ বা বিশ্ববিষয়ক যাই হোক না কেন—জ্ঞান মূলত এক। মানবজাতির সাধারণ উত্থান ও অগ্রগতির সাথে ইসলাম সংগতি রক্ষা করে চলে। ইসলাম লব্ধ জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে এবং জ্ঞান প্রসার ও প্রচারে নিজস্ব অবদান রাখে।

কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, ইসলাম সত্যের অন্বেষাকে নিরুৎসাহিত করে এবং ইসলাম বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাবিরোধী। তাঁরা আরো মন্তব্য করেন যে, মুসলিম পণ্ডিতগণ বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণকারী মাত্র এবং তাঁদের নিজস্ব কোনো মৌলিকতা নেই। সমালোচকদের এসব উক্তি ও মন্তব্য ইসলাম এবং এর ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতার পরিচয়ই বহন করে।

ইসলাম জ্ঞানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। জ্ঞান অর্জনের জন্য এ উৎসাহ প্রত্যক্ষভাবে পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে আসে। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। যাঁরা ইসলাম ধর্ম পুরোপুরিভাবে পাঠ করেছেন এবং নিরপেক্ষভাবে এর সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন তাঁরা জানেন পবিত্র কোরআন "হিকমাত" বা বুদ্ধির উপর কি পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যাঁকে জ্ঞান, হিকমাত বা বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তাঁকে অফুরন্ত সম্পদ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যাদিষ্ট প্রথম আয়াতে মোহাম্মদ (দঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে : "... পাঠ করুন, মহান দয়ালু আল্লাহর নামে যিনি মানুষকে কলম ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাকে বস্তুর সম্পর্কীয় জ্ঞান প্রদান করেছেন" (XCIV)। পবিত্র কোরআন মানুষকে উপদেশ দিচ্ছে : 'হে প্রভু আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' (XXII,4)। পবিত্র কোরআন উল্লেখ করে যাদের জ্ঞান নেই তারা তাঁদের সমকক্ষ হতে পারে না যাঁদের জ্ঞান রয়েছে (XXXIX,9); "... তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর ..." (VII–179),

প্রত্যাদেশে বিবৃত বর্ণনা তাদেরই দেয়া হয় "যারা চিন্তা করে"। (VI–98)—"... নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য ..." (VI–99)। সকল বস্তুর মধ্যে জ্ঞান হচ্ছে সেই গুণ যার দ্বারা মানুষ ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র প্রতিনিধিস্বরূপ (II.3f)। পবিত্র কোরআন মানুষকে প্রকৃতির ঘটনা, স্বর্গ-মর্ত্যের সৃজন, ঋতুর পরিবর্তন, দিনরাত্রির আবর্তন, সমুদ্ররাশি, মেঘমালা, বায়ুপ্রবাহ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং এদের নিয়মবিধি সম্বন্ধে অনুধ্যানপরায়ণ চিন্তা করতে শিক্ষা দেয়। পবিত্র কোরআন মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, ক্রমবৃদ্ধি ও ক্ষয়, মানুষ জাতির উত্থান-পতন বিষয়ে ধ্যানমগ্ন চিন্তা করতে নির্দেশ দেয়। সূর্যাস্ত, উষাকাল, পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণাধারা ও গিরিসংকট, সোপান, নভোমণ্ডল, নক্ষত্রের চাঁদোয়া, সমুদ্রবক্ষে জাহাজ চলাচল এবং আত্মার বিকশিত সৌন্দর্য বিষয়ে গভীর অনুধাবন করতে পবিত্র কোরআন অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যোগায়। নিশ্চিত জ্ঞানে উন্নীত হওয়ার জন্য এই মহাগ্রন্থ জ্ঞানের ত্রি-মাত্রার (Three degrees) স্তর বিন্যাসের কথা ঘোষণা করে : (১) অনুমানলব্ধ জ্ঞান, (২) পর্যবেক্ষণজাত জ্ঞান, (৩) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান (LXIX, SOCii-ff)। একটি মূর্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা এদের পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন : (১) অনুমানলব্ধ জ্ঞান : অগ্নি সর্বদা জ্বলে, (২) পর্যবেক্ষণজাত জ্ঞান : অগ্নি রহিমের হাত পুড়িয়েছে, (৩) অগ্নি আমার হাতও পুড়িয়েছে ইত্যাদি।

ডিউট্সে পবিত্র কোরআনের এই শিক্ষাকে পরিব্যক্ত করে বলেন, "পবিত্র কোরআন হলো সেই মহাগ্রন্থ যার দ্বারা আরবগণ ... জ্ঞানালোক ধারণ করেন এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য ইউরোপে রাজন্যের ন্যায় আগমন করেন। এটা মৃত হেলাস (Hellas)-এর বিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে জাগিয়ে তোলে। পবিত্র কোরআন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সংগীতবিদ্যা শিখতে উৎসাহ দান করে। কোরআন হলো আধুনিক বিজ্ঞান পরিচর্যার ভিত্তি।"

এবারে নবি (দঃ)-এর হাদিস প্রসঙ্গে আসা যাক। নবি (দঃ) বলেন, "প্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে তা হচ্ছে প্রজ্ঞা (reason) এবং প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির চেয়ে আল্লাহ্ আর কোনো উত্তম বস্তু সৃষ্টি করেন নাই।" "জ্ঞান অন্বেষণে যে ব্যক্তি তার গৃহত্যাগ করেন, তিনি আল্লাহ্র রাস্তায় চলেন।" "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমান নর ও নারীর কর্তব্য।" "জ্ঞান অন্বেষণ কর" তিনি উল্লেখ করেন, কারণ "জ্ঞান, জ্ঞানের অধিকারীকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম করে তোলে, জ্ঞান বেহেশতের পথ আলোকিত করে। জ্ঞান নির্জন মরুভূমে আমাদের বন্ধু, একাকীত্বের নিরাপত্তা, সঙ্গীহীনের সঙ্গী। জ্ঞান সুখের নির্দেশনা দেয়, দুর্দশা থেকে দূরে রাখে। জ্ঞান বন্ধুর জন্য অলংকার ও গৌরব। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ।" "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।" নবি (দঃ) পুনরায় উল্লেখ করেন : "জ্ঞান অর্জন কর, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জ্ঞান অর্জন করেন, তিনি ধর্মের একটি কর্তব্য সম্পাদন করেন।" "যিনি জ্ঞান অন্বেষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, তিনি তাঁর আল্লাহকে ভক্তি করেন"। "যিনি জ্ঞানের কথা বলেন, তিনি তার প্রভুকেই প্রশংসা করেন।" "যিনি জ্ঞান বিতরণ করেন,

www.pathagar.com

তিনি জ্ঞান দানই করেন।" "জ্ঞান-অন্বেষণকারীর জন্য ফেরশতাগণ তাঁদের পাখা বিস্তার করেন।" "যিনি জ্ঞান অন্বেষণ করেন, তিনি মরেন না, তিনি জীবিতই।"

ভক্তির সাথে জ্ঞানকে তুলনা করে নবি (দঃ)-এর কিছু প্রাসঙ্গিক উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে : "জ্ঞানীদের কথা শুনা এবং বিজ্ঞান পাঠ করা (Lessons of Science), অন্যদের মনে সঞ্চার করা ধর্মীয় অনুশীলনের চেয়ে উত্তম।" "যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করে সে আমাকেই শ্রদ্ধা করে।" "জ্ঞানী ব্যক্তির কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।" "আল্লাহর সৃষ্টির উপর এক ঘণ্টা চিন্তা ও ধ্যান সত্তর বৎসরের এবাদতের চেয়ে উত্তম।" "বিজ্ঞান ও শিক্ষকের উপদেশাবলি এক ঘণ্টা শ্রবণ করা হাজার রাত্রি দাঁড়িয়ে এবাদত করার চেয়ে অনেক গুণে উত্তম।"

পবিত্র কোরআন এবং নবি (দঃ)-এর এ ধরনের শিক্ষা যে মুসলমানদের বৌদ্ধিক ক্রিয়া তৎপরতার উল্কাবৎ উদ্ভব (meteoric rise) ঘটাবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মুসলমানগণ জ্ঞানের সকল উৎসকে আকণ্ঠ পান করেছিলেন যার ফলে তাঁরা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হন।

এসব উৎসের মধ্যে প্রথম হচ্ছে সেই যা স্বয়ং আরবে উদ্ভব ঘটেছিল, অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং হাদিস। পবিত্র কোরআন ও হাদিস হচ্ছে, বলতে গেলে, মায়ের পবিত্র স্তনের ন্যায় যা থেকে মুসলিম চিন্তা শৈশবে পুষ্টি লাভ করে। পবিত্র কোরআন মুসলমানকে নতুন নীতি, নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব, নতুন দর্শন—ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান, গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং একখোদাবাদী (Monotheistic) দর্শন প্রদান করে। বিশ্ব ব্যাখ্যার জন্য পবিত্র কোরআন সুস্পষ্টভাবে এক ওখাদাবাদী ধারণা ব্যক্ত করে। তবে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য এ মহান গ্রন্থ সর্ব ব্যাখ্যার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। সকল সার্বজনীনতাই (Universality) বিশেষকে উপেক্ষা করে এবং যে ধর্ম সার্বজনীনতা দাবি করে তার জন্য বিশেষকে উপেক্ষা করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। এক আল্লাহ, তবে তিনি কি অতিবর্তী না অন্তর্ব্যাপী (Transcendent or immanent) নাকি উভয়ই। তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, এ নামগুলো কি তাঁর সারসত্তার (Essential) গুণাবলি নাকি সেই গুণাবালি যাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়।

তিনি চিরন্তন, সর্বত্র সবখানে—কিন্তু স্থান ও কালের সাথে তিনি কি ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখেন? আল্লাহ্র নিকট থেকে সকল কার্য প্রবাহিত হয়, যদিও মানুষ তার ক্রিয়াকর্মের জন্য নিজেই দায়ী—কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? পবিত্র কোরআন এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকে মানব বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার জন্য রেখে দিয়েছে। মানুষ তার বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগে এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করবে। মুসলিম হতে গেলেই একজনকে খোদাবাদী হতে হবে, সে-ই-এক খোদাবাদীর ধারণা বিস্তৃত বিবরণ যাই হোক না কেন। এই ধারণার বিভিন্নতার কারণেই বিভিন্ন মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, এমনকি গোঁড়া মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যেও এ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এবং চিন্তা প্রবাহকে অগ্রগতির পথে প্রভাবিত করে।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন অবশ্য বুদ্ধিকে অনিয়ন্ত্রিত নির্দেশনা দেয় না, তবে একে শৃংখলিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতি যেমন জীবদেহকে কতকগুলো সহজাত উত্তেজনা বা অনুপ্রেরণা (Impulse) দিয়ে বিকাশের জন্য যোগ্য (Suitable) পরিবেশের ওপর ছেড়ে দেয়, ঠিক অনুরূপভাবে, মুসলিম চিন্তার বীজও পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের মূল ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত। মুসলিম চিন্তার অগ্রগতি ও ক্রমোন্নতি হচ্ছে এ বীজেরই অংকুরোদ্গম ও পরিণতি—এগুলো কিছু পূর্ব অস্তিত্বশীল চিন্তার উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশে লালিত।

অন্য উৎসসমূহ

অন্য যেখান থেকে মুসলমানগণ জ্ঞানের উৎস লাভ করেছেন তা হচ্ছে সিরিয়া, মিশর এবং পারস্য। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে হেলেনীয় দর্শন গ্রিস থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে এটা সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। প্লটিনাসের নব্য প্লেটোবাদ (২৬৯ খ্রি.) পরফিরির এরিস্টোটলের উপাদানের সাথে সমন্বিত ও সংমিশ্রিত হয়। পরফিরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষে রোমে শিক্ষা দান করেন। এ মতবাদ আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টানগণ পরিগ্রহণ করেন। যার প্রধান ছিলেন ক্লিমেন্ট এবং ওরিজেন। তাঁরা উভয়েই খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের সাথে সমকালীন দর্শনের সংগতি রক্ষা করার প্রয়াস চালান। কিন্তু স্থানীয় কলহ ওরিজেনকে বাধ্য করে আলেকজান্দ্রিয়া পরিত্যাগ করতে। তিনি পেলেস্টাইন গমন করেন এবং সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ার সদৃশ সেজরিয়াতেএকটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এর অল্প কিছুকাল পরে (আনুমানিক ২৭০ খ্রি.) মালচিওন (Malchion) এন্টিওকে (Antioch) ও অনুরূপ আদর্শে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর সিরিয়া ভাষাভাষীদের মধ্যে নিসিবিসে (Nisibis) অনুরূপ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়; পরে এটা এডিসিয়াতে স্থানান্তরিত হয় এবং পনের শতাব্দীর মধ্যভাগে পুনরায় এটাকে নিসিবিসে ফিরিয়ে আনা হয়।

এর কিছু পূর্বে গোড়াপন্থী চার্চ এবং এন্টিওক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। গোঁড়াপন্থীগণ আলেকজান্দ্রিয় মতবাদের ন্যায় অভিমত পোষণ করেন যে, যিশুর মধ্যে মানব উপাদান ও ঐশীগুণের চিরন্তন মিলন ঘটে। এন্টিওকীয়গণ যিশুর সম্পূর্ণ মানবত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা জন্মের পর আল্লাহর সাথে ক্ষণস্থায়ী মিলনে বিশ্বাসী। এ দ্বন্দ্বের পূর্বে সাধারণ দার্শনিক বিশ্বাস ছিল যে, পিতা ঈশ্বর রয়েছেন—তিনি সকল বস্তুর উৎস ও প্রথম কারণ। পুত্র অথবা লগোস (logos) অথবা সৃষ্ট আত্মা (Created spirit) তাঁর থেকে একটি নির্গমন (Emanation) এবং তাই পুত্র ঈশ্বর। আফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্দ্রারের প্রভাবে এটাও বিশ্বাস করা হয় যে, প্রত্যেক আত্মা এবং শিশুআত্মাও চিন্তাশক্তির (জড়ীয় বুদ্ধি) অতীত একটি সক্রিয় বুদ্ধি (Active intellect) রয়েছে এবং এটাও ঐশী সত্তা থেকে নির্গত। প্রথম নির্গমন থেকে দ্বিতীয় নির্গমন ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ দ্বন্দ্ব ছিল প্রথম নির্গমন লগোস এবং দ্বিতীয় নির্গমন সক্রিয় বুদ্ধির মধ্যকার সম্বন্ধ বিষয়ক দ্বন্দ্ব।

www.pathagar.com

নেস্টোরিয়ানগণ দ্বিতীয় নির্গমনকে অস্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তাঁর জন্মের পর অস্থায়ীভাবে মানবশিশু দেহে প্রথম নির্গমন প্রবেশ করে। ইফিসাসে সাধারণ পরিষদে ৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে নিন্দে জ্ঞাপনের মাধ্যমে এ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। নেস্টোরিয়াস এবং তাঁর অনুসারীদের ধর্মবিরোধী বলে আখ্যা দেয়া হয়। তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এন্টিওক থেকে বিতাড়ন করা হয় এবং গ্রিক ভাষাভাষী সিরিয়া থেকে দূরে রাখা হয়। তৎপরিবর্তে নেস্টোরিয়াস চার্চ নামে অভিহিত তাঁরা তাঁদের নিজস্ব চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। পারস্য রাজ্যের নিসিবিসে এ চার্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ্রিকদর্শন থেকে তত্ত্ব গ্রহণ করে নিসিবিসের নেস্টোরীয়গণ তাদের খ্রিষ্টান মতবাদ রক্ষা করেন। এভাবে প্রচারধর্মী (missionary) কার্য প্রচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে, কেবল তাঁদের ধর্মতত্ত্বের জন্যই নয়, হেলেনিস্টিক দর্শনের জন্যও বটে। তাই প্রাক-ইসলাম জগতে গ্রিকদর্শনের প্রাচ্যীয় অনুবাদের বাহকরূপে তাদের গুরুত্ব। প্রথম বিভেদের পর আলেকজান্দ্রিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য একটি বির্তকের সৃষ্টি হয়। একগোষ্ঠী যিশুর মানবত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁরা উভয় নির্গমনই ঈশ্বরের চিরন্তন স্বভাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যগোষ্ঠী মনে করেন, যদিও যিশু মানুষ ছিলেন, তবু লগোস এবং বৌদ্ধিক আত্মার মিলন ক্ষণস্থায়ী নয়—এ হচ্ছে চিরন্তন। সিরাগের (Serug) জেকবের নাম অনুসারে এ গোষ্ঠীর নাম হয় জেকোবীয়। জেকব এই নতুন চার্চ সংগঠন করেন। এ বিতর্ক ৪৪৮ খ্রিষ্টাব্দে চেলসিডন পরিষদের উদ্ভব ঘটায়। এ পরিষদ জেকোবীয়দেরকে রাষ্ট্রীয় চার্চ থেকে বহিষ্কার করে। তারা নিজেরাই নিজেদের এক চার্চ গঠন করেন। কান্নাসরিন (চেলসিডন)-এ সেই চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা গ্রিক আলোচনার জন্য নতুন কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়।

খ্রিষ্টান চার্চের দু'বিরাট দ্বন্দ্বের মধ্যকার সময়কাল এবং মুসলিমদের সিরিয়া বিজয়কাল গ্রিক থেকে সিরিয়ভাষায় অনুবাদ, টীকা ও ব্যাখ্যার জন্য অত্যন্ত উর্বর ও সমৃদ্ধশালী কাল ছিল—তবে এই সক্রিয়তা ধর্মতত্ত্বের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। অধিবিদ্যা এবং এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে তা করা হয় শুধু ধর্মতত্ত্বকে রক্ষা বা সমর্থন করার জন্য। চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা পাঠের উপরও জোর দেয়া হয়, কিন্তু কোনো মৌলিকতা দেখা যায় নি।

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিষ্ঠান নিজেকে শুধু ধর্মতত্ত্বেই সীমাবদ্ধ রাখে নি, চিকিৎসাবিদ্যায়ও নিজেকে নিয়োজিত রাখে। গেলনের নির্বাচিত ষোলটি প্রবন্ধের উপর এতদুদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠান রসায়নশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণাকর্ম চালায়। মুসলিমদের সিরিয়া বিজয়ের প্রাক্কালে আলেকজান্দ্রিয়া তার বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য সুপরিচিত ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে যুরাস্ত্রবাদ থেকে ধর্মান্তরিত মার আহ্বা নিসিবিসের অনুরূপে সেলুসিয়াতে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এর কিছুকাল পর বাইজানটাইন সম্রাট এথেন্সের প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেন। পারস্য সম্রাট বিতাড়িত গ্রিক দার্শনিকদের আশ্রয় দান করেন।পারস্যরাজ নওশেরওাঁ জুনদিশাহপুরে যুরাস্ত্রিনিয়ান

www.pathagar.com

সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শুধু গ্রিক ও সিরিয় রচনাবলিই নয় দর্শন বিজ্ঞানের উপর লেখাও পাহ্‌লবিতে অনুবাদ করা হয়। গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞান পদ্ধতিও শিক্ষা দেয়া হয় এবং তা বিকাশ লাভ করে।

এছাড়া আলেকজান্দ্রারের সময়ে হারান (Harran) একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। পরফিরি কর্তৃক সুসংবদ্ধ হয়ে নব্য প্লেটোবাদ ও গ্রিক প্যাগানবাদের কেন্দ্র হিসেবে এটা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এটি একটি মরূদ্যানের ন্যায় কাজ করে বহুকাল যাবৎ টিকে থাকে।

এভাবে দেখা যায় যে, আলেকজান্দ্রিয়া, নিসিবিস, কন্নাসরিন, সেলুসিয়া, জুনদিশাহপুর এবং হারান স্বয়ং প্রকৃতির ন্যায় নবজাত মুসলিম চিন্তার লালনক্ষেত্রে পরিণত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের স্থায়িত্বকালে ব্যতিক্রমধর্মী কোনো দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর জন্ম দিতে পারে নি এবং চিরস্থায়ী কোনো মূল্যবান গ্রন্থও রচিত হয় নি। তবে আনন্দের ও আশার কথা এই যে, তারা জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যকে সজীব করে রাখে বা পরবর্তীকালে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের উর্বর মৃত্তিকা সরবরাহ করে। এই উর্বর মৃত্তিকায় যখন ইসলামি ভাবের বীজ পতিত হয় তখন এক বা দুয়ে নয় শয়ে শয়ে চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটায়। তাই ও' লিয়ারি বলেন, "এসব প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা সরবরাহ করে যার উপর ভিত্তি কর মুসলিম ধর্মতত্ত্ব, দর্শন এবং বিজ্ঞান গড়ে ওঠে।"

চিন্তা ও ভাবের মৌলিকতা থাকা সত্ত্বেও যে কালে ও সময়ে মুসলিম চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল, তা প্রধানত ব্যাপকভাবে অনুবাদকর্মের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর বাগদাদে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান এবং অন্য ভাষা থেকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যকর্মে অনুবাদের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। খলিফার রাষ্ট্রীয় অনুপ্রেরণায় বহু পণ্ডিত অনুবাদকর্মে নিয়োজিত থাকেন। এই পণ্ডিত ও জ্ঞানীদের অনেকেই ছিলেন, ইহুদি, খ্রিষ্টানএবং ইসলামে নবদীক্ষিত ব্যক্তি। তখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 'এলিমেন্টস অব ইউক্লিড'-এর প্রথম অনুবাদক ছিলেন। সময়টা ছিল ৭৮৬ ও ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল। গেলন এবং হিপোক্রেটিসের অধিকাংশ রচনা আবু ইয়াহিয়া অনুবাদ করেন। এটা ছিল ৭৯৬ ও ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকাল। অবশ্য গ্রিক রচনাবলির আদি অনুবাদগুলো তেমন সন্তোষজনক ছিল না।

৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা-আল-মামুন মানমন্দিরসহ (Observatory) একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। এতে পাঠাগার (library) এবং অনুবাদ কার্যালয়ও ছিল। বাগদাদে ছিল এর অবস্থান। হিট্টি বলেন, তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলেকজান্দ্রিয়ান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পরপরই একাডেমী কোনো কোনো ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। এখানে রচনাবলি সিরিয় ও পাহ্‌লভি থেকে অনূদিত হয়, আর সিরিয় ও পাহ্‌লভি নিজেরাই গ্রিক অনুবাদকর্ম। ইয়াহিয়া বিন মাসাওয়াহ এই একাডেমীর প্রধান নিযুক্ত হন। তিনি খলিফা হারুন-আল-রসিদের জন্য চিকিৎসা বিষয়ক কিছু পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেছিলেন বলে কথিত হয়। কিন্তু একাডেমীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা তাঁর শিষ্য হুনায়েন ইবনে ইশাক কর্তৃক রচিত হয়। হুনায়েন সম্ভবত তাঁর অন্য সহযোগীদের

www.pathagar.com

সহায়তায় ইউক্লিডের গ্রন্থ (book of Euclid), গেলনের কিছু রচনাবলি, হিপোক্রেটিস, আর্কিমের্ডিস এবং এপোলনিয়ামাস প্লেটোর রিপাবলিক, লজ টিমিয়াস প্রভৃতি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। তিনি ক্যাটাগরিস, ফিজিক্স, মেগনা মরালিয়া এবং এরিস্টটলের কৃত্রিম খনিজবিদ্যাও (minerology) আরবিতে অনুবাদ করেন। তাঁর পুত্র প্লেটোর সফিস্ট, এরিস্টটলের মেটাফিজিক্স, দি এনিমা, হারমেনিউটিকা এবং পরফিরির ভাষ্য, এফ্রোডিসিয়াস-এর আলেকজান্দ্রার প্রভৃতি আরবিতে অনুবাদ করেন। আবু বিরস মাত্তা বিন ইউনুস এরিস্টোটলের ক্যাটাগরিস ও পরফিরির ইসাগন—এর উপর ভাষ্য রচনা ব্যতীত এরিস্টটলের এনালাইটিকা, পোস্টেরিওরা এবং পয়েটিকার আরবি ভাষান্তর করেন।

হুনায়েন যেমন নেস্টরীয় অনুবাদক দলের প্রধান ছিলেন, তেমনি ছাবিত ইবনে ফুরাহ (৮৩৬ খ্রিঃ) হারানের সাবিয়ান দলের নেতা ছিলেন। হারান তখন দর্শন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। ছাবিত এবং তাঁর শিষ্যগণ গ্রিক গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রচনাবলির অধিকাংশই অনুবাদ করেন এবং পুরাতন অনুবাদগুলোর উন্নতি সাধন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি মুতাদিদ খলিফার আনুকূল্য লাভ করেন।

দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জেকোবীয় অনুবাদক দলের উদ্ভব ঘটে। এ দলের প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন ইয়াহিয়া ইবেন আদি। তিনি বহু আদি অনুবাদের সংস্কার সাধন করেন এবং ক্যাটাগরিস, সফিস্ট, এলেঙ্ক, পয়েটিকস এবং এরিস্টোটলের মেটাফিজিক্সের নব ভাষান্তর করেন। তিনি প্লেটোর লজ, টিমিয়াস গ্রন্থের অনুবাদ করেন। আফ্রোসিডিয়াসের আলেকজান্দ্রার কর্তৃক রচিত ক্যাটাগরিসের এবং থিওফ্রেসটাস কর্তৃক রচিত মরালিয়ার উপর তিনি ভাষ্য রচনা করেন। আবু আলী ইসা ইবনে সুরাহ (১০০৮ খ্রি.) ক্যাটাগরিস ও নেচারেল হিস্ট্রির অনুবাদ করেন।

দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে আরবি অনুবাদ এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, বাগদাদ প্রতিষ্ঠার আশি বৎসরের মধ্যেই আরবগণ এরিস্টোটলের অধিকাংশ রচনার সঙ্গেই পরিচিত হয়ে যান। তারা প্লেটো ও নব্য প্লেটোবাদ, তার রচনা, হিপোক্রেটিস, গেলন, ইউক্লিড, টলেমিএবং পরবর্তী লেখকদের ভাষ্য এবং পারস্য সমালোচকদের সমালোচনার সাথেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। এসব ঘটছিল মুসলিম বিশ্বে, যখন গ্রিকচিন্তা পাশ্চাত্যে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। "প্রাচ্যে" হিট্টি বলেন, "আল-রশিদ এবং মামুন যখন গ্রিক ও পার্সিয়ান দর্শনের গভীর গবেষণায় নিয়োজিত, পাশ্চাত্যে তাঁদের সমকালীন চ্যার্লিমেঞ্জ এবং তাঁর প্রভুগণ তাঁদের স্বীয় যশোগাথা লিখার কাজে ব্যস্ত।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুসলিম চিন্তাধারার উৎস হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ই। আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মুসলমান পবিত্র কোরআন ও হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন। বাহ্যিক উৎস থেকে তারা পারস্য, গ্রিস বিশেষ করে গ্রিক জ্ঞান লাভ করেন। এসব উৎস থেকে জ্ঞান আহরন করে মুসলমানগণ পরবর্তীকালে তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন।

www.pathagar.com

৩. মুসলিম দর্শনের পরিসর ও পরিধি

মুসলিম দর্শনের পরিসর, ক্ষেত্র বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে এবার আলোচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় মুসলিম দর্শনেরও আলোচ্য বিষয়সমূহ রয়েছে এবং এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কোরআন ও হাদিসের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং জীবনের স্বরূপ ও মূল্য নির্ধারণ করাই হচ্ছে মুসলিম দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মুসলিম দর্শনের মূল উৎস হচ্ছে কোরআন ও হাদিস। পরম জ্ঞান ও চরম সত্য লাভের জন্য মুসলিম দর্শন যে প্রয়াস চালায় তার পশ্চাতে রয়েছে কোরআন ও হাদিসের অনুপ্রেরণা। গোঁড়া ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধি-প্রজ্ঞার দ্বারা সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করতে কোরআন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন, কোরআন ঘোষণা করে : "নিশ্চয় ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজনে দিবা-রাতের পরিবর্তন জ্ঞানবানদের জন্য জ্ঞানের নিদর্শন রয়েছে।" (৩ : ১৯০) হাদিস শরিফেও মানুষকে জ্ঞানের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছে : "প্রতিটি বিশ্বাসী নরনারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা অবশ্যই পালনীয়।" "জ্ঞান অনুশীলনের জন্য যিনি গৃহত্যাগ করেন, তিনি আল্লাহ্‌রই পথে পরিভ্রমণ করেন।"

জ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে পাশ্চাত্য দর্শনে প্রধানত তিনটি মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। যথা বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ ও স্বজ্ঞাবাদ। বুদ্ধিবাদ বুদ্ধিকে, অভিজ্ঞতা বাদ অভিজ্ঞতাকে এবং স্বজ্ঞাবাদ স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করে। পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় মুসলিম দর্শনও জ্ঞানলাভের জন্য কিছু ধীশক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে। যথা প্রজ্ঞা, প্রথা ও স্বজ্ঞা। মুসলিম দর্শনের মুতাযিলা সম্প্রদায় প্রজ্ঞা, আশারীয় সম্প্রদায় প্রথা এবং সুফি গোষ্ঠী স্বজ্ঞার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই কোরআন ও হাদিসের আলোকে প্রজ্ঞা, প্রথা ও স্বজ্ঞার সাহায্যে জীবন ও জগতের সমস্যা সমাধান ও মূল্য নিরূপণ মুসলিম দর্শনের আলোচনার অন্তর্গত।

কোরআন ও হাদিসের ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দানকালে বিভিন্ন মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং এ মতপার্থক্যের কারণে মুসলিম চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। যথা মুরজিয়া সম্প্রদায়, কাদারিয়া সম্প্রদায়, জাবারিয়া সম্প্রদায়, সেফাতিয়া সম্প্রদায়, মুতাযিলা ও আশারিয়া সম্প্রদায় প্রভৃতি। এসব সম্প্রদায়ের অভিমত ও বক্তব্যগুলো আলোচনা করা মুসলিম দর্শনের আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারায় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য কারণসমূহ অনুপ্রবেশ করেছে। অবশ্য যেসব বিষয় ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী তা সর্বদাই পরিত্যাজ্য হয়েছে। আভ্যন্তরীণ কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে গতিধর্মী এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ। বর্হিকারণের মধ্যে রয়েছে গ্রিক দর্শন নব্য প্লেটোবাদ, পারসিক ও ভারতীয় ভাবধারার আলোচনা। মুসলিম দর্শনের ক্রমবিকাশের পথে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার কারণে মুসলিম চিন্তাবিদগণ এগুলোর উপর তাঁদের সুস্পষ্ট ভাষ্য, মন্তব্য ও টীকা প্রদান করেন। মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তার অগ্রযাত্রায় এঁদের প্রভাব আলোচনা করাও মুসলিম দর্শনের আওতাভুক্ত।

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে বাস্তবধর্মী ও জীবনকেন্দ্রিক। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম দার্শনিকগণ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। ফলে দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা এবং নতুন ধ্যানধারণা প্রদান করার জন্য তাঁরা সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইবনে সিনা তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য ভুবনবিখ্যাত হয়ে আছেন। ইবনে হায়সাম একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ হিসেবে আজও পরিচিত। আলকিন্দি বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি গণিত, পদার্থ ও দর্শনবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইবনে মাশকাওয়াত একজন পদার্থবিদ, প্রাণিতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক ছিলেন। ইবনে তোফায়েল ও আল রাজীর নাম মুসলিম দর্শন ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। তাঁরা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের আলোচনার বিষয়সমূহও মুসলিম দর্শনের আওতাভুক্ত।

মুসলিম দর্শন জড়, প্রাণ, মন এবং আল্লাহ্‌র বিষয়ে আলোচনা করে। দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যতা, আত্মার অমরতা প্রভৃতি বিষয়ও আলোচনা করে। আল্লাহ্‌র ঐশী গুণাবলি, কোরআন, সৃষ্ট না অসৃষ্ট, ইহজগৎও পরজগৎ সম্পর্কেও মুসলিম দর্শন আলোকপাত করে। সৎ-অসৎ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বিবর্তনবাদ, ধর্ম, বুদ্ধি, মূল্যতত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে মুসলিম দর্শন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে।

ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যতা মুসলিম দর্শনে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা, যদি থাকে তবে তা আল্লাহ্‌র ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এ বিষয় নিয়ে জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলা ও আশারিয়া সম্প্রদায় যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছে। এ সব বিষয়ও মুসলিম দর্শনের পরিসরভুক্ত। ইচ্ছার স্বাধীনতার ন্যায় আত্মার অমরতা প্রশ্নটিও মুসলিম দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দৈহিক বা শারীরিক মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না—এরপরও যে অনন্ত এক জীবন রয়েছে কোরআন ও হাদিসের আলোকে এ বিষয়ের উপর বহু যুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

পবিত্র কোরআন শরিফ পরম আধ্যাত্মিকতার ভাবে ভরপুর। আধ্যাত্মিকতার চরম শীর্ষে উপনীত হওয়ার জন্য প্রতিটি মানুষের থাকে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্মিলনে, মানুষ ও স্রষ্টার ঐক্যবোধ কোরআন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (দঃ)-এর জীবনাদর্শ এই আধ্যাত্মিক সাধনাই মূর্ত প্রতীক। কাশফ (স্বজ্ঞা) ব্যবহারে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ব্যাখ্যা করতে তিনি নির্দেশ দেন। কোরআনের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা মুসলিম চিন্তাবিদদেরকে সূফিতত্ত্বে পরিচালিত করে। মুসলিম দর্শনে মরমি ভাবধারা সুফিবাদ নামে পরিচিত। সুফিতত্ত্বকে ইসলামে মা'রেফাত নামে অভিহিত করা হয়। মা'রেফায় বা গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আত্মা পরম সত্য লাভ করতে সমর্থ হয়। এ অবস্থায় আত্মা আল্লাহ্‌র জ্যোতি লাভে সক্ষম হয়। সুফিতত্ত্ব বিষয়ক সব ধরনের আলোচনা ও পর্যালোচনা মুসলিম দর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম দর্শনের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। উপরে উল্লেখিত সমস্যাবলি ছাড়াও আমাদের এ বাস্তব জগতে ও পরজগতে মানুষ কিভাবে সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে তা নিয়েও মুসলিম দর্শন অনুসন্ধান ও গবেষণা করে।

www.pathagar.com

৪. মুসলিম দর্শন ও ইসলামি দর্শন

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান লাভের প্রয়াসই হচ্ছে দর্শন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ, সমাজ ও জাতির একটি দর্শন রয়েছে। মুসলিম জাতিরও রয়েছে অনুরূপ এক দর্শন। মুসলিম দর্শন কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ, প্রথমত মুসলিম দর্শন কোরআন ও হাদিসে বিধৃত দর্শনকেই বুঝায় এবং দ্বিতীয়ত, ইসলামি চিন্তার বিকাশ সাধনে বিভিন্ন পর্বে আবির্ভূত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বাধীন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে নির্দেশ করে। মুসলিম দর্শন হচ্ছে জীবন ও মূল্যবোধ বিষয়ক আদর্শ। এই আদর্শ অবশ্যই কোরআন ও হাদিসের অনুসরণে হতে হবে। মুসলিম জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের সেই আদর্শ থেকেই এটা বিকশিত ও পরিস্ফুটিত।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ মুসলিম দর্শন ও ইসলামি দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। এই পার্থক্যকরণের প্রশ্ন উঠেছে বিষয়ের ব্যাপকতা বা প্রসারতা নিয়ে। কেউ কেউ মনে করেন মুসলিম দর্শনের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ ইসলামের ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন যুগে উদ্ভূত বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব যা কোরআন ও হাদিসের পরিপন্থী নয় তা মুসলিম দর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের অব্যাহত অগ্রগতির ধারায় পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কোরআন ও হাদিসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন চিন্তাধারাও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে মুসলিম দর্শনের ব্যাপকতা শুধু ইসলামের কোরআন ও হাদিসের বর্ণিত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি এর ব্যাপক প্রসারতা ঘটেছে।

অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করি ইসলামি দর্শনের পরিসর মুসলিম দর্শনের চেয়ে সংকীর্ণতর। কারণ এক. ইসলামি দর্শন শুধু কোরআন ও হাদিসের বর্ণিত তত্ত্বালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুই. ইসলামি দর্শন শুধু কোরআন ও হাদিসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দার্শনিক ধারণাবলিকেই অর্থ করে—যে কোনো মুসলিম চিন্তাকে নয়।

"ইসলামি দর্শন'—এর পরিবর্তে অধ্যাপক এস. এ. হাই-এর অনুসরণে "মুসলিম দর্শন" কথাটি ব্যবহার করা অধিক সমীচীন ও যথার্থ বলে অনুভব করি।

৫. মুসলিম দর্শন ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ব

ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যা ইসলামে আলোচিত হয় নি। ইসলামের সামগ্রিক জীবনবিধান মুসলিম জাতির চিন্তাধারা ও কর্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। এখানে ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, বিজ্ঞান ও দর্শন একাকার হয়ে সুসংহত রূপ লাভ করেছে। পাশ্চাত্য জীবনধারার ন্যায় ইসলামে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ নামে কোনো বিভাগ স্বীকৃত হয় নি। মুসলিম জাতির চিন্তার ইতিহাস ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দর্শনের সৃষ্টি হয় নি। বরং ধর্মে সকল বিষয়ই একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে মুসলিম দর্শন হয়ে উঠেছে ধর্মভিত্তিক, জীবনধর্মী এবং বাস্তব। ইসলামের সার্বজনীন জীবনবোধ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম জাতির সকল প্রকার উৎসাহ ও উদ্দীপনার মূল। পবিত্র কোরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ বা জীবনবিধান। এ পবিত্র গ্রন্থ কেবল ধর্মীয় বিধি-নিষেধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এ

www.pathagar.com

ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পথনির্দেশকও বটে। হাদিস শরিফ পবিত্র কোরআনের ভাষ্য ও বাস্তবায়ন। ইসলামের মূলনীতি ও পরম আদর্শ হচ্ছে পবিত্র কোরআন ও হাদিস। কোরআন ও হাদিসের শিক্ষাই মুসলিম জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির চরম শীর্ষে নিয়ে গেছে। পবিত্র কোরআন অনুসারে মানুষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন জীব। এই প্রজ্ঞা ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করেই মানুষ আজ সর্ববিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে এবং সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের মূলনীতির আলোচনার মধ্যেই চিন্তার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। যুগে যুগে মুসলিম চিন্তাবিদগণ জীবন ও জগতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনাবলিই পরিগ্রহণ করেছেন।

মুসলিম দর্শন ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ব পরস্পর পৃথক বা ভিন্ন নয়—আবার সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়। ধর্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. রশিদুল আলমের ভাষায় "ইসলামের মূলনীতির তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন, কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও আলোচনা, জীবনের পটভূমিতে কোরআনিক মূল্যবোধের রূপায়ণ, হজরতের বাণীর সংকলন ও গ্রন্থন, কোরআন ও হাদিসের মূলনীতির আলোকে চলমান জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিল সমস্যাবলির সমাধান প্রচেষ্টা, কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা ও মূলনীতির আলোকে (ইজতিহাদ) ও শরিয়তের কানুন প্রণয়ন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের (আইনবিজ্ঞান) উৎপত্তি, ইজতিহাদের বিভিন্ন রূপ ইজমা, কিয়াস প্রভৃতি প্রয়োগে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধান প্রচেষ্টা—এইগুলো মুসলিম ধর্মতত্ত্বে আলোচ্য বিষয়। সংকীর্ণ অর্থে এই কারণে যে, ইসলামে জীবন ও ধর্ম, ইহজগৎ ও পরজগৎ স্বতন্ত্রভাবে প্রাধান্য লাভ করে নি। এক সামগ্রিক জীবন-চেতনার উৎস ধর্মই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।" পাশ্চাত্যের মনীষীগণ মুসলিম জাতির চিন্তাধারার এই বিশেষ দিকটি উপলব্ধি করতে পারেন নি যার ফলে পাশ্চাত্য জগতের অনেক মনীষী মুসলিম চিন্তাধারাকে অবমূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু পরিশেষে তাদের নিকট মুসলিম জাতির এই সামগ্রিক দিকটি যখন ধরা পড়েছে তখন একে এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং মুসলিম চিন্তাবিদদের অবদানকে গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করে একে যথার্থ আসনে ভূষিত করেছেন।

পাশ্চাত্য দর্শনে ধর্মতত্ত্বকে যেভাবে ব্যাখ্যায়িত করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ধর্মতত্ত্ব হচ্ছে পরম সত্তা বা স্রষ্টা বিষয়ক আলোচনা। এর দুটো রূপ—এক. প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব (Natural Theology) এবং দুই. প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব (Revealed Theology)। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব বাহ্য-জগৎ ও মানবাত্মার স্বভাব-প্রকৃতি অনুধাবন করে পরম সত্তার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে গবেষণা করে। এ ধরনের ধর্মতত্ত্বকে যৌক্তিক ধর্মতত্ত্ব ((Rational theology) বলেও আখ্যায়িত করা হয়—কারণ, বাহ্যজগৎ ও মানবাত্মার প্রকৃতি ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই যুক্তি অবলম্বনে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে মহাপুরুষদের মাধ্যমে প্রচারিত ঐশী প্রত্যাদেশ হচ্ছে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব। এই প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্বে স্রষ্টা বা আল্লাহর বর্ণনার মাধ্যমেই তাঁর স্বরূপ নিরূপিত হয়। স্রষ্টা ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়। ইসলামি প্রত্যাদেশ 'ওহি' নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

বিষয়বস্তুর দিক থেকে মুসলিম দর্শন ও মুসলিম ধর্মতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নেই। যেমন :

(১) মুসলিম দর্শন ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ব উভয়ই পরম সত্য ও পরম সত্তাকে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সত্যানুসন্ধান কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

(২) মুসলিম দর্শন ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ব উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে অখণ্ড জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা এবং এতে মানুষের অবস্থান, কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং গতি নিরূপণ করা।

(৩) মুসলিম দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উভয়ই সত্তার রহস্য, বিশ্বজগৎ, জীবন ও আত্মা এবং স্রষ্টার বিষয়ে গবেষণা করে এবং অনুসন্ধান কার্য চালায়।

(৪) মুসলিম দর্শন ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ব উভয়েরই উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন ও হাদিস।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে এতসব সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও প্রণালি বা পদ্ধতিগত দিক থেকে ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যকার পার্থক্য বিস্তর। যেমন :

(১) ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক ও গভীর বিশ্বাস। ধর্মতত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে : "ধর্ম হচ্ছে অদৃশ্য শক্তিতে একপ্রকার বিশ্বাস যা আমাদের জীবন ও ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সমন্বয়পূর্ণ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।" অর্থাৎ বিশ্বাসই ধর্মের সার। পক্ষান্তরে "দর্শনের মূলনীতি হচ্ছে এক মুক্ত-স্বাধীন অনুসন্ধান। দর্শন সব কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। দর্শনের কার্যাবলি হচ্ছে তাদের গোপন স্থানে মানবচিন্তার নির্বিচার ধারণাসমূহের অনুসন্ধান করা এবং এ কর্মতৎপরতা চালাতে গিয়ে এটা অস্বীকৃতিতে সমাপ্ত করতে পারে অথবা পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অক্ষমতার কথার অকপট স্বীকৃতি জানাতে পারে।"

(২) মুসলিম ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস ও আবেগপ্রবণতার দ্বারা পরিচালিত। মুসলিম দর্শন যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত। ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসের আধিক্য, যুক্তিতর্কের ভূমিকা গৌণ। মুসলিম দর্শনে বিশ্লেষণের প্রাবল্য; অনুভূতি-আবেগ বিবর্জিত। মুসলিম ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস পূর্বগামী, বিচার-বিশ্লেষণ অনুগামী। ধর্মের মূলনীতিগুলো বিনা বিচারে গ্রহণ ও বিশ্বাস করার পর ধর্মে এর যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়। ইসলামের মৌলনীতি ও বিধিনিষেধ প্রশ্নাতীত—বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রজ্ঞার দ্বারা বিশ্বাসের মূল্যকে শুধু দৃঢ়ীভূত করা হয়। কিন্তু ধর্মদর্শনে আমরা পাই বিশ্বাস বিবর্জিত এক মুক্ত চিন্তা-ভাবনা। ধর্মদর্শনে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণ মুক্ত, স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত।

(৩) মুসলিম ধর্মতত্ত্বের গোঁড়ায় রয়েছে 'ওহি' ও ইলহাম। ওহি বা প্রত্যাদেশ আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবি-রাসুলদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ইলহামও এক ধরনের প্রত্যাদেশ। এ হচ্ছে সাধকগণের ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। নবি-রাসুলগণ ওহি এবং সাধকগণ ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পরম সত্য ও পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করে থাকেন।

www.pathagar.com

(৪) মুসলিম ধর্মতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়বাদকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে মনে করেন। কিন্তু মুসলিম দর্শন বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের প্রাধান্য দান করেন। কোনো কোনো দার্শনিক স্বজ্ঞাবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদকে একমাত্র, শ্রেষ্ঠ উৎস বলে মনে করেন।

(৫) মুসলিম ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টিবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুসলিম দর্শন বিশ্বাস করে অভিব্যক্তিবাদে।

পরিশেষে বলা চলে, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম দর্শন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক আন্তরিক ও নিবিড় সম্পর্ক। পরম ও চরম সত্য-জ্ঞান লাভই হচ্ছে উভয়ের লক্ষ্য। কিন্তু এ সত্যানুসন্ধানে উভয়ের পথ-পদ্ধতি ও প্রণালি কেবল ভিন্ন। ধর্মতত্ত্ব স্বজ্ঞার সাহায্যে এ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালায়। অন্যদিকে ধর্মদর্শন বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে এ অনুসন্ধানক্রিয়া পরিচালনা করে। এ ব্যতীত মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম দর্শন উভয়েরই মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন ও হাদিস। কোরআন ও হাদিসের আলোকে উভয়েই জগৎ ও জীবনের সমস্যাবলি আলোচনায় অগ্রসর হয় এবং এর সমাধানের পথ অনুসন্ধান করে জগৎ ও জীবনের মূল্য নিরূপণের প্রচেষ্টা চালায়।

৬. মুসলিম দর্শনের উৎসসমূহ এবং এর ক্রমবিকাশে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপ্রভাব

মুসলিম ধর্মতত্ত্বের বিকাশ বৈদেশিক প্রভাবের ফল বলে কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন। কিন্তু ইসলাম ও তার অনুসারী আরবদের সম্পর্কে তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, তাদের ধারণা ইসলামের ধর্মমতের (dogmas) মধ্যে দর্শন বা স্বাধীন চিন্তার কোনো অবকাশ নেই এবং আরবদের মধ্যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও গভীর চিন্তার অভাবহেতু তাদের পক্ষে মুক্ত চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব। এসব ভ্রান্ত ও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পাশ্চাত্য কিছুসংখ্যক দার্শনিক মুসলিম ধর্মতত্ত্বের উৎপত্তির পেছনে কিছু ইসলাম-বহির্ভূত সূত্রের সন্ধান পান। তাঁদের ধারণা মুসলিম ধর্মতত্ত্বের পশ্চাতে গ্রিক, খ্রিষ্টীয়, নব্য প্লেটোবাদী, পারসিক ও ভারতীয় প্রভাব রয়েছে। সমালোচকদের এসব ধারণা ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক এবং অনেকটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আমরা জানি মুসলিম দর্শনের মূল হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস। পরবর্তীতে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল ভাবধারা বিভিন্ন খাতে বিকাশ লাভ করে। পবিত্র কোরআন অনুসারে মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। বুদ্ধি ও ধীশক্তির দ্বারা তাকে ভূষিত করা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞান অনুশীলন করা তার কর্তব্য এবং জ্ঞানই তার পূর্ণতা। ইসলাম তার ধর্মবিশ্বাসকে অন্ধভাবে গ্রহণ করার কখনও দাবি করে না। ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের যৌক্তিক এবং প্রজ্ঞাসম্মত অনুধাবন বিশ্বাসেরই অপরিহার্য অঙ্গ।

ইসলামে অন্ধ বিশ্বাসের স্থান নেই। কারণ অন্ধ বিশ্বাস মানুষের ধীশক্তিকে পঙ্গু করে দেয় এবং তাকে পশু পর্যায়ে পর্যবসিত করে। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজ সম্বন্ধে

www.pathagar.com

চিন্তা করা উচিত যাতে করে সে নিজেকে এবং জগৎকে জানতে পারে। জীবন ও জগৎ উভয়কে জানা তার অপরিহার্য কর্তব্য। নবি (দঃ) বলেছেন, "জ্ঞান আহরণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে চীন দেশেও যাও।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য গৃহত্যাগ করে, সে আল্লাহ্‌রই পথে পরিভ্রমণ করে।" জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরজ বা একান্ত কর্তব্য। "শহীদের রক্তের চেয়েও জ্ঞানের কালি মূল্যবান।" "জ্ঞান তোমাদেরই উত্তরাধিকার এবং তা যেন হারানো মেষ, তাকে যেখানে পাও সেখানেই হস্তগত কর।" আল্লাহ্‌র নিকট মহানবির সার্বক্ষণিক প্রার্থনা ছিল "হে আল্লাহ্, বস্তুত পরম প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে পূর্ণ জ্ঞান দান কর।" পবিত্র কোরআন স্বাধীন চিন্তার দ্বারা প্রকৃতিকে অনুধাবন করার জন্য উৎসাহ যোগায়। "প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঘটনা এমনকি কোনো বৃক্ষের একটি পাতাই জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌কে চিনবার একটি রহস্যঘন পুস্তক। আল্লাহ্‌পাক প্রকৃতির মাঝ দিয়েই মানুষের কাছে মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রকাশিত হন।" জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের অনুসন্ধান করা কোরআনের নির্দেশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম দর্শনের মূলে পবিত্র কোরআন ও হাদিস শিক্ষাকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই।

মুসলিম দর্শনের মূলে কোরআন ও হাদিস এ-মত সমর্থন করতে গিয়ে আমরা সেইসব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণের উপস্থিতি অস্বীকার করছি না যা পরবর্তীকালে মুসলিম দর্শনকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করে। প্রথমে আমরা এর আভ্যন্তরীণ কারণসমূহ এবং পরে এর বহিঃ প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

আভ্যন্তরীণ উৎস

প্রথমে ইসলামে রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণে কিছু নীতি প্রণয়ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যার দ্বারা রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ তাদের নিজেদেরকে সমর্থন করতে পারে। নবি (দঃ)-এর ওফাতের পর নেতা নির্বাচনের বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে। উমাইয়াগণ শাসনক্ষমতায় এসে এক নতুন দর্শনের বিকাশ ঘটান যার দ্বারা তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক দাবিকে জোর সমর্থন জানান এবং পরিশেষে এই জীবনদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত রূপ প্রদান করেন। ফলে, জনমনে আশাবাদের সঞ্চার হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম সম্প্রসারণের ইতিহাস থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, বিজিত জাতির বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চালায়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ভাবধারা অত্যন্ত উদার। ইসলাম মানব জীবনের বহিঃ সুবিধাগুলোই কেবল ব্যবহার করে নি, মানবজাতির বৌদ্ধিক জ্ঞান আহরণের উপরও গুরুত্ব দেয়। এই ভাবধারা অনেকাংশে ইসলামে ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা বিকাশে সহায়তা দান করে। ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে ইসলাম ধর্ম বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সংস্পর্শে আসে। ফলে সৃষ্টি হয় একটি নতুন পরিবেশ। এই পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে চলতে হয় ইসলামকে। এই পরিবেশের আলোকে নব ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম নিজেকে মানিয়ে চলে। ব্যাখার এই প্রক্রিয়াই ইসলাম প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী ভাব ও মতবাদ দ্বারা

www.pathagar.com

প্রভাবিত হয়। ইসলামি শিক্ষার সাথে কেউ কেউ গ্রিক, নিউপ্লেটোনিক এবং অন্যান্য বিদেশী এবং প্রাক-ইসলামি ভাবধারা মিশিয়ে ফেলেন। এ কারণেই অনেকে উল্লেখ করেন যে, পরবর্তীতে মুসলমানগণ যে দর্শন গড়ে তুলেন তা হচ্ছে বহিঃভাবধারার সাথে কোরআনের শিক্ষার সংমিশ্রণ।

তৃতীয়ত, নবি (দঃ) জীবনের কোনো কোনো ঘটনাকে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি (আকল), কোনো কোনো ঘটনাকে ঐতিহ্য বা প্রথা (নকল) এবং কোনো কোনো ঘটনাকে স্বজ্ঞার (কাশ্‌ফ) দ্বারা ব্যাখ্যা করতে তাঁর অনুসারীদের উপদেশ দিয়েছেন। এ তিন উৎস থেকে মানবজ্ঞানের উৎপত্তি। ব্যাপক ও জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য এ তিন উৎসেরই প্রয়োজন। কিন্তু এ তিন উৎসের কোনো একটির উপর গুরুত্ব আরোপের কারণে ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন দার্শনিক বা চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। দৃষ্টান্তরূপ, মুতাযিলাগণ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির সাহায্যে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালান। আশারীয়গণ ঐতিহ্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং সুফিগণ গুরুত্ব আরোপ করেন স্বজ্ঞার উপর।

চতুর্থত, নবি (দঃ)-এর ওফাতের পর জীবনের ক্রমবর্ধমান সমস্যাদির সমাধানের জন্য মুসলমানগণকে তাঁর শিক্ষার নতুন ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কারণ নবি (দঃ) যেমন জটিল সমস্যা সমাধানকল্পে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহি বা প্রত্যাদেশ পেতেন, তারা তা পেত না। স্মরণ করা যেতে পারে যে, নবি (দঃ)-এর নিকট কোরআন অবতীর্ণ হতো তখনই যখন তিনি জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র নিকট জ্ঞান ও নির্দেশনা যাচ্ঞা করতেন। সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদা মোতাবেক কোরআন ও হাদিসের নব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রবণতা ইসলামি শিক্ষার ব্যবহার ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবাদের জন্ম দেয়। ইসলামের কিয়াস, ইজমা ও ইজতেহাদ হচ্ছে এ বিভিন্ন মতাবাদেরই সফল উৎস।

১. কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অনুমান) : জীবনের নতুন সমস্যাবলিকে ব্যাখ্যা করার নিমিত্তে মুসলমানগণ এই নীতি বা সূত্র গ্রহণ করে থাকেন। যখন কোনো সমস্যাকে কোরআন ও হাদিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেত না, তখন প্রাচীন শিক্ষার বিশ্লেষণ হতে সমাধান খুঁজার প্রয়াস চালানো হতো। এর ফলে রায় বা সিদ্ধান্তের উদ্ভব ঘটে। রায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে প্রথমে কোরআন ও হাদিসের উপর নির্ভরশীল হতে হয়, তারপর সাদৃশ্যমূলক অনুমানে এবং পরিশেষে ব্যক্তিগত বিচারের উপর নির্ভর করতে হয়।

২. ইজমা (চিন্তা বা সামাজিক মতৈক্য) : এ হচ্ছে কর্তৃত্বের (Authority) নীতি। বিশ্বাস ও আচরণের অনুমোদনযোগ্য পরিসরকে সীমাবদ্ধ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। সমগ্র জাতির বিবেকের উপর এটা নির্ভরশীল। যে বিশ্বাস ও আচরণের সার্বজনীন স্বীকৃতি রয়েছে তাকেই বৈধ বলে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত অভিমতের মূল্য অতি সামান্য যে পর্যন্ত না এটা জনগণের অনুমোদন লাভ করে। জনগণের অনুমোদন লাভ না করা পর্যন্ত ব্যক্তিগত মতামতের কোনো মূল্য নেই।

৩. ইজতিহাদ (গবেষণালব্ধ জ্ঞান) : এটা ইজমারই অনুরূপ অংশ। ধর্মীয় ব্যাপারে এই নীতির ব্যবহার ইসলামই প্রথম সূচনা করে। ইকবাল একে ইসলামের গতিশীলতার

www.pathagar.com

উৎস বলে আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইজতিহাদের এই নীতি ষষ্ঠ শতাব্দীতেই মুসলিমগণ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। সম্ভবত চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশের ক্ষেত্রে এটাই আদিতম স্তর। খ্রিষ্টানগণ ষোড়শ শতাব্দীতে এই নীতিকে স্বীকৃতি দান করে।

ইজাতহাদ অর্থ হচ্ছে নিজেকে জাহির করা অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোরআন ও হাদিস শিক্ষার যথার্থ প্রয়োগ আবিষ্কারের প্রয়াস। সত্যিকার সমাধান পাওয়ার লক্ষ্যে ধর্মবিশ্বাসের ব্যাখ্যার জন্য প্রজ্ঞা ও যুক্তি প্রয়োগ করা উচিত। মুসলমানগণ অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত বিচারের এ অধিকারকে দুটো অর্থে পরিগ্রহণ করেছেন। রক্ষণশীল দল মনে করেন যে, ইজতিহাদ তখনই অনুমোদনযোগ্য হয় যখন এটা ইজমা কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। এ হচ্ছে ইজতিহাদের সংকীর্ণ অর্থ। অন্যদিকে, প্রগতিশীল দল ইজতিহাদকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেন এবং অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইজতিহাদে প্রতিষ্ঠিত বিধিকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার একজনের রয়েছে। ব্যক্তিগত বিচার উত্তম মনে হলে সে তার অনুসরণও করতে পারে। অথবা নিজ এবং জাতির জন্য কল্যাণকর মনে হলে বুদ্ধির পথও অনুসরণ করতে পারে। অজ্ঞতার সেই যুগে মুসলমানগণ এই ইজতিহাদ নীতির প্রজ্ঞাসম্মত ব্যবহারের কারণে জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই ইজতিহাদ প্রশ্নে মুসলমানগণ দু'দলে বিভক্ত। একদল অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভিমত এই যে, বিশ্বাস এবং আচরণের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। কারণ অতীতে এগুলো ইজমার দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু প্রগতিশীল দল, অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অভিমত হচ্ছে যে, ইজতিহাদের এখনও অবকাশ আছে এবং জীবনের আধুনিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় বিধানকে নতুন ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে বিশ্বাসকে যুগোপযোগী করে নিতে হবে যাতে করে বিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে ধর্মমত তাল মিলিয়ে চলতে পারে। প্রগতিশীলগণ মনে করেন যে, পরবর্তীকালের লেখক পূর্ববর্তীকালের মানুষের ভুলভ্রান্তি মেনে নিতে বাধ্য নয়। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে তারা পুরানো শিক্ষাকে আধুনিক চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান এবং তাঁদের মধ্যে আমরা মুসলিম দর্শনের উৎস খুঁজে পাই।

পঞ্চমত, প্রাথমিক স্তরে মুসলিমগণ ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কেউ কেউ ধর্মীয় শিক্ষার মূল ভাবধারা অনুধাবন করার প্রয়াস পান। তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের উত্থাপন করেন, এক ধর্মগ্রন্থের সাথে অন্য ধর্মগ্রন্থের তুলনামূলক বিচার করেন এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে মানুষের মনে স্বাধীন চিন্তার ভাবধারা জাগিয়ে তুলেন। এসব ভাবধারাই পরিণামে কাদারিয়া ও জাবারিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিতর্কের উদ্ভব ঘটায়।

মুসলিম দর্শনের বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব বাহ্য উপাদান প্রভাবিত করেছিল, আমরা এবার সেদিকে ফিরে যাই :

www.pathagar.com

বহিঃউৎস

ক. আরবদের প্রাক—ইসলামি ধারণা : ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশসমূহে যেসব ভাবধারা বিদ্যমান ছিল সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ কাজ। তবুও বিশ্বখ্যাত আরবি কবিতা 'মোয়াল্লাকাত ও মোফাদ্দলিয়াত' হতে এবং পবিত্র কোরআনের বর্ণনা থেকে আমরা তৎকালীন আরবদের জীবনাদর্শ, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হতে পারি। তাদের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, ইসলাম আবির্ভাব-পূর্ব আরবগণ ছিল জড়বাদী, অদৃষ্টবাদী ও ভোগবাদী। এর মধ্যে অদৃষ্টবাদ ইসলামে অনুপ্রবেশ করে বেশ কিছুটা আধিপত্য বিস্তার করে। প্রাক-ইসলামি আরবগণ যে নিয়তিতে বা অদৃষ্টে বিশ্বাস করত—পবিত্র কোরআনে তার আভাস রয়েছে।

খ. গ্রিক প্রভাব : মুসলিম দর্শনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য বাহ্য-প্রভাবের মধ্যে গ্রিক দর্শনের প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হয়। গ্রিক দর্শনের পিথাগোরাস, প্লেটো, এরিস্টোটল ও নব্য-প্লেটোবাদীদের দর্শন মুসলিম চিন্তাবিদদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাদের তত্ত্ব ও দর্শন প্রকৃতপক্ষে মুসলিম দার্শনিকবৃন্দের চিন্তার খোরাক সরবরাহ করে। আব্বাসীয় শাসনামলে লক্ষ্য করা যায় যে, মুসলিম চিন্তাবিদগণ প্লেটো ও এরিস্টোটলের রচনা আরবিতে অনুবাদ করেন। তাঁরা প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের অন্যান্য গ্রন্থও আরবিতে অনুবাদ করেন। এ সময় "ফালাসিফা' সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয়ই নয়, অন্যান্য বিষয়, যথা—গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বহু রচনাও মূল ও আদি গ্রিক ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এরিস্টোটলের দর্শন সম্বন্ধে খ্রিষ্টান দার্শনিকগণ জ্ঞানলাভ করেন মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট থেকে। সেন্ট অগাস্টিন ও সেন্ট টমাস একুইনাসের খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে এ সত্যের সন্ধান মেলে।

প্লেটো এবং এরিস্টোটলের দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ আরবিতে অনুবাদ হওয়ার কারণে গ্রিকদর্শনের নব্য-প্লেটোবাদ বা খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারা মুসলিম দর্শনে অনুপ্রবেশ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর উপর এই প্রভাব সুস্পষ্টরূপে লক্ষণীয়। কিন্তু বিষয়টি যথার্থ নয়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম চিন্তাবিদদের আরবি অনূদিত গ্রন্থাবলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং এরই মাধ্যমে খ্রিষ্টান দার্শনিকগণ এরিস্টোটেলের অধ্যাত্ম দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হন। অবশ্য এরিস্টোটলের লজিক সম্বন্ধে তাঁরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে, মুসলমানগই খ্রিষ্টানদের নিকট গ্রিক দর্শন-জ্ঞান সরবরাহ করেন। খ্রিষ্টান দর্শনের ন্যায় মুসলিম দর্শনেরও সেই সমস্যাটি ছিল যে কিভাবে ওহি বা প্রত্যাদেশের সাথে মানববুদ্ধির সংগতিবিধান ও সমন্বয় সাধন করা যায়। এ ক্ষেত্রে মুসলমানগন গ্রিকদর্শনের যুক্তিবাদী জ্ঞানকে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার জোর প্রচেষ্টা চালান। তাঁদেরই আবিষ্কৃত যুক্তি-পদ্ধতি খ্রিষ্টান চিন্তাবিদগণ গ্রহণ করেন। মুসলিম দার্শনিকগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত বহু ধ্যান-ধারণা ও যুক্তি-পদ্ধতি খ্রিষ্টানদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে মুসলিম

www.pathagar.com

দার্শনিকদের চিন্তার সাহায্য ব্যতিরেকে স্কলাস্টিক (Scholastic) চিন্তাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

আসল কথা হচ্ছে, সময় ও পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার উপর মুসলিম দর্শন স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে। বৈদেশিক প্রভাবের চেয়ে মুসলিম মন-মানসের স্বকীয় বিশিষ্টতা এর ক্রমবিকাশের পথে প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বহু বৈদেশিক প্রভাবের সংস্পর্শে এলেও মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব চিন্তা, ধ্যান—ধারণা কখনও পরিত্যাগ করেন নি। কোরআন ও হাদিসের রূপরেখা থেকে ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রয়োজন ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই এর ক্রমউন্নতি সাধিত হয়েছে। ডি বত্তরের ভাষায় "ইসলামে এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যাঁরা তত্ত্ব আলোচনা না করে থাকতে পারেন নি, এমন কি গ্রিকদর্শনের আবরণের মধ্যেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট।"

কিভাবে ইসলামি সাম্রাজ্যে গ্রিকদর্শন অনুপ্রবেশ করে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একটা বিশদ বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

ও'লিয়ারি মন্তব্য করেন মুসলিম চিন্তা বিকাশ লাভ করে হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি সংপৃক্ত পরিবেশে। প্রকৃতপক্ষে সে সময়কার মুসলিম চিন্তাবিদদের লেখা থেকে আমরা গ্রিকদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি। জগতের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকসমূহকে আরবিতে অনুবাদ করার জন্য শিক্ষার দুই প্রধান পৃষ্ঠপোষক আল-মনসুর ও আল-মামুন তৎকালীন প্রখ্যাত বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। প্লেটো ও এরিস্টোটলের রচনাবলি অনূদিত হয় এবং এগুলো মুসলিম চিন্তাবিদদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। মুতাযিলা, আশারিয়া দার্শনিকবৃন্দ এবং সুফি মতবাদ আলোচনাকালে গ্রিকদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে। অন্যান্য বহিঃপ্রভাব অতিক্রম করার পূর্বে আরবদের নিকট গ্রিকদর্শন পরিবাহিত হওয়ার কালে এর অবস্থা বর্ণনা এবং প্রাচ্যের আবহাওয়ায় এর গতি নির্ণয় করা আবশ্যক। পরিবাহনের এই প্রক্রিয়ায় গ্রিকদর্শন অনেক পরিবর্তিত হয় এবং খ্রিষ্টান শিক্ষার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে হেলেনীয় দর্শন গ্রিস থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করেছিল এবং সেখান থেকে এটা সিরিয়ায় বিস্তার লাভ করে। প্লটিনাসের নব্য প্লেটোবাদ (২৬৯ খ্রি.) পরফিরির এরিস্টোটলীয় উপাদানের সাথে সংমিশ্রিত হয়। পরফিরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে রোমে এ শিক্ষাদান করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক এ মতবাদ গৃহীত হয় যার পুরোধা ছিলেন ক্লিমেন্ট এবং ওরিজেন। তাঁরা উভয়েই খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের সাথে সমকালীন দর্শনকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস চালান। কিন্তু স্থানীয় কলহ অচিরেই ওরিজেনকে আলেকজান্দ্রিয়া পরিত্যাগে বাধ্য করে। তিনি প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার অনুরূপে সেজরিয়াতে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এর অব্যবহিত পরই (আনুমানিক ২৭০ খ্রি.) অনুরূপ ছাঁচে মানচিওন এনটিওকে আরেকটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর নিসিবিস-এ অনুরূপ আরো একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিসিবিসি

www.pathagar.com

ছিল সিরিয়া ভাষাভাষীদের কেন্দ্রস্থল। পরবর্তীতে এ সম্প্রদায় এডেসাতে স্থানান্তরিত হয় এবং পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি পুনরায় একে নিসিবিসে ফিরিয়ে আনা হয়।

এর সামান্য পূর্বে গোড়া চার্চপন্থী এবং কনস্টানটিনোপোল-এর বিশপ নেস্টোরিয়াস-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এন্টিওক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিরোধের কারণ ছিল যিশুখ্রিস্টের মানবত্ব ও ঐশীত্ব প্রশ্ন নিয়ে। গোঁড়া চার্চপন্থীগণ আলেকজান্দ্রীয় মতবাদের অনুসারী। তারা আলেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় মনে করেন যে, ক্রিস্টে যখন ঐশীত্ব প্রবেশ করে, তখন তা তাঁর মানবত্বের সাথে মিশে যায়। অপরপক্ষে, নেস্টোরিয়দের মতে খ্রিস্টের মধ্যে যখন ঐশীত্ব প্রবেশ করে তখনও তাঁর মানবত্বকে অক্ষুণ্ন ও পৃথক রাখা হয়। এই দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধের পূর্বে সাধারণ দার্শনিক বিশ্বাস ছিল যে, জন্মদাতা এক ঈশ্বর রয়েছেন, যিনি উৎস ও সকল বস্তুর কারণ এবং পুত্র বা লগোস (বুদ্ধি) বা খ্রিষ্ট-আত্মা তাঁর থেকে নির্গত এবং সে কারণেই নির্গত আত্মা ঈশ্বরপুত্র বা মানবপুত্র (যিশু)। এফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্দ্রারের প্রভাবে (আনুমানিক ২০০ খ্রি.) এটাও বিশ্বাস করা হতো যে, প্রত্যেক আত্মা এবং খ্রিষ্টের আত্মায়ও চিন্তাশক্তির (জড়ীয় বুদ্ধি) ব্যতীত সক্রিয় বুদ্ধি রয়েছে এবং এটাও ঐশী সত্তা থেকেই নির্গত। দ্বিতীয় নির্গমন প্রথম নির্গমন থেকে আগত বলে মনে করা হয়। এ দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষেই ছিল প্রথম নির্গমন লগোস এবং দ্বিতীয় নির্গমন অর্থাৎ সক্রিয় বুদ্ধির মধ্যকার সম্বন্ধ পম্পর্কিত।

নেস্টোরীয়গণ দ্বিতীয় নির্গমনকে অস্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, প্রথম নির্গমন জন্মের পর মানব খ্রিস্টে অস্থায়ীভাবে প্রবেশ করেছিল। ৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে ইফিসিয়াতে সাধারণ পরিষদে নিন্দা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। নেস্টোরিয় ও তার অনুসারীদের প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী বলে আখ্যা দেয়া হয়; ক্রমে ক্রমে এন্টিওক এবং সিরিয়া ভাষাভাষীদের পরিবেশ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। গোঁড়া চার্চপন্থীদের পরিত্যাগ, নেস্টোরীয় চার্চ নামে পরিচিত তাদের স্বীয় প্রতিষ্ঠিত চার্চ, পারস্য রাজ্যের আশ্রয়ে নিসিবিসে তাদের অবস্থানের ফলে শক্তি বৃদ্ধি হয়—সেই নিসিবিস যা বর্তমানে পারস্য রাজ্যের অধীন।

গ্রিকদর্শন থেকে তত্ত্বসমূহ টেনে নিসিবিসের নেস্টোরিয়গণ তাঁদের খ্রিষ্টীয় মতবাদ রক্ষা করেন। এভাবে প্রচারধর্মী কার্য প্রচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে কেবলমাত্র তাদের ধর্মতত্ত্বের জন্যেই নয়, তাঁদের হেলেনীয় দর্শনের জন্যেও। তাই ইসলাম-পূর্ব জগতে গ্রিকদর্শনের প্রাচ্যীয় ভাষান্তকরণের পরিবাহকরূপে তাঁদের গুরুত্ব। প্রথম বিভেদের কিছুকাল পর আলেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য একটি দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে। খ্রিষ্টের মানবত্বকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে একদল অভিমত পোষণ করেন যে, উভয় নির্গমনই ঈশ্বরের চিরন্তন স্বভাবের।

অনুসারী মনোফিসাইটস অথবা জেকোবাইটস নামে পরিচিত অন্যদলের অভিমত হচ্ছে যে, যদিও যিশু মানব ছিলেন, তবুও লগোস এবং বুদ্ধিগত আত্মার মধ্যকার মিলন ক্ষণস্থায়ী ছিল না যেমন নাকি নেস্টোরিয়গণ মনে করে থাকেন। এ মিলন ছিল চিরন্তন। এ দ্বন্দ্ব ৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে চেলসিডন পরিষদের জন্ম দেয় যা মনোফিসাইটসদের রাষ্ট্রীয় চার্চ

www.pathagar.com

থেকে বহিষ্কার করে। তাঁরা তাদের নিজস্ব চার্চ গঠন করেন এবং তাঁদের আবাসভূমি হয় কান্নাসিরিন (চালসিসে) যা গ্রিক আলোচনার নতুন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

খ্রিষ্টান চার্চের দু'বিরাট দ্বন্দ্বের মধ্যকার সময়কাল এবং মুসলমান কর্তৃক সিরিয়া বিজয় গ্রিক থেকে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ, সমালোচনা এবং আলোচনার জন্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সক্রিয়তা ধর্মতত্ত্বের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। এরিস্টোটলের আধ্যাত্ম দর্শন ও তর্কবিদ্যা পাঠের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু সে কেবল প্রধানত ধর্মতত্ত্বকে রক্ষা করার খাতিরেই। চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা পাঠ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কোনো মৌলিকত্ব প্রদর্শিত হয় নি।

আলেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায় নিজেকে কেবল ধর্মতত্ত্বেই নিয়োজিত রাখে নি, চিকিৎসাবিদ্যাও নিয়োজিত রাখে। গ্যালনের নির্বাচিত ষোলটি প্রবন্ধের উপর ভাষণ প্রদান করা হয়। চিকিৎসাবিদ্যা ব্যতীত আলেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায় রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যায়ও গবেষণাকর্ম চালান। মুসলমানদের সিরিয়া বিজয়ের পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি যুরাস্ত্রবাদ থেকে ধর্মান্তরিত মারআহ্বা নিসিবিসের অনুরূপে সিলোসিয়াতে এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এর কিছুকাল পর যখন বাইজেনটাইন সম্রাট এথেন্সে সম্প্রদায়সমূহ বন্ধ করে দেন, তখন পারস্য, সম্রাট নওশেরআঁ বিতাড়িত গ্রিক দার্শনিকদের আশ্রয় দান করেন এবং জুনদিশাহপুরে যুরাস্টিনিয়ান সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শুধু গ্রিক ও সিরীয় রচনাবলিই নয়, দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর ভারতীয় রচনাও পাহ্লবিতে অনুবাদ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতীয় ও গ্রিক পদ্ধতি উভয়ই শিক্ষা দেয়া হয় এবং ক্রমোন্নতি লাভ করে।

এতদ্ব্যতীত, আলোকজান্ডারের সময়ে হারানে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। পরফিরি কর্তৃক গঠিত নব্য-প্লেটোবাদ ও গ্রিক ধর্মবাদের কেন্দ্র হিসেবে এটি বহুকাল যাবৎ টিকে থাকে। গ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি মরুদ্যানের ন্যায় দীর্ঘকাল বহাল থাকে।

এভাবে আলেকজান্দ্রীয়া, নিসিবিস, কান্নাসিরিন, সেলুসিয়া, জুনদিশাহপুর এবং হারান স্বয়ং প্রকৃতির ন্যায়ই নবজাত মুসলিম চিন্তার প্রকৃত লালনক্ষেত্রে পরিণত হয়। এসব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের অস্তিত্বকালে ব্যতিক্রমধর্মী মেধাসম্পন্ন কোনো দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর জন্ম দিতে পারে নি কিংবা স্থায়িত্বশীল কোনো মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করতে পারে নি। কিন্তু বৌদ্ধিক ঐতিহ্যধারাকে তারা সজীব রাখে যা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের উর্বর মৃত্তিকা প্রদান করে। এবং যখন ইসলামের ভাবধারার দ্বারা বীজ সরবরাহ হয়, তখন ডজন ডজন নয় বরং শত শত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। যেমন ও' লিয়ারি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা সরবরাহ করে যার উপর মুসলিম ধর্মতত্ত্ব, দর্শন এবং বিজ্ঞান সুদৃঢ় শিকড় গেড়েছিল।

গ. খ্রিষ্টীয় ও নব্য প্লেটোবাদী প্রভাব : আরবদের নিকট গ্রিক দর্শন পরিচিত করে দেয়ার জন্য খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকগণই যে মূলত দায়ী তা সুস্পষ্ট। মুসলিম খলিফাগণের দরবারে এসব ধর্মপ্রচারকের অনেকেই উচ্চপদে আসীন ছিলেন। এসব ধর্মপ্রচারক এবং মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় বিতর্ক করার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। বিশেষ করে উমাইয়া

www.pathagar.com

রাজত্বকালে এসব ধর্মপ্রচারক মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। উমাইয়াগণ এত উদার ছিলেন যে, তাঁরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে বহু অমুসলিমকে নিয়োগ দান করেন। আব্বাসীয় শাসনামলে বাগদাদ যখন মুসলিম জগতের রাজধানীতে পরিণত হয়, তখন এটা বৃহত্তম আন্তর্জাতিক নগর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বাগদাদ তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আন্তর্জাতিক সম্মিলন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ফলে মুসলমানগণ বিভিন্ন ধরনের বহিঃ-ভাবধারার সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে। আল-মনসুর ও আল-মামুনের রাজত্বকালে বাগদাদে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একাডেমীর কাজ ছিল বিশ্বের উল্লেখযোগ্য মূল্যবান সাহিত্যসমূহ আরবি ভাষায় অনুবাদ করা। অনুবাদকদের অনেকেই খ্রিষ্টান ও ভারতীয় পণ্ডিত ছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, নব্য প্লেটোবাদী কর্তৃক সংশোধিত হয়েই খ্রিষ্টান ধর্ম মুসলমানদের নিকট পৌঁছেছিল।

ঘ. পারসিক প্রভাব : মুসলমানদের দ্বারা পারস্য বিজিত হবার পর পারস্যের বহুলোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বিজিত দেশের জ্ঞানী-গুণী এবং পণ্ডিতবর্গ যখন ইসলাম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন, তখন স্বভাবতই তাঁদের দেশীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ছাপ এতে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে তা ইসলামি চিন্তাধারার মধ্যেও প্রবেশ করে। শিয়া ও সুফিগণের পরবর্তী বিকাশধারায় পারসিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভবের জন্য পারসিক প্রভাবই প্রধানত দায়ী যার ফলে ইসলাম-বহির্ভূত কিছু কিছু বিশ্বাস ও আকিদা শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন : ঐশীভাবে নিযুক্ত ইমামের ধারণাটি। সুফি দর্শনের উৎপত্তি পারসিক প্রভাবের ফল বিদেশী পণ্ডিতদের এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। সুফি দর্শনের মূলভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস। একথা অনস্বীকার্য যে, অনেক সুফি সাধক পারস্যদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সুফি দর্শনের ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়ে কিছু পারসিক প্রভাবও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে সুফি দর্শন পারিসক প্রভাবের পরিণতি এমন বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। মুসলিম এবং পারসিকদের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। যেমন, পারসিকগণ অগ্নির উপাসক এবং দ্বৈতসত্তার পূজারী। অন্যদিকে, মুসলমানই তাওহিদবাদী, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী। এক আল্লাহ্‌র চিন্তা ও ধ্যানে প্রতিটি মুসলমানই নিবেদিতপ্রাণ। অগ্নি-উপাসক ও দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাসী পারস্যবাসীদের ধ্যান-ধারণা একেশ্বরবাদী মুসলমানদের চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে এ ধরনের ধারণা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক।

ঙ. ভারতীয় প্রভাব : ভারতীয় চিন্তাধারার সাথে মুসলমানদের সংযোগ ঘটে আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে। আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের কাল থেকে খলিফা আল-মামুনের মৃত্যু পর্যন্ত (৭৫৪-৮৩৩ খ্রি.) সময়কালকে মুসলিম সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ সময়ে বহু মৌলিক গ্রন্থের আরবি অনুবাদ করা হয় এবং এরই সুযোগে ভারতীয় ভাবধারা মুসলিম দর্শনে অনুপ্রবেশ করে। ইসলামের সুফি দর্শন ভারতীয় ভাবধারা থেকে উদ্ভূত—এ ধরনের মন্তব্য কেউ কেউ করে থাকেন। কিন্তু বিষয়টি আদৌ সত্য নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুফি দর্শনের মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং রাসুল (দঃ)-এর

www.pathagar.com

জীবনাদর্শ হতেই সুফি মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। একথা সত্য যে, ভারতীয় মরমিবাদ এবং ইসলামের সুফিবাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ড. এনামুল হক সুফিবাদের উপর বৌদ্ধদর্শনের প্রভাবের কথা বলেন। ড. দাশগুপ্ত সুফিদের 'রুহ'-এর ধারণা এবং উপনিষদে 'আত্মা'র ধারণার মধ্যে মিল দেখিয়ে সুফিবাদের উপর উপনিষদের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। নিকলসন সুফিদর্শনের 'ফানা' এর ধারণা ভারতীয় উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু এসব সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ইসলামের সুফিবাদ ভারতীয় চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত একথা কিছুতেই স্বীকার কর যায় না। নিম্নে আমরা ভারতীয় মরমিবাদ ও ইসলামি মরমিবাদের মধ্যে পার্থক্য ও অনৈক্য প্রদর্শন করছি যার থেকে উপলব্ধি করা যাবে যে, সুফিবাদ ভারতীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্ন।

প্রথমত, ধর্মবিশ্বাসে ভারতীয়গণ পৌত্তলিক বা বহু ঈশ্বরপূজক। অন্যদিকে মুসলমানগণ নিরাকার ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপাসক। মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র তাওহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধদর্শন নিরীশ্বরবাদী অপরপক্ষে সুফিগণ এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী। তৃতীয়ত, সাধারণত বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনের নির্বাণের সাথে সুফিদের 'ফানা'র সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধদর্শনের 'নির্বাণ' এবং সুফিদর্শনের 'ফানা' শব্দের অর্থ হচ্ছে অবলুপ্ত বা বিলোপ সাধন। বৌদ্ধদের নির্বাণেই সবকিছুর সমাপ্তি তারপর আর কিছু নেই; অর্থাৎ এটা নঞর্থকধর্মী। অন্যদিকে সুফিদের 'ফানাতেই' সবকিছু শেষ নয়। 'ফানার' পরও রয়েছে আরেকটি স্তর—বাকা স্তর বা চিরস্থায়ী অবস্থান। অর্থাৎ 'ফানা' সদর্থকধর্মী। এই বাকা স্তরে উপনীত হওয়াই হচ্ছে মুসলমান ও সুফির জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে চিরস্থায়ী অবস্থান। চতুর্থত, উপনিষদীয় 'আত্মার' ধারণা আর সুফিদের 'রুহ'-এর ধারণা এক ও অভিন্ন নয়। তারা সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা বৈশিষ্ট্যের। সুফিদের 'রুহ'-এর রয়েছে অতি উচ্চমানের স্তর যা অদ্যাবধি রহস্যাবৃতই হয়ে আছে। এতসব মতপার্থক্য সত্ত্বেও কি যুক্তিসংগতভাবে বলা চলে যে, মুসলিম দর্শন ভারতীয় ভাবধারা হতে উদ্ভূত? মুসলিম দর্শন ভারতীয় ভাবধারা থেকে উদ্ভূত নয়, প্রভাবিতও নয়—এর রয়েছে নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যার মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস।

৭. মুসলিম দর্শনের সম্ভাব্যতা

মুসলিম দর্শন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিরূপ মনোভাব রয়েছে। পাশ্চাত্য সমালোচকদের কেউ কেউ মুসলিম দর্শন বলতে কিছু আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা মুসলিম দর্শনের সম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। দর্শনের ক্রমবিকাশধারায় মুসলিম দার্শনিকদের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানের কথা যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাও একে বিদেশী প্রভাবজাত বলে উল্লেখ করেছেন। আলফ্রেড গুইলাম বলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যেও মাঝে-মধ্যে 'আরবি দর্শন'-এর সন্ধান পাওয়া যায়। কোনো কোনো লেখক আরবীয় দর্শনকে প্রাচীনদের মতবাদের সংমিশ্রণ বলে মনে করেন যার মধ্যে সকল রকমের ভিন্নজাতের উপাদান প্রক্ষিপ্ত ও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন যে, আরবীয় দর্শন বলতে কিছু নেই। আরব ভাষাভাষীগণ সেই গ্রিক দর্শন

www.pathagar.com

পরিগ্রহণ করেন যা সিরীয় খ্রিষ্টানদের এবং হাররানের সংস্কৃতিসম্পন্ন পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং ভারত ও পারস্য থেকে ধার করা কিছু উপাদান এতে সংযোজন করেন। ডি. বত্তর বলেন. "গ্রিক ভাষা হতে অনূদিত গ্রন্থাবলির উপর নির্ভর করে মুসলিম দর্শন সর্বদা সংগ্রহ হিসেবে চলে এসেছে। এর ইতিহাসের গতিতে সৃষ্টির পরিবর্তে ছিল সংগ্রহ প্রক্রিয়া। মুসলিম দর্শনকে সত্যিকার অর্থে দর্শন বলে আমরা আদৌ অভিহিত করতে পানি না।"

মুসলিম দর্শনের সম্ভাব্যতা বিষয়ে এ হচ্ছে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমত ও মন্তব্য। তাঁরা তাঁদের এসব মন্তব্যের স্বপক্ষে বাস্তব যুক্তির যে অবতারণা করেন তা নিম্নরূপ :

(১) ইসলাম ধর্ম পেশীশক্তি দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। যে ধর্ম পেশী বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল সে ধর্মে দার্শনিক ভিত্তি আছে বলে মনে করা যায় না।

(২) আরবগণ যুদ্ধপ্রিয় জাতি। যুদ্ধ ও সংগ্রামের ভেতর দিয়েই তাদের জীবন পরিচালিত। সুতরাং তাদের মধ্যে দার্শনিকসুলভ কোনো মন-মানসিকতা থাকতে পারে না।

(৩) কোরআন ধর্মবিশ্বাসে তার অনুসারীদের নিকট থেকে অন্ধ-আনুগত্য দাবি করে। ফলে, এখানে স্বাধীন চিন্তার কোনো অবকাশ নেই।

মুসলিম দর্শনের বিরুদ্ধে এসব কাল্পনিক অভিযোগ বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ অভিযোগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ অভিযোগগুলো ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। শুধু তাই নয়, এ অভিযোগগুলো উদ্দেশপ্রণোদিত ও বিদ্বেষপ্রসূত। যাই হোক, এবারে আমরা এ অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণে সচেষ্ট হবো।

প্রথমত, ইসলাম ধর্ম পেশীশক্তি দ্বারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল বলে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে অভিযোগ আনয়ন করেন তার পশ্চাতে ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়েই এ ধরনের অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে : 'ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই, সত্য ভ্রান্তির পথ থেকে আপন দীপ্তিতে দীপ্তমান।' সুরা ২, আয়াত ২৫৬। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআনে উল্লেখ হয়েছে : "তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেন না।" সুরা২, আয়াত ১৯০। অন্যের ধর্মের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার জন্য কোরআনের নির্দেশ : "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।" সুরা ১৯০। উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ এ সাক্ষ্য বহন করে যে ইসলামে অসি প্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের কোনো স্থান নেই। হার্ডির মন্তব্য : ইসলাম সর্বত্রই তার মানবিক আবেদনে গৃহীত হয়েছে। 'ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে নৈতিক আবেদনই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।" আমরা জানি ইসলাম হচ্ছে স্বভাবধর্ম বা দ্বীন-ই-ফিতরাত। ইসলাম আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, তৎকালীন সামাজিক,

www.pathagar.com

নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থানই ইসলামের ন্যায় একটি উদারধর্মী মানবতাবাদী ধর্মের জন্ম দেয়। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে কার্যকর ভূমিকা পালন করা হয় তা হচ্ছে তার নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা। পবিত্র কোরআনের সাথে সংগতি রেখে রাসুল (দঃ)-এর আদর্শিক জীবনযাপন প্রণালি সহজেই তৎকালীন কলহলিপ্ত আরবগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাসুল (দঃ)-এর সহনশীলতা, উদারনীতি, চরিত্রমাধুর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি গোষ্ঠী-চরিত্রের উপর মানবিক ও নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের সাম্যের বাণী, ভ্রাতৃত্ববোধ তাঁদেরকে নতুন জীবন লাভের প্রেরণা যোগায়। ইসলাম শান্তির ধর্ম—বিশ্বজনীন শান্তি কামনাই এর লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষই সুখ ও শান্তি চায়। মানুষের রয়েছে দ্বিবিধ কামনা, এক পার্থিব, দুই অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক কামনা। ইসলাম মানুষের এ দ্বিবিধ কামনারই প্রয়োজন মেটায়। বস্তুত, রাসুল (দঃ)-এর জীবনেও আমরা দেখি পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়। সারকথা হচ্ছে : ইসলামের উদারনীতি ও বিশ্বজনীন আবেদনের কারণেই এর প্রচার ও প্রসার ঘটে। তাই, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিযোগ—বল প্রয়োগে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এ কথা শুধু কাল্পনিক নয়, উদ্দেশ্যমূলক ও বিদ্বেষজাতও বটে।

দ্বিতীয়ত, আরবগণ যুদ্ধ ও কলহপ্রিয় জাতি, সুতরাং তাঁদের মধ্যে দার্শনিকসুলভ মনমানসিকতা থাকতে পারে না—পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এরূপ অভিযোগও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, সূক্ষ্ম-চিন্তা, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এবং সৃজনীশক্তির ক্ষেত্রে আরব জাতির গৌরব আজও অক্ষুণ্ন আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্রোত মধ্যযুগে যখন পতনোন্মুখ, তখন মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণই সেই স্রোতধারাকে অব্যাহত রাখেন। আরবদের সাহিত্য, শিল্পকলা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা সে সময়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুসলিম চিন্তাবিদদের অবদান স্বীকার করা প্রসঙ্গে উইলিয়াম ম্যুর বলেন, "এই পণ্ডিতগণের পরিশ্রমের ফলেই মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় জাতিসমূহ তাদের নিজস্ব বিস্মৃত সম্পদ প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হয়েছিল।" আরবগণ গ্রিকদর্শনকে পতনের মুখ থেকে রক্ষা করেন। তাঁরা দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রিক গ্রন্থসমূহ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁদের আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা এর উন্নতি সাধন করেন। বহু ভারতীয় ও ফারসি গ্রন্থও আরবিতে অনূদিত হয়। রাসুল (দঃ)-এর মৃত্যুর দুইশত বৎসরের মধ্যে আরবগণ পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হন। অন্যদিকে, তাঁরা কোরআন ও হাদিসের আলোকে জীবন ও জগৎকে নতুন ব্যাখ্যা দান করে চিন্তার রাজ্যে নবযুগের সূচনা করেন। হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জাফর সাদেক, হাসান বসরির ন্যায় সাধকগণ মুসলিম দর্শনের ভিত নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবধারার সংস্পর্শে এসে মুসলিম দর্শন আরো উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। মুসলিম খলিফাদের শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেই সম্পর্কে অধ্যাপক জে. হেল বলেন, "জ্ঞান প্রচারে মনীষীগণ সর্বপ্রকার উৎসাহ প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনীর সন্তান থেকে শুরু করে কারিগরের

www.pathagar.com

সন্তান সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়। দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করতো, শিক্ষকদেরকে অধিক পরিমাণে বেতন দেয়া এবং সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হতো। কায়রোর রাজকীয় গ্রন্থাগারে এক লক্ষ পুস্তক এবং কর্ডোভা রাজকীয় গ্রন্থাগারে তার ছয় গুণের অধিক পুস্তক ছিল। গ্রন্থসমূহের সংগ্রহণ এবং পণ্ডিতবর্গের সমাবেশকরণ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকগণ কি মূল্যবান সেবা প্রদান করেছিলেন।"

আরবজাতির সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, জীবন-জিজ্ঞাসার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার স্বীকৃতিস্বরূপ পাশ্চাত্য মনীষীগণ যে মন্তব্য প্রদান করেছেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা গেল যার থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, আরবগণ যুদ্ধপ্রিয় জাতি হলেও দর্শন ও স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে মোটেও পিছিয়ে ছিল না।

১. "এটা যথার্থই লক্ষণীয় যে, আধুনিক মানুষের মনকে নাড়া দেয় না এমন কোনো জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল না যা আরবগণ কর্তৃক তাত্ত্বিকভাবে আলোচিত হয় নাই।" (It is indeed remarkable that there is hardly any searching question which might stir the mind of a modern man, that was not philosophically discussed by the Arabs.) অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার, পৃ. ৪৩৩ (An introduction to Islamic Culture, p. 433.)

২. "আরবগণ যা পেয়েছে তা-ই গ্রহণ করেছে এবং এর উপর জ্ঞানসৌধ নির্মাণ করে আরো অগ্রগতির পানে ধাবিত হওয়ার জন্য তাদের পরিশ্রমের ফসল প্রাথমিক সোপান হিসেবে পরবর্তীদের নিকট হস্তান্তর করে গেছে।" (The Arabs took what they found, built upon it, and handed down the result of their lobours as stepping stone for further progress.)—জোসেফ হেল (Joseph Hell).

৩. "মধ্যস্থতার কাজে আরবগণ প্রশংসনীয়ভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা ইউফ্রেতিস থেকে গোয়াদালকুইভার এবং মধ্য আফ্রিকার জাতিসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টান্তহীন বৌদ্ধিক ক্রিয়া-তৎপরতা বিশ্ব ইতিহাসে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নবযুগের সূচনা করে।" (The Arabs were admirably situated to act the part of mediator, and to influence the nations from the Euphrates to the Guadalquivir and Mid-Africa. Their unexampled intellectual activity marks distinct epoch in the history of the world.)—হামবল্ড (Humboldt).

৪. "ইসলামের উদ্ভব ও প্রসার হচ্ছে একটি স্মরণীয় বিপ্লব যা বিশ্বের জাতিসমূহের উপর নতুন ও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।" (The rise and expansion of Islam is one of the most memorabe revolutions which has impressed a new and lasting character on the nations ot the globe.)—গিবন (Gibbon)

৫. "রজার বেকন আরবীয় বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য রজার অথবা পরবর্তী বেকনকে কৃতিত্ব দেয়া যায় না। খ্রিষ্টান ইউরোপে রজার বেকন মুসলিম বিজ্ঞান ও পদ্ধতির একজন দূত বৈ আর কিছু নন। তাঁর

www.pathagar.com

সমকালীনদের জন্যে একথা ঘোষণা দিতে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করতেন না যে, আরবীয় বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রকৃত ও যথার্থ জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতির উদ্ভাবক কে, এ বিষয়ে আলোচনাসমূহ ইউরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তিবিষয়ক ভ্রান্তিমূলক বর্ণনার অংশ। বেকনের সময়ে আরবীয় বিজ্ঞানের পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল এবং সমগ্র ইউরোপে ঔৎসুক্যের সাথে অনুশীলিত হয়েছিল।" (Roger Bacon learned Arabic science. Neither Roger Bacon nor his later namesake has any title to be credited with having introduced the experimental method. Roger Bacon was no more than one of the apostles of Muslim science and method to Christian Europe, and he never wearied of declaring that knowledge of Arabic Science was for his contemporaries the only way to true knowledge. Discussions as to who was the originator of the experimental method are part of the colossal misrepresentation of the origins of the European civilization. The experimental method of Arabic science was in Bacon's time widespread and eagerly cultivated throughout Europe.)—ব্রিফল্ট (Briffult)

৬. "যদিও ইউরোপের উন্নয়নের এমন একটি দিক নেই, যেখানে ইসলামি সংস্কৃতির নিশ্চিত প্রভাব লক্ষণীয় নয়, তথাপি আধুনিক জগতের স্থায়ী ও বিশিষ্ট শক্তি, এর সাফল্যের চরম উৎস প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারা—যে শক্তি হতে জন্মলাভ করেছে সেখানেই এই প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ। ... আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করি তা ইউরোপে উদ্ভব হয়েছিল অন্বেষার নতুন ভাবধারা নিয়ে, অনুসন্ধানের নতুন পদ্ধতি নিয়ে, পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপন ও গণিতশাস্ত্রের বিকাশের আকারে যা গ্রিকদের নিকট অপিরিচিত ছিল। আরবদের দ্বারাই এ ভাবধারা এবং পদ্ধতিসমূহ ইউরোপে প্রবেশ করে।"(For althought here is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable, nowhere it is so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory ... natural science and the scientific spirit ... ।

What we call science arose in Europe as a result of a new spirit of inquiry, of new methods of investigation, of method of experiment, observation, measurement of the development of mathematics in a form Unknown to the Greeks. That spirit and those methods were intorduced into the European world by the Arabs.—ব্রিফল্ট (Briffult)

www.pathagar.com

৭. "ইবনে রুশদ কর্তৃক প্রকৃতি ব্যাখ্যায়িত হয়েছে সমালোচনামূলক মনোভাব ও প্রাধিকার-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দ্বারা যা আধুনিক দর্শনের দু'টো প্রধান বৈশিষ্ট্য। আরব চিন্তাবিদদের শিক্ষার দ্বারাই প্রধানত এর উদ্ভব হয়েছিল।" (Nature was interpreted by Averroes, by the critical attitude and revolt against authority, the two main characteristics of modern philosophy were raised mainly by the teachings of the Arab thinkers.)

তৃতীয়ত, কোরআন ধর্মবিশ্বাসে তার অনুসারীদের নিকট থেকে অন্ধ আনুগত্য দাবি করে; সুতরাং এখানে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ নেই—পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এ অভিমত পবিত্র কোরআন এবং কোরআনীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার পরিচয়ই বহন করে। কোরআনের শিক্ষা আধ্যাত্মিক ও জড়ীয়—এ উভয় দিকের প্রগতির লক্ষ্যে নিয়োজিত। ইহকাল ও পরকাল এ উভয় জগতের সাফল্যের উপর ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে একজন ইউরোপীয় মনীষী উল্লেখ করেন, "কোরআনের মহান গুরুত্ব এখানে যে, কোরআন ও হাদিসের পঠন-পাঠনে এটা যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছে, অন্যান্য বিজ্ঞানের বেলায়ও ততটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে।" পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়াদির মধ্যে তেমন কোনো বড় ধরনের পার্থক্য নেই। মানুষের কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ পরিসরই যথার্থ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এ সত্যের প্রকাশ করব এবং প্রমাণ করব যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিযোগ সত্য নয় এবং তা কোনো যুক্তির ধোপেও টিকে না।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে : "হে স্রষ্টা, তুমি আমাদেরকে এ জগৎ ও পরবর্তী জগতের সুখশান্তি দাও।" অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে : "তোমরা উপাসনা কর এবং পরে তোমাদের দৈনন্দিন কাজে বেরিয়ে পড়। সত্য আবিষ্কার এবং জীবন ও জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য চিন্তা বা প্রজ্ঞাশক্তিকে কাজে লাগাতে কোরআন নির্দেশ দেয় এবং অনুপ্রেরণা যোগায়। রাসুল (দঃ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন, "আপনি পাঠ করুন নিজের রাব্বের নাম নিয়ে যিনি (যাবতীয় বস্তু) সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পাঠ করুন, আপনার রাব্ব অত্যন্ত দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।" "যাকে হিকমাত বা গুণ প্রদান করা হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যাণের বস্তু প্রদান করা হয়েছে।" "আর নসিহত সেসব লোকদের জন্য যারা সুষ্ঠু বোধশক্তিসম্পন্ন।" (২-২৬৮)। "নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমিনের সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে রাত ও দিনের আগমনে আর নৌযানসমূহ যা চলাফেরা করে সমুদ্রে মানুষের লাভজনক পণ্যসম্ভার নিয়ে আর বৃষ্টির পানিতে যা আল্লাহতায়ালা আসমান হতে বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে (অর্থাৎ পানির দ্বারা শুষ্ক যমিনে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন) এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন এতে সর্বপ্রকারের জীবজন্তু এবং বায়ুর পরিবর্তনে এবং মেঘে যা আবদ্ধ (ঝুলানো) থাকে আসমান ও যমিনের মধ্যস্থলে (শূন্যমণ্ডলে) নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যাঁরা জ্ঞানবান বুদ্ধিমান।" (২-১৬৩)। এতদ্ব্যতীত হাদিসে জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। "জ্ঞানানুসন্ধান প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য" "জন্ম হতে মৃত্যু

www.pathagar.com

পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।" "আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘণ্টা চিন্তা বা অনুধ্যান সত্তর বৎসরের এবাদতের চেয়ে উত্তম।" "জ্ঞানী ব্যক্তির কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্রতর।" "যিনি জ্ঞান আহরণের নিমিত্তে গৃহত্যাগ করেন তিনি আল্লাহ্‌র পথেই পরিভ্রমণ করেন।"

পবিত্র কোরআনে প্রায়শ একটি আয়াত লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি, ঋতুর পরিবর্তন, জন্মমৃত্যুর রহস্য, মানব জাতির উৎপত্তি ও বিলয় এবং অন্যান্য ঘটনাক্রম বর্ণনা করে এসব বিষয়ে চিন্তা করতে বলা হয়। এসবের আলোচনার পরও এ কথা বলা কি যুক্তিসংগত হবে যে, ইসলামে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ নেই? ইমাম রাজি ও আল্লামা জামাকশারী সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন যে, কোরআনের মধ্যে এমন কিছু নেই যা বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না কিংবা প্রকৃতির নিয়মবিধির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। প্রখ্যাত জার্মান কবি গ্যাটে কোরআন পাঠ করে মন্তব্য করেন, "এই যদি হয় ইসলাম, তবে আমাদের প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই হচ্ছে মুসলিম।" (If this is Islam, then every thinking man among us is in fact, a Muslim, ... Goöthe) এম. এম. শরীফ উল্লেখ করেন, "কোরআন মুসলিমদের দিয়েছে নব নীতিজ্ঞান, নব রাজনৈতিক ধারণা এবং একটি নব দর্শন—বাস্তব ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং এক আল্লাহ্‌বাদী দর্শন ... কোরআন সত্যই চিন্তার পথনির্দেশ করে এবং কোনরূপেই একে শৃঙ্খলিত করে নি।" (The Quran gave the Muslim a new ethics and a new political theory and a new philosophy—a practical ethics, a democratic politics and a monotheistic philosophy ... The Quran did indeed give guidance to the intellect but in no way did it chain and fetter if." (Prof. M. M. Sharif —Muslim Thought, 910)

জ্ঞানার্জন, জ্ঞানানুসন্ধান ও সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যান্য দর্শনের ন্যায় মুসলিম দর্শনও একটা 'সিস্টেম' বা পদ্ধতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট। প্রত্যেক যুগের চিন্তাধারার সুষ্ঠু প্রকাশই সেই যুগের দর্শন। মুসলিম চিন্তাবিদগণ কোরআন ও হাদিসকে ভিত্তি করে জীবন-জিজ্ঞাসার যে বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন তা-ই মুসলিম দর্শন রূপ লাভ করেছে। মুসলিম দর্শনকে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের সাথে একাত্ম করে দেখা ঠিক হবে না। কারণ, "মুসলিম দর্শন কেবল মুসলিম দর্শনের ন্যায়ই এবং অন্যকিছু নয়। এখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম দর্শন বলতে অবশ্যই এক দর্শন আছে যা স্ব-বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান।

৮. মুসলিম দর্শন পাঠের গুরুত্ব

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী হচ্ছে মুসলিম জাতির ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ। এ সময় মুসলিম জাতির প্রতিভার বিভিন্নমুখী অগ্রগতি সাধিত হয়। এ যুগের মুসলমানগণ ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও গবেষণার অগ্রদূত। তাঁরা গ্রিক ধ্যানধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করেন এবং বহুবিধ নতুন বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করে ইউরোপের রেনেসাঁর দ্বার উন্মুক্ত করেন। "লাতিন ক্রিশ্চান রাষ্ট্রে এরিস্টোটলের পাঠ জাগরণের জন্য তাঁরাই (মুসলিম দার্শনিকগণ) দায়ী ছিলেন। এরিস্টোটলীয় প্রথাকে তাঁরাই বিকাশ সাধন করেন যা

www.pathagar.com

ইসলাম সিরীয় ভাষাভাষীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রিক মূলগ্রন্থ প্রত্যক্ষ পাঠে তাঁরা এর সংশোধন ও পরিমার্জন করেন এবং নব্য প্লেটোবাদী সমালোচকদের নির্দেশিত রূপরেখায় তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ ফলপ্রসূ করেন।" (It was they (Muslim philosophers) who were largely responsible for awakening Aristotelian studies in Latin Christendom and it was they who developed the Aristotelian tradtion which Islam hand received from Syriak community correcting and revising its content by a direct study of the Greek text and working out their conclusions on lines indicated by the neoplatonic commentators." —O'leary.

"আরবগণ তাঁদের বৌদ্ধিক ছাপ ইউরোপের উপর ফেলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে ক্রিশ্চান জগত এই সত্যতা স্বীকার করবে।" (The Arab has impressed his intellectual stamp upon Europe and not in too remote a future will Christendom concede this truth.)

"উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে ক্রুশের স্পেনিশ রহস্যবাদী সেন্ট জন-এর কবিতা পাঠ করা অসম্ভব এ সিদ্ধান্ত ব্যতীত যে, সে তাঁর চিন্তা ও ভাবের সমগ্র প্রক্রিয়ার অনেকাংশের জন্যই মুসলিম রহস্যবাদীদের নিকট ঋণী যাঁরা স্পেনেরই অধিবাসী ছিলেন।" (It is impossible, for example, to read the poems of the Spanish mystic St. John of the cross without concluding that his entire process of thinking and imaginative apparatus owed much to their Muslim Mystics who had also been natives of Spain.)—A. J. Arberry. The History of Sufism.

"নবম শতাব্দীর পর দক্ষিণ ভারতীয় চিন্তাধারার আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য ইসলামি প্রভাবের দৃঢ় ইঙ্গিত প্রদান করে। এগুলো হচ্ছে : একত্ববাদ, আবেগাত্মক উপাসনা, আত্মসমর্পণ (পরপত্তি), শিক্ষক-শ্রদ্ধা (গুরুভক্তি) এবং উপরন্তু শ্রেণীপ্রথার পদ্ধতির কঠোরতার হ্রাস এবং অধিক কার্যসিদ্ধতার প্রতি উদাসীনতা।"

(Certain other characteristics of South India thought from the ninth century onwards, however, strongly point to Islamic influence. These are the increasing emphasis on monotheism, emotional worship, self-surrender (parapatti) and adoration of the teacher (Guru Bhakti) and in addition to them levity in the rigours of the caste system and indifference towards more virtual)—Tarchand. Influence of Islam on Indain Culture. এসব থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কিভাবে মুসলিম ভাবধারা বিশ্বের অন্যান্য, জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মুসলিম দর্শনকে ভিত্তি করেই আধুনিক দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যযুগে মুসলিম দার্শনিকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষাদীক্ষায় এত উন্নতি লাভ করেন যে পাশ্চাত্য জগতে তাদের নামের পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন, ইবনে সিনাকে আবেসিনা, ইবনে রুশদকে অ্যাভারোজ প্রভৃতি নামের এরূপ পরিবর্তন ঘটলেও এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাশ্চাত্য জগতে তাঁদের আলোচনা জনপ্রিয় ছিল এবং তাঁরাও অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আধুনিক দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাসে মুসলিম দর্শনের অবদান অনস্বীকার্য। এ

www.pathagar.com

সত্যকে যাঁরা অস্বীকার করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকেই অস্বীকার করেন। মধ্যযুগের টমাস একুইনাস, ডন স্কেটাস, দান্তে, রোজার বেকন, ফ্রান্সিস বেকন, ডেকার্ট, হিউম, স্পিনোজার ন্যায় দার্শনিকদের অবদান প্রতিভাত হয়েছে। "আধুনিক ইউরোপীয় মানবতাবাদের ফলে অদ্ভুত আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন বিভিন্নভাবে মুসলিম সংস্কৃতির ফলশ্রুতি মাত্র।" (The fruits of modern European Humanism in the shape of modern science and philosophy are in many ways only further development of Muslim culture ... Iqbal.

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ও মধ্যযুগীয় মুসলিম দর্শনের দার্শনিকদের মধ্যে কোনো কোনো সময় বিচিত্র ধরনের এক অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আলোচনার বিষয়বস্তু, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা পদ্ধতিগত দিক থেকে এ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সংবেদনের উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ বিষয়ক যে সূত্র পাশ্চাত্য দার্শনিকদ্বয় ওয়েবার-ফেকনার প্রদান করেন তার সাথে উক্ত বিষয়ে মুসলিম দার্শনিক আলকিন্দির প্রদত্ত সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য রয়েছে। ওয়েবার গণিতবিদ্যা থেকে, অপরদিকে আলকিন্দি চিকিসার্থবিজ্ঞান থেকে তাঁদের সূত্রের আভাস লাভ করেছিলেন। মধ্যযুগীয় প্রাচ্য মুসলিম দার্শনিক আল-গাযালি ও আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্টের দর্শন সংশয় থেকে উদ্ভূত। কিন্তু পরিণামে আল-গাযালি সংশয় থেকে উপনীত হন মরমিবাদে, ডেকার্ট উপনীত হন বুদ্ধিবাদে। এখানে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুসলিম দার্শনিকগণ চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার দিক থেকে কোনো কারণেই পিছিয়ে থাকেন নি।

মুসলিম দার্শনিকগণ বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা, ভাষ্য টীকা প্রদান করে তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র মতবাদ গড়ে তোলেন। সাসতারি উল্লেখ করেন, "মুসলিম দার্শনিকগণ ইসলামি শিক্ষাকে নিজেদের যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে নিজস্ব দার্শনিক ঐতিহ্য গড়ে তোলেন।" তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রধানত ছিল অধিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও রাষ্ট্রদর্শন। এতদ্ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা, মনোবিদ্যা, সৌন্দর্যবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিত প্রভৃতিও তাঁদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

ইসলামের মূলনীতি হতে মুসলিম দর্শনের উদ্ভব। পবিত্র কোরআন ও হাদিস শুধু আধ্যাত্মিকতার ভাবেই পরিপূর্ণ নয়। এর মধ্যে রয়েছে মানব জীবনের সামগ্রিক আলোচনা। মুসলিম দর্শন সর্বদাই নৈতিক মূল্যবোধকে উচ্চাসন দিয়েছে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কোরআন ও হাদিস নৈতিক উপদেশে ভরপুর। মুসলিম দর্শনে ভাববাদ, বস্তুবাদ ও নৈতিক দর্শনের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। মুসলিম দর্শন বাস্তবধর্মী ও জীবনকেন্দ্রিক। মুসলিম মনীষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দর্শনচিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে নি। ফলে চিন্তা ও ধ্যান—ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম দর্শনে বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা ও ধ্যান-ধারণা পরিলক্ষিত হয়। ভাবের সাথে কর্মের, জীবনের সাথে জগতের, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্মিলনের মধ্যেই মুসলিম দর্শনের মূলসুর অন্তর্নিহিত। এসব বিষয় আলোচনা করতে গিয়েই মুসলিম দর্শন আধুনিক মতবাদের জন্ম দেয়।

উপসংহারে বলা চলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনের মহামিলনে ইসলামি ভাবধারায় মুসলিম দর্শনের যে সৌধনির্মিত হয় তার গুরুত্ব অপরিসীম এবং ইতিহাসের পাতায় তা সমুজ্জ্বল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়

পূর্বাভাষ

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। এখানে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য বা প্রভেদ নেই। পবিত্র কোরআনএই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা দৃঢ়ভাবে পরিব্যক্ত করেছে; "সকল বিশ্বাসী একে অপরের ভাই।" (৪ : ১১৬) মহানবি (দঃ)-ও এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ঘোষণা করে গেছেন। ইসলামে সাম্যের নীতি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যা অন্য কোনো ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের এই ধর্ম অনৈক্য, বিভেদ ও সংঘর্ষ এড়াতে পারে নি। কালক্রমে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যেও বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ইসলাম ধর্মের মূলনীতিসমূহকে স্বীকার করে নিয়েই যুগের প্রয়োজনের মোকাবিলায় এসব সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে। বহুবিধ কারণে ইসলাম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারমধ্যে প্রধান কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

এক. নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব : হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে কোনো উত্তরাধিকার নিয়োগ করে যান নি। এই উত্তরাধিকারীর প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই উত্তরাধিকারীর প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের নেতা নির্বাচন এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ ভাবেন মহানবি (দঃ) প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কোনো উত্তরসূরি স্থির না করলেও মাঝেমধ্যে তিনি এমন আভাস ব্যক্ত করেছেন, যার ফলে হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর উত্তরসূরি বলে ধরে নেয়া যায়। অন্যদিকে অসুস্থতার কালে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নামাজ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফলে, অনেকে মনে করেন, হযরত অবু বকর (রাঃ)-ই মহানবির যথার্থ উত্তরসূরি। এমনি ধরনের আরো বহু যুক্তি প্রদর্শন করে এ প্রশ্নটি নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভ্রান্তিকর প্রতিযোগিতায় ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যাইহোক, উত্তরসূরি নির্বাচনের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা ও বাকবিতণ্ডার নিসরনকল্পে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে মুসলমানদের খলিফা নির্বাচন করা হয়। মহানবি (দঃ)-এর শিক্ষার আলোকেই জনসাধারণ গণতন্ত্রকে এ সমস্যা সমাধানের উৎকৃষ্ট পন্থা বলে ভাবতে থাকে এবং এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে চারটি দল ছিল : মুহাজির, আনসার, উমাইয়া ও বেদুইন। মক্কা হতে মদিনায় হিজরতকারী মুসলমানদের মুহাজির বলা হয়। হযরতের বংশ হাশেমীয় গোত্র ও কুরাইশদের কোনো কোনো গোত্রের লোক

www.pathagar.com

এই মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। মদিনায় আশ্রয়দানকারী মুসলমানদেরকে আনসার বলা হয়। মুহাজির ও আনসার উভয় দলই "সাহাবা" নামে পরিচিত। মুহাজিরদের মধ্য থেকেও প্রতিনিধিত্বের দাবি ওঠে। প্রাক ইসলামি যুগে উমাইয়াগণ মক্কার শাসনভার ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। বেদুইগণ পরবর্তীতে উমাইয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করে। এইভাবে স্বাধীন নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও মতবাদের বিকাশ ঘটে। এই দলীয় দ্বন্দ্বের সাথে হাশেমীয় ও উমাইয়া গোত্রের দীর্ঘকালের পুরাতন বিরোধ সংযুক্ত হয়ে অবস্থাকে আরো শোচনীয় কর ফেলে। এই দুই গোত্রের দলাদলিকে সৈয়দ আমির আলী মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের মূল কারণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

"খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর ভিতরে কুশাই বংশধরগণ প্রথমে মক্কায় এবং পরে ক্রমশ হিজাজ প্রদেশে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পূর্ব পর্যন্ত মক্কা প্রধানত কুঁড়েঘর তাঁবু বিশিষ্ট সামান্য গণ্ডগ্রাম ছিল। কুশাই কাবাগৃহের সংস্কার করেন। তিনি নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধানকক্ষ সাধারণের কার্যনির্বাহের জন্য মন্ত্রণাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। তিনি কুরায়েশদিগকে কাবার চর্তুদিকে প্রস্তর নির্মিত গৃহে বাস করিতে বাধ্য করেন। জনসাধারণের কর আদায় এবং আরবদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত তীর্থযাত্রীদের আহার্য ও পানীয় সরবরাহ প্রভৃতির জন্য তিনি আইনকানুন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।"

"৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে কুশাই-এর মৃত্যুর পর তৎপুত্র আবদুল্লাহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর মক্কার শাসনকর্তৃত্ব লইয়া তাঁহার পৌত্রগণ ও তাঁহার ভ্রাতা আবদুল মন্নাফের পুত্রদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। তাঁহারা পরস্পর শাসনক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করেন। মক্কার পানি সরবরাহ ও কর আদায়ের ভার আবদুল মন্নাফের পুত্র আবদুস শামসের হস্তে অর্পিত হইল এবং কাবা মন্ত্রণাগৃহ ও সামরিক বিভাগের রক্ষকতার ভার আবদ্দারের পৌত্রগণের উপর ন্যস্ত হইল।

"আবদুস শামস তদীয় ক্ষমতা স্বীয় ভ্রাতা হাশিমকে অর্পণ করেন। হাশিম মক্কার একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং অতিথি-অভ্যাগতদের প্রতি পরম সদাশয় ছিলেন। ৫১০ খ্রিষ্টাব্দে হাশিমের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দয়ালু উপাধিকারী মুত্তালিব এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ৫২০ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শায়বা ইহা লাভ করেন। শায়বা হাশিমের পুত্র ছিলেন। তিনি আবদুল মুত্তালিম নামে সবিশেষ পরিচিত।

ইতোমধ্যে আবদ্দারের পৌত্রগণ ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু হাশিম পরিবার সাধারণের ভক্তি ও ভালোবাসা অধিকার করায় ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহারা সমস্ত ক্ষমতা হস্তগতকরত মক্কার নেতৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবদুস শামসের উচ্চাভিলাষী পুত্র উমাইয়া এই দলের প্রধান ছিলেন। এতদসত্ত্বেও আবদুল মুত্তালিব তাঁহার উদারচরিত্র ও কুরায়েশদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার বলে ৫৯ বৎসর পর্যন্ত মক্কা শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনকার্যে তিনি দশটি পরিবারের প্রধানদের সাহায্য পাইতেন।" সৈয়দ আমীর আলীর রচিত "দি হিস্ট্রি অব সেরাসন্স"—এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ "আরবজাতির ইতিহাস" পৃ. ৫—৬।

www.pathagar.com

দুই. কোরআনের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য : কোরআন ও হাদিস ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি চিন্তাগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। পবিত্র কোরআন মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা এতে আলোচিত হয় নি। পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করা সহজ নয়। নবি (দঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কোরআনের বাণী প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পবিত্র কোরআনের বাণী এবং তাঁর নিজের কথা-উপদেশের ব্যাখ্যা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যাদান ও তার প্রয়োগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী বা মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। যেমন : হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব। এতদ্ব্যতীত জীবনের নতুন নতুন সমস্যা ব্যাখ্যায় মুসলমানগণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাঁরা পুরানো শিক্ষার নতুন ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। এইভাবে নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করতে গিয়ে মুসলমাগণ ক্রমশ নতুন নতুন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

তিন. জ্ঞানের বিভিন্ন উৎসের উপর গুরুত্ব আরোপ : জ্ঞানের যথার্থ উৎস নিরূপণকে কেন্দ্র করে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে কিছু চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। ইসলাম নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ ছাড়াও জ্ঞানের আরো তিনটি উৎসকে নির্দেশ করে। যেমন, প্রজ্ঞা (আকল), প্রত্যাদেশ (নকল) ও স্বজ্ঞা (কাশ্‌ফ)। হযরত (দঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে জীবনের কিছু ঘটনাকে প্রজ্ঞা, কিছু ঘটনাকে প্রত্যাদেশ এবং কিছু ঘটনাকে স্বজ্ঞার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার উপদেশ দেন। আসলে জীবনের সমস্যাবলির উপলব্ধি, জীবন জগতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য জ্ঞানের এই পদ্ধতিগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু কালপ্রবাহে মুসলিম চিন্তাবিদেরা প্রজ্ঞা, প্রত্যাদেশ এবং কাশ্‌ফ-এর উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন নি—তাঁরা কেউ কেউ প্রজ্ঞা, কেউ কেউ নকল এবং কেউ-কেউ কাশ্‌ফ-এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলশ্রুতিতে, বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে; যেমন—মুতাযিলা,আশারিয়া ও সুফি সম্প্রদায়। মুতাযিলাগণ প্রজ্ঞাকে, আশারীয়গণ প্রত্যাদেশকে এবং সুফিগণ কাশ্‌ফকে জ্ঞানের নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য উৎস বলে মনে করেন। মুসলিম দর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের মূলে জ্ঞানান্বেষণের এই পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ সক্রিয় ছিল।

চার. ধর্মের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যার প্রয়াস : ধর্ম হিসেবে ইসলামকে যুক্তিসংগত করা এবং একটি সমর্থনযোগ্য ও নির্ভরশীল বৌদ্ধিক বিধানের উপর একে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস থেকেও ইসলামের বিভিন্ন গোত্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রথমদিকে মুসলমানগণ কেবল ধর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু কালের অগ্রগতির সাথে সাথে এই ধর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁরা ক্রমশ গভীর বিচারমূলক চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তাঁরা তাদের ধর্মকে যুক্তির আলোকে বিচার করার এবং প্লেটো ও এরিস্টোটলের দর্শনের আলোকে বুঝার প্রয়াস পান। ইসলামকে যুক্তিসংগত করার এই মানসিকতাই কালক্রমে ইসলামে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পথ উন্মুক্ত করে।

পাঁচ. কোরআনের আয়াতের আবির্ভাব : পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর ব্যাখ্যা লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

কোরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কথা দৃঢ়ভাবে পরিব্যক্ত করে। আবার এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এইসব চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে 'জাবারিয়া' ও 'কাদারিয়া' সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছয়. আল্লাহ্র গুণাবলি : কোরআনের নিত্যতা, দিব্যদর্শন প্রভৃতি ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যাকে সামনে রেখে ইসলামের ইতিহাসে কিছু চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এইসব চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে 'মুতাযিলা ও 'আশারীয়া' সম্প্রদায়। আল্লাহ্র গুণাবলি কি তার সত্তা থেকে ভিন্ন না তাঁর সত্তার অন্তর্ভুক্ত, কোরআন কি সৃষ্ট না নিত্য ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস চালায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলিম দর্শন ইতিহাসে যেসব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটায় সেই সকল সম্প্রদায় ইসলামের মূল নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ও আস্থাশীল ছিল। যেসব সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তার মধ্যে রাজনৈতিক, কিছু ধর্মতাত্ত্বিক ও কিছু দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেণীবিন্যাস

আলোচনার সুবিধার জন্য মুসলিম চিন্তাবিদদেরকে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, মুসলিম চিন্তাবিদদেরকে নিম্নলিখিত ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে (Religio-Political Schools)-এ বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উপশ্রেণিগুলো হচ্ছে : খারিজি সম্প্রদায়, সুন্নি মাযহাব এবং শিয়া সম্প্রদায়। দ্বিতীয়ত, মুসলমান চিন্তাবিদরদেরকে ধর্মাতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ে (Theological Schools) বিভক্ত করা যায় এবং উপশ্রেণিগুলো হচ্ছে : মুরজিয়া, জাবারিয়া, কাদারিয়া এবং সিফাতিয়া সম্প্রদায়। তৃতীয়ত, মুসলমান চিন্তাবিদরদেরকে দার্শনিক সম্প্রদায়ে (Philosophical School) বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মুতাযিলা, আশারিয়া, সুফি এবং ফালাসিফা গোষ্ঠী (সৈয়দ আবদুল হাই, মুসলিম ফিলস্ফি পৃ. ৩৭-৩৮)। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই বিভাজন বা শ্রেণীবন্যাস খুব সুদৃঢ় নয়, কারণ এদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। আলোচনার সুবিধার জন্যই এই শ্রেণীবিন্যাসের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন ধর্মীয়-রাজনৈতিক সম্প্রদায়

খারিজি সম্প্রদায়[১]

উমাইয়াদের শাসনামলে তাদের বিরুদ্ধে যে দুটি দল সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে খারিজি ও শিয়া। খারিজিরা শিয়া ও উমাইয়াদের বিরোধী ছিল। এদেরকে খারিজি বলা হতো এ কারণে যে, তাঁরা অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে মতানৈক্য ঘোষণা করেন এবং নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন। এ দলটি প্রথমে আলির প্রতি দৃঢ় আস্থা ও সমর্থন থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করেছিলেন। খারিজিরা আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এইজন্য যে, মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর কর্তৃত্বের দাবি করেন নি।

এ ব্যাপারে খারিজিদের মধ্যে কথা হলো এই যে, মুসলিম জাহানের প্রয়োজনে এবং নিজেদের মধ্যে বিরোধ মেটাতে হলে আলি ও মুয়াবিয়া দু'জনকে সরিয়ে নিরপেক্ষ কোনো ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই দলটি যুগ যুগ ধরে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসেছে। তাঁরা একচ্ছত্র (Absolute) গণতন্ত্রের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। নেতা সম্পর্কে হযরত আবুবকর ও ওমরের ধারণার অনুরূপ ছিল তাঁদের ধারণা। এ মতানুযায়ী সমগ্র মুসলিম সমাজ দ্বারা খলিফা নির্বাচিত হবেন এবং অযোগ্য বলে মনে হলে সাথে সাথে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে। তাঁদের কোনো নির্দিষ্ট পরিবার বা গোত্রের সদস্য হতে হবে না। প্রকৃত মুসলমান হলে যে কেউ ইমাম বা নেতা হতে পারবেন। এ মতানুযায়ী মহিলাও ইমাম হওয়ার যোগ্য । এদের কেউ কেউ আবদুল্লাহ্‌ইবী ইমামের সত্যতা স্বীকার করলেও কেউ কেউ ইমামের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, একটি মুসলিম বিচারকমণ্ডলী নিজেদের বিচার করতে পারদর্শী। তাঁরা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পুরনো ধারণা পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। তবে তাদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ছিল অন্যদের মতের বিরোধী। তাঁরা অখারিজিদের বেইমান বলে ঘৃণা করেন। কাজেই বুঝা যায় যে, অন্য মুসলমানদের প্রতি খারিজিদের চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন এবং এটি ছিল মুসলমানদের মধ্যকার সীমাহীন বিরোধ ও বিদ্রোহের কারণ। এ গোষ্ঠী বিভিন্ন অবস্থায় নানাবিধ মতের সমর্থন করে এবং কিছু কিছু উপসম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে পড়ে। এসব উপসম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে অনুগ্র ও মধ্যপন্থী বলে খ্যাত ছিল বাসরায় কেন্দ্রীভূত আবেদি সম্প্রদায়। আবেদিরা অন্য মুসলমানদের প্রতি উগ্রপন্থীদের ন্যায় এত বৈরীভাবাপন্ন ছিল না। তাঁরা অন্যদের প্রতি

www.pathagar.com

যথেষ্ট বিনয়ী ছিল। আবার যেসব খারিজি তাদের মতবাদ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশ করে নি, উগ্রপন্থীদের কাছে তারা অযোগ্য হলেও আবেদিদের কাছে যোগ্য ছিল। বিশ্বের কিছু কিছু দেশে আজও এই খারিজি সম্প্রদায় বিরাজ করছে।

সুন্নি সম্প্রদায়

মুসলমানদের প্রধান সম্প্রদায়ের নাম সুন্নি। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমই এই মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। সুন্নি সম্প্রদায় এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, হযরতের (দঃ) বংশের বাইরে কোরায়েশ বংশোদ্ভূত যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন ও সুস্থ ব্যক্তি মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হতে পারেন। খলিফাকে যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তি হতে হবে এমন কোনো কথা নয়। পরবর্তী সময়ে তারা এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, কোরায়েশ বংশ বহির্ভূত মুসলমানও খলিফা পদ লাভ করতে পারেন। তাঁরা সব খলিফাকেই ইসলামের খলিফা বলে স্বীকার করেন।

হযরত (দঃ)-এর আদেশ, নির্দেশ এবং কর্মপ্রণালি অনুসরণ করার কারণে এই সম্প্রদায় সুন্নি নামে অভিহিত। সুন্নি শব্দটি সুন্নাহ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে পথ, প্রথা, ব্যবহার ও অভ্যাস এবং সংবিধি। সাধারণ ব্যাখ্যানুসারে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর কর্ম, উক্তি ও সমর্থনকে সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাতের নির্দেশ পালন "মুহাম্মদ (দঃ)-এর আদর্শ পালন নামে অভিহিত করা হয়। সুন্নি মুসলমানগণ খোলাফায়ে রাশেদিনের সিদ্ধান্তের বৈধতা, ইজমা ও কিয়াসের নীতিসমূহকে কোরআন ও হাদিসের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করেন। সুন্নি মুসলমাগণ কয়েকটি মাযহাবে বিভক্ত। তবে সাধারণ স্বীকৃত বিষয় এবং মূলনীতিতে তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—পার্থক্য শুধু কতকগুলো গৌণ বিষয়ে। সব মাযহাবই কোরআন, হাদিস ও ইজতিহাদের প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল।

সুন্নিগণ চারটি মাযহাবে বিভক্ত : হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি। চার ইমাম এই চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা : ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। এই চার মাহযাবের যে কোনো মাযহাবের অনুসারীকে মুকাল্লিদ বলা হয়। এই চার মাযহাব ব্যতীত সুন্নি মুসলমানদের আরেকটি সম্প্রদায় রয়েছে। তাঁরা গায়ের মুকাল্লিদ নামে পরিচিত। তাঁরা এই চার মাযহাবের অনুসারী নয় বলে তাঁদেরকে এই নামে আখ্যায়িত করা হয়। এরা আহলে হাদিস নামে পরিচিত।

সুন্নি সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় সম্প্রদায়—কোনো রাজনৈতিক ফলশ্রুতিতে তাঁদের উদ্ভব ঘটে নি। তবে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশিত রাজনৈতিক মতবাদ তাঁদের রয়েছে।

শিয়া সম্প্রদায়[২]

এ গোষ্ঠীর মূলে যুদ্ধের এক সুদীর্ঘ পটভূমি ও ইতিহাস রয়েছে এবং অসামান্য আগ্রহ ও আকর্ষণের বিষয় হিসাবে ইসলামের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের নিকট উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সম্প্রদায় ফাতেমি সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। তারাও বিভিন্ন

www.pathagar.com

উপসম্প্রদায়ে ভাগ হয়েছিল। তাদের মধ্যে ইসমাইলি শাখা, বারোপন্থী শাখা, কারামাত শাখা, গুপ্তঘাতক শাখা এবং পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের নাম উল্লেখযোগ্য। শিয়া সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রসারের মূলে রয়েছে প্রধানত পারস্যের প্রভাব। পারসিরা আদিম যুগে অগ্নি উপাসক ছিল। আরবদের দ্বারা বিজিত হয়ে বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা তখনও ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত শাসকের পুরনো ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। এ গোষ্ঠী আলী ও তাঁর উত্তরসূরিদের সমর্থন করে। এর আবির্ভাব ঘটে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে এবং পরিণামে তা ধারণ করে একটি ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসাবে। এরাই মেহেদির চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটায়। তাদের ধারণা অনুযায়ী গোটা মুসলিম জাহান সেদিনের অপেক্ষায় আছে, যেদিন মেহেদি আবির্ভূত হয়ে ন্যায় ও সততার রাজত্ব কায়েম করবেন। আলির কোনো উত্তরসূরির কাছে আনুগত্য প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় এবং কাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। নেতা চিহ্নিতকরণ এবং নেতার প্রতি কি রকম চিন্তা-ধারণা করা উচিত তা নিয়েও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ দ্বন্দ্বের কারণেই শিয়া সম্প্রদায় অনেক উপসম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে পড়ে।

শিয়াদের মতানুযায়ী ইমাম বা নেতা চিহ্নিতকরণের পিছনে কিছু নির্ধারিত নিয়মাবলির প্রয়োজন। ইমাম বা নেতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত করা ঠিক নয়। কারণ, তাদের এ নির্বাচনে প্রায়ই দোষত্রুটি থাকতে পারে। ইমাম বা নেতাকেই অবশ্যই স্বর্গীয়ভাবে নিয়োগ করতে হবে। বস্তুত, স্বর্গীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ইমাম বা নেতা অবশ্যই একজন আছেন। তাঁকে খুঁজে বের করা এবং তাঁর প্রদত্ত উপদেশ মেনে চলা জনগণের কর্তব্য। তাঁরা আরও যুক্তি দিয়ে বলেন, নেতৃত্ব শুধু মহানবির উত্তরপুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এবং প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব হযরত আলির সন্তানাদির ও স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ)-এর মধ্যে সীমিত রয়েছে। শিয়া গোষ্ঠীদের একাংশ গোপন ইমাম বা নেতার চিন্তা ধারণা করে। তাঁদের মতানুযায়ী, আলির পুত্র মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াকে আল্লাহ্ গোপনে জীবিত রেখেছেন। তিনি ঠিক সময়েই পৃথিবীতে নাজিল হবেন এবং ন্যায়, সত্য ও সততার শাসন কায়েম করবেন। ইমাম বা নেতার ব্যক্তিত্ব নিয়েও শিয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেন যে, নেতা বা ইমাম অবশ্যই আল্লাহর দ্বারা নিযুক্ত। তবে তিনিও অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষ। অন্যদিকে কিছু কিছু শিয়া সম্প্রদায় আলিকে এমন একজন স্বর্গীয় পুরুষ বলে মনে করতেন, যার মধ্যে আল্লাহ্র ওহি বা প্রত্যাদেশের স্রোত প্রবহমান এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই আত্মা তাঁর কোনো উত্তরসূরির মধ্যে স্থানান্তরিত হবে। ইমাম অকাট্য ও সর্বপ্রকার পাপমুক্ত এবং তাঁকে অবশ্যই বিনা বিচারে ও একবাক্যে মেনে নিতে হবে। এভাবেই শিয়ারা ইসলামে অনেক অনৈসলামিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, শিয়ারা তাদের নেতাকে স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব বলে মনে করতো এবং তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু তাদের সর্ববিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার রূপ ধারণ করে এবং ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে তাদের বিলোপ ঘটে। পরের দিকে শিয়ারা মহানবির চাচা আব্বাসের উত্তরপুরুষ সাফার নেতৃত্বে খারিজিদের সঙ্গে যোগদান করে এবং উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই ক্ষেত্রে তাদের সম্মিলিত

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা পরিণতি লাভ করে আব্বাসীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠায়। এতে শিয়ারা তাদের ভুল বুঝতে সচেষ্ট হন। কারণ মহানবির পরিবার বলতে আব্বাসীয়রা চিন্তা করতেন হাশেমের বংশধরদের। অথচ শিয়া সম্প্রদায় বিষয়টিকে গ্রহণ করেছিলেন আরও সংকীর্ণ অর্থে। এ কারণেই তারা মহানবির পরিবার বলতে বুঝতেন আলির বংশধরদের। বস্তুত, এজন্যই শিয়া ও আব্বাসীয়দের মধ্যকার মিল ভেঙে যায় এবং তাদের পুরনো দ্বন্দ্ব আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এভাবেই আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলোএবং উমাইয়ারা পরাজয়-বরণ করে স্পেনে পালিয়ে গিয়ে সেখানে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো। আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে শিয়াদের প্রায়ই বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হতো। তারা বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত তারা যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করে ধর্মীয় ব্যাপারে মনোনিবেশ করে। বিদ্রোহে পরাজয়ের পর কেউ কেউ উত্তর আফ্রিকায় পালিয়ে হাশিমের পৌত্র ইদ্রিস আবদুল্লাহর নেতৃত্বে মরক্কোতে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে। সেখানে ইদ্রিসের বংশধরেরা আজও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের ব্যবধান এই যে, সুন্নিদের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে নয়।

যায়েদি ও ইমামি সম্প্রদায়[৩]

শিয়া সম্প্রদায়ের যেসব মধ্যপন্থী আজও বাকি আছে তাঁরা সংগঠিত হয়েছে ইয়েমেনের যায়েদিদের নিয়ে। তারা ফাতেমাপন্থী, এবং তাদের ধারণা হলো ফাতেমার যে কোনো বংশধর ইমাম হতে পারে না। তারা এও ধারণা পোষণ করে যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে একজন ইমাম বা নেতার উপযুক্ত দাবিকে তার জায়গায় যে কোনো কাউকে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করা যায়। এদের মধ্যে প্রথম দুজন ইমাম-এর নির্বাচনকে স্বীকার করে। কারণ তাদের ধারণা অনুযায়ী ইমাম নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে আলির দাবি যদিও অগ্রাধিকারযোগ্য ছিল, তবুও তখনকার পরিস্থিতির জন্য তাঁর পূর্ববর্তী দু'জন ইমামের নির্বাচন বৈধ ছিল। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থেই তাঁরা ইমাম নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ঐ সময়ে হযরত আলিকে অন্য জায়গায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত ওসমানকেও ইমাম হিসাবে গ্রহণ করেছিল, যদিও তাঁর অপকর্মকে তাঁরা ঘৃণা করেছিল। অধিকন্তু তারা ধারণা করত যে, একই সময়ে দূরদূরান্তে অবস্থিত দু'টি দেশে দু'জন ইমাম থাকতে পারে।

যায়েদিরা ছিল উদার শিয়াদের ধারক। রক্ষণশীল শিয়াদের ধারক বলে যারা স্বীকৃত, তারাই ইমাম হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব উভয় ব্যাপারে তারা উগ্র মত পোষণ করে। তারা ইমামের ব্যক্তিত্বে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তাদের ধারণা, যে কোনো কালের ইমাম তাঁর কালের বা সময়ের ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশিত হয়েছেন। উদহারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আলি ইমাম নির্দেশিত হয়েছিলেন স্বয়ং মহানবির দ্বারা এবং তাঁর প্রতিটি উত্তরসূরি ইমাম নির্দেশিত হয়েছেন প্রত্যেকের পূর্বসূরি দ্বারা। তবে প্রকৃতপক্ষে কোনবিশেষ ব্যক্তি তার পূর্বসূরি দ্বারা ইমাম নির্দেশিত হয়েছিলেন, এ নিয়ে মতবিরোধের অবধি ছিল না। ফলে প্রায় ৭৩টি

www.pathagar.com

উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এসব উপসম্প্রদায়ের মধ্যে 'বারোপন্থী' (Twelvers) , ও সাতপন্থী (Seveners) সম্প্রদায় বিখ্যাত।

বারোপন্থী ও সাতপন্থী সম্প্রদায় (ইস্না-আশারীয়া, সাবিয়া)

বারোপন্থী বা ইস্না-আশারীয়া নামে খ্যাত সম্প্রদায়টি প্রাধান্য লাভ করে ৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। তাদের বিশ্বাস, হযরত আলির দ্বাদশ বংশধর মোহাম্মদ বিন আল হাসান ৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সশরীরে অদৃশ্য হয়েছেন বটে, কিন্তু যথার্থ ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র বিশ্ব বিজয়ে তিনি আবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। দৃষ্টির অন্তরালে থেকে তিনি বার বার কর্মরত রয়েছেন তাঁর পরিবেশের কর্তা হিসাবে। এটা আধুনিক পারস্যের রাজনৈতিক মতবাদ। পারস্যের রাজার সরকারি নাম শাহ্। তাঁর মর্যাদা বা সম্মান ইমাম বা খলিফার চেয়ে বেশ আলাদা। ইমাম রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ের প্রধান। কিন্তু শাহ শুধু রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক যথার্থ ইমামকে পৃথিবীতে প্রেরণের আগ পর্যন্ত পার্থিব শাসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তাদের মতে যথার্থ ইমামকে এ পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। এমনিতে শাহের কোনো আধ্যাত্মিক আধিপত্য নেই। তিনি শুধু আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে ধর্ম ও আইনবিশারদ ওলামার ওপর।

সাতপন্থী সম্প্রদায় ছিল উগ্রপন্থী শিয়াদের অপরএকটি শাখা। তারা আবার ইসমাইলি সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বারোপন্থীদের ন্যায়ে তারাও গোপন ইমামের ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। তবে তাদের মতে ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদেক তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে ইমাম মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অমিতাচার ও অসদাচরণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি এ সিদ্ধান্ত-পরিবর্তন করে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুসা আল কাজিমকে ইমাম মনোনীত করেন। জনগণের অধিকাংশই এই পরিবর্তিত মনোনয়ন গ্রহণ করে, কিন্তু অন্য একটি শাখা ইসমাইলের প্রতি অনুগত থেকে ইসমাঈলীয় বা সপ্তম ইমামের অনুসারী বলে অভিহিত হয়। তারা আবার বাতেনি বলেও পরিচিত। কারণ তাঁদের মতে, বাহ্যত ইসমাইল একজন মাতাল বলে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই আপাত বা প্রতীয়মান চারিত্রিক দোষ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে বিঘ্নিত কিংবা ধ্বংস করে না। তারা আরও মনে করে যে, কোরআনের প্রতিটি আয়াতে প্রতীয়মান অর্থের গভীরে একটি গূঢ় অর্থ রয়েছে। পিথাগোরীয়দের ন্যায় তারাও মনে করতেন যে, সংখ্যা হিসেবে সাতএকটি মরমি অর্থের অধিকারী এবং এজন্যই তারা সবকিছুকে সাত সংখ্যাটি দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ৮৩-৮৪
২ সাঈদুর রহমান : ইসলামিক ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, পৃ. ১০৩
৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ

'ইখওয়ানুস সাফা' বা পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ[১]

৯৮০ সালে বসরায় একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। তারা নিজেদেরকে 'ইখওয়ানুস সাফা' বা 'সততার অনুসারী' বলে দাবি করতেন। হিট্টির মতে, 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থের বন্য কবুতরের কাহিনী হতে 'ইখওয়ানুস সাফা' দলের সদস্যরা তাঁদের দলীয় নাম গ্রহণ করেন। গল্পটি হলো : একদল কবুতর একে অন্যের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে একে অন্যের সাহায্যের মাধ্যমে এক শিকারীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

বলিষ্ঠ জনমত গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সততার অনুসারীবৃন্দের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকলেও ধীরে ধীরে তারা একটি ধর্মীয় দার্শনিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তখনকার শাসকরা তাদের অভিসন্ধি যাতে বুঝতে না পারে, তার জন্য তারা গোপনে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তারা চারটি দলে বিভক্ত ছিলেন : প্রথমটি ১৫ থেকে ৩০ বছরের যুবক, তাঁদেরকে শিক্ষকদের প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা ও আনুগত্য জ্ঞাপনের শিক্ষা দেয়া হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সের লোক, যাঁদের পার্থিব শিক্ষা এবং বস্তুর সাদৃশ্যানুমানিক জ্ঞান দেয়া হত, তৃতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪০ থেকে ৫০ বছরের ব্যক্তিরা, তারা ঘটমান জগতে ঐশী বিধানসমূহের রহস্য অনুধান করতেন এবং চতুর্থ পর্যায়ে ৫০ বছর উর্ধ্বের লোক যাঁরা তাঁরা হবেন প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানে সত্যিকার জ্ঞানী। এ দলের সদস্যরা গোপনে তাঁদের অধিনায়ক যায়দ-বিন-রিফার গৃহে মিলিত হতেন। তাঁরা রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। যায়েদ-বিন-রিফাত ছাড়াও আবু সুলায়মান মুহম্মদ বিন-মাশার, আবুল হাসান আলি বিন-হারুন, আবু আহম্মদ এবং আল আওফি আলোচনা সভা পরিচালনা করতেন।

"সততার অনুসারী' সঙ্ঘের সদস্যরা বিশ্বাস করতেন যে, তৎকালীন ধর্মীয় বিধান ও কার্যাবলী ভ্রান্তিপূর্ণ। তাই এসব ভুল ধ্যান, ধারণা দূর করতে হলে বিশুদ্ধ গবেষণা ও মিলনের ফলে এ ক্ষেত্রে ইপ্সিত ফল লাভ করা সম্ভব। তারা বলেন, ধর্ম সাধারণ মানুষের জন্য। ধর্মের বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে যে দার্শনিক তত্ত্ব লুক্কায়িত তা তাঁদের মতে, শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারেন।

সততার অনুসারীদের বিরাট অবদান তাঁদের রচিত 'রাসাইল-ই-ইখওয়ানুস সাফা'। এর মধ্যে মোট ৫২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ১৪টিতে আলোচিত হয়েছে যুক্তিবিদ্যার সমস্যাবলি, ১০টিতে অধিবিদ্যা, ১১টিতে মরমিবাদ ও জ্যোতির্বিদ্যা, ১৭টিতে প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, আবহাওয়াতত্ত্ব,

www.pathagar.com

ভূগোল প্রভৃতি। তাছাড়া নীতিবিদ্যা, সংখ্যাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পারলৌকিক জীবনশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ও এদের দৃষ্টি এড়ায় নি। দশম শতকে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রসার ও বিকাশ ঘটেছিল, তার চিত্র মুদ্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কেউ কেউ এই গ্রন্থকে সেকালের দর্শন ও বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বলেও অভিহিত করেন।

ধর্ম[২]

ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু ইসলামের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের সদস্যগণ নিজেদের মতবাদ প্রচার করে থাকেন। তাঁরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেন। তাঁদের মতে, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, কালেমা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যম। অন্যপথেও এই লক্ষ্যে পৌছানো যেতে পারে। দর্শন ও ধর্ম, জীবন ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করতে গিয়ে তাঁরা বুদ্ধিমূলক ধর্মের ধারণায় পৌছান। ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত নয়। গভীরভাবে চিন্তা ও উপলব্ধির সাহায্যেই ধর্মের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হয়। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হলো মৃত্যুর পর আত্মাকে খোদার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে সাহায্য করা।

সংখ্যাতত্ত্ব[৩]

নব্য পিথাগোরীয়দের পরে পবিত্র ভ্রাতৃসংঘই সংখ্যাতত্ত্ব গড়ে তোলে। তাদের মতে, বুদ্ধির বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরেই সংখ্যাতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করা যায়। ধর্ম, ইতিহাস, ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মালেই আত্মা সংখ্যাতত্ত্বের উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হতে পারে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে তাঁরা কাল্পনিক দিক দিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়। এক হচ্ছে সব অস্তিত্ব ও ভাবনার চূড়ান্ত নীতি। কাজেই সংখ্যাবিজ্ঞান সকল দর্শনের শুরুতে, মধ্যে ও পরিণতিতে সক্রিয়। গণিত সংখ্যার বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, জ্যামিতি গণিতের একটি অংশ। গণিত ও জ্যামিতি এ দু'টোই আত্মাকে ইন্দ্রিয়বস্তুর উর্ধ্বে অবস্থিত আধ্যাত্মিক সত্তার জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

জ্যোতির্বিদ্যা[৪]

ডি'ব্যুওর ভ্রাতৃসংঘের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় মতবাদকে কাল্পনিক ও স্ববিরোধী বলেছেন। তাদের মতে, নক্ষত্র শুধু মানুষের ভাগ্যের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করে না, বরং মানব ভাগ্যের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সকলই নক্ষত্রসমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। বৃহস্পতি, শুক্র, ও সূর্য সৌভাগ্যের কারণ। অপরপক্ষে শনি, মঙ্গল ও চন্দ্র দুর্ভাগ্যের কারণ। বুধ গ্রহ ভাল ও মন্দ উভয়েরই জনক। বুধ শিক্ষা ও বিজ্ঞানের জনক এবং বুধের প্রভাবেই আমরা জ্ঞানপ্রাপ্ত হই। অন্যান্য গ্রহও বিভিন্নভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।

www.pathagar.com

চন্দ্র মানুষের দেহের বিকাশ করে এবং বুধ তার মনকে গঠন করে। তারপর মানুষ শুক্র গ্রহের প্রভাবে আসে। শুক্র তাকে পরিবার ও ঐশ্বর্য দান করে, আর মঙ্গল প্রদান করে সাহসিকতা ও মহত্ত্ব। তারপর মানুষ বৃহস্পতির অধীনে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে বস্তুজগৎ অতিক্রম করার শক্তি অর্জন করে; অবশিষ্ট শনির অধীনে সে শান্তি লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত অনেক মানুষই দীর্ঘজীবী না হওয়ার কারণে স্রষ্টা দয়া করে প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ করে অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করেন।

যুক্তিবিদ্যা

পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের বিশ্বকোষ হিসাবে যুক্তিবিদ্যা ও গণিত পরস্পর সম্পর্কিত। গণিতশাস্ত্র বস্তুজগৎ হতে ভাবজগতে আমাদেরকে উত্তরণে সাহায্য করে। বিজ্ঞান হিসাবে যুক্তিবিদ্যার অবস্থান পদার্থবিদ্যা ও অধিবিদ্যার মাঝখানে। পদার্থবিদ্যা বস্তুজগৎ এবং অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু যুক্তিবিদ্যা আত্মায় বস্তুর যে চিন্তা জন্মে এবং আত্মার নিজস্ব চিন্তা, উভয় সম্পর্কেই আলোচনা করে থাকে। এ দিকে যুক্তিবিদ্যা গণিতের চেয়ে নিকৃষ্ট।

তবে ভ্রাতৃসংঘের যুক্তিবিদ্যা পরফিরি ও অ্যারিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যারই অনুকরণ। জাতি (genus), প্রজাতি (species) ও ব্যক্তি (Individual)—এ তিনটি বস্তুগত গুণ এবং লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ এগুলো নৈর্ব্যক্তিক গুণ। দশ প্রকারের আকার রয়েছে, প্রথমটি দ্রব্য এবং বাকি নয়টি দ্রব্যেরই বিকার। এসব সম্প্রত্যয়কে আবার প্রজাতিতে বিভক্ত করা যায়। বিশ্লেষণ, (analysis), সংজ্ঞা (definition) ও অবরোহ (deduction) হলো অপর তিনটি যৌক্তিক পদ্ধতি। বিশ্লেষণ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি, কিন্তু সংজ্ঞা ও অবরোহের মাধ্যমে বস্তুর স্বরূপ আধ্যাত্মিক বিষয় অবগত হওয়া যায়; পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুজগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু বস্তুর আধ্যাত্মিক স্বরূপ জানা যায় শুধু প্রজ্ঞা বা অনুধ্যানের সাহায্যে।

সৃষ্টিতত্ত্ব বা বিকিরণবাদ[৫] (Emanation Theory)

পরম সত্তা আল্লাহ্ হতে বিকিরণ-এর মাধ্যমে বস্তুজগৎ ও ঐশীজগৎ নিঃসৃত হয়। সাধারণ লোকদের বুঝবার জন্য বলা হয়েছে যে, জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। খোদা বা প্রথম নীতি হতে নির্গত হয় পরপর (১) সৃজনক্ষম আত্মা, (২) নিষ্ক্রিয় আত্মা (বিশ্ব আত্মা), (৩) প্রথম উপাদান, (৪) সক্রিয় প্রকৃতি, (৫) দ্বিতীয় উপাদান, (৬) মণ্ডলসমূহ, (৭) পার্থিব উপাদান, (৮) খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণী। এই ৮ ও প্রথম নীতি মিলে ৯টি সংখ্যা পূরণ করে। নয়টি সংখ্যার পরিপূরক নয়টি উপাদান হতে সবকিছুই উদ্ভূত। শক্তি, আত্মা, জড় ও প্রকৃতি এই চারটি হলো সরল সারসত্তা। দেহকে নিয়ে শুরু হয় সেই জটিল জগতের, যেখানে সবকিছু গঠিত হয় জড় ও আকারের সমবায়ে। প্রথম দ্রব্য হলো জড় ও আকার। দেশ, গতি, স্বর ও আলোকে এগুলো আদি আপতিক বস্তু। জড় একক, সকল বহুত্ব ও বৈচিত্র্য এসেছে আকার হতে। দ্রব্যকে আবার বলা হয় আবিশ্যক

www.pathagar.com

জড়ীয় আকার; আর আপতিক বস্তু বা গুণ হলো পূর্ণতাদায়ক আধ্যাত্মিক আকার। দ্রব্য নিহিত থাকে সার্বিকে, বিশেষে নয়। জড় ও আকারের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনো সম্বন্ধ নেই। চিন্তা ও সত্তার ক্ষেত্রে জড় ও আকার পৃথক, বাস্তব অভিজ্ঞতায় উভয়ই অবিচ্ছেদ্য। আকার জড় জগতের পরিচালিকা নীতি ও শক্তিস্বরূপ এবং তা এক জড় অন্য জড়ে প্রবেশ করে। আকারই জড়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বিভিন্নভাবে।

ভ্রাতৃসংঘ দশম শতাব্দীতে বিবর্তনবাদের আভাস দিয়ে গেছেন।

মনোবিদ্যা[৬]

মানবাত্মা একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি মানুষকে বলা চলেএকটি ক্ষুদ্র অনুজগৎ, আর বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডকে বলা চলে একটি অতিকায় মানুষ। মানবাত্মা বিশ্বআত্মা বা সার্বজনীন হতে নিঃসৃত। সকল ব্যক্তি-মানুষের আত্মাসমূহকে এক করে ভাবলে একে বলা যায় নিরপেক্ষ মানুষ বা মানবতার শক্তি। প্রতিটি ব্যক্তি-আত্মাকেএমন এক জড়বন্ধনে আবদ্ধ করা হয় যার প্রভাব থেকে তা মুক্ত হতে চায় নিরন্তর। এ মুক্তি অর্জনের জন্য আত্মাকে যেসব শক্তি ও বৃত্তি কাজে লাগাতে হয় তার মধ্যে আনুধ্যানিক বৃত্তি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অনুধ্যানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই আত্মার প্রাণস্বরূপ। জন্মের সময় শিশুর আত্মা সাদা অলিখিত শ্লেটের ন্যায়। পঞ্চেন্দ্রিয় আনীত অভিজ্ঞতাই এতে মুদ্রিত হয়, বিচার-বিশ্লেষণের অধীন হয় এবং অভিজ্ঞতা বিকশিত হয় এবং অবশেষে মস্তিষ্কের সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাদভাগে সঞ্চিত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় দর্শনেন্দ্রিয়ের চেয়ে অগ্রগণ্য। শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সমবায়ে গঠিত বুদ্ধিপ্রসূত ইন্দ্রিয়সমূহ। মনের ওপর এসব ইন্দ্রিয়ের প্রভাব স্থায়ী থাকে অনন্তকাল ধরে। ইতর প্রাণীর মতো মানুষের ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু মানুষের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে তার বুদ্ধিশক্তিতে। বুদ্ধির মাধ্যমেই সে বিচার করে, কথা বলে, কাজ করে। বুদ্ধির দ্বারাই শুভ ও অশুভ, যথার্থ ও অযথার্থের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

নীতিবিদ্যা[৭]

পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের উদ্দেশ্য আলোচনা কালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ভ্রাতৃসংঘের শিক্ষার সংযমী ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট। তাঁদের মতে, মানুষ যখন তার প্রজ্ঞা অনুসারে পরিচালিত হয় তখন তার কার্য নীতিসম্মত। প্রত্যেক মানুষেরই উচিত জাগতিক নিয়মকানুন অনুগত থেকে বুদ্ধিময় জীবন যাপন করা। প্রকৃতিরই নিয়মানুযায়ী চলা ছিল ভ্রাতৃসংঘের নৈতিক আদর্শ। একমাত্র বুদ্ধিদীপ্ত জীবনই মানুষকে উচ্চতর পর্যায়ে পরিচালিত করে এবং খোদার সাথে মিলন ঘটিয়ে থাকে। পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের মতে, সর্বোচ্চ সুকৃতি হলো প্রেম। প্রেমই মানুষকে খোদার সঙ্গে যুক্ত করে, খোদার সঙ্গে মিলন ঘটায়। আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি ভালবাসাই মানুষের হৃদয়ের স্বাধীনতা দান করে এবং সমগ্র বিশ্বের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করে। আর পরলোকে উন্নীত করে অনন্ত জীবনে। কাজেই আত্মার মুক্তির আনন্দের জন্য সাধনা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। তবে আত্মা যেন তার সুপ্ত গুণাবলিকে বিকশিত করার যথেষ্ট

www.pathagar.com

সময় ও সুযোগ পায়, সেজন্য দেহেরও উপযুক্ত পরিচর্যা আবশ্যক। এ যুক্তিতেই ডি'ব্যওর বলেন; "ভ্রাতৃসংঘ এমন এক আদর্শ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা সম্মিলিত করেছিল বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য বৈশিষ্ট্যকে। একজন আদর্শ ও পরিপূর্ণ নৈতিক মানুষকে হতে হবে জন্মের দিক দিয়ে পূর্ব পারস্যদেশীয়, বিশ্বাসে আরব, শিক্ষায় ইরাকি (ব্যবিলনীয়), বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় গ্রিক, আচরণে খ্রিষ্টের শিষ্য, ধার্মিকতায় সিরীয় সন্ন্যাসী, ব্যক্তিগত বিজ্ঞানসমূহে গ্রিক, সবরকম রহস্যের ব্যাখ্যায় ভারতীয় এবং সর্বোপরি ধর্মীয় জীবনে একজন সুফি।"

রক্ষণশীল সম্প্রদায়[৮]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ইসলামের মূল বিধি ও বিধানসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে যতসব মতপার্থক্য দেখা যায়, তারই ফলশ্রুতিতে একপর্যায়ে ইসলামে কিছু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের সমর্থনকে কেন্দ্র করে নয়, বরং ইসলামের মৌল শিক্ষাসমূহের আলোকে নতুন সমস্যাবলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও স্পষ্ট হয়েছিল। বস্তুত, মহানবির ইন্তেকালের পর তখনকার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুসলমানেরা বিভিন্নরকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। খোদার নিকট থেকে প্রেরিত প্রত্যাদেশের অনুপস্থিতিতে তাদের তখন পুরানো শিক্ষার নতুন সমায়োপযোগী ব্যাখ্যা দিতে হয় এবং তা করতে গিয়েই মুসলমানেরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মীয় প্রশ্নাবলিকে কেন্দ্র করে এভাবে উদ্ভব ঘটে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের।

শিয়ারা কিভাবে অনেকগুলো উপসম্প্রদায় নিজেদেরকে ভাগ করেছিল, ইতিমধ্যেই তা আমরা দেখেছি। সুন্নিরাও ৪টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। এ মতভেদের দ্বারাই গঠিত হয় হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি—এ ৪টি সম্প্রদায়। কোরআনের ব্যাখ্যা ও ধর্মানুশীলনের বিভিন্ন বিষয়ে এসব সম্প্রদায়ের একটির সাথে অন্যটির যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন কিছু কিছু মৌল ব্যাপারে তারা একমত। তাদের মতপার্থক্য শুধু গৌণ বিষয়ে। কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। পরিশেষে উল্লিখিত দু'টো বিষয় থেকে নিঃসৃত সত্যাবলি নিয়েই কেবল তাদের মধ্যে মতপার্থক্য। কোনো কোনো বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু। যে কেউ যে কোনো একটি মাযহাব পালন করতে পারেন, কিন্তু যখন কেউ একটি বিশেষ মাযহাব গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সেটাকে অনুসরণ করতে হয়,এবং অন্য কোনো মাযহাবের সদস্যদের সঙ্গে বিরোধ ভাব ধারণ করা তাঁর পক্ষে অনুচিত। কোনো একটি কাজ যদি একটি বিশেষ মাযহাব দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, তাহলে অন্যকোনো মাযহাব যদি সেই কাজ অনুমোদন করে, তাহলে কেউ ঐ অনুমোদনকারী মাযহাবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এই শর্তে যে, তখন থেকে উক্ত ব্যক্তি আলোচ্য মাযহাবের অন্যান্য সব নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলবে।

www.pathagar.com

ওহাবি সম্প্রদায়[৯]

পৃথিবীর অনেক জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কয়েক শতাব্দীর প্রচার ও প্রচেষ্টার ফলে। তাই সম্ভবতকারণেই বিশেষ দেশের জনগণের আঞ্চলিক, জাতীয় ও ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে এক হয়ে চলতে হয়। এ কারণেই দেখা যায়, মানুষের কাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ওপর রচিত হয়েছিল ইসলামের যে মূলতত্ত্ব, সময়ের তাগিদে তাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হলো। বিশেষত পারস্য, তুরস্ক ও ভারতে ইসলামের মূল আদর্শের যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়। সেই ইসলাম মহানবির সময়ের ইসলাম ছিল না। এ অবনতির কথা চিন্তা করে মুসলমানদের রক্ষণশীল অংশ প্রয়োজনবোধ করলো ইসলামকে তার আদি মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ শতকে আরব দেশে সূচিত হলো ওহাবিবাদ নামে এক ধরনের নতুন আন্দোলন। ইসলামকে আদি মান ও মর্যাদায় ফিরিয়ে নেওয়াই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। প্রথম দিকে এ আন্দোলনটি একটি নতুন ধর্ম গড়ার আন্দোলন বলে ধারণা করা হয়েছিল। এটা সুন্নার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক চিন্তার আলোকে ইসলামকে পরিশোধন ও সংশোধন করার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ওহাবি আন্দোলন ছিল একটি প্রতিবাদস্বরূপ।

ওহাবিদের মতে, মাজার উপাসনা কিংবা অলি-পয়গম্বরদের দেহাবশেষের উপাসনা একটি গর্হিত অপরাধ। কবরের উপর দরগা, মিনার প্রতিষ্ঠা করাকেও তাঁরা ঘৃণা করেন। তাঁরা মূলত কট্টর রক্ষণশীল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শিক্ষা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইবনে তায়মিয়ার শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, গায়ের মুকাল্লেদবাদ নামে অভিহিত ঐ সময়ে অপর মতবাদটিকে ওহাবি মতবাদের সঙ্গে একত্রিত করা যায় না। এদের মতে, অন্তরাত্মাকে মহৎ ও পরিষ্কার করাই নামাজের কাজ। আর একারণেই মানুষের কর্তব্য হলো নিজ নিজ ভাষায় নামাজ আদায় করা। যে নামাজ পড়বে তাকে অবশ্যই নামাজের অর্থ বুঝতে হবে, অন্যথায় তা কিছু সূত্র ও কোরআনীয় আয়াতের অর্থহীন উচ্চারণ ও নিছক একটি দৈহিক কসরতে পরিণত হয়ে যায়। অনুবাদ মূল কোরআনের মর্যাদা বহন করে কিনা এবং আরবি ভাষা ছাড়া অন্যকোনো ভাষায় নামাজ আদায় করা যায় কিনা এটা ছিল তাদের কাছে প্রশ্ন। তারা কোরআনের সুরাসমূহকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করে আবৃত্তি করার পক্ষপাতি ছিল।

ওহাবিবাদ ৪টি রক্ষণশীল সিদ্ধান্তকে বাধ্যতামূলক হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি জানায়। অনুমান বা কিয়াসকে তারা প্রত্যাখ্যান করে ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস হিসাবে। গোটা সম্প্রদায়ও ভুল করতে পারে এসব অনুমানে। তাঁরা রাসুলুল্লাহর সহচরদের যুক্তিই বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করেন। কোরআন ও হাদিস থেকে প্রতিটি মুসলমানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার আছে। তারা আবার কোরআনের আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। খোদার নৈকট্য লাভ করার জন্য পির-দরবেশের সাহায্য স্বীকার করে না। তাঁদের মতে পির-দরবেশের মাজারে যাওয়া কিংবা অন্যকোনভাবে প্রয়াত ব্যক্তিদের উপাসনা করা নিষিদ্ধ কাজ।

www.pathagar.com

বাবিবাদ

ওহ্‌বিগণ ইসলামকে তার স্বরূপে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চালান। কিন্তু সে সময়েই অন্য একটি সম্প্রদায় ব্রতী হয় ইসলামকে সমকালীন প্রয়োজনের আলোকে পূর্ণরূপে গঠন করার কাজে। পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায়ের একটি শাখা বাবিবাদ নামে পরিচিত হয়। প্রাচ্যদেশীয় ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করা এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। পারস্য ও শিয়া ধারণাগুলোতে এর ভাবধারা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। ইসমাইলীয়দের মেহেদি শাস্ত্র ছিলএদের মূলভিত্তি এবং মির্জা আলি আহমদ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজেকে লুক্কায়িত ইমামের দরজা বা বাব বলে ঘোষণা করেন। পরে তিনি আবার নিজেকে সত্যের ধারক মেহেদি বলে প্রচার করেন। তিনি ইসা নবি ও মুসা নবির অবতার বলেও ঘোষণা দেন। তিনি মহানবির প্রত্যাদেশকে রূপকের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস চালান। তিনি শেষবিচার, বেহেশত,দোযখ প্রভৃতির নয়া ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পান।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীতে মুসলিমদের বিভক্ত হওয়া কোরআনের শিক্ষা ও ভাবধারার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে মুসলিমগণ প্রথমে মুসলিম হন, তারপর তারা শিয়া বা সুন্নি বা অন্য যে কোনো উপশিরোনামে পরিচিত হন। মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হওয়ার প্রবণতা ইসলামের ভাবধারার পরিপন্থী। তবে, এই প্রবণতা স্বয়ং ধর্মের সজীবতাকেই নির্দেশ করে।মুসলিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনো না কোনভাবে নেতৃত্ব প্রশ্নেই তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিরোধ দেখা দেয়।

শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে বিতর্কটি সংক্ষেপে আলোচনা করলে দেখা যায় কি কারণে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। শিয়াগণ দাবি করেন যে, কেবল আলি বা তাঁর সাক্ষাৎ বংশধরগণ ইমামের মর্যাদা লাভ করতে পারেন। তাঁরা নির্বাচিত ইমামের বিরোধিতা করেন। কারণ ঐশী নিয়োগের দ্বারাই নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়। নির্বাচিত ইমামের নিকট আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব অর্পণ করা যায় না। কারণ, মানুষ ইমাম নির্বাচনে ভুল করতে পারে।

সুন্নিদের মতে, ইমামকে বিশেষ কোনো পরিবারের সদস্য হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কুরাইশদের মধ্য থেকে সমগ্র মুসলিম জাতির দ্বারা তিনি নির্বাচিত হতে পারেন। ইমামকে তাঁর সময়ের বিখ্যাত লোক হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তিনি সর্বাধিক মুসলিম জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবেন। স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম এমন যে কোনো ব্যক্তি ইমাম হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্য। একই সময়ে দু'জন ইমাম থাকা বৈধ নয়। কিন্তু দেশ যখন বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, তখন একের অধিক ইমাম নির্বাচন অনুমোদনযোগ্য। সাধারণ মুসলিমদের অনুমোদন সাপেক্ষে ইমাম তাঁর নিজ উত্তরসূরি মনোনয়নের ক্ষমতা লাভ করতে পারেন। এইভাবে সুন্নিগণ ইসলামের মৌলিক গণতন্ত্রকে সংরক্ষণ করেন।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, পৃ. ৩২-৩৩
২ ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ২৬৮-২৭০

www.pathagar.com

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০
৪. সাঈদুর রহমান : ইসলামিক ফিলসফি এ্যান্ড কালচার, পৃ. ১১৪-১১৫
৫. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ৯৬
৬ সাঈদুর রহমান : ইসলামিক ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, পৃ. ১১৭
৭ ড. রশিদুল আলম :মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ১১৯-১২০
৮. সাঈদুর রহমান : ইসলামিক ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, পৃ. ১২০-১২৩
৯. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১০০-১০৩

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়

মুরজিয়া সম্প্রদায়

হযরত (সঃ)-এর মৃত্যুর পর পুরানো গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-কলহ হিংসা-বিদ্বেষ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে অনেক দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। ইসলামের প্রথম চারজন খলিফার রাজত্বের পর উমাইয়াগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন অঢেল ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। তাঁরা অনেকেই উচ্চশ্রেণীর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ লোকই ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ছিলেন নিস্পৃহ ও উদাসীন। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যে দু'টি দল প্রধানভাবে সক্রিয় ও তৎপর ছিল তারা হলো খারিজি ও শিয়া সম্প্রদায়। এ উভয় দলই উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তীব্র ধর্মবিরোধিতা ও পৌত্তলিকতার অভিযোগ আনয়ন করেন। এভাবে তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সহনশীলতার মূলনীতি নিয়ে আবির্ভাব ঘটে নতুন একটি দলের। এ দলের নাম হচ্ছে মুরজিয়া সম্প্রদায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে সহনশীলতার ভাব নিয়ে আবির্ভূত এই সম্প্রদায় পরোক্ষভাবে উমাইয়া শাসনকেই সমর্থন করার প্রয়াস চালায়। তাঁরা অভিমত পোষণ করেন যে, উমাইয়াগণ যেহেতু ইসলাম প্রচার করেন, তাই তাদেরকে ধর্মবিরোধী বলে নিন্দা করা উচিত নয়। সহনশীলতার দ্বারা তাদেরকে গ্রহণ করে নিতে হবে যে পর্যন্ত না বিচারদিবসে আল্লাহ কর্তৃক তাদের শাস্তি দেয়া হয়। মুরজিয়া শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে স্থগিতকরণ। অর্থাৎ ধর্মীয় উদাসীনতার জন্য একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে বিচার-দিবসে আল্লাহ্ কর্তৃক রায় ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত বিচার স্থগিতকরণ। মুরজিয়া বিশ্বাসের মূলনীতি হচ্ছে পাপ সম্পাদনকারী বিশ্বাসীদেরকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা না করে তাদের সম্বন্ধে রায় মূলতুবি রাখা। পাপের জন্য একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে ধর্মচ্যুত বলতে পারে না—যদি এমন কেউ করে তবে সেই মুসলিম নিজেই ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে। এভাবে মুরজিয়াগণ বলেন যে, উমাইয়াগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা মুসলমানদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য গ্রহণ করবে, যদিও তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। তাঁরা যদি কোনো পাপ করে থাকেন, তবে তার বিচার ও শাস্তি একমাত্র আল্লাহ্ই করতে পারেন। তাই তাঁদেরকে ধর্মচ্যুত বলে নিন্দা করা যাবে না এবং কোনো মুসলমানেরই তাঁদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করা উচিত নয়। তাঁদের

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত সুস্পষ্ট অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্য সেই কালের উমাইয়া শাসকগণ প্রজাদের আনুগত্যের দাবি রাখে বলে মুরজিয়াগণ প্রচার করেন। এইভাবে এই সম্প্রদায় পরোক্ষভাবে উমাইয়াদের রাজনৈতিক দাবি সমর্থনের প্রয়াস চালান। তাঁরা খারেজীয় ও শিয়া সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক শুদ্ধাচারবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁরা তাঁদের সেই আপোষহীনতার ভাবধারারও বিরোধিতা করেন। এই আপোষহীনতার কারণেই সামান্য ব্যাপারেও মতপার্থক্যের দরুন তাঁরা বিরোধকারীদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই গোষ্ঠীর আবির্ভাব। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সাথে তা ধর্মতত্ত্বে প্রবেশ করেন।

এই সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পিছনে অন্য একটি কারণও রয়েছে বলে প্রফেসর ম্যাকডোনাল্ড অভিমত পোষণ করেন। প্রাচীন যুগের মুসলমানগণ অদৃষ্টবাদের বিষণ্ন যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তারা পাপবোধের জন্য নিজেদেরকে স্বর্গীয় বস্তু থেকে সরিয়ে রেখেছে। পাপের এই চৈতন্যবোধ বিচারদিবস সম্বন্ধে তাদের মনে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি করে। নৈরাশ্যবাদের এই ভাবধারায় তারা এই বিশ্বাসে পরিচালিত হয় যে, মানুষের জন্য ভীতি ও উপাসনা ব্যতীত আর কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে একদল লোক আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং বিচারদিবসে তার শাস্তি প্রদানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। পরবর্তীকালে মুরজিয়াগণ সময়ের এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক প্রবণতার বিরোধিতা করেন। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসের উন্নতি সাধন করেন। শাস্তি বিধানের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে চিরকাল দোজখে থাকবে না। অনুশোচনার প্রকাশ এবং ভবিষ্যতে পুনরায় পাপ না করার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানুষ তার পাপ মোচন করতে পারে।

অধিকন্তু, মুরজিয়াগণ ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কোনো কোনো উগ্র মুরজিয়া মনে করেন যে, বিশ্বাস জিনিসটা হচ্ছে অন্তরের ব্যাপারে, আভ্যন্তরীণ বিষয়—আল্লাহ্‌র সঙ্গে গোপন সংযোগ স্থাপনের বিষয়। প্রকাশ্য প্রচার বা বাহ্য অনুষ্ঠানিকতা অপরিহার্য নয়। প্রকাশ্যভাবে অন্যধর্ম পালন করেও একজন আন্তরিকভাবে মুসলমান হতে পারেন। প্রকাশ্য মুসলিম হওয়া অপরিহার্য নয়। বাহ্যভাবে আনুষ্ঠানিকতা পালন করার চেয়ে ধর্ম হচ্ছে অধিকতররূপে মানসিক ও আন্তরিক। মধ্যপন্থী মুরজিয়াগণ মনে করেন ধর্ম হচ্ছে আন্তরিকতা ও ক্রিয়াশীলতা উভয়বিধ। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অন্তরের দৃঢ়তা সরবরাহ করে যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

মুরজিয়া সম্প্রদায় ইসলামে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যান। তাঁরা ইসলামে কবিরা (বড়) এ সগিরা (ছোট) গুনাহ (পাপ)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বড় পাপ যদি বহুত্ববাদকে অন্তর্ভুক্ত না করে তবে তা মানুষকে চিরকালের জন্য বেহেশত থেকে বঞ্চিত করবে না। ছোট পাপ বা সগিরা গুনাহ অনুশোচনা প্রকাশের দ্বারা মোচন করা যায়। মুরজিয়া সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে সহনশীলতা এবং উগ্র ধর্ম উন্মাদনা থেকে মুক্ত হওয়া। ভীতি বা ভয়ের পরিবর্তে তাঁরা আল্লাহ্ অনুরাগ, প্রেম-প্রীতি ও

www.pathagar.com

ভালবাসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাস্তবিকপক্ষে, সত্যিকার ধর্ম আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় নয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম-ভালবাসার উপর নির্ভর করে আছে। ভীতি আল্লাহ্ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে, প্রেম তাকে কাছে টানে। ইসলামে যৌক্তিক ও অগ্রগতির এ-ই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। হানাফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা হচ্ছেন এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ প্রতিনিধি।

জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়

যে প্রধান সমস্যা মুসলমানদের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং যা পরিণামে ইসলামে বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটায়, শাহরিস্তানির মতে তার সংখ্যা চারটি :

১. মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্ন,
২. আল্লাহ্‌র গুণাবলি বিষয়ক সমস্যা,
৩. বিশ্বাস ও ক্রিয়ার ভেদরেখা,
৪. প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব,

উপরে উল্লেখিত বিতর্কমূলক সমস্যাবলির মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রথমটি অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি যুগেই মানুষ এই প্রশ্ন নিয়ে সাবধানী আলোচনা চালিয়েছে। আল্লাহ্ স্বেচ্ছাচারী শাসক কিনা অর্থাৎ তিনি যা খুশি তাই করেন নাকি মানুষকে তার ভাগ্য গড়ার জন্য কিছু শক্তি দিয়েছেন—এই আলোচনা অদ্যাবধি চলে আসছে। কিন্তু প্রশ্নটি পূর্বের ন্যায়ই জটিল রয়ে গেছে। তাই এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই বিষয়টি দর্শনমনস্ক মুসলিমদেরকে প্রথম থেকেই নিয়োজিত রাখে এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়েই ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের বহুলোক অর্থাৎ মানব সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ হচ্ছে নিরঙ্কুশ শাসক, তিনি ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছু নির্দেশ করেন, তিনি যা খুশি তাই করেন, মানুষ হচ্ছে সেই ঐশী শক্তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র। বিপরীতে একদল লোক কার্যের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বিশ্বাস করতেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্ মানুষকে শক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ তার ইচ্ছামাফিক সেই ক্ষমতার সৎ-অসৎ ব্যবহার করতে পূর্ণ স্বাধীন। "একদিকে অনপেক্ষ নিয়ন্ত্রণবাদ (Absolute determinism) এবং অন্যদিকে মানুষের দায়িত্বশীলতা—এই দু'টো চেতনা থেকে মুসলিম ধর্মতত্ত্বে যে দু'টো সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তাই হচ্ছে জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়।"[১]

জাবারিয়া সম্প্রদায়

আল্লাহ্‌র স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাস ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্বীকৃতির পরিণতি হিসেবে জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব। জাহম বিন সাফওয়ান (মৃত্যু ৭৪৫) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আরবি 'জাবর' শব্দ হতে জারাবিয়া শব্দটি উদ্ভূত। 'জাবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে

www.pathagar.com

বাধ্যতা, নিয়তি, অদৃষ্ট। অদৃষ্টে বা আল্লাহ্‌র স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাস করার জন্য এই সম্প্রদায় জাবারিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাঁদের মতে আল্লাহ্‌ স্বেচ্ছাচারী শাসক, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। মানুষ তাঁর হাতের ক্রীড়নক মাত্র। মানুষকে তিনি যা করতে বাধ্য করেন, মানুষ তা-ই সম্পন্ন করে। মানুষের নিজের কোনো ইচ্ছার স্বাধীনতা বা কর্মক্ষতা নেই। আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী। মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোনো মূল্য নেই। মানুষের ভাগ্যে যা ঘটবে তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত। কাজেই মানুষের কার্যাবলীর জন্য তাকে দায়ী করা চলে না। কারণ, মানুষ যা করে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাযন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। মানুষের কোনো কার্য নির্বাচন করার ক্ষমতা নেই—তাঁর ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নেই। সে সম্পূর্ণরূপে সার্বভৌম শক্তির নিয়ন্ত্রণে। সারকথা হচ্ছে : জাবারিয়া চিন্তাবিদগণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্বের ক্ষমতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

জাবারিয়াগণ সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন। সবকাজ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসে। মানুষের কোনো কার্য নির্বাচন করার ক্ষমতা বা শক্তি নেই। মানুষ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ অসহায়। জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনা আল্লাহ্‌র নির্দেশে সংঘটিত হচ্ছে। মানুষ যদি স্বাধীন হতো, তবে যত মানুষ আছে, তত ক্রিয়াশীল কর্তা থাকত এবং তার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর শক্তির সীমিতকরণ। আল্লাহ হচ্ছে জগতের সার্বভৌম শাসক। তাঁর ইচ্ছানুসারেই জীব ও অ-জীব সত্তার সব গতি পরিচালিত। এইভাবে জগতের সবকিছুকে তারা আল্লাহ্‌র পূর্ব-নির্ধারিত ইচ্ছার অধীন করে রাখেন এবং মানুষের জন্য স্বাধীনতাকে অসম্ভব বলে থাকেন। জাহম বিন সাফওয়ান বলেন : "প্রকৃতপক্ষে মানুষ কাজ করে না, কেবল রূপকার্থেই বলা চলে যে সূর্য যেমন কিরণ প্রদান করে, মিলের চাকা যেমন ঘুরে অনুরূপে মানুষও কাজ করে বলা চলে। (Man does not really act, it is only metaphorically that he is said to act in the same way as the sun is said to shine, mill wheel to turn.-- Muslim Philosophy, Syed Abdul Hye) জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর মূল বক্তব্য হচ্ছে : জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনা আল্লাহ্‌র নির্দেশে সংঘটিত হয়ে থাকে। মানুষের কোনো ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়। সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম শক্তির অধীন। মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত—তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কার প্রদান করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, উমাইয়া শাসকগণ জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উমাইয়া শাসকবর্গ চরম অদৃষ্টবাদী ছিলেন। সম্ভবত নিজেদের দুষ্কর্মের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রচার করেন যে, আল্লাহ্‌র নিকট মানুষ সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত, তার কোনোরূপ ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। ফলে, মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়।

শাহরিস্তানি জাবারিয়া সম্প্রদায়কে দু'টো দলে ভাগ করেন, এক, গোঁড়া বা চরমপন্থী জাবারিয়া, দুই, মধ্যমপন্থী জাবারিয়া। চরমপন্থী জাবারিয়াদের মতে কোনো অর্থেই মানুষ কিছু করে বা মানুষের কার্যশক্তি আছে বলে স্বীকার করে না। মধ্যপন্থী

www.pathagar.com

জাবারিয়াদের মতে মানুষের শক্তি আছে বলে স্বীকার করে, তবে সেই শক্তি কার্যের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। শাহরিস্তানি জাবারিয়াদের তিনটি প্রধান উপদলের কথা উল্লেখ করেন। যেমন : 'জাহ্‌নিয়া', 'নাজ্জারিয়া' ও 'জাবারিয়া'।[২] এই উপদলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো গৌণ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে তাঁদের কোনো মতানৈক্য ছিল না। তাঁরা সবাই মানুষের অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিলেন।

জাবারিয়া সম্প্রদায় তাঁদের মতবাদের সমর্থনে পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ উল্লেখ করেন :

"... আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, কারণ তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ...।" (সুরা-২, আয়াত-২৮৪)

"বলুন, হে আল্লাহ্, তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। যাকে ইচ্ছা তুমি রাজত্ব দান কর, যাকে ইচ্ছা রাজ্যচ্যুত কর, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ এবং তুমিই সববিষয়ে পরম শক্তিমান।" (সুরা-৩, আয়াত-২৬)

"... তিনি যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালনা করেন।" (সুরা-২, আয়াত-২৭২) "... তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।" (সুরা-২৫, আয়াত ২)

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, জাবারিয়া চিন্তাবিদগণ কোরআনের সে সমস্ত আয়াতই উল্লেখ করেছেন যে আয়াতগুলো আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কোরআনে যে সমস্ত আয়াতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মশক্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে, জাবারিয়া চিন্তাবিদেরা সেই সমস্ত আয়াতের উল্লেখ করেন নি বা আদৌ উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন নি।

কাদারিয়া সম্প্রদায়

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব। কাদারিয়া মতবাদের সাহসী প্রচারের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন মা'বাদ আল-জুহানি। তিনি উমাইয়া যুগের প্রথম পর্বের লোক। এ সময়টা ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। উমাইয়াদের নেতৃত্বে দেশে তখন অত্যাচার ও নির্মম রক্তপাত চলছিল। পরিণামে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষুব্ধ একটা সাধারণ অনুভূতি সঞ্চারিত হতে থাকে। স্বাধীনচেতা আরবগণ এ অবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাবি করেন :[৩]

তোমরা কেন এই বর্বরোচিত কাজ কর?
এসব কি ইসলামের পরিপন্থী নয়?
তোমরা কি মুসলমান নও?

নিরাপরাধীরা যতই ভণিতা করুক না কেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উত্তর ছিল : আমরা যা করি তার জন্য আমরা দায়ী নই। আল্লাহই সবকিছু করেন। ভাল-মন্দ তাঁরই ক্ষমতা। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, ম'বাদ আল জুহানী একদিন তাঁর সাথী ওয়াসিল ইবনে

www.pathagar.com

আতাসহ প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী হাসান-আল-বসরি (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, "হে আবু সাইদ, যেসব শাসক মুসলমানদের রক্তপাত ঘটায় এবং দুষ্কর্ম করে এবং বলে যে, তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ্ কর্তৃক সাধিত হয়।" এতে হাসান আল-বসরি (রাঃ) জবাব দেন, "আল্লাহর শত্রু, তারা মিথ্যাবাদী।" এভাবে দেখা যায় যে, প্রাচীন মুতাযিলা কর্তৃক প্রথম যে মত পেশ করা হয় তা ছিল মন্দ বা অসৎ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। এগুলো আল্লাহ্র উপর আরোপ করা যায় না। এটা কদর মতবাদ নামে পরিচিত। এজন্যই আদি মুতাযিলীয়গণকে 'কদর' শব্দ উদ্ভূত কাদারিয়া নামে অভিহিত করা হয়। মা'বাদ আল-জুহানি প্রকাশ্যে এ মতবাদ প্রচার করেন। সেজন্য খলিফা আবদুল মালেকের নির্দেশে ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জাজ কর্তৃক তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

মা'বাদ আল জুহানির পর গায়লান আল-দিমাশ্কি অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি প্রচার করেন যে, প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত করা এবং দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখা। গায়লানের এই প্রচার উমাইয়া শাসক-স্বার্থ সংরক্ষণের প্রকাশ্য প্রতিবন্ধক ও হুমকিস্বরূপ ছিল। ফলে হিজরি ১০৫ (খ্রিষ্টাব্দ ৭২৩) শাসনকালের শুরুতে তাঁকে হত্যা করা হয়।

গায়লান এবং মা'বাদ-এর মৃত্যু তাঁদের মতবাদকে বলিষ্ঠতা দান করে। আরবি মূলশব্দ 'কদর' হতে কাদারিয়া শব্দের উৎপত্তি। 'কদর' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শক্তি' বা 'ক্ষমতা'। জাবারিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীতে এই সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ মানুষের কার্যক্ষমতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। এই গোষ্ঠী কাদারিয়া নামে সুপরিচিত। কাদারিয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্যের জন্য সে নিজেই দায়ী। মানুষ বাইরের অবস্থার দাস নয়, সে নিজেই নিজের কার্যাবলীর নিয়ন্তা। আল্লাহ্ সরাসরি কোনো মানুষের মধ্যে কার্য-সৃষ্টি করেন না অথবা কার্য সম্পাদন করেন না। তিনি মানুষকে কার্যক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং এই অর্থে তিনি সর্বশক্তিমান। কাদারিয়াগণ মানুষের নৈতিক দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মানুষ নিজেই তার কার্যের কর্তা, নিয়ন্তা ও স্রষ্টা—মানুষ স্বেচ্ছায় ভাল বা মন্দ পথ অনুসরণ করে। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ ও কর্তব্যবোধ রয়েছে—ফলে তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কার্যের স্বাধীনতা রয়েছে। ভাল কাজ করলে সে পুরস্কার পাবে এবং মন্দ কাজ করলে শাস্তি পাবে।

চরমপন্থী কাদারিয়াগণ মাঝেমধ্যে মানবীয় পরিধির সীমা লংঘন করেন এবং কিছু ঐশী শক্তি মানুষের ক্ষেত্রে আরোপ করেন। তাঁরা কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষকে সার্বভৌম শক্তি প্রদান করতে চান। তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী—তার জ্ঞান আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল।

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় কাদারিয়া চিন্তাবিদগণও তাঁদের মতের সমর্থনে পবিত্র কোরআনের নিম্নে উল্লেখিত আয়াতসমূহ নির্দেশ করেন : "যে ব্যক্তি পাপ করে, সে নিজ দায়িত্বেই তা করে ...।" (সুরা ৪, আয়াত ১১১) "... যে জাতি নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করে না, আল্লাহ্ও সে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না ...।" (সুরা ১৩,

www.pathagar.com

আয়াত ১১) "যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে অণুপরিমাণ দুষ্কর্ম করবে সে তা প্রত্যক্ষ করবে।" (সুরা ৯৯, আয়াত ৭-৮) "যে যেমন কাজ করবে সে অনুরূপ ফল পাবে।" "মানুষ চেষ্টার অতিরিক্ত ফল পাবে না।" "তোমাদের যে মুসিবত ঘটে, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল।" (সুরা ৪২, আয়াত ৩০) "... যারা সৎপথ অনুসরণ করে নিজেদের কল্যাণেই করে, আর যে বিভ্রান্ত হয় সেও নিজেই তার নিজ দায়িত্ব বহন করে ...।" (সুরা ১০, আয়াত ১০৮)

জাবারিয়া ও কাদারিয়া উভয় সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণই চরম পন্থা অবলম্বন করেছেন। জাবারিয়াগণ মানুষের নীতি, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধকে চরম অবহেলা করেছেন। অপরদিকে কাদারিয়াগণ মানুষের নীতি, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইসলামি মতবাদ হচ্ছে এই চরমপথের অর্থাৎ বাধ্যবাধকতা ও নিরংকুশ স্বাধীনতার মধ্যপথ। ইমাম আলি-আর-রিদা ইসলামি মতবাদকে নিম্নরূপে ব্যক্ত করেন : "আল্লাহ্ তোমাদের দু'টো পথ নির্দেশ করেছেন, তাদের একটি তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহ্র) দিকে পরিচালিত করে, অন্যটি তাঁর (আল্লাহ্) পূর্ণত্ব থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে রাখে। এদের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে তোমরা স্বাধীন। আনন্দ অথবা বেদনা, পুরস্কার অথবা শাস্তি তোমাদের নিজস্ব স্বভাবের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মন্দকে ভাল, পাপকে সৎ-এ পরিবর্তন করা মানুষের ক্ষমতা নেই।" (স্পিরিট অব ইসলাম, আমির আলি)

জাবারিয়া ও কাদারিয়া এই উভয় সম্প্রদায়ের মতামতকে সমন্বয় সাধন করে উপসংহারে আমরা যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি তা হচ্ছে : নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ হচ্ছেন সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। কিন্তু ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাগ্য পরিবর্তনে মানুষেরও কিছুটা হাত রয়েছে। আল্লাহ্ যেমন মানুষের ব্যাপারে পূর্ব নির্ধারণের কথা বলেন তখন তার অর্থ হচ্ছে এই যে তারা কার্যের সাধারণ নিয়মাবলি অর্থাৎ প্রবৃত্তির নিয়ম অবশ্যই পালন করবে। মানুষ তার অস্তিত্বের সীমিত ক্ষেত্রে পরম বুদ্ধির তত্ত্বাবধানে নিজে তার চরিত্রের নির্মাতা ও ভাগ্যের নিয়ন্তা।

সেফাতিয়া সম্প্রদায়

জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধ দীর্ঘকালের। অবশেষে জাবারিয়া সম্প্রদায় সেফাতিয়া সম্প্রদায়ে প্রবেশ করলে এই বিরোধ ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, সেফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠী অদৃষ্টবাদের প্রভাব হতে কোনো সময়ই মুক্ত হন নাই বা মুক্ত হবার কোনো প্রচেষ্টাও চালান নাই। সেফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠী আল্লাহ্র গুণাবলি বিষয়ে নতুন মতবাদ প্রদান করেন। তাঁদের মতে আল্লাহ্র কতকগুলো সেফাত বা গুণ রয়েছে। এই গুণগুলো তাঁর সত্তা হতে পৃথক। এই গুণগুলো হচ্ছে, জ্ঞান, শক্তি, জীবন ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন, গরিমা, ঔদার্য, দান , দয়া, গৌরব ও মহত্ত্ব।[৪] তাঁরা সত্তার গুণাবলি ও কার্যের গুণাবলি প্রদান করেন, যথা—হাত, মুখমণ্ডল প্রভৃতি। তাঁদের কথা হচ্ছে কোরআনে এই ধরনের বর্ণনা রয়েছে, অতএব, এই গুণগুলোকেও কোরআনের বর্ণনা অনুসারে পরিগ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে তাঁদের মধ্যেই একদল ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেন যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলি মানুষের গুণাবলির ন্যায়—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। এইসব চিন্তা মোশাব্বিহা বলে অভিহিত। তাঁরা আল্লাহকে মানুষের গুণে ভূষিত করেন। তাঁদের কথা—কোরআনে আল্লাহ্‌র গুণাবলি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—এদের রূপকার্থ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই।[৫]

চরমপন্থী সেফাতিয়া গোষ্ঠী মুজাসসিমা বা কার্বামিয়া নামে পরিচিত। আবু-আবুল্লাহ্ মুহম্মদ কাররম এই দলের নেতৃত্ব দান করেন। তাঁর মতে আল্লাহ্ একটি দ্রব্য এবং তিনি সর্বদা সিংহাসন বা আরশ-এর উপর উপবিষ্ট কিন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করতে পারেন।[৬]

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ড. আমিনুল : ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি পৃ. ১১৫
২. কাজী আয়ুব আলী : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩
৩. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৩
৪. সৈয়দ আমীর আলী : দি স্পিরিট অব ইসলাম, পৃ. ৪১৩
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩-৪১৪
৬. সৈয়দ আবদুল হাই : মুসলিম ফিলসফি পৃ. ৬১

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুতাযিলা সম্প্রদায়

ক. ভূমিকা

ইসলামের অন্যান্য চিন্তাগোষ্ঠীর ন্যায় মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব মহানবি (সঃ)-এর সাহাবিগণের পরবর্তীকালে। ইসলামে সরল বিশ্বাসের ধারা মহানবির ওফাতের পরও কিছুকাল অব্যাহত থাকে। এরপরই রোমান ও পারসিকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ আরবদের দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সম্মোহিত করে রাখে। এছাড়া, প্রথমদিকে মুসলমানগণ ধর্মপ্রচারের কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, ধর্মতত্ত্বের গূঢ় আলোচনার অবকাশ তাদের অল্পই ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও সাহাবিগণের একটা গোষ্ঠী ছিল যাদের সাথে সামরিক অভিযানের তেমন একটা সংস্পর্শ ছিল না। ফলে তাঁরা প্রচুর অবসর পান এবং অবসরের এই মুহূর্তে তাঁরা নিজেদেরকে ধর্মতত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ব্যস্ত রাখেন। এখানে এই বিশেষ দলেরই প্রসঙ্গে টানা হচ্ছে যারা[১] 'ন্যায়বিচারের লোক' (The people of the Bench) বলে পরিচিত ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারেএই গোষ্ঠী যুক্তি বা বুদ্ধির অবাধ স্বাধীনতা সাধারণভাবে স্বীকার করতেন না। তবে প্রয়োজনবোধে যুক্তির আলোকেই তাঁরা ধর্মীয় চিন্তাধারার ভাষ্য উপস্থাপন করতেন। এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হযরত আলি (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), মুয়ায ইবনে জাবর (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ সমস্ত ব্যক্তিত্বই মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ভিত গড়ে তোলেন।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, সম্প্রসারিত রাষ্ট্রে ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্নমুখী নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে এবং নতুন নতুন চিন্তাগোষ্ঠীরও উন্মেষ ঘটবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেসব দল এবং গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শিকড় থাকে কেবলমাত্র সেসব দল ও গোষ্ঠীর প্রাধান্য পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ খারিজি ও শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির বিষয়টি ধরে নেয়া যায়। পরবর্তীকালে মুতাযিলা মতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তিও তৎকালীন রাজনৈতিক বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

কাদেরিয়া মতবাদের সাহসী প্রচারের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন মা'বাদ আল-জুহানি। তিনি উমাইয়া যুগের প্রথম পর্বের লোক। এ কালটা ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। উমাইয়াদের নেতৃত্বে দেশে তখন অত্যাচার ও নির্মম রক্তপাত চলছিল। পরিণামে

www.pathagar.com

জনসাধারণের মধ্যে ক্ষুব্ধ একটা সাধারণ অনুভূতি সঞ্চারিত হতে থাকে। স্বাধীনচেতা আরবগণ এ অবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাবি করেন :

তোমরা কেন এই বর্বরোচিত কার্য সম্পাদন কর?

এসব কি ইসলামের পরিপন্থী নয়?

তোমরা কি মুসলমান নও?

নিরপরাধীর যতই ভণিতা করুন না কেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উত্তর ছিল : আমরা যা করি তার জন্য আমরা দায়ী নই। আল্লাহ্‌ই সবকিছু করেন। ভাল-মন্দ তাঁরই ক্ষমতা।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, মা'বাদ আল-জুহানি একদিন তাঁর সাথী ওয়াসিল ইবনে আতা-সহ প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী হাসান আল-বসরি (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং বলেন : "হে আবু সাঈদ, এসব শাসক মুসলমানদের রক্তপাত ঘটায় এবং দুষ্কর্ম করে এবং বলে যে, তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সাধিত হয়।" এতে হাসান আল বসরি (রাঃ) জবাব দেন : "আল্লাহ্‌র শত্রু, তারা মিথ্যাবাদী।" এভাবে দেখা যায় যে, প্রাচীন মুতাযিলা কর্তৃক প্রথম যে মতবাদ পেশ করা হয় তা ছিল : মন্দ বা অসৎ কার্যের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। এগুলো আল্লাহ্‌র উপর আরোপ করা যাবে না। এটা 'কদর' মতবাদ নামে পরিচিত। এজন্যই আদি মুতাযিলীয়গণকে[২] 'কদর' শব্দ-উদ্ভূত কাদারিয়া নামে অভিহিত করা হয়। একই কারণে তাঁদেরকে আদেলীয়ও বলা হয়। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের রক্ষক। কারণ, মানুষের কাজের জন্য মানুষ দায়ী থাকলেই আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার সংরক্ষিত হয়। মা'বাদ আল-জুহানি (রাঃ) প্রকাশ্যে এ মতবাদ প্রচার করেন। সে জন্য খলিফা আবদুল মালিকের আদেশে ৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জাজ কর্তৃক তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

মা'বাদ আল-জুহানির পর গায়লান আল-দিমাশ্কি অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি প্রচার করেন যে, প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত করা এবং দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখা। গায়লানের এই প্রচার উমাইয়া শাসক-স্বার্থ সংরক্ষণের প্রকাশ্য প্রতিবন্ধক ও হুমকিস্বরূপ ছিল। ফলে হিজরি ১০৫ (খ্রিষ্টাব্দ ৭২৩) শাসনকালের শুরুতেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

গায়লান এবং মা'বাদ-এর মৃত্যু তাঁদের মতবাদকে বলিষ্ঠতা দান করে। তাঁদের শিক্ষা সমকালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রভাব বিস্তার করে। হাজার হাজার লোক মুতাযিলা মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসে। এ সময় একই সনে হিজরি ৮০ (খ্রিস্টাব্দে ৬৯৯)-তে মুতাযিলা চিন্তার ক্ষেত্রে দু'জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ দু'জন হচ্ছেন : ওয়াসিল ইবনে আতা এবং আমর ইবনে উবায়েদ। তাঁরা উভয়েই বসরার সুবিখ্যাত মসজিদে ভাষণদানকারী হাসান আল-বসরি (রাঃ)-এর শিষ্য। একদিন হাসান আল-বসরি (রাঃ) কিছু সমস্যা নিয়ে যখন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন, তখন কোনো এক ব্যক্তি মুরজীয় ও ওয়াদিয়ার বিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গির এক প্রশ্ন নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। প্রথমপক্ষের অভিমত : গুরুতর পাপ সম্পাদনকারীকেও একজন মুসলিম বলে গণ্য করা উচিত। তাকে একজন অবিশ্বাসী

www.pathagar.com

বলে অভিযুক্ত করা যথার্থ নয়। তার বিচারের ভার আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত করা উচিত। পবিত্র কোরআনে শাস্তিমূলক আয়াতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপে অপরপক্ষের অভিমত : গুরুতর পাপ সম্পাদনকারী যেহেতু সত্যপথ হতে বিচ্যুত, তাই তাকে সম্ভবত বিশ্বাসী বলে বিবেচনা করা যায় না। হযরত হাসান (রাঃ) কোনো উত্তর দেয়ার পূর্বেই ওয়াসিল অথবা আমর তাঁদের একজন মন্তব্য করেন : এমন লোকের অবস্থান মধ্যবর্তী জায়গায় (middle position) অর্থাৎ, সে বিশ্বাসীও নয়, অবিশ্বাসীও নয়। হযরত হাসান (রাঃ) এতে ব্যথিত হন এবং বলেন, ইতিযালা আন্না অর্থাৎ সে আমাদের দল পরিত্যাগ করেছে। ওয়াসিল এবং আমর তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে মসজিদের অন্যপ্রান্তে চলে যান এবং নিজেদের মত প্রচার করতে শুরু করেন। যারা ওয়াসিল এবং আমরের মতবাদের অনুসারী হন তারাই মুতাযিলা নামে পরিচিত হন।[৩]

মুতাযিলা মতবাদের প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে ওয়াসিল ইবনে আতা এবং আমর ইবনে উবায়েদের চিন্তাধারা। তাঁরা ছিলেন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। 'কদর' এবং 'আদল' মতবাদ ভিন্ন তাঁরা তাঁদের ব্যাখ্যায় আরো গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বক্তব্য সংযোজন করেন। এর ফলে অচিরেই এই সম্প্রদায়ের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং তাঁরা এত সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে তা' সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইয়াযিদ ইবনে ওয়ালিদ তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালে প্রকাশ্যভাবে মুতাযিলা মতবাদ সমর্থন করেন এবং এই সময়ই এই গোষ্ঠী অন্যান্য চিন্তাগোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। হিজরি ১৩২ (খ্রিষ্টাব্দ ৭৪৯) সনে উমাইয়াদের পতনের পর মুতাযিলারা আব্বাসীয়দের হাতে উত্তম ব্যবহার পেতে থাকেন। আব্বাসীয় দ্বিতীয় শাসক মনসুর এবং আমর ইবনে উবায়েদ বাল্যবন্ধু এবং স্কুল জীবনের সহপাঠী। মনসুর, আমর ইবনে উবায়েদের ধার্মিকতা, নিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুতে এক শোকগাঁথা রচনা করেন। তাঁর রাজত্বকালে মুতাযিলাগণ সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে থাকেন। ওয়াসিল ইবনে আতা মুতাযিলা চিন্তাধারা প্রচারার্থে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচারকর্মী প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিছ মিশর, হায়স ইবনে সেলিম খুরাসান, আইয়ুব মাজিরাহ্ হাসান ইবনে মাকওয়াল কুফা এবং উসমান তাবিলকে আরমানিয়া প্রেরণ করা হয়। মুতাযিলাগণ যেখানেই গমন করে, সেখানেই তারা আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত হন।[৪] ইতোমধ্যে অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতিও সূচিত হয় যা মুতাযিলাগণকে ইসলামি জগতে প্রাধান্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান প্রদান করে। সাম্রাজ্য নিরাপদ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর মনসুর বিজ্ঞান ও শিল্প বিকাশে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। সংস্কৃত, ফার্সি, সিরীয় এবং গ্রিক ভাষায় বিজ্ঞান ও দর্শনের বিষয়ের উপর যে কোনো পুস্তক প্রাপ্ত হলে তিনি তা আরবি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিতেন। শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অনুবাদকর্মে বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে প্রভূত আনুকূল্য লাভ করে। ইহুদি, খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ ধর্মীয় নীতি প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক সমস্যা উত্থাপনে আকৃষ্ট হন, এমন কি, ইসলামের সমালোচনা করারও স্বীকৃতি পান। মনসুর সহনশীল ও উদারধর্মী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যুক্তি ও আলোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। ধর্মতত্ত্ববিধ এবং ঐতিহ্যবাদিগণ অমুসলিমদের সঙ্গে বুদ্ধিজাত

www.pathagar.com

আলোচনায় এগিয়ে আসেন। ফলে বুদ্ধি, যুক্তি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে। প্রজ্ঞা ও দ্বান্দ্বিক যুক্তিবাদে সজ্জিত হয়ে মুতাযিলাগণ অমুসলিমদের যুক্তিতর্ক খণ্ডন করে তাদেরকে নির্বাক ও নিশ্চুপ করে রাখেন। এর ফলে মুতাযিলাদের গৌরব বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তীকালে মুতাযিলাগণ আল-মামুনের রাজসভায় সম্মানিত স্থান পান। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের দু'জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আবু আল হুদায়েল আল্লাহ্ এবং আন-নাজ্জাম আল-মনসুরের ওস্তাদ ছিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। আবু আল হুদায়েল প্রসঙ্গে আল-মামুন বলতেন[৫] : লোকের উপর ছায়া যেমন বিস্তৃত থাকে, দ্বান্দ্বিক শিল্পের উপর তাঁর প্রভাবও তেমনি।[৬]

আল-মামুন বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে বিতর্ক শুনতে পছন্দ করতেন এবং তিনি তাদেরকে চিন্তা ও কথনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। এসব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মুতাযিলাগণই বিজয়ী হতেন এবং এভাবে তাঁরা নিজেদেরকে ইসলামের রক্ষক (protectors of Islam) বলে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল-মামুনের পর দু'জন যথা : আল-মুতাসিম এবং আল-ওয়াসিক মুতাযিলাদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কাজি আহমদ বিন দাউদ ছিলেন এ ধারার একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তিনি আল-মুতাসিম ও আল-ওয়াসিকের সভায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুতাযিলা সম্প্রদায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। অতঃপর আল-জুব্বাইয়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ইসলামের ইতিহাসে যুক্তিবাদ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

মুতাযিলা আন্দোলন প্রধানত যুক্তির আলোকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করার একটা প্রবণতা। বিভিন্ন তত্ত্বীয় ও ধর্মীয় সমস্যাবলি সম্বন্ধে এ চিন্তাধারার লোকেরা স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করেন। ব্যক্তিগত মতপার্থক্য এবং গৌণ বর্ণনা উপেক্ষা করে আমরা এখানে তাদের মতবাদের সাধারণভাবে কিছু গৃহীত মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করব।

খ. মূলনীতি ও মতবাদসমূহ

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মহান চিন্তানায়ক আবু আল হুসায়েন আল মায়্যাত-এর মতে মুতাযিলাদের পাঁচটি মূলনীতি রয়েছে। মুতাযিলা বলে দাবিদারকে এই পাঁচ নীতিকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে হয়। এ পাঁচটি নীতি হচ্ছে :

১. আল-তাওহিদ (খোদার একত্ব)
২. আল-আদল (খোদার ন্যায়বিচর)
৩. আল-ওয়াদ-ওয়াল-ওয়াইদ (পুরস্কারের অঙ্গীকার ও শাস্তির ভীতি)
৪. আল-মানযিলা বায়না আল-মানযিলাতাইন (বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থান)
৫. আমর বিন মা'রুফ ওয়াল নেহয়ি 'আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ)

www.pathagar.com

অন্যগুলোর চেয়ে প্রথম দু'টো নীতি হচ্ছে মূল বা কেন্দ্রীয় নীতি। কারণ মুতাযিলাগণ একান্তভাবেই নিজেদেরকে ঐক্য ও ন্যায়বিচারের লোক বলে অভিহিত করেন।

১. আত-তাওহিদ (খোদার একত্ব) : যদিও মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র একত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা শিরক থেকে পৃথকীভূত, তবু মুতাযিলাগণকে উৎকৃষ্ট ঐক্যবাদী বলে অভিহিত করা হয়। কারণ তাঁরা তাওহিদি ধারণাকে অমূর্ত চিন্তার বিষয়ীভূত করে দর্শনকে উপজীব্য করে তুলেছেন। মুতাযিলাগণ বিশেষ করে চারটি সমস্যা উপস্থাপন করেন এবং এর প্রত্যেকটির সঙ্গে তাওহিদি ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে :

ক. খোদার সিফাত (ঐশী গুণাবলি)
খ. পবিত্র কোরআন সৃষ্ট বা অসৃষ্ট (Createdness or uncreatedness of the holy Quran)
গ. পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র বাহ্যিক আকৃতিমূলক আয়াতের ব্যাখ্যা (Interpretation of the anthropomorphic verses of the Quran)

ক. সত্তার সঙ্গে আল্লাহ্‌র গুণাবলি বা সিফাতের সম্পর্ক : পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌কে সর্বজ্ঞাতা (Knower, Alim), শক্তিশালী (Powerful, Qdir), চিরঞ্জীব (The living, Hayy) বলে বর্ণনা করেছেন। ঐতিহ্যবাদিগণ (বিশেষ করে সিফাতিয়া গোষ্ঠী) মনে করেন যে, এসব প্রকাশ সুস্পষ্টভাবে এই অর্থ করে যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান, শক্তি এবং জীবন প্রভৃতি গুণাবলি রয়েছে। এ প্রশ্নে মুতাযিলাগণ আপত্তি তুলেন : আল্লাহ্ এক, তার গুণাবলিকে এভাবে বর্ণনা করার অর্থ হচ্ছে তাঁর উপর বহুত্ব আরোপ করা। তাদের[৭] আশঙ্কা ছিল যে এসব গুণ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যদি গুণাবলিকে আল্লাহ্‌র সত্তা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলে ভাবা হয়, তবে নিশ্চিতরূপেই তা বহু ঈশ্বরবাদে পরিণত হবে। মুতাযিলাগণ আল্লাহ্‌র গুণাবলি যথা : জ্ঞান, শক্তি, জীবন প্রভৃতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহ্ তাঁর সত্তার স্বরূপেই জ্ঞাত, শক্তিশালী এবং চিরঞ্জীব। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর সত্তা থেকে পৃথক জ্ঞান, শক্তি, জীবন প্রভৃতি গুণ বহন করেন।

আল-মামুনের উস্তাদ আন-নাজ্জাম গুরুত্ব সহকারে বলেন যে, গুণাবলি আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে নয় বরং এগুলোই হচ্ছে তাঁর সত্তা। (Qualities are not in the essence of God, but are His essence)। তাঁর সর্বশক্তির কারণেই আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং এ-ই হচ্ছে তাঁর সত্তা। তাঁর সর্বজ্ঞানের কারণেই তিনি সর্বজ্ঞাতা এবং এই হচ্ছে তাঁর সত্তা।

কোনো কোনো মুতাযিলা উল্লেখ করেন যে, এসব গুণ নঞর্থকভাবে বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহতে কোনো হ্যাঁ-সূচক গুণ আরোপ করা যাবে না। কারণ, তাহলে আল্লাহ্‌র পরম ঐক্য বিপন্ন হবে। আল্লাহতে কোনো সদর্থক গুণ স্বীকার করার অর্থ হবে তাঁর মধ্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-এর জটিলতা রয়েছে। অথচ তিনি বিশুদ্ধতম পরম ঐক্য। "আল্লাহ্‌র সত্তায় কোনোরূপ বহুত্বের স্থান না দিয়ে একত্বের সমর্থনের কারণে

www.pathagar.com

মুতাযিলাদের একত্বের মানুষ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তবে তাঁরা যে বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক ও অনপেক্ষ (absolute) আল্লাহ্র ধারণা সমর্থন ও প্রচার করেন, তা মানুষের হৃদয়ে স্বাভাবিক আশা-প্রত্যাশাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি।"[৮]

আল্লাহ্র সত্তার সঙ্গে তাঁর গুণাবলির সম্পর্ক—এ সমগ্র সমস্যাটিই মুতাযিলাদের আত্মসৃষ্ট জটিলতা। সমস্যার স্বরূপটাই হচ্ছে একটা অসম্ভাব্য ব্যাপার যা সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞা ও বোধের অতীত। এখানে পথনির্দেশনার জন্য একমাত্র প্রত্যাদেশেরই দাবি রয়েছে।

খ. কোরআন সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট : মহাগ্রন্থ কোরআন মুসলমানদের নিকট অতি পবিত্র এবং সম্মানিত গ্রন্থ। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ পবিত্র নবির সঙ্গে কথা বলেন। কথাগুলো নিশ্চিতরূপেই আল্লাহ্র কথা। এজন্যই পবিত্র কোরআনকে ঐশীবাণী বা আল্লাহ্র বাণী অর্থাৎ কালাম আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র কালাম বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মুসলিম ধর্মানুরাগ আরো অগ্রসর হয় এবং এই মত পোষণ করে যে পবিত্র কোরআন অসৃষ্ট। কোরআন অনন্তকাল থেকেই আল্লাহ্র সঙ্গে বিদ্যমান ছিল। অবশ্য নবি (সঃ) নিকট এর প্রত্যাদেশ কালের একটি ঘটনা। এই মতবাদের সমর্থনে সনাতন চিন্তাগোষ্ঠী পবিত্র কোরআন থেকেই প্রমাণ আনেন। 'কুন' অর্থাৎ 'হও' শব্দের মাধ্যমেই আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ শব্দটি স্বয়ং সৃষ্ট হয় নি। যদি তা-ই হতো, তবে এই সৃষ্ট শব্দটাই সৃষ্টিকর্তা হতো। তাই আল্লাহ্র বাণী বা আল্লাহ্র কালাম অসৃষ্ট। পুনরায়, কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সৃষ্টি এবং নির্দেশ কি তাঁর নয়'? (সূরা ৭, আয়াত-৫৪)। নির্দেশ এখানে সুনিশ্চিতভাবেই সৃষ্ট থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ এ অসৃষ্ট। কিন্তু, আল্লাহ্র নির্দেশ নিশ্চিতরূপেই তাঁর বাণীর মধ্যে রয়েছে। তাই আল্লাহ্র বাণী অর্থাৎ কোরআন অসৃষ্ট। কিন্তু, মুতাযিলাগণ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কোরআনের চিরন্তনতাকে অস্বীকার করেন। কারণ, আল্লাহ্ই একমাত্র চিরন্তন। তাদের মতে যারা কোরআন অসৃষ্ট বলে বিশ্বাস করে তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোরআনকে সহ-নিত্য করে ফেলে। "আল্লাহ্র একত্ব ইসলামের মূলনীতি। এজন্যই যা কিছু নীতিবিরুদ্ধ তাকেই শিরক বলে বর্জন করতে হবে। কোরআন প্রথমে আল্লাহ্র মনে উপাত্ত (content) হিসেবে উপস্থিত ছিল, কিন্তু ভাষায় এর বাহ্য প্রকাশ ঘটেছিল পরবর্তীকালে। শুধু এ অর্থেই কোরআনকে নিত্য বলা যেতে পারে।[১০]

গ. আল্লাহ্র দর্শনের সম্ভাব্যতা : সকল যুক্তিবাদী দার্শনিক, মুতাযিলাগণ, ঐতিহ্যবাদী চিন্তাগোষ্ঠী খোদা দর্শনকে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু সেই দর্শনের বা দেখার প্রকৃতি কি তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ জগতে বা পরজগতে শারীরিক বা দৈহিক চক্ষে খোদাকে যে দেখা যায় না এ বিষয়ে সব মুতাযিলাই একমত। কারণ, তাঁদের মতে খোদা স্থান-কালের অতীত। আবু আল-হুদায়েল এবং অধিকাংশ মুতাযিলাগণ উল্লেখ করেন : "আমাদের মনঃচক্ষুর দ্বারা খোদাকে দর্শন করব। অর্থাৎ, আমরা একমাত্র আমাদের হৃদয়ের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারব।[১১] তাঁদের মতবাদের সমর্থনে তারা যে প্রমাণ উপস্থাপন করেন নিম্নোক্ত শিরোনামে তা বর্ণনা করা যেতে পারে :

www.pathagar.com

ক. কোরআন থেকে প্রমাণ

১. "চক্ষু তাঁকে দর্শন করতে পারে না এবং তিনি চক্ষু অবলোকন করেন, তিনি সূক্ষ্মদর্শী, অভিজ্ঞ" (সুরা ৬, আয়াত ১০৩)।

তাঁদের মতে এই আয়াত হচ্ছে একটা সাধারণ প্রযোগ এবং অর্থ হচ্ছে এ জগতে বা পরজগতে দৈহিক চক্ষু আল্লাহকে দর্শন করতে পারে না।

২. মুসা (আঃ)-এর সনির্বন্ধ মিনতির জবাবে আল্লাহ্ দৃঢ়ভাবে না করে বলেন, "তুমি কখনই আমাকে দেখতে পারবে না।" মুসা (আঃ)-এর প্রার্থনা : "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে দর্শন দাও—যেন আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।" (সুরা ৭, আয়াত ১৪৩)।

৩. "... পরন্তু, তারা মুসা (আঃ)-কে এর অপেক্ষাও বড় প্রশ্ন করেছিল : কারণ, তারা বলেছিল "আল্লাহ্কে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। অনন্তর তাদের অপকর্মের জন্য বিদ্যুৎ তাদেরকে পাকড়াও করেছিল ...।" (সুরা ৪, আয়াত ১৫৩)।

মুসা (আঃ)-এর লোকজন যদি আল্লাহর নিকট সম্ভাব্য বিষয় দাবি করত তবে তাদেরকে দুষ্কর্মকারী বলে অভিহিত করা হতো না এবং বিদ্যুতও তাদের পাকড়াও করত না।

খ. দৃষ্টিবিজ্ঞান থেকে প্রমাণ : একটা বস্তু দর্শন বা দেখার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলোর[১২] প্রয়োজন বলে মুতাযিলাগণ উল্লেখ করেন :

১. একজনের সুস্থ দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে।
২. দৃশ্য বস্তুটি চোখের সামনে বা বিপরীতে থাকতে হবে। যেমন আয়নায় প্রতিফলনের জন্য বস্তুকে তার বিপরীতে রাখতে হয়।
৩. দৃষ্ট বস্তু যাতে চোখের খুব দূরবর্তী না হয়।

অথবা

৪. বস্তু যেন চোখের একেবারে নিকটবর্তী না হয়।
৫. বস্তু যেন দেখতে অতি সূক্ষ্ম না হয় অর্থাৎ একে রঙিন অথবা পর্যাপ্ত স্থূল হতে হবে।

আল্লাহ্ যেহেতু দৃশ্যবস্তু হিসেবে উপরোক্ত শর্ত পূরণ করেন না, তাই মুতাযিলাদের মতে তাকে দৈহিক চোখে দেখা যায় না।

গ. হাদীস থেকে প্রমাণ : নবি (সঃ)-এর উপর আরোপিত আয়াতে বলা হয়েছে : 'পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তুমি তোমার প্রভুকে দর্শন করবে। তখন তোমরা নিজেদের মধ্যে তার দর্শন সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করবে না।' (তিরমিজি) মুতাযিলাগণ উল্লেখ করেন হাদিসটির প্রসঙ্গ হচ্ছে আহাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে (category of Ahad), মুতাওয়াতির (Mutawatir) নয়। অর্থাৎ এ প্রেরকের একক পথের মধ্য দিয়েই আসে (It comes through a single channel of transmitters)। কারণ এ যখন পবিত্র কোরআনের প্রকাশ্য আয়াত যেমন "দৃষ্টি তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, তিনি সব দৃষ্টি পরিবেষ্টন করে আছেন" (সুরা ৬, আয়াত ১০৩)-এর সংঘাতে আসে তখন তা

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে, তারা হযরত বিবি আয়েশার একটি উক্তি উল্লেখ করেন যেখানে নবি (সঃ)-এই জগতে আল্লাহকে দেখেছেন কি-না প্রশ্ন রয়েছে : যে বলে নবি (সঃ) ব্যক্তি আল্লাহকে (god in person) দেখেছেন সে মিথ্যে বলে। (বোখারি)

ঘ. কোরআনে দেহমূলক আয়াতের ব্যাখ্যা : পবিত্র কোরআনে আমরা আল্লাহর উপর অনেক দেহ বা অঙ্গমূলক ভাবের প্রকাশ পাই। যেমন :

১. 'অতএব পবিত্রতম তারই সত্তা যার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।' (সুরা ৩৬, আয়াত ৮৩)
২. যা আমি স্বীয় হস্তে সৃষ্টি করেছি।
৩. যা আমার নয়ন সমক্ষে সঞ্চারিত।
৪. আর অবশিষ্ট থাকবে আপনার রব্বের সত্তাই যিনি মহত্ত্ব ও গৌরবের অধিপতি (সুরা ৫৫, আয়াত ২৭)
৫. আর তিনি পরম করুণাময়; আরশের উপর (তার মাহাত্ম্যোপযোগীরূপে) অবস্থিত আছেন। (সুরা ২০, আয়াত ৫)
৬. আর আপনি ফেরেশতাদেরকে দেখবেন আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে অবস্থান করবে এবং স্বীয় রাব্বের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে। (সুরা ৩৯, আয়াত ৭৫)

তাদের খোদা-দর্শন অভিমত থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মুতাযিলাগণ স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর উপর সকল প্রকার দেহ বা অঙ্গমূলক উক্তি, যথা : মুখ, হস্ত, নয়ন, আরশ-'পরি অধিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতীকী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। মুতাযিলাগণ আল্লাহর বিশুদ্ধ ঐক্য বা তাওহিদি রক্ষার্থে সকল প্রকার আক্ষরিকতাকে তীব্র নিন্দা করেন। প্রয়োজনে তাঁরা পবিত্র কোরআনের আয়াত ব্যাখ্যা[১৩] তা'বিল (Tawil) নীতি অনুমোদন করেন। মুতাযিলাগণ দৈহিক অর্থে নবি (সঃ)-এর মেরাজ গমন অস্বীকার করেন। কবরে দৈহিক শাস্তি, তুলাদণ্ড (Balance), পুলছিরাত এবং অন্যান্য প্রতীকী অস্বীকার করেন। তবে যাই হোক, দৈহিক পুনরুত্থান, বেহেশত এবং এর ইন্দ্রিয়সুখ, দোজখ এবং এর শারীরিক যন্ত্রণার কথা তাঁরা স্বীকার করেন।

২. আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা : সনাতন চিন্তাগোষ্ঠী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ন্যায়বিচার করার জন্য আল্লাহর কোনো আবশ্যক নেই। তিনি যা করেন তাতে তিনি সম্পূর্ণভাবেই স্বাধীন। আল্লাহর ইচ্ছার দ্বারাই সৎ এবং অসৎ তাদের স্বভাবপ্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম—নির্দেশের মাধ্যমেই মানুষ তা জানতে পারে। তাই প্রত্যাদেশ মাধ্যম ব্যতীত কোনো ধর্মতত্ত্ব বা নীতিবিজ্ঞান থাকতে পারে না। মুতাযিলাগণ এ মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, প্রজ্ঞার ধী-শক্তির দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ উপলব্ধি করা যায় এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা চলে। জার্মান দার্শনিক কান্টের ন্যায় তাঁরা নৈতিকতাকে ধর্মতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র মনে করেন এবং ভালমন্দের বস্তুগত সত্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী মুতাযিলারা বিশেষ করে "আন-নাজ্জাম মনে করেন আল্লাহ্ যে অশুভ কিছু করেন না শুধু তাই নয়, তিনি তার সৃষ্টজীবের অমঙ্গল করতে পারেন না। তিনি এমন কিছু করতে পারেন না যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং মানবজীবনে যে সব অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্য অনুষ্ঠিত হয়, আল্লাহ্ সেগুলোর কর্তা নন। নিজের জীবনে অকল্যাণ ও দুঃখকষ্টের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী।"[১৪]

যাই হোক, ম্যাকডোন্যান্ডের অনুসরণে এমন অভিযোগ আনা অন্যায় যে জগতে অস্তিত্বমান বিধি বা স্থির নীতির গ্রিক ধারণার দ্বারা মুতাযিলাগণ অভিভূত। আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান[১৫]। পবিত্র কোরআনের বর্ণনানুসারে আল্লাহ্ মূলত ন্যায়বান ও ন্যায়বিচারক।[১৬] মুতাযিলাগণের আল্লাহ্র ন্যায়পরায়ণতা মতবাদ গ্রিক ভাবধারা থেকে নয় বরং পবিত্র কোরআনের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নের পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে :

১. "আল্লাহ্ তাঁর সেবেকগণের প্রতি বিন্দুমাত্র অত্যাচার করেন না।" (সুরা ২২, আয়াত ১০)
২. "আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো অত্যাচার করেন না।..." (সুরা ১০, আয়াত ৪৪)
৩. "উত্থান দিবসে আমি ন্যায়ের তুলাদণ্ড সংস্থাপন করব, তখন কেউই অত্যাচারিত হবে না এবং যদি এটা শর্ষপ-বীজ পরিমিত হয় তবে তাও উপস্থাপিত করা হবে এবং আমিই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট" (সুরা ২১, আয়াত ৪৭)

মানুষের নৈতিক দায়িত্ব এবং আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের জন্য মুতাযিলাগণ মানুষকে কিছুমাত্র ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁরা এটাও উল্লেখ করেন—"আল্লাহ্ মানব সত্তাকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপান না, কিন্তু, তার ক্ষমতানুসারে ... ।" (সুরা ২, আয়াত ২৮৬) এ আমাদেরকে কান্টের নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় : আমি পারি; অতএব, আমার করা উচিত।

যেহেতু তাঁরা কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী তাই তাঁরা মানব স্বাধীনতার দৃঢ় সংরক্ষক। মানুষের স্বাধীনতা এবং আল্লাহ্র ন্যায়বিচার উভয়ই যুগপৎ চলে। মানুষ তার কর্মের জন্য নিজেই দায়ী নতুবা মৃত্যুর পর পাপীজনকে শাস্তি দানে আল্লাহ্র ন্যায্যতা প্রতিপাদন হবে না।

কোনো কোনো মুতাযিলা যুক্তি দেন যে, শিশুদেরকে কখনই দোজখের শাস্তি প্রদান করা হবে না, কারণ, তারা কখনই ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রয়োগ করে নি, তাই কোনো দায়িত্বও তাদের উপর বর্তায় না।

৩. পুরস্কারের অঙ্গীকার ও শাস্তির ভীতি : এই মতবাদ ন্যায়বিচারের মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আল্লাহ্ ন্যায়ী, তাই পরবর্তী জীবনে তিনি পাপীদেরকে শাস্তি এবং ধার্মিকগণকে পুরস্কার দেবেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ কি নিজে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির ভয় প্রদান করেন নি?

www.pathagar.com

১. "আল্লাহ্ বিশ্বাসীবৃন্দ ও বিশ্বাসীগণকে বেহেশতের বাগানের অঙ্গীকার করেন ...।" (সুরা ৯, আয়াত ৭২)
২. দুষ্কর্মকারীরা নিশ্চয়ই নরকে থাকবে, (সুরা ৮২, আয়াত ১৪)
৩. যে অণু পরিমাণ সৎকার্য করবে, সে তা অবলোকন করবে এবং যে অণু পরিমাণ দুষ্কর্ম করবে সে তাও প্রত্যক্ষ করবে। (সুরা ৯৯, আয়াত ৭-৮)

মুতাযিলাগণ বলেন যে, ধার্মিকগণকে পুরস্কার এবং দুষ্কর্মকারিগণকে শাস্তিদান আল্লাহ্র উপর বাধ্যবাধকতাপূর্ণ এবং তিনি এ ব্যতীত অন্যকিছু করতেও পারেন না। এর বিপরীতে সনাতন চিন্তাগোষ্ঠী বিশেষ করে আশারীয়গণ বিশ্বাস করেন যে, পুরস্কার এবং শাস্তি সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহ্র দান। যাকে ইচ্ছা তিনি তাঁকে পুরস্কৃত করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা তাঁকে শাস্তি দান করতে পারেন। তবে নিশ্চিত যে তাঁর ওয়াদানুসারে তিনি সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কৃত করবেন এবং দুষ্কর্মকারীদেরকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু কোনো বিবেচনাই তাঁর স্বাধীনতা বাধ্যবাধকতার অধীন নয়। এ-ই বা সে-ই করতে তাঁকে বাধ্য করা যাবে না। তাঁর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করার অর্থ হচ্ছে তাকে নির্ভরশীল সত্তায় রূপান্তরিত করা। কিংবা তাঁকে যন্ত্রে পরিণত করা, সেই যন্ত্রে যা স্ব-ইচ্ছা ব্যতীত সঞ্চালিত হয় ও কার্য সম্পাদন করে। সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার এবং দুষ্কার্যকারীকে শাস্তি দানে যদি তাঁকে বাধ্য করা হয় তবে একজন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা একজন বিচারকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায় যাদের রায় প্যানাল কোডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত?

অন্যদিকে মুতাযিলাদের মতে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির ভয়ের কথা অপরিপূর্ণ থাকতে পারে না, কেননা তাহলে, আল্লাহ্র ন্যায়নিষ্ঠতার প্রশ্নই সংশয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তাঁর বাণীকে কখনও পরিবর্তন করেন না। কোরআনেই পরিব্যক্ত হয়েছে : "... আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন নেই ...।" (সূরা ১০, আয়াত ৬৪)

সৎকর্মশীলগণ বেহেশত এবং দুষ্কর্মকারিগণ যে নরকে যাবে সনাতন চিন্তাগোষ্ঠী এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের সঙ্গে একমত। তবে মুতাযিলাদের মতে, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য ও অনমনীয়। সনাতন চিন্তাগোষ্ঠীদের মত অনিশ্চিত ও সম্ভাব্য। আল্লাহ্ কি করবেন এ বিষয়ে তিন সম্পূর্ণ স্বাধীন। সনাতন চিন্তাগোষ্ঠী দৃঢ়তার সাথে অভিমত ব্যক্ত করেন : আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ধার্মিকদের নরকে, অথবা ন্যূনপক্ষে দুষ্কর্মকারীদেরকে বেহেশতে দিতে পারেন। মুতাযিলাগন উল্লেখ করেন : অবস্থা যদি এ-ই হয় তবে আল্লাহর স্বাধীনতা হবে খামখেয়ালিপূর্ণ এবং আল্লাহ্র ন্যায়পরায়ণতার সকল অর্থ ও তাৎপর্য মূল্যহীন হয়ে পড়বে। মুতাযিলাগণ কান্টপন্থীদের ন্যায় ধর্মতত্ত্বের পূর্বে নৈতিকার স্থান দেয়, অন্যদিকে সনাতন চিন্তাবিদগণ নৈতিকতার পূর্বে ধর্মতত্ত্বকে উপস্থাপন করেন।

৪. বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থান : বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থানের মতবাদ গ্রহণ করার জন্যই মুতাযিলাগণ[১৭] মুতাযিলা নাম ধারন করেন। স্বভাব ও প্রকৃতির দিক দিয়ে এ মতবাদ যত না ধর্মতাত্ত্বিক তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। মুতাযিলাগণ মনে করেন যে, মানুষ যখন গুরুতর পাপ সংঘটন করে,

www.pathagar.com

তখন সে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী অবস্থায় থাকে না—সে মধ্যবর্তী এক স্থান দখল করে। যদি অনুশোচনা ব্যতীত তার মৃত্যু হয়, তবে নরকাগ্নি যন্ত্রণা ভোগ করবে—তবে পার্থক্য এই যে তার উপর প্রদত্ত শাস্তি অবিশ্বাসীদের উপর প্রদত্ত শাস্তির চেয়ে কম হবে। কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতেই এ মতবাদ সমর্থিত হয়। বিশ্বাসীরা কি মন্দ-কার্যকারীদের ন্যায়? তারা সমপর্যায়ভুক্ত নয়। (সুরা ৩২, আয়াত ১৮)। পুনরায়, নবি (সঃ) বলেন, যে গুরুতর পাপ থেকে বিরত নয়, সে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী নয়।

৫. সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ : সৎকার্যের নির্দেশ এবং মন্দ কার্যের নিষেধ মুতাযিলাদের প্রয়োগিক ধর্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। সনাতন চিন্তাগোষ্ঠীও এ মতবাদের সমর্থন করে। তবে পার্থক্য এই যে, মুতাযিলাগণ একে ফরজে আইন বা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন, অপরপক্ষে, সনাতন চিন্তাগোষ্ঠী একে ফরজে কেফায়া অর্থাৎ দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে একজন এ নির্দেশ পালন করলেই যথেষ্ট মনে করেন।

ইসলামি ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীতে মুতাযিলা মতবাদসমূহ শুধু মৌখিকভাবেই নয়, ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কার্যপ্রয়োগের মাধ্যমেও প্রচার ঘটায়। যারা তাদের মতবাদের প্রতি সমর্থন জানায় না, বিশেষ করে 'কোরআন সৃষ্ট' মতবাদের প্রতি, তাদের সকলের বিরুদ্ধে আল-মামুনের নেতৃত্বে মুতাযিলা মতবাদ ক্রমে দুর্বৃত্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে বা মিহনায়[১৮] পরিণত হয়।

কোরআন সৃষ্ট মতবাদের প্রতি কর্মচারিদের বিশ্বাসী পরীক্ষার নিমিত্তে আল-মামুন রাষ্ট্রের সকল কাজির নিকট নির্দেশনামা জারি করেন। তিনি এমন নির্দেশও জারি করেন যে যারা এ পরীক্ষায় অসম্মতি জানাবে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। স্বাভাবিকভাবেই এই মনোভাব জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং পরিণামে মুতাযিলাদের পতন ডেকে আনে।[১৯]

গ. মুতাযিলাদের আরো কতিপয় বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ লক্ষণীয়

১. মুতাযিলাগণ কবরে মুনকার-নাকিরের জেরা অস্বীকার করেন।
২. মুতাযিলাগণ বিচার দিবসের আভাস, ইয়াজোজ, মাজোজ এবং দাজ্জালের আবির্ভাব অস্বীকার করেন।
৩. মুতাযিলাগণ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা কিরামান-কাতেবিনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এর কারণ-স্বরূপ তারা উল্লেখ করেন যে আল্লাহ্ তার সেবকগণের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক হতো, যদি না আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সেবকগণের কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত না হতেন।
৪. মুতাযিলাগণ আল-হাউজের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁরা বর্তমানে বেহেশত-দোজখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তবে বিচার দিবসে তাদের অস্তিত্ব হবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন।

www.pathagar.com

৫. তাঁরা আল-মিছাক বা সংবিদা অস্বীকার করেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ কেবল নবি, ফেরেশতা বা সিংহাসনের আলম্বের নিকট কথা বলেন নি, কিংবা তাদের পানে কোনো দৃষ্টিও দেবেন না।

৬. মুতাযিলাদের নিকট কার্যাবলী যাচাইকরণসহ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে মহাপাপী সর্বদাই দোজখে অবস্থান করবে।

৭. তাঁরা সাধুপুরুষ বা অলির অলৌকিকতা বা আল-কারামত অস্বীকার করেন। কারণ কারামত স্বীকার করলে তা নবিদের প্রামাণিক অলৌকিকতার সাথে মিশ্রিত হয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। জাহেমীয়দেরও অনুরূপ বিশ্বাস ছিল।

৮. মুতাযিলাগণ ইসলামের নবির ঊর্ধ্বারোহণ বা আল-মিরাজও অস্বীকার করেন, এর প্রমাণ ব্যক্তি হাদিসের সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত যা কার্য বা বিশ্বাসকে অপরিহার্য করে তুলে না। তবে তাঁরা মহানবি (সঃ)-এর জেরুজালেম যাত্রা অস্বীকার করেন না।

৯. তাঁদের মতে যে প্রার্থনা করে, কেবলমাত্র সে-ই প্রার্থনার পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। যে আকারেই হউক না কেন, এর উপকার অন্য কারোর উপর বর্তায় না।

১০. যেহেতু আল্লাহ্র বিধান পরিবর্তন করা যায় না, কাজেই প্রার্থনা কোনোই উদ্দেশ্য সাধন করে না। প্রার্থনার দ্বারা কিছুই লাভ হয় না। কারণ প্রার্থিত বস্তু যদি নিয়তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে একে লাভ করা অসম্ভব।

১১. তাঁরা সাধারণভাবে বলেন যে, মানবজাতির নিকট প্রেরিত আল্লাহ্র মানবীয় দূত বা রাসুলের চেয়ে আল্লাহ্র বার্তাবাহক ফেরেশতাগণ পদমর্যাদায় অনেক উন্নত।

১২. তাঁদের মতে উম্মাহ্র (মুসলিম জাতি) উপর ইমাম অপরিহার্যভাবেই নিয়োজিত।

১৩. আশারিয়া স্কলাসটিকদের বিপরীতে তাঁদের অভিমত হচ্ছে যে, মুজতাহিদ (ধর্মীয় বিধানের স্বীকৃত ব্যাখ্যাতা) তাঁর মতামত কখনও ভ্রান্ত হতে পারেন না।

ঙ. মুতাযিলা ও সুন্নি মতবাদের পার্থক্য[২০] :

পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুতাযিলা এবং সুন্নিগণ প্রায়শ ভিন্ন মত পোষণ করেন :

১. গুণাবলির সমস্যা।
২. খোদা দর্শনের সমস্যা।
৩. ভয় এবং অঙ্গীকারের প্রতিশ্রুতি।
৪. মানুষের কার্যের সৃষ্টি সমস্যা।
৫. আল্লাহ্র ইচ্ছার সমস্যা।

ইবনে হাযাম তাঁর মিকাল-ওয়াল নিহাল-এ উল্লেখ করেন যারা বিশ্বাস করে ১. কোরআন সৃষ্ট, ২. সব কাজ আল্লাহ্র বিধানে সম্পন্ন, ৩. বিচারদিবসে মানুষ আল্লাহ্র

www.pathagar.com

দর্শনের দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট, ৪. এবং যাঁরা কোরআন হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ্‌র গুণাবলি স্বীকার করে এবং ৫. কবিরা গুনাহ্-য় অংশগ্রহণকারীকে অবিশ্বাসী মনে করে না, তাদেরকে মুতাযিলা বলে অভিহিত করা যাবে না, যদিও তারা মুতাযিলাদের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে একমত পোষণ করে।

ইবনে হাযামের বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে মুতাযিলাগণ যুক্তিবাদী সম্প্রদা⁻⁻। তাঁরা তত্ত্বীয় যুক্তির দ্বারা ইসলামের সব বিশ্বাসকে বিচার করেন এবং যুক্তিবহি ৃ সব বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা ক্বচিৎ উপলব্ধি করেন যে, অন্যান্য ধীশক্তির ন্যায় যুক্তিরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে—যুক্তি ও প্রজ্ঞা সত্তার সবদিক উন্মোচন করতে পারে না। বিষয়টির বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যেমন শেকস্‌পিয়র বলেন : তোমার দর্শনের ভাববিলাসের চেয়েও হে হোরাসিও, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে অনেক অজ্ঞাত বিষয় রয়েছে। আধুনিক চিন্তাবিদদের ধারণা উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে—এরই অনুসিদ্ধান্তে তারা জ্ঞানের উৎসরূপে ওহি বা প্রত্যাদেশের স্বীকৃতি জানায়। তাই ইকবাল বলেন : জীবন উষার ফেরেশতা আমাকে বললে : 'তোমার হৃদয়কে করো না প্রজ্ঞার দাস'।

সম্ভবত একই কারণে ইকবালের পথনির্দেশক রুমীর তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ :

"নবীর নিকট বুদ্ধি তোমার কর সমর্পণ
আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, বল তিনিই পর্যাপ্ত
ইচ্ছেকৃত যুক্তি-তর্ক থেকে হও সতর্ক
দুঃসাহসিক উন্মাদনাকে কর অভ্যর্থনা
সেই উন্মাদ যাকে ব্যঙ্গ করে উন্মাদনা
বিধানকর্তাকে করে না যে লক্ষ্য।"

কয়েকজন বিখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ ও তাঁদের মতবাদ : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করলে বেশ ক'জন মুতাযিলা চিন্তাবিদের সন্ধান মিলে। এদের মধ্যে ওয়াসিল বিন আতা, আল-আল্লাফ, আন-নাজ্জাম, জাহিজ, মুতামির, মুয়াখার, থুমামাহ, আল-জুবাই, আবু হাশিম, আয-যামাকশারি প্রমুখ চিন্তাবিদের নাম উল্লেখযোগ্য। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এদের জীবনবৃত্তান্ত ও চিন্তাধারা আলোকপাত করা হলো :

১. ওয়াসিল বিন আতা (৬৯৯-৭৪৯ খ্রি.) : ওয়াসিল বিন আতা ছিলেন মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন, কোরআনের অনাদিত্ব আল্লাহ্‌র একত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাজেই কোরআন সৃষ্ট (মাখলুক), চিরন্তন (কাদামি) নয়। আল্লাহ্ এবং তাঁর গুণাবলিকে পৃথক করা যায় না। আল্লাহ্‌র গুণাবলি আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে এক ও অভিন্ন। তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং মন্তব্য করেন যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত মানুষের দায়িত্ববোধের কথা ঘোষণা করে এবং মানুষকে যদি স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করা হয়, তবে তার অবশ্যই কর্মের স্বাধীনতা আছে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণ কাজেই তিনি খামখেয়ালিভাবে বা অন্যায়ভাবে অযৌক্তিক কোনো কিছু করেন না। কোনো মুসলমান কবিরা গুনাহ করলে তার অবস্থান হবে নাস্তিক ও মুসলমানের মধ্যবর্তী। এভাবে তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন আর

www.pathagar.com

তাই আমরা বলতে পারি ওয়াসিল বিন আতা ছিলেন মুসলিম দর্শনে মুক্তবুদ্ধির প্রধান পুরোহিত।

২. আবুল হুদায়েল আল-আল্লাফ (মৃ. ৮৫৭ খ্রি.) : আবুল হুদায়েল আল-আল্লাফ ছিলেন এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মুতাযিলা পণ্ডিত। মুতাযিলা চিন্তাবিদদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। মুতাযিলাবাদের উপর তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। গ্রিক দর্শন, বিশেষ করে নব্য প্লেটোবাদী দর্শন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল বলে জানা যায়। তিনি উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্র গুণাবলি অনাদি ও অনন্ত সন্দেহ নেই, তবে এসবগুণ তাঁর সত্তা থেকে অচ্ছেদ্য। এসব গুণ শুধু আল্লাহ্র সত্তা বহির্ভূত বাহ্যগুণ নয়, বরং তার সত্তার বিভিন্ন অবস্থা বা ধরন। তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলেন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, কিন্তু এই স্বাধীনতা কেবলমাত্র ইহজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই স্বাধীনতা মানে দায়িত্বহীনতা নয়, বরং দায়িত্ববোধই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। এই দায়িত্ব পালন ইহকালের ব্যাপারে, পরকালে বেহেশত বা দোযখে মানুষের কোনো করণীয় নেই বলে কোনো দায়িত্ব থাকবে না। কারণ পরকালে সবকিছু আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ব গতিশীল, পরিবর্তনশীল এবং শুরু ও শেষ আছে। সৃষ্টির পূর্বে এ বিশ্বজগৎ আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে শান্ত অবস্থায় ছিল এবং ধ্বংসের পর এটা পুনরায় সে অবস্থায় ফিরে যাবে। তখন পৃথিবীর সব গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। আল্লাফের মতে মানুষের কর্ম দু'প্রকার যথা—নৈতিক ও প্রাকৃতিক।

৩. ইব্রাহিম বিন সাইয়ার আন-নাজ্জাম (৮০৯-৮৪৫ খ্রি.) : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে আন-নাজ্জাম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ, দার্শনিক ও সুলেখক। আন-নাজ্জাম বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর রচনার বহু অংশ হারিয়ে গেলেও কিছু মূল্যবান অংশ তাঁর প্রিয় শিষ্য আল-জাহিজের রচনার মাধ্যমে সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ্র একাত্মতা ও কোরআনের পবিত্র বাণী আন-নাজ্জামের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তিনি বলেন, পবিত্র কোরআনই হচ্ছে ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞানের একমাত্র উৎস। আন-নাজ্জাম বলেন, আল্লাহ্ মঙ্গলময়, তিনি নিজে মন্দ নন। তাই তিনি কখনও কোনো অন্যায় বা অকল্যাণ করতে পারেন না। মন্দ তাঁর স্বভাবধর্মিতা নয়, কাজেই সৃষ্টির জন্য যা কিছু সর্বোত্তম তিনি তাই করেন। তিনি হইজগৎ ও পরজগতে কেবল মঙ্গলই সাধন করেন। সৃষ্টি সম্পর্কে আন-নাজ্জাম বলেন, আল্লাহ্ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সবকিছুই একসময়ে সৃষ্টি করে অবিকশিত অবস্থায় রেখেছিলেন। পর্যায়ক্রমে আবার সবকিছুই সক্রিয়তা লাভ করেছে। আত্মা সম্পর্কে বলেন, "মানুষের আত্মা এমন একটি মসৃণ জড়ীয় বস্তু যা দুধের মধ্যে যেমন মাখন উপস্থিত, তেমনি রক্তমাংসের দৃশ্যমান দেহে উপস্থিত। আল্লাফের মতো নাজ্জাম মনে করেন যে, ঐশী জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞান প্রজ্ঞার সাহায্যে পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ ও মানুষের জন্যই স্বাধীনতা, কিন্তু গোটা ভাগ্য কিছু আবশ্যিক (necessary) নিয়মের অধীন। নাজ্জাম অ্যারিস্টোটলের ন্যায় মনে করেন পরমাণু অন্তহীনভাবে বিভাজ্য। তিনি বলেন, বস্তুসমূহ আকস্মিক গুণের (Accident) দ্বারা সৃষ্ট। এরূপ কোনো গুণকে বস্তু বলা চলে। যেমন, ফুলের গন্ধ, পদার্থের আলো ইত্যাদি।

www.pathagar.com

নাজ্জাম ইজমা ও কিয়াসকে স্বীকৃতি দেন নি। নাজ্জামের অনুসারীরা নাজ্জামিয়া নামে পরিচিত।

৪. জাহিজ (মৃ. ৮৬৮ খ্রি. মতান্তরে ৮৬৯ খ্রি.) : জাহিজ নাজ্জামের শিষ্য ছিলেন। তিনি সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 'কিতাবুল হাইয়ান' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর মতবাদ ও চিন্তাধারা ছিল অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বাস্তব ও ঐতিহাসিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল। জাহিজ বলেন, পদার্থ চিরন্তন, আল্লাহ্ নিরাকার। তিনি ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু তিনি মঙ্গলের খোদা। তিনি কখনো অমঙ্গল সৃষ্টি করতে পারেন না। ভালমন্দ মানুষের সাথে জড়িত। মানুষই ভালমন্দের জন্য দায়ী।

জাহিজ মনে করেন যারা দোজখে নিপতিত হবে তারা চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে না। কারণ দোজখের শাস্তি ভোগ করার পর তারা পুতপবিত্র হবে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ নিরাকার বা তার দেহ নেই, তিনি ন্যায়বিচারক এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ, তাকে মুসলমান গণ্য করা উচিত। কোনো ব্যক্তির আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার মানসিক শক্তি না থাকলে তাকে নিন্দা করার কিছু নেই।

৫. বিশার বিন মুতামির (মৃ. ৮৪৮ খ্রি.) : বিশার বিন মুতামির ছিলেন বাগদাদ দলের অন্যতম মুতাযিলা চিন্তাবিদ। তিনি বহু ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'তাও যাল্লাদ' মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ মতবাদের মূল প্রশ্ন : মানুষের কর্ম ও আচরণ বাহ্যশক্তি দ্বারা কতটুকু নিয়ন্ত্রিত? এবং পূর্বনির্ধারিত যে কর্ম সম্পাদনের কথা মানুষ সজ্ঞানে ভাবে নি, সেই কর্মের জন্য কতটুকু দায়ী। তাঁর মতে কাজের নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হবে উদ্দেশ্য দ্বারা, পরবর্তী ফলাফল দ্বারা নয়। মুতামির মূলত ইচ্ছার সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেন। তাঁর মতে শিশুরা চিরদিন দোযখে শাস্তি ভোগ করবে না, কারণ তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তার মতে অবিশ্বাসীদের চরম শাস্তি হওয়া উচিত, কেননা তারা স্বাধীন বিচারবুদ্ধির আলোকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাসী হতে পারত। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে বর্তমান জগতের চেয়ে ভাল ও সুখকর জগৎ সৃষ্টি করতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তা করেন নি, কারণ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের পথের জন্য এ জগৎ আবশ্যিক। এ জগতে পরিলক্ষিত দুঃখ খোদার সৃষ্ট নয়—এসব মানুষের কর্মফলবিশেষ।

৬. মুয়াখার বিন আবদাদ আল-সোলামি : মুয়াখার একজন সুপ্রসিদ্ধ মুতাযিলা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মুতাযিলাদের মধ্যে যৌক্তিক-পরাতাত্ত্বিক ধ্যান-অনুধ্যানের সূত্রপাত করেন। তনি বলিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র গুণাবলি অস্বীকার করেন এবং আল্লাহকে সম্পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট সত্তায় পরিণত করেন। আল্লাহ্‌র গুণাবলি তার একত্বের বিরোধী। আল্লাহ্ জগৎকে একসময় সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পদার্থ সত্তাবিশেষ। এই সত্তা হতে আবান্তর গুণের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতি নিয়মের অধীন এবং নিয়মশাসিত। আল্লাহ্ জাগতিক নিয়মের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করেন না।

www.pathagar.com

সৃষ্টিবাদ (Theory of creation) প্রসঙ্গে মুয়াখার নাজ্জামের মতটিকে সম্প্রসারিত করেন। আল্লাহ্ শুধু দ্রব্য বা অন্তঃসারই সৃষ্টি করেছেন। সসীম বস্তুনিচয় এমনকিছু শক্তির অধিকারী যা আপাতন সৃষ্টি করে। দ্রব্য বলতে তিনি সামগ্রিকভাবে জড়কে বুঝে থাকেন।

আত্মা সম্পর্কে মুয়াখার বলেন, আত্মা নৈর্ব্যক্তিক, একটি ভাব বা অবস্তুগ্রাহ্য সত্তাবিশেষ। আত্মা মানুষের সার। আত্মা একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। মানুষের আত্মা স্বাধীন সত্তা এবং ইচ্ছার মধ্যে এর সক্রিয়তা প্রকাশ পায়। কিন্তু মানুষের দেহ যান্ত্রিক নিয়মের অধীন।

৭. থুমামাহ্ ইবনে আল-আশরাস : থুমামাহ্ মুতাযিলা মতবাদকে আরো সম্প্রসারিত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ বিশেষ একটি নিয়মানুযায়ী জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগৎ হলো আল্লাহ্‌র ক্রিয়াফল এবং তাঁর প্রকৃতি বা স্বরূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌র স্বরূপই তাঁকে জগৎ সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছে এবং এদিক থেকে জগৎ অনাদি ও অনন্তকাল ধরে তার স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত। এ মতের অর্থ হলো জগৎ সৃষ্টি আল্লাহ্‌র কোনো পরবর্তী ইচ্ছার ফল নয় বরং তাঁর স্বরূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব জগৎ ও স্রষ্টা সহনিত্য। তাঁর মতে পদার্থ চিরন্তন।

৮. আল-জুবাই (মৃ. ৯১৫ খ্রি.) : জুবাই ছিলেন খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে একজন বিশিষ্ট মুতাযিলা চিন্তাবিদ। আল-জুবাই তাঁর পূর্ববর্তী মুতাযিলা পণ্ডিতদের মতবাদসমূহ সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মুতাযিলা মতবাদের মূলনীতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। একাধিক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দার্শনিক এ্যারিস্টোটল ও মুতাযিলা পণ্ডিত নাজ্জামের মতপার্থক্য ছিল। তিনি এসব দার্শনিকদের সমালোচনা করে পুস্তক রচনা করেন। তিনি পবিত্র কোরআন মজিদের উপর টীকা ভাষ্য রচনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর গুণাবলি অভিন্ন, পৃথক নয়। আল্লাহ্ যখন খুশি তখন ঐশীবাণী সৃষ্টি করেন।

৯. আবু হাশিম (মৃ. ৯৩৩ খ্রি.) : আবু হাশিম ছিলেন একজন বাস্তববাদী (realist)। তিনি মুতাযিলা চিন্তাধারাকে অব্যাহতভাবে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র গুণাবলি তাঁর সত্তা থেকে ভিন্ন নয়, আবার অভিন্নও নয়; বরং সেগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাবিশেষ। তিনি আরো বলেন, সার্বিক ও আল্লাহ্‌র গুণাবলি অনেকটা আধুনিক বাস্তববাদের নিরপেক্ষ সত্তার ন্যায় বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর পিতা আল-জুবাই এ মতের বিরোধিতা করেন এবং সত্তা, অসত্তা, অবস্থা, সম্বন্ধ—এই চার প্রকার সত্তার কথা বলেন। অবস্থা ও সম্বন্ধ সত্তা ও অসত্তার মতোই বাস্তব, কিন্তু আল-জুবাই অবস্থা ও সম্বন্ধের বাস্তবতা অস্বীকার করেন এ যুক্তিতে যে, তাঁর মতে, এগুলো জ্ঞাতার আত্মগত অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০. আয-যামাকসারি (Azzamakshari) : কথিত আছে যে, মুতাযিলা চিন্তাবিদদের মধ্যে সর্বশেষ চিন্তাবিদ ছিলেন আয-যামাকসারি। তিনি ছিলেন পবিত্র কোরআনের সুবিখ্যাত ভাষ্য "আল-কাশশাফ" (Al-Kaskshaf) গ্রন্থের রচয়িতা। আয-যামাকসারির পর হতে মুতাযিলা আন্দোলনের তেমন কোনো অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা যায় না।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. এম. সাঈদ শেখ, স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১
২. এম. সাঈদ শেখ, স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৫
৩. মুতাযিলা নামের এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর অন্তর্নিহিত ভাব হচ্ছে হাসন-আল বসরি (রাঃ)-এর পরিমণ্ডল থেকে মুতাযিলাদিগকে বহিষ্কার করা এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধবাদী বলে তাদেরকে চিহ্নিত করা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুতাযিলাগণ তাঁদের এই নামকরণের জন্য অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতেন। যদি এই নামকরণ অবজ্ঞাসূচকই হতো, তবে এতে তাঁরা কখনই গর্ব অনুভব করতেন না। আল-মাসুদি নিজে একজন মুতাযিলা। তাঁর ঐতিহাসিক ভৌগোলিক বিশ্বকোষ মুরুজ-আল-দাহাব গ্রন্থে মুতাযিলা নামকরণের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, যারা 'ইতিমালা' মতবাদ মানেন, তারাই মুতাযিলা। অর্থাৎ 'মানযিলাহ্-বায়নাল মানযিলাতাইন' নীতি এর অর্থাৎ যারা বিশ্বাস (ঈমান) ও অবিশ্বাস (কুফর)-এর মধ্যবর্তী তৃতীয় অবস্থা স্বীকার করেন, তাঁরাই হলেন মুতাযিলা। কবিরা বা বড় পাপ সাধনকারী একজন মুসলিমের অবস্থান প্রশ্নে মুতাযিলাগণ মুরজিয়া ও ওয়াদিয়া গোষ্ঠী থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে রাখেন। তুলনীয় : আল-মাসুদি; মুরুজ-আল-দাহাব, বারবিয়ার ডি মিনার্ড প্যারিস কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৬১-৭৭, খণ্ড ৬, পৃ. ২২
৪. পূর্বোক্ত, শিবলি, নুমানি মাকালাত-ই-শিবলি মতেবা মা'রিফ, আযমগড়, ১৩৭৫/১৯৫৫, খণ্ড ৫. পৃ. ১২
৫. তুলনীয়, ইবিইডি, পৃ. ১২
৬. পূর্বোক্ত, আইবিড. পৃ. ১৩
৭. এম. সাঈদ শেখ, স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৯
৮. মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি : ড. আমিনুল ইসলাম : মুতাযিলা সম্প্রদায়, পৃ. ১৯৯
৯. এম. সাঈদ শেখ, স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৯
১০. মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি : ড. আমিনুল ইসলাম : মুতাযিলা সম্প্রদায়, পৃ. ১২০
১১. স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১১
১২. এম. সাঈদ শেখ, স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১২
১৩. তা'বিল (Tawil) ব্যাখ্যায় ভাষ্য।
১৪. মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি : ড. আমিনুল ইসলাম, পৃ. ১২০
১৫. পূর্বোক্ত, ডি. বি. ম্যাকডোন্যাল্ড : ডেভেলপমেন্ট অব মুসলিম ফিলসফি, জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড কনসটিটিউশন্যাল থিওরি, লন্ডন, ১৯০৩, পৃ. ১৪৪-১৪৫।
১৬. এম. সাঈদ শেখ, স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১৪
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৮. মিহ্নি শব্দ সাধারণত মুতাযিলাদের প্রবর্তিত অনুসন্ধান ২১৮-২৩৪ হিজরি/৮৩৩-৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিরুদ্ধবাদীগণের নিপীড়ন বুঝায়। ব্যুৎপন্নক্রিয়া ইম্‌তাহহালা—এর হিস্ট্রি দি সুলতানস মামলুক্স ১-২, পৃ. ৮১, টীকা-১০১
১৯. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা পৃ. ৩০৭
২০. এম. এম. শরীফ : হিস্ট্রি অব মুসলিম ফিলসফি।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

আ'শারীয় সম্প্রদায়

ক. ভূমিকা

মুতাযিলাদের ধর্মীয় বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে আ'শারীয় মতবাদ হচ্ছে একটি প্রতিবাদ। মানব প্রজ্ঞার দ্বারা বিশ্বজগতের রহস্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় বলে মুতাযিলাগণ মনে করেন। কিন্তু আ'শারীয়গা আল্লাহ্‌র কালাম (কোরআন), পরম্পরাগত ঐতিহ্য (হাদিস) রসূল (সঃ)-এর আচরণ-বিধি এবং আদি সম্প্রদায়ের (সালাফ) আদর্শিক নমুনার উপর দৃঢ় আস্থাশীল। মুতাযিলাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী ধর্মতত্ত্বের পদ্ধতি গঠনের অসম্ভব কার্য থেকে এ হচ্ছে আ'শারীয়দের[১] পশ্চাদপসরণ।

আ'শারীয় মতবাদের সূচনা অস্পষ্টতার আবরণে আবৃত। প্রথমে এ মতবাদ কেবল ভাবের ক্রম-অগ্রগতি এবং সচেতন পরিবর্তন ছিল। মানুষ এর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় নি। পরবর্তীতে যখন এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো, তখন এই বিরাট আন্দোলনের পশ্চাতে একজন একক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন বলে মানুষের ধারণা প্রকাশ পায় এবং আল-আ'শারী[২] নামে ব্যক্তিত্বের উপরই এর সমগ্র দায়দায়িত্ব আরোপিত হয়। এটা অবধারিত সত্য যে, এই মতবাদ আল-আ'শারীর কালেই আকস্মিকভাবে আত্মসচেতনতায় পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এর ক্রমান্বয়িক অগ্রগতি[৩] বহু পূর্ব থেকেই পরিলক্ষিত হয়। মূলত আল-আ'শারী ছিলেন মুতাযিলা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আল-জুব্বাই-এর শিষ্য। পরবর্তীতে আল্লাহ্ কর্তৃক ভাগ্য নির্ধারণে ঔচিত্য সম্পর্কে এক বিতর্কের কারণে তিনি স্বীয় উস্তাদ আল জুব্বাই-এর দল পরিত্যাগ করেন এবং স্বকীয় পথ অবলম্বনে নিজস্ব মতবাদ গড়ে তোলেন। বিতর্কিটি ছিল নিম্নরূপ :[৪]

আল-আ'শারী : তিন ভাই, একজন পরমবিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ, অন্যজন অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহী এবং অপরজন অবোধ শিশু। এরা সবাই মৃত্যুবরণ করল। পরকালে এদের কর্মফল কিভাবে বিচার্য হবে?

আল-জুব্বাই : ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বেহেশত, ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি দোজখ এবং অবোধ শিশু নাজাত পাবে। (অর্থাৎ বেহেশত দোজখ কোনটিই নয়, সে হবে মুক্তিপ্রাপ্ত)।

আল-আ'শারী : যদি অবোধ শিশু বেহেশতে তার অবস্থান কামনা করে, তবে তাকে কি তা দেয়া হবে?

আল-জুব্বাই : না। কারণ, পুণ্যকর্মবলেই তা অর্জন করা যায় এবং অবোধ শিশুর কোনো পুণ্যকর্ম নেই।

www.pathagar.com

আল-আ'শারী : অবোধ শিশু যদি বলে, 'হে আল্লাহ্ সে তো আমার অপরাধ নয়। পুণ্যকর্ম করার সুযোগ আমাকে দেয়া হয় নি। দীর্ঘ জীবন দান করলে আমিও পুণ্য অর্জন করতে পারতাম।

আল-জুব্বাই : খোদা বললেন, "আমি জানি তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করলে তুমি অবাধ্য হতে এবং নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে। তাই তোমার কল্যাণের জন্যই অবোধ অস্থায় তোমার মৃত্যু ঘটিয়েছি।

আল-আ'শারী : এ পর্যায়ে যদি অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহী ভ্রাতা বলে, হে প্রভু, আমার ভবিষ্যৎ পরিণামও তো তুমি জান, তবে কেন আমাকে শিশু অবস্থায় মৃত্যু ঘটালে না—ভাইয়ের সুবিধা করে দিলে, আমার জন্য কেন নয়?

এ প্রশ্নের জবাবে আল-জুব্বাই নিশ্চুপ রইলেন। এই বিরাট পটভূমির দ্বারা আল-আ'শারী এই বুঝাতে চাইলেন যে, শুধু যুক্তি বা প্রজ্ঞার দ্বারা সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। আমাদেরকে কোরআনের বাণী, হাদিস এবং প্রত্যাদেশের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। পাশ্চাত্যের একজন লেখকের উক্তিতে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন,[৫] "মানব জীবনে ঘটনাবলির জন্য মানব ধারণাগুলো অপর্যাপ্ত। বিভিন্ন মানুষের ভাগ্যের মধ্যকার পার্থক্যের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করা যায় না—একজনকে বাধ্য হয়েই তা (বিশ্বাসকে) গ্রহণ করতে হয়।" অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই মুতাযিলাপন্থী আল-আ'শারী উস্তাদ আল-জুব্বাই-এর দল পরিত্যাগ করেন এবং নিজস্ব দর্শন মত প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁরই নামানুসারে এই গোষ্ঠীর নাম হয় আ'শারীয় সম্প্রদায়[৬]।

এই সম্প্রদায় ধর্ম সমর্থনে 'কালাম' ব্যবহার করেন। ফলে আ'শারীয়গণ অনেক সময় মোতাকাল্লিমুন বলেও পরিচিত।[৭] ও'লিয়ারি তাঁর 'এরাবিক থটস অ্যান্ড ইটস প্লেস ইন হিস্ট্রি' গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন যে, ধর্মের ব্যাখ্যা ও রক্ষার জন্য যে দর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে কালাম বলে। 'কালাম' শব্দের অর্থ হচ্ছে যুক্তিবিজ্ঞান। ধর্মের সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশ্যেই আ'শারীয়গণ দর্শনের এই যুক্তিপদ্ধতি গ্রহণ করেন। কালামের মূল হচ্ছে ওহি বা প্রত্যাদেশ। ওহি বা প্রত্যাদেশ সত্যের প্রকৃত মানদণ্ড। মুতাযিলাদের এবং ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যই আ'শারীয়গণ কালামের আশ্রয়[৮] গ্রহণ করেন। বস্তুত কালাম হচ্ছে ধর্মেরই সুরক্ষণ ও সুদৃঢ়করণ। বেদাত (অভিনবত্ব) হতে ধর্মকে রক্ষার জন্য একশ্রেণীর লেখকের কালাম শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আ'শারীয়গণ মনে করেন। তাঁরা কালাম বা যুক্তির বিবর্তনে বিশ্বাসী। আল-আ'শারী নিজেই 'ইলমুল কালাম' বা যুক্তিবিজ্ঞানের উদ্ভাবক। বুদ্ধিবাদী মুতাযিলা এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়া মুসলমান এই উভয় দলের মধ্য দিয়ে প্রথম দিকে আ'শারীয়গণকে অতি সংগোপনে এবং সন্তর্পণে চলতে হয়েছিল। কালাম এবং যুক্তিপদ্ধতি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন অ্যারিস্টোটলীয় ভাবধারা বর্জিত হয়, অন্যদিকে গোঁড়া মুসলমানগণ কালাম পদ্ধতির মাধ্যমে ধর্মীয় রীতিনীতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এতদ্‌সত্ত্বেও আ'শারীয়দের মতবাদ তীব্র গতিতে বিকাশ লাভ করে। বহু প্রতিভাবান মুসলিম মনীষী তাদের পথ অনুসরণ করে এই মতবাদের

www.pathagar.com

উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখেন। অচিরেই আ'শারীয় মতবাদের অনুরূপে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ধর্মতত্ত্বের বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যেমন স্পেনে ইবনে হাযামের সম্প্রদায়, মিসরে তাহয়ি সম্প্রদায় এবং সমরখন্দে মাতরুদি সম্প্রদায়।[৯] কিন্তু সব সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে আল-আ'শারীয় গোষ্ঠী ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং সাড়ম্বরে বিকশিত হয়। কারণ, এর সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন আল-বাকিল্লানি, ইমাম আল-হারামায়েন, আল গাজ্জালি, ফখর আল দীন রাজি প্রভৃতির ন্যায় প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণ।[১০] পরবর্তী পর্যায়ে, আল-বাকিল্লানি ও ইমাম গাজ্জালি সুফি নিগূঢ় তত্ত্বের ভাবধারায় আ'শারীয় মতবাদের উন্নতি ও সংস্কার সাধন করেন এবং এই সম্প্রদায়কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তোলেন। দার্শনিক মতবাদ হিসেবে আ'শারীয় গোষ্ঠীর পরিচিত লাভের জন্যও আল-গাযালির অবদান অপরিসীম। বস্তুত তিনিই এই মতবাদের পরিপূর্ণতা দান করেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুতাযিলা এবং আ'শারীয়া সম্প্রদায় উভয়েই তাদের আলোচ্য বিষয়ের সমর্থনে 'কালাম' বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এজন্য উভয় সম্প্রদায়ই 'মুতাকাল্লিমুন' বলে পরিচিত। পার্থক্য শুধু এই যে, মুতাযিলাগণ যুক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন অন্যদিকে আ'শারীয়গণ গুরুত্ব আরোপ করেন 'ওহি' বা প্রত্যাদেশের উপর। মুতাযিলাগণ প্রজ্ঞাকে প্রত্যাদেশের উর্ধ্বে স্থান দেন; অপরদিকে, আ'শারীয়গণ প্রজ্ঞাকে প্রত্যাদেশের অধীন বলে মনে করেন। মুতাযিলাগণ প্রজ্ঞার অবাধ গতিতে বিশ্বাসী। আ'শারীয়গণ প্রজ্ঞার অবাধ প্রভাব স্বীকার করেন না। তারা ধর্মে নিয়ন্ত্রিত প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী।

খ. মূলনীতি ও মতবাদসমূহ

মুতাযিলা কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত আ'শারীয় সম্প্রদায়ের মূলনীতিগুলো নিম্নরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে।[১১]

১. আল্লাহ্‌র গুণাবলি এবং তাঁর সারসত্তার সাথে তাদের সম্পর্ক।
২. পবিত্র কোরআনের নিত্যতা বা অনিত্যতা।
৩. কোরআনের ভাষা আল্লাহ্‌র ভাষা।
৪. দিব্যদর্শনের সম্ভাব্যতা।
৫. আরশ' পরি স্বয়ং আল্লাহ্‌র উপবেশন।
৬. ইচ্ছার স্বাধীনতা।

১. আল্লাহ্‌র গুণাবলি এবং তাঁর সারসত্তার সাথে তাদের সম্পর্ক : আল্লাহ্‌র গুণাবলি তাঁর তৌহিদ বা একত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তা আল্লাহ্‌র তৌহিদ বা বিশুদ্ধ ঐক্য যুক্তিসঙ্গতভাবে সংরক্ষণ করার জন্য মুতাযিলাগণ আল্লাহ্‌র গুণাবলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন কিংবা গুণাবলিকে তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। আ'শারীয় চিন্তাবিদগণ এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁরা প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত মতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং বলেন যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলি কখনই অভিন্ন হতে

www.pathagar.com

পারে না। তাঁরা আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবীলর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সাত প্রজ্ঞাজনিত গুণ যথা : জীবন, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন ও কথন স্বীকার করেন এবং এর সমর্থনে কোরআনের আয়াত উল্লেখ করেন : (ক) "... তাঁরা কি দেখে না যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে ক্ষমতাশালী ..." (সূরা ৪১, আয়াত ১৫), (খ) "... আল্লাহ্ যদি তাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কেড়ে নেন এবং অন্তরে মোহর এঁটে দেন ...।" (সূরা ৬ আয়াত ৪৬) (গ) আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি যা জ্ঞাত, তা তোমরা অবগত নও।" (সূরা ২ আয়াত ৩০)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র গুণাবলি প্রসঙ্গে[১২] মোখালাফা মিল হাওয়াদিস এবং বিলা-কায়ফা ওয়ালা তাসবিহা-গুণ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র গুণাবলি আছে বলে আ'শারীয়গণ স্বীকার করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে আরোপিত গুণাবলি মানব সত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয় বলে বুঝতে হবে। আল্লাহ্‌র গুণ আছে, কিন্তু কিভাবে আছে সে-ই প্রশ্ন করা আমাদের উচিৎ নয় এবং উচিৎ নয় আল্লাহ্ ও সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলির মধ্যে কোনো তুলনা করা। মানব সত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদসমূহ খোদ আল্লাহ্‌র উপর আরোপিত হয়, তখন তার অর্থ হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আলাদা। যেহেতু মানব সত্তা থেকে তিনি অধিকতর জ্ঞানী এবং অধিক শক্তিশালী তাই মানুষের গুণাবলি থেকে আল্লাহ্‌র গুণাবলির পার্থক্য শুধু পরিমাণগতই নয়—এ পার্থক্য সমগ্র প্রকৃতিতে, সমগ্র স্বভাবে। আ'শারীয়দের[১৩] তানযিহ্ নীতি অনুসারে আল্লাহ্ সম্বন্ধীয় প্রকাশ বা ভাব সকল মানব উপাদান বর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবু আল-হুদায়েল আল্লাফ আল্লাহ্‌র সারসত্তার সঙ্গে আল্লাহ্‌র গুণাবলিকে অভিন্ন মনে করেন। আল-আ'শারী এই অভিন্নতার বা শনাক্তিকরণকে নিম্নরূপে খণ্ডন করেন বলে কথিত আছে।[১৪] আবু আল-হুদায়েল আল্লাফ বলেন : আল্লাহ্‌র জ্ঞানই হচ্ছে আল্লাহ্। এবং তাই তিনি আল্লাহকে জ্ঞান এর সমার্থক মনে করেন। যেহেতু জ্ঞান এবং আল্লাহ্ উভয়ই অভিন্ন, সুতরাং তাঁকে (হুদায়েলকে) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে জ্ঞান মিনতি করতে বলা উচিৎ[১৫] "হে জ্ঞান, আমায় ক্ষমা কর।" সম্ভবত, আল-আ'শারী গুরুত্ব সহকারে এ মন্তব্য করেছিলেন। যদি তা-ই হয়, তবে আল-আ'শারীর পক্ষে এ মন্তব্য বিজ্ঞজনোচিত হয় নি। ঐশী গুণাবলি এবং সারসত্তার অভিন্ন তার উপর গুরুত্ব আরোপের জন্য আবু হুদায়েলসহ অন্যদের আল্লাহ্‌র ঐক্যবিষয়ক ধারণা দ্বৈতবাদে, এমন কি, পুরাদস্তুর সন্দেহবাদে পরিণত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবু হাশিমের নিকট আল্লাহ্‌র ঐক্যের ধারণা হচ্ছে একটা অমূর্ত সম্ভব্যতা (abstract possibility) যার সম্বন্ধে সার্থকভাবে কোনো বিধেয় আরোপ করা যায় না। ইবনে আসরাস এবং আল যাহিজ (চশমা পরিহিত)—এর দ্বারা এই ধারণা দ্বৈতবাদী প্রকৃতিবাদে উন্নতি লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, আল-যাহিজ পুরোপুরিভাবে সন্দেহবাদের পক্ষে কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু অপরদিকে, যদিও আল-আ'শারীর বিলা-কায়ফা এবং মোখালাফা নীতি গোঁড়া বিশ্বাসীদের পরিতৃপ্তি দান করে, তথাপি তাত্ত্বিক মন অনুসন্ধিৎসু আত্মাকে তা স্বস্তি দিতে পারে নি। তাঁরা ধর্মীয় অজ্ঞতার বালসুলভ অসহায়ত্বের দ্বারা অভিভূত হতে অস্বীকার করেন।

www.pathagar.com

২. পবিত্র কোরআনের নিত্যতা বা অনিত্যতা : মুতাযিলাদের মতে, কোরআন সৃষ্ট। তাঁরা কোরআন অনাদি ও নিত্য এই সাধারণ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। যেসব কারণে তাঁরা আল্লাহ্‌র সত্তা বহির্ভূত তার গুণাবলি অস্বীকার করেন, ঠিক একই কারণে তারা কোরআনের নিত্যতা অস্বীকার করেন।

(ক) আ'শারীয়গণ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কোরআনের চিরন্তনতা এবং কোরআন যে অসৃষ্ট এই মতবাদ পোষণ করেন। তাঁদের এই মতবাদ ইহুদি কিংবা ক্রিশ্চান লগোস (Logos) ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়—যেমন প্রাচ্যের কিছুসংখ্যক দার্শনিক, এমন কি মুতাযিলাগণ পর্যন্ত অভিযোগ আনেন। তাঁদের এই মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ যেমন (ক) '... পূর্বেও আল্লাহ্‌রই ক্ষমতা ছিল এবং পরেও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র রয়েছে ... ।" (সুরা ৩০, আয়াত ৪) (খ) সৃষ্টি ও নির্দেশ কি তাঁর নয়? (সুরা ৭, আয়াত ৫৪)। এখানে আল্লাহ্ নির্দেশের কথা বলেছেন সৃষ্টির কার্যের চেয়ে অন্যকিছু অর্থ বোঝাতে। আ'শারীয়দের মতে এর তাৎপর্য হচ্ছে : আল্লাহ্‌র নির্দেশ সৃষ্ট বস্তুর শ্রেণীভুক্ত নয়। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ স্বভাবগত কারণেই, তাঁর বাণী বা তাঁর কথনের মাধ্যমে প্রকাশিত। সুতরাং এ হচ্ছে কালাম—আল্লাহ্ অথবা কোরআন অসৃষ্ট (গ) আল্লাহ্ বলেন, একটা বস্তুর প্রতি আমাদের শব্দ হচ্ছে "হও" যখন আমরা একে হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করি। এই "হও" শব্দ বলার সাথে সাথে বস্তু হয়ে যায়, অর্থাৎ বস্তু তাঁর অস্তিত্ব লাভ করে। (কুন ফা-ইয়াকুন সুরা, আয়াত ৪৭) আল আ'শারী যুক্তি দেন, যদি কোরআন 'সৃষ্ট' বলে মনে করা হয়, তবে কোরআনের অস্তিত্বের পূর্বে 'হও' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল। আল্লাহ্ যদি কোরআন সৃষ্টির জন্য 'হও' শব্দ বলেন যা আল্লাহ্‌রই বাণী, তবে কোরআনের এই 'হও' শব্দের সৃষ্টির জন্য আরো একটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল। সেই উচ্চারিত শব্দের জন্য অন্য একটি শব্দ এবং তার জন্য আরেকটি অর্থাৎ পরবর্তী শব্দের অস্তিত্বের জন্য পূর্ববর্তী শব্দের উচ্চারণ প্রক্রিয়া অনবরত চলতেই থাকবে—যার কোনো শেষ নেই। আ'শারীয়দের মতে এই ধরনের অনন্ত শৃঙ্খল অসম্ভব ও অচিন্ত্যনীয়। এইভাবে একটি অনুমানকে অযৌক্তিক পরিণত করে আ'শারীয়গণ কোরআন সৃষ্ট নয়, অর্থাৎ কোরআন[১৬] চিরন্তন বলে প্রমাণ করেছেন—এই দাবি করেন।

(খ) মুতাযিলাগণ অভিযোগ আনেন যে, আ'শারীয়গণ কোরআনের অনিত্যতা মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে ক্রিশ্চান লগোস[১৭] (Logos) ধারণা সমর্থন করেন এবং শিরক অর্থাৎ বহুত্ববাদে ঝুঁকে পড়েন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, যদি আ'শারীয়গণ কোরআনের অনিত্যতার উপর দৃঢ় থাকেন, তবে তারা কোরআনকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সহ-নিত্য করে ফেলবেন এবং এই অর্থ করবেন যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর অংশীদারের অস্তিত্ব অনন্তকাল যাবৎ ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আ'শারীয়গণ মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছিলেন এবং মুতাযিলাদেরকে প্রথম শ্রেণীর বহুত্ববাদী বলে আখ্যায়িত করেন। আ'শারীয়গণ যুক্তি দেখান যে, যারা কোরআনের নিত্যতার উপর দৃঢ় থাকেন, তাঁরা কোরআন রাসুল (সঃ)-এর স্বীয় মনের সৃষ্টি এ ধর্মীয় অবিশ্বাসীদের অতি সন্নিকটে। তাঁরা পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেন যার মধ্যে কোরআন সম্বন্ধে বহুত্ববাদীদের বিশ্বাসের কথা আল্লাহ্ই ব্যক্ত করেছেন : এতো নিছক মানুষের উক্তি। (সুরা ৭৪, আয়াত ২৫)

www.pathagar.com

৩. কোরআনের ভাষা আল্লাহ্‌র ভাষা : আ'শারীয়দের এই মতবাদ যথার্থ ও সঠিক নয় বলে পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন। কোরআনে কিছু সিরীয়, ফার্সি ও গ্রিক শব্দাবলি লক্ষ্য করে ও' লিয়ারি মন্তব্য করেন যে, কোরআনে এসব শব্দের উপস্থিতি কোরআন চিরন্তন হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ।[১৮] কোরআন যদি চিরন্তনই হয়, তবে এসব শব্দ কোরআনে প্রবেশ করে কি করে? এছাড়াও সপ্তম শতাব্দীর আরবি ভাষার বিভিন্ন রূপ কোরআনে পরিলক্ষিত হয়। কোরআন অনাদি হলে ভাষার এ বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয় কি করে? ও' লিয়ারির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন, যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন[১৯] শাশ্বত, চিরন্তন বর্তমান। তাঁর নিকট অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তিনি সর্বকালের সর্বলোকের সর্ববিষয়ে জ্ঞাত—অদৃশ্য বিষয়সমূহে অবহিত। সুতরাং তাঁর পক্ষে বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্ভার জানা এবং সপ্তম শতাব্দীর আরবি ভাষার বিভিন্ন রূপ অবহিত হওয়া আশ্চর্যের কিছুই নয়।

৪. দিব্যদর্শনের সম্ভাব্যতা : মুতাযিলা চিন্তাবিদগণ আল্লাহ্‌র দর্শনের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেন। আল্লাহ্‌র দেহ বা অবয়ব নেই—তাই তাঁকে দিব্যচোখে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আ'শারীয়গণ রক্ষণশীল মতকে জোর সমর্থন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, পরকালে বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে সাক্ষাৎ লাভ করবেন। তাঁরা তাঁদের দিব্যদর্শনের সমর্থনে নিম্নরূপ প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন, এমন কি[২০] দেহিক অর্থেও।

(ক) কোরআন থেকে প্রমাণ : (১) বহু মুখমণ্ডল তো সেদিন উজ্জ্বল হবে এবং স্বীয় রবের পানে তাকাতে থাকবে। (সুরা ৭৫, আয়াত ২২, ২৩) আ'শারীয়দের মতে এই আয়াতে দিব্যদর্শনের সম্ভাব্যতার কথা অতি সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হিসেবে বেহেশতবাসীদেরকে এই সন্দর্শন মঞ্জুর করবেন।

(২) তিনি মুসা (আঃ) বলেন,[২১] "হে প্রভু, তুমি নিজকে আমাকে প্রদর্শন কর যাতে করে আমি তোমার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি।" আল-আ'শারী বলেন, আল্লাহ্-দর্শনের বাস্তবায়ন যদি অসম্ভব হতো, তবে মুসা (আঃ) এমন প্রার্থনা করতেন না। মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিতপুরুষ, পাপ এবং মহাভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কি করে তিনি একটি অযৌক্তিক এবং অসম্ভব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন?

(খ) হাদিস থেকে প্রমাণ : আ'শারীয়গণ পবিত্র নবির একটি উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুনরুত্থান দিসবে আল্লাহ্‌র দর্শন সম্ভব কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে নবি (সঃ) বলেন, "পূর্ণচন্দ্র তোমরা যেমন অবলোকন কর, তদ্রূপ তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে।"

(গ) যুক্তিবিজ্ঞান থেকে প্রমাণ : দিব্যদর্শনের অনুকূলে আ'শারীয়দের তথাকথিত যৌক্তিক তর্ক নিম্নে উল্লেখ করা গেল। এগুলো আ'শারীয়দের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য যুক্তি কৌশলকেই প্রতিনিধিত্ব করে।[২২]

১. যা অস্তিত্বশীল আল্লাহ্ তা আমাদের দেখাতে পারেন।
আল্লাহ্ অস্তিত্বশীল
সুতরাং, তিনি নিজেকে আমাদের দেখাতে পারেন।

www.pathagar.com

২. যিনি বস্তু দেখেন তিনি নিজেকে দেখেন।
আল্লাহ্ বস্তু দেখেন,
অতএব, আল্লাহ্ নিজেকে দেখেন।
আবার, যিনি নিজেকে দেখেন, তিনি নিজেকে দেখাতে পারেন।
আল্লাহ্ নিজেকে দেখেন
সুতরাং তিনি নিজেকে দেখাতেও পারেন।

৩. পরম কল্যাণ সর্বোচ্চ জগতে উপলব্ধ হয়।
দিব্যদর্শন পরম কল্যাণ
অতএব দিব্যদর্শন সর্বোচ্চ জগতে উপলব্ধ হবে।

আ'শারীয়গণ অভিযোগ করেন যে, যারা আল্লাহ্র দর্শনকে অস্বীকার করেন, তারা আল্লাহকে তাত্ত্বিক অমূর্তে পরিণত করেন, এমন কি, আল্লাহকে অনস্তিত্বশীলও করে তুলেন।

৫. আরশ উপরি স্বয়ং আল্লাহ্র উপবেশন[২৩] : কোরআনে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ থেকে আ'শারীয়দের নিকট এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে আল্লাহ্ বেহেশতে উচ্চাসনে উপবিষ্ট।

১. (আর) তিনি পরম করুণাময়; আরশের উপর (তাঁহার মাহাত্ম্যোপযোগীরূপে) অবস্থিত আছেন, (সুরা ২০, আয়াত ৫)

২. "... তাঁরই দরবারে পৌঁছে থাকে সৎ বাক্য। ..." (সুরা ৩৫, আয়াত ১০)

৩. আল্লাহ্ তাঁকে (ঈসা (আঃ))-কে নিজ দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। (সুরা ৪, আয়াত ১৫৮)।

৪. পরকালে তাঁরা আল্লাহ্র নিকটেই আসবে।

৫. "তোমরা কি নির্ভয় রয়েছ তা হতে যিনি আসমানে আছেন এই বিষয়ে যে তিনি তোমাদেরকে জমিনের মধ্যে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন।" (সুরা ৬৭, আয়াত ১৬)

৬. "আর আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে অবস্থান করবে এবং স্বীয় রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে এবং (তখন) সব মীমাংসা করে দেয়া হবে।" (সুরা ৩৯, আয়াত ৭৫)

কোরআনের এসব আয়াত রাসুল (সঃ)-এর হাদিস দ্বারা আরো দৃঢ়ভাবে সমর্থিত। তিনি বলেছেন : প্রতি রাত্রে আল্লাহ্ ভিন্নতর বেহেশতে অবতরণ করেন এবং আহ্বান জানান :

এমন কি কেউ আছে যে আমায় অনুরোধ জানায় আমি তা মঞ্জুর করি।

এমন কি কেউ আছে, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে? আমি ক্ষমা প্রদর্শন করি— প্রভাত হওয়া পর্যন্ত এরূপ চলতে থাকে।

কোরআন এবং হাদিস হতে উপরোক্ত প্রমাণ ব্যতীত আরশে আল্লাহ্র উপবেশন বিষয়ে আল-আ'শারী নিম্নলিখিত যুক্তিও প্রদান করেন। এগুলো তাঁর যুক্তিতর্কের অদ্ভুত

www.pathagar.com

ধরন। মুতাযিলাদের অভিমত অনুযায়ী যদি আল্লাহ্ সর্বস্থানে থাকেন, তবে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি গভীরতার নিচে এবং সৃষ্টজীব তাঁর নিচে। এটা যদি সত্য হয়, তবে যার উর্ধ্বে তিনি আছেন তিনি অবশ্যই এর নিচে হবেন এবং যার নিচে আছেন তার উর্ধ্বে হবেন। যেহেতু এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাই আল্লাহ্ সব জায়গাতে আছেন এমন বলা যায় না।

আল্লাহ্ সব জায়গায় আছেন মুতাযিলা এবং অন্যেরা যে রূপক ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন, আল-আ'শারী তা তীব্রভাবে আক্রমণ করেন।[২৪] তিনি বলেন, "এ যদি সত্য হয় তবে যৌক্তিকভাবে এটাও অনুসৃত হবে যে, আল্লাহ্ মেরির জঠরে, শৌচাগারে, এবং আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্যের মধ্যেও আছেন।"

৬. ইচ্ছার স্বাধীনতা : (ক) ইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ে আল-আ'শারীর বর্ণনা ম্যাকডোনাল্ড রচিত 'ডেভোলাপমেন্ট অব থিওলজি' গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। (খ) ম্যাকডোনাল্ডের[২৫] মতে ইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ে প্রাচীন গোঁড়াপন্থীদের অবস্থান সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী। ঐশী ন্যায়বিচারের নীতি অনুযায়ী মুতাযিলাগণ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার জন্য পথ উন্মুক্ত রাখেন। আল-আ'শারী এখানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। 'মানুষ বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না; আল্লাহ্ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। মানুষের শক্তি তার কার্যের উপর কোনই ফলাফল উৎপাদন করতে পারে না। আল্লাহ্ তার সৃষ্টজীবের মধ্যে শক্তি (কুদ্‌রা) এবং নির্বাচন (ইখতিয়ার) ক্ষমতা সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি সৃষ্টি শক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতা অনুসারে সৃষ্টজীবের মধ্যে তার কার্য সৃষ্টি করেন। আল-আ'শারীর মতে যদিও প্রারম্ভিক উদ্যম এবং উৎপাদন উভয় হিসেবেই সৃষ্টজীবের কার্য আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট, তবুও সৃষ্টজীব কর্তৃক তা অর্জিত হয়। (গ) অর্জন (কাসব)[২৬] সৃষ্টজীবের মধ্যে পূর্বে সৃষ্ট শক্তি ও নির্বাচনকে অনুসরণ করে। সৃষ্টজীব কেবল[২৭] সঞ্চার-বিন্দু (Focus, Mahal) অথবা তার কার্যের কর্তা। এইভাবে আল-আ'শারী ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং মানুষকে তার কার্যের জন্য দায়ী করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, মানুষ যখন কলম দ্বারা কাগজে লিখে, আল্লাহ্ তার মনে লিখার ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং একই সময়ে লিখার শক্তি তাকে দান করেন, হাত ও কলমে আপাত গতি সৃষ্টি করেন এবং কাগজের উপর শব্দের উদ্ভব ঘটান। অর্জন মতবাদ বিশুদ্ধ নিয়ন্ত্রণবাদের আবরণ বৈ অন্য কিছু কি-না সন্দেহ জাগে। যাইহোক, এটা জোর দাবি করা হয় যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে আ'শারীয়দের এই নব্য মতবাদ লাইবনিজ প্রচারিত পূর্ব-শৃঙ্খল মতবাদের অতি কাছাকাছি। ম্যাকডোনাল্ড আল-আ'শারীকে এজন্য একজন অতি উঁচুমানের মৌলিক চিন্তাবিদ বলে মর্যাদা দেন। আল-আ'শারী সমগ্র অর্জন মতবাদের জনক। অর্জন মতবাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, মানুষের স্বাধীনতা তার স্বীয় স্বাধীনতার চৈতন্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির স্বীকৃতিই মানুষ শুধু দেয় এবং দাবি করে যে এগুলো তার নিজস্ব।[২৮]

www.pathagar.com

গ. আ'শারীয়দের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আ'শারীয়গণ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন (১) জগৎ সৃষ্টি বা পরমাণু মতবাদ, (২) (ক) আল্লাহ্ (খ) আত্মা সম্পর্কীয় ধারণা, (৩) কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ক মতবাদ এবং (৪) সুপারিশ সম্পর্কীয় মতবাদ।

(১) পরমাণুবাদ : জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে মুতাযিলাগণ অ্যারিস্টোটলের মতবাদের সাথে কোরআনের ভাবধারার এক সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন। মুতাযিলাদের মতে জগৎ চিরন্তন ও সৃষ্ট উভয়ই। কিন্তু আ'শারীয়গণ এ মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। আ'শারীয় চিন্তাগোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে তাদের পরমাণু[২৯] মতবাদ। বস্তুত আ'শারীয়দের এই পরমাণু মতবাদ একদিকে অ্যারিস্টোটলের নিশ্চল জগতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্যদিকে মুতাযিলাদের চিরন্তন ও সৃষ্ট জগতের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ। আ'শারীয়দের মতে জগৎ ঐশী ইচ্ছার প্রকাশ—তাই এ নিশ্চল ও চিরন্তন নয়, এ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। জগৎ এমন কতকগুলো আপতন নিয়ে গঠিত যা নিয়ত পরিবর্তনশীল।[৩০] এই পরিবর্তনশীল ঘটনাপুঞ্জের অভ্যন্তরে কোনো পদার্থ বা জড় নেই। যা আছে তা হচ্ছে পরমাণু। প্রকৃতপক্ষে পরমাণু হচ্ছে পরিবর্তনশীল বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা। এদের কেবল বিস্তৃতি, দেহ বা অবয়ব নেই। এরা অবিভক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা। এরা অবিভাজ্য ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এদের দ্বারা গঠিত বস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে পরিবর্তন।[৩১] অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে এ বিশ্বজগৎ গঠিত।

পরমাণু সংখ্যায় অগণনীয়। আল্লাহ্র সৃজনীশক্তির ধারা অব্যাবহতভাবে বয়ে চলেছে। তাই প্রতিক্ষণে নব নব পরমাণু জন্মলাভ করছে সংখ্যাহীনভাবে। পরমাণু অস্তিত্ব নিরপেক্ষ। অস্তিত্ব পরমাণুর একটি গুণ। পরমাণু সৃষ্টির পর আল্লাহ্ এর উপর অস্তিত্ব-গুণ আরোপ করেন। প্রশ্ন জাগতে পারে : অস্তিত্ব গ্রহণ করার পূর্বে পরমাণু কোথায় ছিল? উত্তরে বলা যায় যে, অস্তিত্ব-গুণ অর্জন করার পূর্বে পরমাণু আল্লাহ্র সৃজনীশক্তির মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। পরমাণু বিস্তৃতিহীন এরা কোনো স্থান দখলে করে না। দেশ বলতে তাঁরা পরমাণুর সংযোগ থেকে প্রাপ্ত একটি গুণকেই অর্থ করে। এক কথায় বলা চলে আ'শারীয়দের পরমাণু ধারণা একদিকে দার্শনিক লাইবনিজের চিৎপরমাণু এবং অন্যদিকে কান্টের শুদ্ধ বস্তুর সদৃশ।[৩২] প্রতিটি পরমাণু বিপরীত গুণের সমন্বয়ে গঠিত।[৩৩] এই বিপরীত গুণগুলো ধানাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি-বিশেষ। এরা লাইবনিজের চিৎপরমাণুর ন্যায় বিচ্ছিন্ন। তাই পরমাণু পরস্পরের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পরমানু যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও পৃথক না হতো, তবে গতি অসম্ভব হয়ে পড়ত। দুই গতির মধ্যে একটি স্থিতি বা বিরতি রয়েছে। এভাবে আ'শারীয়গণ শূন্যদেশকে একটি স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা বলে স্বীকার করেন। কাল বলতেও অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন 'এখন' এর পারস্পর্যকে অর্থ করে। কালের যে কোনো দু'টি মুহূর্তের মধ্যেও একটি শূন্যস্থান বিদ্যমান (Empty Space)। শূন্যদেশের সাথে সম্পৃক্ত অসুবিধাদি দূরীভূত করার জন্য আ'শারীয়গণ তাফরা (Jump) অর্থাৎ লম্ফ ধারণা গ্রহণ করেন। এই ধারণা অনুযায়ী পরমাণু দেশের মধ্য দিয়ে গমন করে না—এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে লম্ফ দিয়ে চলে।

www.pathagar.com

জগৎ এক পরিবর্তনের নাট্যশালা। প্রতিটি পরিবর্তন নতুন পরিবর্তনের জন্ম দিচ্ছে। পুরাতনকে সরিয়ে নতুনের আগমন ঘটছে। আ'শারীয়দের মতে জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তে নিত্যনতুন পরমাণুর জন্ম হচ্ছে। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে সতত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ফলে, বস্তু তার নিত্য নবরূপ প্রকাশ করছে। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিক্ষণে নিত্যনতুন পরমাণু সৃষ্টি না হলে পরমাণুর অস্তিত্ব লোপ পেত। আল্লাহ্ প্রতি মুহূর্তে জগতকে এমনভাবে পরিবর্তন করেন যে, এর বর্তমান অবস্থার সাথে অতীত বা ভবিষ্যতের কোনোরকম সম্পর্ক থাকে না। অর্থাৎ, কার্যকারণ কোনো সম্বন্ধ নেই। তবে এক ক্রমধারা বিদ্যমান। ফলে একজগতের পর অন্য জগৎ আবির্ভূত হচ্ছে। আল্লাহ্ জাগতিক ঘটনাকে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করেন না। তিনি সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতির মাধ্যমে তা উপস্থান করেন। ফলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা নীতির উদ্ভব ঘটে। কার্যকারণ শুধু ঘটনার পারম্পর্য আসলে এর বাস্তব অস্তিত্ব নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দার্শনিক হিউমও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। তাঁর মতে কার্যকারণ হচ্ছে ঘটনার পূর্বাপর পরম্পরা মাত্র। যাই হোক, আ'শারীয়দের মতে এক নিয়মানুবর্তী পরম্পরায় আল্লাহ্ ঘটনাবলি ঘটান। আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় ক্ষমতাবলে এ কার্য ব্যাহত করতে পারেন, কিন্তু তিনি তা করেন না।

আ'শারীয়দের পরমাণু বিষয়ক চিন্তাধারা বিশ্বইতিহাসের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, তাদের এ চিন্তাধারার মধ্যে আধুনিককালের লাইবনিজের চিৎপরমাণু, কান্টের বিশুদ্ধ সত্তা এবং হিউমের কার্যকারণ তত্ত্বের সুস্পষ্টভাব পরিলক্ষিত। অধুনা যে পরমাণু তত্ত্ব নিয়ে আমরা গর্বিত, তার পশ্চাতে রয়েছে আদি গ্রিক ও আ'শারীয় সম্প্রদায়ের পারমাণু মতবাদের উল্লেখযোগ্য অবদান।[৩৪]

২ক. আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা : আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। মানুষের কার্যাবলি সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ অবহিত। তিনি সর্বকাল অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লাহ্ পরমসত্তা। তিনি সৃষ্টির আদিকারণ। জগতের সব গতি-প্রকৃতি ও পরিবর্তনের মূলেও রয়েছেন তিনি। তিনি চিরন্তন, একক ও অদ্বিতীয়। এই প্রেক্ষাপটে কোনো গৌণ কারণ বা প্রাকৃতিক নিয়ম থাকতে পারে না। আল্লাহ্ প্রত্যক্ষ এবং সরাসরিভাবে পরমাণুর উপর ক্রিয়া করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ 'কলম' দ্বারা কাগজে লিখে, আল্লাহ্ তার মনে লিখার ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং একই সময়ে লিখার শক্তি তাকে দান করেন; হাত ও কলমে আপাত-গতি সৃষ্টি করেন এবং কাগজের উপর শব্দের উদ্ভব ঘটান। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ্ই একমাত্র ক্রিয়াশীল কর্তা। আল্লাহ্ সম্বন্ধে আ'শারীয়দের ধারণা দার্শনিক স্পিনোজার দ্রব্যের (Substance) ধারণার সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্পিনোজার মতে আল্লাহ্ একমাত্র পরম দ্রব্য (Absolute substance)—এই পরম দ্রব্য ভিন্ন অন্যকোনো বিষয় বা বস্তুর নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু মায়া, ভ্রম, অলীক ও মিথ্যে।

www.pathagar.com

২খ. আত্মা সম্পর্কে ধারণা : আল্লাহ্ পরমাত্মা। এই পরমাত্মা থেকেই সসীম আত্মাসমূহের উদ্ভব। আ'শারীয়দের মতে আত্মা হচ্ছে সূক্ষ্ম—মসৃণ পরমাণু বিশেষ। তাদের এই ধারণা কোরআনীয় মতবাদের পরিপন্থী। কারণ, কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে—'আত্মা আল্লাহ্র নির্দেশ'। (কুল : আর-রূহু মিন আমরি রাব্বি)।[৩৫]

এই বিশ্বজগতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থ থেকে শুরু করে আত্মসচেতন সম্পন্ন মানুষ পর্যন্ত এক বিরাট অহং (great I am)-এর আত্মবিকাশ ঘটেছে। এই "পরম অহং" থেকেই সসীম অহংসমূহের উদ্ভব। পরম অহমের মধ্যে ক্রিয়া ও চিন্তা একাত্ম হয়ে আছে। পরম অহমের সৃজনীশক্তি অহংরাশির একত্ব হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীর সর্বনিম্ন সত্তা থেকে শুরু করে আত্মসচেতন মানুষ পর্যন্ত সর্বত্র পরম অহমের অভিব্যক্তি ও প্রতিফলন ঘটে। দৈবশক্তির প্রতিটি পরমাণু (তা যত নিম্নমানেরই হোক না কেন) এক বিরাট অহংস্বরূপ। তবে অহমের অভিব্যক্তির নানা মাত্রাভেদ রয়েছে। সমগ্র জগতে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর মানুষ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অহংবোধ বা আমিত্বের উন্মেষ ঘটে। কোরআনে তাই বলা হয়েছে : পরম অহং প্রত্যেক মানুষের কাছে তার ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটতর। "আমরা স্বর্গীয় জীবনের অবিরাম স্রোতে মুক্তার মতো চলাফেরা করি ও বেঁচে থাকি। এইভাবে আ'শারীয়দের পরমাণুবাদ অবশেষে পরিণত হলো এক ধরনের আধাত্মিক বহুত্ববাদে।" নিশ্চিত জ্ঞানের জন্য এখানে আমাদের ধর্ম ও প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৩. কল্যাণ ও অকল্যাণ : মুতাযিলাগণ ভাল-মন্দ বা ইষ্ট-অনিষ্ট কথাগুলোকে[৩৬] তিন অর্থ ব্যবহার করেন। যথা : গুণ ও দোষ অর্থে, লাভ-লোকসান এবং পুরস্কার ও শাস্তি অর্থে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞা বা ইষ্ট-অনিষ্টের একমাত্র মাপকাঠি তা তাঁরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু আ'শারীয়গণ প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থে মুতাযিলাদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করলেও পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আ'শারীয়দের অভিমত হচ্ছে একমাত্র ধর্মই বলতে পারে কি করে এবং কোন পন্থা অবলম্বন করে আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি এবং কেমন করে আমরা তার ক্রোধের শিকার হই। বস্তুত পুরস্কার ও শাস্তি হচ্ছে ঐশী সত্তার সন্তুষ্টি ও ক্রোধের পরিণাম। এতদ্ব্যতীত কিছু আদেশ নিষেধ রয়েছে যা দৃশ্যত সাধারণ প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যদিও এদের সততা ও বিশুদ্ধতা বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে প্রশ্নাতীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ্র নিকট নামাজ আদায় প্রশংসনীয় কাজ রূপে সর্বজন-স্বীকৃত, কিন্তু কোনো কোনো সময় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। রোজা নিশ্চিতরূপেই আত্মিক বিশুদ্ধতার উপায়-বিশেষ, কিন্তু বৎসরের কোনো কোনো দিনে তা নিষিদ্ধ। প্রত্যাদেশের সহায়তা ভিন্ন নামাজ ও রোজার এ বিভিন্নতা নিরূপণ করা এককভাবে প্রজ্ঞার পক্ষে সম্ভব নয়।

অধিকন্তু প্রজ্ঞাই যদি আমাদের কার্যাবলির একমাত্র নির্দেশক হয়, তবে প্রেরিতপুরুষ বা রাসুল প্রেরণের আবশ্যকতা কোথায়? প্রত্যাদেশ ব্যতীত যদি আমরা নিশ্চিত চলতে পারি, তবে রাসুলগণের মহৎ প্রচারাভিযানের কোনই যৌক্তিকতা বা সার্থকতা থাকে না। কিন্তু রাসূল প্রেরণের যে পরম আবশ্যকতা রয়েছে তা সবাই স্বীকার করেন।

www.pathagar.com

ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে হাদিস একটা পার্থক্য নির্দেশ করে। ধর্মীয় ব্যাপার আল্লাহ্ ও রসুলের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।[৩৭] নবি (সঃ) বলেন, "পার্থিব জাগতিক ব্যাপারে তোমরাই উত্তম জান।" নিঃসন্দেহে "সত্য" কল্যাণকর, এই অর্থে যে, এটা হচ্ছে গুণাবলি অর্জনের উপায় অথবা এটা একটা মহৎ কার্য। এই "সত্য" জানার জন্য প্রত্যাদেশের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের পুরস্কার নিশ্চিত করবে, "সত্য"কে এই অর্থে গ্রহণ করলে আমাদের প্রত্যাদেশের শরণাপন্ন হতেই হবে। অনুরূপে "মিথ্যা" মন্দ এই অর্থে যে এটা হীন ও অনিষ্টকর কার্য। এই "মিথ্যা" জানার জন্য প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরকালে এটা যে নিশ্চিতরূপেই ধ্বংস ও শাস্তি বয়ে আনবে তা আমরা ধর্মের সাহায্য ব্যতীত নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না। এখানে আমাদের ধর্ম ও প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪. আল্লাহ্র ন্যায়বিচার ও সুপারিশ : মুতাযিলাগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পুণ্যবানদেরকে পুরস্কার ও পাপীদেরকে শাস্তি দান করা আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে বাধ্য। তিনি এর অন্যথা করতে পারেন না। বিপরীতে আ'শারীয়গণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পুরস্কার ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।[৩৮] যাকে ইচ্ছে তিনি পুরস্কৃত করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দিতে পারেন। তবে এটা দৃঢ়ভাবে আশা করা যায় যে, তিনি পুণ্যবানদেরকে পুরস্কার এবং পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ তিনি এইরূপই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু কোনো বিবেচনায়ই আল্লাহ্র ইচ্ছাকে বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহ্র উপরই বাধ্যবাধকতা আরোপ করার প্রকৃত অর্থ আল্লাহকে নির্ভরশীল সত্তায় পরিণত করা অথবা তাকে* যন্ত্রে পরিণত করা। যে যন্ত্রের নিজস্ব কোনো গতি বা কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা থাকে না। পুণ্যবানদেরকে পুরস্কার এবং পাপীদেরকে শাস্তি দানে যদি তাকে বাধ্য করা হয়, তবে একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের চেয়ে আল্লাহ্র পার্থক্য কোথায়?[৩৯] ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকগণ নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলির দ্বারাই পরিচালিত হন। সৃষ্টজীবের ঊর্ধ্বে স্রষ্টার স্থান দিতে গেলে অবশ্যই আমাদের স্বীয় বিচারের ঊর্ধ্বে তার (আল্লাহ্র) বিচারের স্থান দিতে হবে। এই বিষয়ে কোরআনের আয়াত সুস্পষ্ট। যেমন : "... তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করবেন। ..." (সুরা-২, আয়াত-২৮৪)

আল্লাহ্র ন্যায়বিচার এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার দৃঢ় সমর্থক মুতাযিলাগণ বিচার দিবসে হযরত (সঃ)-এর সুপারিশের প্রচলিত মতবাদ অস্বীকার করেন। তাঁদের যুক্তি আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক। সুতরাং মানুষের কার্য অনুসারেই আল্লাহ্ মানুষকে পুরস্কৃত বা শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের সাথে হযরত (সঃ) এর সুপারিশ বিষয়টি সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে তারা মনে করেন। পক্ষান্তরে, আ'শারীয়গণ মনে করেন, আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের সাথে হযরত-এর সুপারিশ বিষয়টি অসংগতিপূর্ণ নয়। তাঁরা পবিত্র কোরআনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন : "... এমন কে আছে যে তাঁর (আল্লাহ্র) নিকট সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? ..." (সুরা-২, আয়াত-২৫৫)। এইখানে সুপারিশ কথাটি লক্ষ্যণীয়। আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে অর্থ দাঁড়ায় : আল্লাহ্র অনুমতি ভিন্ন কেউ সুপারিশ করতে

* এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১৬

www.pathagar.com

পারবে না। আল্লাহ্ যাকে সেই অনুমতি ও ক্ষমতা দেবেন তা তাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : "শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এইরূপ দান করবেন যাতে আপনি পরিতুষ্ট হন।" (সুরা-৯৩, আয়াত-৫)। এখানে হযরত (সঃ)-এর সুপারিশের আভাষ প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত। এই আয়াত আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত নিজে উল্লেখ করেন, "আমার অনুসারি কোনো উম্মত দোজখে থাকতে আমি কখনই সন্তুষ্ট হব না।"

সমগ্র আলোচনায় আ'শারীয়দের মূল বক্তব্য হচ্ছে আমাদের দুটো বিকল্প :

১. হয় আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্র ক্ষমতা নীতিগত বাধ্যবাধকতার দ্বারা সীমায়িত। ফলে তিনি উদ্দেশ্যহীন, অসঙ্গত ও অনভিপ্রেত কোনো কাজ করতে পারেন না।

২. অথবা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্র ক্ষমতা এত ব্যাপক ও অসীম যে, যৌক্তিক-অযৌক্তিক সবকিছুকেই তা অন্তর্ভুক্ত করে। তবে তিনি কখনও অসংগত ও অযৌক্তিক রাজ্যে প্রবশে করেন না। এই দুই বিকল্পের মধ্যে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। কারণ এতে করে আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা এবং তার কার্যের যৌক্তিকতা উভয়ই বজায় থাকে। প্রথম বিকল্প আমরা অন্যায়ভাবে আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করি।

কয়েকজন খ্যাতিমান আ'শারীয় ব্যক্তিত্ব

১. আল-আ'শারী : ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আল আ'শারীর জন্ম। মৃত্যু ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে। মুসলিম দর্শন-ইতিহাসে তিনি সাধারণভাবে আল-আ'শারী নামে পরিচিত। তিনি আবু মুসা আ'শারীর বংশ-উদ্ভূত এবং প্রখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ আল-জুব্বাইয়ের শিষ্য। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মুতাযিলা দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর প্রচারার্থে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কিন্তু পরবর্তীতে মতভেদের কারণে তিনি মুতাযিলা মতবাদ পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তাঁর নাম অনুসারেই তাঁর দল বা সম্প্রদায়ের নামকরণ হয় আ'শারীয় সম্প্রদায়। তিনিই আ'শারীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর মতবাদ[৪০] মূলত সমন্বয়ধর্মী। তিনি সনাতন ও মুতাযিলাপন্থী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় ব্রতী হন। তিনি এলমূল কালাম বা যুক্তিবিজ্ঞান-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরই দৃঢ় প্রচেষ্টায় মুতাযিলা মতবাদ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাঁর মুতাযিলা মতবাদ পরিত্যাগের ঘটনাটি বেশ উল্লেখযোগ্য। "৯১২ খ্রিষ্টাব্দে কোনো এক শুক্রবারের বসরার মসজিদে তিনি জনসমক্ষে ঘোষণা দেন, যারা আমাকে জানে, তারা আমার সম্পর্কে অবগত। যারা আমাকে জানেন না, তাদের বলছি আমি আলী বিন ইসমাঈল আল-আ'শারী, আমি এই অভিমত পোষণ করতাম যে কোরআন সৃষ্ট, মানুষের দৃষ্টি আল্লাহকে অবলোকন করতে পারে না, আমরাই আমাদের মন্দ কার্যের কর্তা। এখন আমি সত্যে ফিরে এসেছি। এসব মতবাদ আমি প্রত্যাখ্যান করছি। মুতাযিলাগণকে প্রত্যাখ্যান এবং তাদের দুর্নাম ও অসচ্চরিত্রতা প্রকাশ করার কাজে আমি এখন নিয়োজিত।"[৪১]

www.pathagar.com

আল-আ'শারী বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখেছেন, যথা : কোরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব এবং কালাম বিষয়ক রচনাবলি। কিতাব আল-মারহওয়া আল-তাফসীল, আল-লুমা, আল ইসলামিয়ান, তাবিয়ান ইত্যাদি হচ্ছে তাঁর ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর রাজনীতির গ্রন্থের নাম : আল-ইবনো আল-উসুল আল-দীয়ানা।

নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আল-আ'শারীর মতবাদগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে :

ক. আল্লাহ্‌র গুণাবলি : আল্লাহ্‌র গুণাবলি সম্পর্কে আল-আ'শারীর অভিমত হচ্ছে : গুণাবলি আল্লাহ্‌র সত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং বহির্ভূতও নয়। এগুলো চিরন্তন। মানুষের গুণাবলির সঙ্গে আল্লাহ্‌র গুণাবলির তুলনা করা চলে না।

খ. পবিত্র কোরআন : পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে আল-আ'শারীর বক্তব্য হচ্ছে : কোরআন চিরন্তন ও শাশ্বত। কোরআন অসৃষ্ট, এর কোনো অংশই সৃষ্ট নয়, কারণ কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী।

গ. দিব্যদর্শন : দিব্যদর্শন সম্পর্কে আল-আ'শারীর মত হচ্ছে : বিশ্বাসী ও পুণ্যাত্মাগণ দিব্য চোখে আল্লাহকে দেখতে পাবে।

ঘ. ইচ্ছার স্বাধীনতা : ইচ্ছার স্বাধীনতার ব্যাপারে আল-আ'শারী বলেন : একমাত্র আল্লাহ্‌রই রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা এবং মানুষের অর্জিত দোষগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন।

ঙ. প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ (ওহি) : আল-আ'শারী প্রজ্ঞার অপরিহার্যতার কথা স্বীকার করলেও প্রত্যাদেশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন ,এমন কি, প্রজ্ঞাকে প্রত্যাদেশের অধীন বলে মনে করেন। প্রজ্ঞা বা যুক্তির দ্বারা আল্লাহকে জানা যায় না। ওহি বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই আল্লাহকে জানা সম্ভব।

২. আল-বাকিল্লানি : আবু বকর বিন মোহাম্মদ আল-তায়ব আল-বাকিল্লানি আল-আ'শারীর যোগ্যতম শিষ্য। তিনি আ'শারীয় মতবাদের পূর্ণতা দান করেন। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেলেও জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তিনি ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আ'শারীয় পরমাণুতত্ত্বে আল-বাকিল্লানির অপরিসীম দান অনস্বীকার্য। তিনি* অ্যারিস্টোটলের নিশ্চল জগতের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মনে করেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু পরমাণু সমবায়ে গঠিত। পরমাণু নিশ্চল জড় পদার্থ নয়। পরমাণুর কোনো আক্ষরিক সত্তা নেই। পরমাণুগুলো অপরিবর্তনীয়; কিন্তু এদের দ্বারা গঠিত বস্তুসমূহ পরিবর্তনীয় এবং ধ্বংসশীল। আল্লাহ্‌র সৃজনীশক্তি অবিরাম গতিতে পরমাণু সৃষ্টি করে চলছে। তাই জগতেও নিত্য পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

আল-বাকিল্লানি অ্যারিস্টোটলের জ্ঞানতত্ত্বের ধারণার মধ্যেও বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করেন। অ্যারিস্টোটলের জ্ঞানের দশ আকারের মধ্যে তিনি কেবল দু'টো যথা : দ্রব্য ও গুণ এ দুয়ের মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অবশিষ্টগুলোর জ্ঞাতার মন-বহির্ভূত

---

* ড. আবদুল হামিদ ও ড. মোঃ আবদুল হই ঢালী : মুসলিম দর্শনের পরিচিতি পৃ. ৬৩

www.pathagar.com

কোনো স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব নেই বলে তিনি মনে করেন। অ্যারিস্টোটলের দশ আকার হচ্ছে : (১) দ্রব্য (২) গুণ, (৩) পরিমাণ (৪) সম্পূর্ণ, (৫) দেশ, (৬) কাল, (৭) অবস্থান, (৮) অধিকার, (৯) কার্য ও (১০) ভাবাবেগ।

তাঁর উন্নত চিন্তাধারা লক্ষ্য করে ম্যাকডোনাল্ড আল-বাকিল্লানিকে[৪৩] মুসলিম দর্শনের কান্ট বলে আখ্যায়িত করেন।

'কিতাব আল-তাহমিদ' আল-বাকিল্লানির এক পরিচিত গ্রন্থ। ইলম বা বিজ্ঞান হচ্ছে এর মূল আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞানকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা : আল্লাহ্র অনন্ত জ্ঞান এবং জ্ঞান অর্জনে সক্ষম জীবের কালিক জ্ঞান। কালিক জ্ঞান আবার দু'অংশে বিভক্ত। যথা : স্বজ্ঞিক ও বৌদ্ধিক। স্বজ্ঞিক জ্ঞান সন্দেহের উর্ধ্বে।

৩. আল-শাহ্রাস্তানী : মোহাম্মদ আল-শাহ্রাস্তানির জন্ম ১০৮৯ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১১৯০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি একজন প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ। তাঁর লেখা এবং রচনার দ্বারা আ'শারীয় সম্প্রদায়ের গৌরব এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 'কিতাব-আল-মিলাল ওয়া আল-নিহাল' তাঁর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর দর্শন-মত পরিব্যক্ত করেছেন। আল-আ'শারীর মতো তিনিও আল্লাহ্র গুণাবলি এবং পবিত্র কোরআনের চিরন্তনতায় বিশ্বাস করেন। তিনি আল্লাহ্র সার্বভৌম শক্তি এবং আল্লাহ্ যে কোন বাধ্যবাধকতার অধীন নয় তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

৪. ইমাম-আল-হারমায়েন : ইমাম-আল-হারমায়েনের আসল নাম আবদুল মালেক জুয়াইনি—জন্ম ১০৪১, মৃত্যু ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি একজন প্রখ্যাত আ'শারীয় চিন্তাবিদ। বিচার দিবসে হযরতের সুপারিশ এবং মেরাজে তাঁর সশরীরে গমনে তিনি বিশ্বাসী। তিনি অধিবিদ্যা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রচার করেন। তিনি গ্রিক দর্শনের একজন নির্মম সামালোচক।

৫. ইমাম ফকরুদ্দীন আল-রাজী : ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাজীর জন্ম ১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ আ'শারীয় চিন্তাবিদ। তিনিও ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না।[৪৪] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি মান।[৪৫] তিনি গ্রিক দর্শনের একজন নির্মম সমালোচক।[৪৬]

৬. আল মাতরুদি : আবুল মনসুর মোহাম্মদ মাতরুদি সমরকন্দের অধিবাসী। তাঁর জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু একটা জানা যায় না। তাঁর মৃত্যু ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি আল-আ'শারীর সমসাময়িক ছিলেন। মূল বিষয়ে আল-আ'শারীয় মতবাদের সাথে তাঁর মতবাদের মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে বেশ মত[৪৭] পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন, আল-আ'শারীর উল্লেখ করেন মানুষের মধ্যে কার্য, কার্যের ক্ষমতা এবং ইচ্ছা কার্যের ক্ষমতা এবং ইচ্ছা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন—মানুষ তা অর্জন করে মাত্র। এখানে আল মাতরুদির অভিমত হচ্ছে, কার্য, কার্যক্ষমতা ও ইচ্ছা আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেও, দু'টো কার্যের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়টি স্বয়ং মানুষের। আল-আ'শারীর মতে প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই আল্লাহ্র জ্ঞান লাভ করা যায়, অপরপক্ষে আল-মাতরুদি মনে করেন প্রজ্ঞার মাধ্যমে আল্লাহ্র জ্ঞান লাভ সম্ভব প্রভৃতি।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্যসংকেত

ক. পূর্বোক্ত ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড, ডেভেলপমেন্ট অব মুসলিম থিওলজি, জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল থিওরি, লন্ডন ১৯০৩ পৃ. ১৮৬, ১৮৭. আরো তুলনীয় তাঁর নিবন্ধ 'অ্যান আউটলাইন অব হিস্ট্রি অব স্কলাসেকি থিওলজী ইন ইসলাম, ইন দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড vol. xv, 1925, পৃ. ১৪০-১৪৮।

খ. পূর্বোক্ত : তুলনীয় পৃ. ১৯১, '৯২। আরো তুলনীয় মজিদ ফখরি এর 'সাম প্যারাডক্সিক্যাল ইম্পিকেশনস অব দ্যা মুতাযি লাইট ভিউ অব ফ্রি উইল'; দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড, vol. XLIII, 1953, পৃ. ১৪০-১০০।

গ. পূর্বোক্ত তুলনীয় আল-আ'শারী-এর মাকালাত আল-ইসলামিন, সম্পাদিত এইচ, রিটার, ইস্তাম্বুল, ১৯২৯, পৃ. ৫৪২। আরো তুলনীয় আল ইবানাহ্ 'অ্যান ওসুল আল-দিয়ানাহ্', ইংরেজি অনুবাদ : ওয়ালটার সি. ক্রেইন, নিউ হেভেন, ১৯৪০, পৃ. ১০৩। অর্জন মতবাদে আল-আ'শারী দু'টো পদ ব্যবহার করেন। কসব ও ইকতিসাব উভয় পদই কোরআনের আয়াতে উল্লেখিত : "ক্ষমতার অতিরিক্ত আল্লাহ্ আত্মার উপর বোঝা চাপান না। এটা হচ্ছে সেই যা সে অর্জন করে (মা কাসারাত) এবং বাধ্য থাকে (owes) যা সে অর্জন করেছে (মা কাতাসারাত)' (২:২৮৬)। বিশ্লেষকগণ এ দু'পদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তাঁরা বলেন, কসব বলতে নিজ এবং অপরের ভাল কার্যাবলিকে নির্দেশ করে এবং ইকতিসাব বলতে মন্দ কার্যাবলিকে অর্থ করে কেবল নিজের সাথে সম্পৃক্ত। আল-আ'শারীর অর্জন মতবাদের আরো আলোচনার জন্য তুলনীয় হাম্মোদা গোরবা 'আল-আ'শারীর অর্জন মতবাদ, vol. II, 1955, পৃ. ৩-৮ এবং আরো বদরুদ্দিন আলায়ি-এর 'ফেটালিজম, 'ফ্রি' উইল অ্যান্ড এ্যাকুইজিশন এজ হেল্ড বাই মুসলিম সেইন্টস', ইসলামিক কালচার vol. xviii, 1954 পৃ. ৩১৯-৩২৯।

ঘ. গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এম. মন্টোগোমরি ওয়াট অর্জন মতবাদের জনক আল-আ'শারীর-এ মতের প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁরমতে অর্জন মতবাদের প্রকৃত উদ্যোক্তা হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা বা তাঁর কোনো নিকট অনুসারি। তুলনীয় তাঁর 'দি অরিজিন অব দি ইসলামিক ডক্ট্রিন অব এ্যাকুইজিশন, দি জার্নাল অব দি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৪৩, পৃ. ২৩৪-৪৭ এবং ফ্রি উইল প্রিডিস্টিনেশন ইন আর্লি ইসলাম, লুয়থক অ্যান্ড কোং, লন্ডন, ১৯৪৮, পৃ. ১৬৮। পূর্বোক্ত, এ. জে. ওয়েনসিন্‌ক, দি মুসলিম ক্রিড, ক্যামব্রিজ, ১৯৩২ পৃ. ৯৩।

১. এম সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১৯

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৩. এম. এম. শরীফ : এ হিস্ট্রি অব মুসলিম ফিলসফি, vol. I, পৃ. ২২২।

৪. আর. এ. নিকোলসন : লিটারেরি হিস্ট্রি অব দি এয়ারস, পৃ. ৩৩৭।

৫. ডব্লিউ. এম. ওয়াট : ফ্রি উইল প্রিডিস্টিনেশন ইন আর্লি ইসলাম। "Human conception on inadequate for the fact of life, one cannot give a rational explanation of the differences between the fate of different men, are must safely accept."

৬ ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩২৩

৭ ও' লিয়ারি : এরাবিক থট্‌স এন্ড ইট্‌স প্লেস ইন হিস্ট্রি, পৃ. ২১১

৮. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩২৪

www.pathagar.com

৯. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১১৯
১০. সৈয়দ আবদুল হাই : মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৯৬
১১. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২১
১২. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২০
১৩. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২০
১৪. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২
১৫. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২১
১৬. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২
১৭. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ.২২
১৮. ও' লিয়ারি : এরাবিক থট্স এন্ড ইটস প্লেসইন হিস্ট্রি পৃ.২১৩-২১৪
১৯. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩২৯
২০. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২৩
২১. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২৩
২২. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২৪
২৩. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২৪
২৪. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২৫
২৫. ম্যাকডোনাল্ড : ডেভলপমেন্ট অব মুসলিম থিওলজি পৃ. ১৯২
২৬. আল আ'শারী : মালাকাত আল ইসলামিক, পৃ. ৫৪২
২৭. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২৬
২৮. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ২৭
২৯. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৩৩
৩০. ড. আমিনুল ইসলাম :মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি পৃ. ১৩৩
৩১. এস. রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলসফি, পৃ. ৩৩
৩২. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩৩২
৩৩. এস. রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলসফি, পৃ. ১৩০
৩৪. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৩৪
৩৫. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩২২
৩৬. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩২২
৩৭. ড. সৈয়দ এস নদভী : মুসলিম আর্ট্‌স এ্যান্ড ইট্‌স সোর্স, পৃ. ৬৯
৩৮. এম. সাঈদ শেখ. স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১৬
৩৯. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১৬
৪০. সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, পৃ. ৪১২
৪১. ও' লিয়ারি এরাবিক থট্স এন্ড ইট্স প্লেস ইন হিস্ট্রি, পৃ. ২১২
৪২. ড. রশিদুর আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা পৃ. ৩৩৯
৪৩. ড. আবদুল হামিদ ও ড. আবদুল হাই ঢালী : মুসলিম দর্শনের পরিচিতি, পৃ. ৬৩
৪৪. ড. রশিদুর আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩৪৫
৪৫. আবুল হাসেম : এসেনসিয়াল অব মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৭৪
৪৬. এম. এম. হাসেম : এসেনসিয়াল অব মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৭৪
৪৭. সৈয়দ আবুদল হাই : মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১১০

www.pathagar.com

প্রসঙ্গক্রম :

সাঈদ শেখ ; স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি
আল-আ'শারীর প্রসঙ্গে : পৃ. ১৯-২৫, ১১৬, ১৪২, ১৯৭
দিব্যদর্শন প্রসঙ্গ : পৃ. ২৩
অর্জন মতবাদ : পৃ. ২৬
ইচ্ছার স্বাধীনতা : পৃ. ২৬, ২৭
সিংহাসন পরি আল্লাহ্‌র উপবেশন : পৃ. ২৫, ২৬
পূর্ব-শৃঙ্খলা মতবাদ : পৃ. ২৭
মাকালাত ইসলামিক : পৃ. ১৯৭-১৯৮
আ'শারীয় মতবাদ : পৃ. ১৬, ৩৭, ১০৮, ১৪২, ১৫০
পবিত্র কোরআন সৃষ্ট বা অসৃষ্ট পৃ. ২১-২৩
সারসত্তার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ : পৃ. ২০-২১

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

সুফিবাদ

ক. ভূমিকা

সুফিবাদ হচ্ছে এক ধরনের মরমি ভাবধারা। সর্বকালে এবং সর্বস্থানে প্রতিটি সমাজে কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে এই ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। এটি এসেছে মনের একটি অবস্থা থেকে। এটি সেইসব লোক কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছিল যারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের ভয়ে ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। এই ক্রোধকে আত্ম-সংস্কার ও আত্মশৃঙ্খলার দ্বারা আল্লাহ্‌র গভীর প্রেমে রূপান্তরিত করা যায় বলে তাঁরা মনে করতেন। এই ভাবধারা প্রায়শ তাদের কর্তৃকই বিকাশ লাভ করে, যারা জীবনযুদ্ধে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে নিরাশ, নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীনতার পানে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তাই বলা যেতে পারে যে, সুফিবাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রেম ও ধ্যানের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা এক ধরনের চিন্তন ও অনুভূতি। ইসলামে এর উদ্ভব ঘটে একদিকে মুতাযিলাগণের বুদ্ধিবাদ, অন্যদিকে হিজরি প্রথম তিন শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত গঠনবাদীদের অন্ধ আকারবাদের বিরোধ-প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যক্ষ আবেদন-নিবেদন এবং তাঁর প্রতি গভীর অনুভূতিই হচ্ছে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে, সুফিবাদের মূল সুর। মুসলিম চিন্তাধারায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় সুফিবাদও হচ্ছে ইসলামের একটি একপেশে মতবাদ। মানবজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে এটি প্রজ্ঞা, ঐতিহ্য ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভূমিকাকে গৌণ করে দেখে এবং কাশফ[১] বা স্বজ্ঞার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

সুফি অভিজ্ঞতার জটিলতা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ এর মুক্ত আলোচনা পরিহার করে। ধারণা করা যায় যে, এটি জ্ঞানের সেই দিকের প্রতিনিধিত্ব করে যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে পরিবাহিত হয়। বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল ধারণাগত জ্ঞান নিয়ে এটি জড়িত নয়। এ হচ্ছে অনুভূতি ও ধ্যানের উপর নির্ভরশীল এক প্রকার প্রত্যক্ষ ও স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান। এ হচ্ছে গভীর অনুধ্যানে নিমগ্ন একজন ব্যক্তি-মানুষের অনুপ্রাণিত মুহূর্তে অর্জিত এক প্রকার জ্ঞান। কেবল অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণই এই প্রকার জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। অনানুপ্রাণিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এর আলোচনা তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে।

সুফিবাদ হচ্ছে এক প্রকারের জীবনদর্শন। সুফিদের ধারণা, জগৎ প্রকৃতই এক মন্দ বাসস্থান—মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিকাশের অন্তরায়। সুফিগণ এই জগতের

www.pathagar.com

সবকিছুকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাদের দ্বারা কৃত পাপসমূহের জন্য অতীতকে অনুশোচনার সাথে স্মরণ করেন। এইভাবে দেখা যায় যে, এটা হচ্ছে এক ধরনের দুঃখবাদী (pessimistic) দর্শন।[২] মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি কামনাই তাদের লক্ষ্য। সুফিদের মতে, কেবল বৌদ্ধিক আলোচনার দ্বারা এটা লাভ করা সম্ভব নয়। আলোচনা, নিঃসন্দেহে, মানুষকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং চিন্তার প্রতি আগ্রহও জন্মায়। জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য আলোচনা অপরিহার্য। কিন্তু, একজন সুফি সাধক যার হৃদয় গভীর অনুধ্যানে প্রজ্জ্বলিত, তাঁর জন্য আলোচনার প্রয়োজন নেই। তিনি বরং একে পরিহার করার চেষ্টা করেন। গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একজন সুফি সাধক আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করেন। এই জ্যোতির সাহায্যে তিনি সত্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অবলোকন করেন। তিনি সত্যকে উপলব্ধি করেন এবং এর মধ্যে নিমগ্ন থাকেন। তাই বলা হয়, "যিনি আল্লাহ্‌কে জেনেছেন, তাঁর জিহ্বা নিয়ন্ত্রিত।"[৩]

সুফিবাদ হচ্ছে মনের একটি অবস্থা, একটি ভাবোচ্ছ্বাস-অবস্থা। বর্ণনার চেয়ে একে অনুভবে বুঝাই সম্ভব। এটি প্রধানত আল্লাহ্‌র অনুধ্যান ও অনুরাগের উপর নির্ভরশীল এক আবেগধর্মী অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আত্মানুশীলনের মাধ্যমেই এই স্তরে পৌঁছা সম্ভব। এজন্যই তাসাউফকে[৪] সত্যের জ্ঞান এবং আল্লাহ্‌র প্রেম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটা চৈতন্যের রহস্যাত্মক অবস্থাকে উন্মোচন করে এবং এর মধ্যে ব্যক্তিত্ব নিজেকে গলিয়ে ফেলে এবং অনন্ত সত্তায় মিশে যায়। সুফি সাধক কর্তৃক অর্জিত এই অবস্থা বর্ণনা করা কঠিন, কারণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা উপলব্ধ হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুফিবাদ হচ্ছে ইসলামের সেই শিক্ষার দিক যা পরজগৎ, বৈরাগ্যবাদ এবং ধার্মিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। জীবনকে পরিত্যাগ বা বর্জন করে নয়, বরং জগতের অশুভ-অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষকে এর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে—ইসলামের এই বাস্তব জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভাবধারাকে তাঁরা উপেক্ষা করেন। এইভাবে তাঁরা পরাজয়ের ভাবধারা, অসাড় ও নিষ্ক্রিয় মনোভাব ইসলামে প্রবেশ করান এবং জগতের সকল অকল্যাণ ও মন্দের ঊর্ধ্বে উঠে বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার আত্মবিশ্বাসের শক্তি হারান।

সুফিবাদের ইতিহাসে দু'টো স্তর। প্রাথমিক স্তর : এটি মুসলিম যুগের কয়েক শতাব্দীকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই সময়ে মুসলিম সমাজে এক শ্রেণীর লেখকের আবির্ভাব ঘটে যারা সুখ, সক্রিয় ও সংগ্রামী জীবনের পরিবর্তে আত্মবিনাশের নঞর্থক ভাবধারার পুষ্টি সাধন করেন। সংগ্রামী জীবনের পরিবর্তে তাঁরা মূলত আল্লাহ্‌র প্রেম ও অনুধ্যানের ধর্মীয় ও তাপসজীবন বেছে নেন। তাঁরা হচ্ছেন আত্মপরিতৃপ্ত লোক—এই জগতের সকল সুখ ও আনন্দের প্রতি তাঁরা উদাসীন এবং তাঁদের চাহিদাও ন্যূনতম। তাঁরা প্রধান ঐশী সত্তার উপলব্ধি বিষয় নিয়েই জড়িত থাকেন এবং নিজেদেরকে আহলে-আল-হাক্ক[৫] (সত্যের অনুসারী) বলে অভিহিত করেন। আল্লাহ্‌র প্রেম ও ধ্যানে তাঁরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন। তাঁদের মতে, এই জগৎ আসলেই মন্দ, অশুভ ও অকল্যাণে পরিপূর্ণ—এর মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া মানুষের উচিত নয়। মানুষের উচিত একে পরিহার করে

www.pathagar.com

পরজগতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই প্রাথমিক দলে রয়েছেন প্রখ্যাত তাপস আবু হাসেম, রাবেয়া বসরি, মারুফ কারখি ছাওবান-বিন-ইব্রাহিম, যুননুন মিশরি, বায়জিদ বোস্তামি, আবু ইয়াযিদ, জুনায়েদ বাগদাদি এবং হিজরির প্রথম তিন যুগের অন্য তাপসবৃন্দ।

দ্বিতীয় বা পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির প্রভাবে এই ভাবধারা এক ধরনের মরমি দর্শনে বিকাশ লাভ করে যা মূলত বৈশিষ্ট্যে সর্বেশ্বরবাদী। এই সুফি সাধকগণ তাঁদের শিক্ষার মধ্যে বিভিন্ন বিদেশী এবং অনৈসলামিক উপাদান সংমিশ্রণ করেন। এইসব প্রখ্যাত চিন্তাবিদের মধ্যে রয়েছেন : মনসুর হাল্লাজ, ইবনে-আল-আরবি, আল-ইশরাকি, রুমি এবং জামি। আল-গাযালির মাধ্যমে সুফিবাদ ধর্মীয় জীবনে তার সুদৃঢ় আসন লাভ করে।

খ. সুফি শব্দের বুৎপত্তি

সুফি শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে অতীতে বহু আলোচনা হয়েছে এবং বর্তমানেও এর আলোচনা অব্যাহত আছে। আহল-আল-সুফ্ফা নবি (সঃ)-এর সময় মদিনার মসজিদসংলগ্ন অবস্থানরত সংসারনির্লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে অর্থ করতেই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার কারো কারো মতে, 'সাফ্ফ আউয়াল' সালাতে দণ্ডায়মান মুমিনগণের প্রথম কাতার অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত। অনুরূপে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থে শব্দটাকে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন, বানু সুফা (একটি বেদুইন গোত্র), সাওফানা (একপ্রকার শাক-সবজি), সাফওয়াত-আল-কিফ্যা (মাথার পেছনে ঘাড়ের দিকের কেশগুচ্ছ), সুফিরা (বিশোধিত) প্রভৃতি অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। "প্রাচীন যুগে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে 'সুফি' শব্দ হতে গঠিত অভিন্ন উচ্চারণে দুই বা ততোধিক ভিন্নার্থক শ্লেষ অলংকাররূপে এই কর্মবাচ্যের প্রয়োগ (পশমি বস্ত্রপরিহিত সুফি, সুফিয়া) পরিদৃষ্ট হয়।"[৬] এবং গ্রিক Sophos (Theosophia) শব্দ হতেও 'তাসাউফ' শব্দ গঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। Noldeke শেষোক্ত অভিমতটি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুফি শব্দের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন ধারণাকে পরিহার করে আরবি "সুফ" (পশমি Wool) ধাতু থেকে সুফিবাদের আরবি প্রতিশব্দ 'তাসাউফ' নিষ্পন্ন বলে বর্তমানে অনেকেই মনে করেন। সুফি বলতে জাগতিক দম্ভ পরিত্যাগ করে অনুতাপের প্রতীক হিসেবে পশমি বস্ত্র পরিধান করাকে অর্থ করে। নবি (সঃ) পশমি বস্ত্র পরিধান করতে পছন্দ করতেন এবং তাঁর কতিপয় সাহাবিও এই রীতি অবলম্বন করেন এবং তাঁদেরকে সুফি বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গ. সুফিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সুফিবাদের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে এর ক্রমবিকাশের ধারা এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে যাতে করে পাঠক নিজেই সহজে অনুধাবন করতে পারেন, পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে এর উৎপত্তি নাকি একটা বৈদেশিক প্রভাবের ফল। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, ইসলামি যুগের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে

www.pathagar.com

সুফিবাদের সূচনা। এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে কোনো কোনো পণ্ডিত সুফিবাদকে গ্রিক দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেন। আসল কথা হচ্ছে, সুফিবাদ স্বয়ং ইসলামের মতই প্রাচীন ও পুরাতন।[৭] যে মুহূর্ত থেকে মরমি আয়াতসমূহ নবি (সঃ)-এর নিকট প্রত্যাদিষ্ট হয়, সেইক্ষণ থেকেই এর উৎপত্তি। আরবি ভাষাভাষী পণ্ডিতগণের এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পবিত্র কোরআন রহস্যের স্পর্শে প্রায়শই রূপক। দৃষ্টান্তস্বরূপ "তিনি (আল্লাহ্) হলেন আদি ও অন্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাতা।" LVII : 3; "... আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে ... ।" XLVIII-10; "যখন তুমি তীর নিক্ষেপ কর তখন তুমি তা' নিক্ষেপ কর না, আল্লাহ্ নিক্ষেপ করে।" VIII: 17; "... তিনি সর্বদাই কেননা কোন কার্যেরত ... ।" LV; 29; "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।" LXXXV : 16।

এইসব আয়াত দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, সমস্ত বস্তুসামগ্রীসহ এই জগৎ হচ্ছে কেবল ঐশী সত্তার মূর্ত প্রকাশ। সৃষ্টি হচ্ছে সেই মহান সত্তারই কেবল প্রকাশ। মানুষের শিরার মধ্যেও আল্লাহ্ প্রবহমান। মানুষ পরম সত্তার হাতে ক্রীড়নক মাত্র। তিনি তাকে যেমন ইচ্ছে তেমনি ব্যবহার করে থাকেন। জগতে যা কিছু হয়, তা আপাতত সৃষ্টি থেকে তৈরি বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, আসলে তা স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক উৎপাদিত, অর্থাৎ, এর উৎস স্বয়ং আল্লাহ্। আত্মপ্রকাশের ইচ্ছেই আল্লাহকে পরিণামে জগৎ সৃষ্টির দিকে পরিচালিত করে। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ্ নবি (সঃ)-কে বলেন : "আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম, এবং আমি জ্ঞাত হতে চাইলাম, তাই সৃষ্টি করলাম যাতে করে আমি পরিচিত হতে পারি।" এইসব রহস্যাত্মক ভাবধারা হাদিস কর্তৃক আরো দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। যেমন বলা হয়, "যে নিজেকে জানে, সে তার প্রভুকে জানে।"

কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত সত্তার এই সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্যই ভবিষ্যৎ "সর্বখোদাবাদ" বা "অস্তিত্বের ঐক্য"[৮] মতবাদ স্থাপনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সকল সুফি সাধকের লক্ষ্য হচ্ছে স্রষ্টার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া। কারণ, অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁদের বিশ্বাস আল্লাহ্ই হচ্ছেন একমাত্র প্রকৃত সত্তা, অবশিষ্ট হচ্ছে তাঁরই মূর্ত প্রকাশ মাত্র। পুনরায়, প্রেম হচ্ছে সুফিবাদের মূল সুর। ভক্তি ও প্রেমের ডানায় চড়ে সুফিগণ সত্তার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের প্রয়াস চালান। নিশ্চিতভাবেই এই প্রেম বিশুদ্ধ ও খাঁটি, নিঃস্বার্থ ও স্বার্থশূন্য। সুফিবাদের এই সৌধমূল কোরআন ও হাদিস দ্বারা সমর্থিত। আল্লাহ্ বলেন : "বলুন (তাদেরকে) তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন। (III : 31); "যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্র প্রতি রয়েছে তাদের অতিরিক্ত ভালবাসা। ..." [II : 165); নবি (সঃ) বলেন, "যে ভালবাসে না তার ঈমান নেই।" "যাকে সে ভালবাসে, মানুষ তার সাথেই আছে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায় যে, সুফিবাদের বীজ ইসলামের প্রারম্ভেই সূচিত হয়েছিল। নবি (সঃ) নিজেই মরমি ভাবধারা প্রদর্শন করেছেন। তিনি মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে (দৃষ্টান্তস্বরূপ হেরা গুহা) ভক্তি ও ধ্যানে নিমগ্ন থেকেছেন। আল্লাহ্র মধ্যে সম্পূর্ণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁকে দেখা গেছে প্রায়শই। তাঁর

www.pathagar.com

অনুগামীগণ তাঁকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে গেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবিগণের একটি দল বিশ্বাস গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই ছিল অত্যন্ত মরমি ভাবধারাসম্পন্ন এবং আচার-ব্যবহারে তন্ময়ী ভাবাপন্ন। পার্থিব বিষয়ে তাঁরা ছিলেন উদাসীন, অনীহাপ্রবণ এবং কদাচিৎ তাঁরা নিজেদেরকে জাগতিক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। নবি (সঃ)-এর মসজিদ অলিন্দে তাঁরা সর্বদাই নামাজ, ভক্তি ও ধ্যানাবস্থায় সময় অতিবাহিত করেন।তাঁরা 'আহল-উস-সাফ্ফা"[৯] বলে পরিচিতএবং এ থেকেই সুফি শব্দ আগত বলে প্রাথমিক মুসলিমগণ ধারণা করেন।

প্রাথমিক খলিফাগণ জগতে ব্যস্ততম শাসক ছিলেন। এতসব ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং নিজেদেরকে মরমি ভাবধারায় নিয়োজিত রাখতেন। জগতের প্রতিটি কাজ ঐশী হস্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে তাঁরা মনে করতেন। সূচনাতে মরমির এই ভাবধারা অল্পসংখ্যক মুসলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত উসমানের রাজত্বকালের এবং পরে মুসলিম জগতে যে বিরাট বিপর্যয় ঘটে তার ফলে এই ভাবধারার বিস্তর প্রসার লাভ ঘটে। এই বিপর্যয়ের ফলে বিশ্বাসীদের সুদৃঢ় ঐক্য প্রকম্পিত হয়, ইসলামের ভ্রাতৃত্বে ভাঙ্গন ধরে, তরবারি ঝলসে ওঠে এবং মুসলিমগণ একে অপরের মাথা ভাঙতে থাকেন। এসব বিভীষিকা ও ভয়াবহতা মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মরমি বা সন্ন্যাসভাব তীব্রভাবে জাগিয়ে তোলে এবং পরিণামে একে অগ্রগতির[১০] পথে টেনে নিয়ে যায়।

গোঁড়া খেলাফত কালের শেষদিকে একদল স্বার্থশূণ্য লোকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা প্রকৃতই বাস্তব জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তারা এসব মুসলিম জগতের সর্বপ্রকার জাঁকজমক ও আনন্দ-উল্লাস থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখেন। তাঁরা নিজেদেরকে পরমসত্তার ধ্যানে নিমগ্ন রাখেন এবং একমাত্র তাঁর নিকটই বিভীষিকায় নিমজ্জিত এই জগৎ থেকে পরিত্রাণের আবেদন জানান। ধীরে এবং অত্যন্ত দৃঢ়গতিতে এদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরা তাঁদের সমর্থনে কোরআনের সেইসব আয়াত উল্লেখ করেন যেসব আয়াতে জগতকে ক্ষণস্থায়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যকে চরম আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিদেশী ভাষার সাথে এইসব লোকদের কোনো পরিচিতি ঘটেনি কিংবা গ্রিক বা আর্যদের সাথে মিশবারও কোনো সুযোগ হয় নি। দার্শনিক বলে পরিচিত কোনো ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেও তাঁদের কোনো সংশ্রব ছিল না। আল্লাহ্র চিন্তা ও ধ্যান ব্যতীত তাঁদের অন্যকিছু ভাবনা ছিল না।

এইসব আত্মমগ্ন ও মরমি মুসলিম মূলতই সুফি[১১] ছিলেন। তাঁদেরকে সুফি বলে অভিহিত করা হতো কিনা সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে : তাঁরা সদাসর্বদাই মনেপ্রাণে আল্লাহ্র ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। যাহোক, প্রথম মুসলিম, যিনি সাধারণভাবে সুফি বলে পরিচিতি লাভ করেন, তিনি হচ্ছেন ইমাম হাসান-আল-বসরি। তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু বসরাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইসলামি বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। নবি (সঃ)-এর পরিবার থেকে তিনি এই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। মরমি ও দার্শনিক গুণাবলি তিনি নিজের মধ্যে সমন্বিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

জ্ঞান অন্বেষণকারিগণের উপকারার্থে তিনি জনসমক্ষে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। ইসলামে বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল-বিন-আতা তাঁর শিষ্য ছিলেন। ১১-হিজরি (৭২৮ খ্রি.)-তে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবু হাসিম (১৬২ হিজরি, ৭৭৭-৭৮ খ্রি.) কুফার একজন আরব। তিনি সিরিয়াতে বসবাস করেন। জামি তাঁকে প্রথম মরমি সাধক মনে করেন।। তাঁকেই সুফি পদবি দেয়া হয়। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্য বলখের সিংহাসন পরিত্যাগকারী আবু ইসহাক ইব্রাহিম-বিন-আদহাম অত্যন্ত উঁচুদরের মরমি সাধক ছিলেন। তিনি ১৬১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। রাবেয়াকে শ্রেষ্ঠতম মরমি ও সুফি সাধক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর ন্যায় কঠোর তপস্বিনী এই জগতে বিরল। তিনি ১৬০ হিজরি (৭৭৬ খ্রি.)-তে মৃত্যুবরণ করেন। বলাবাহুল্য যে, গ্রিক বা আর্যদর্শনের সাথে এইসব সাধকের আদৌ কোনো সংশ্রব ছিল না। সুফিবাদের ক্রমবিকাশের এই হলো প্রথম পর্যায়।

সুফিবাদের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় মারুফ কারখির (ফিরোজ বা ফিরোজানের পুত্র) দ্বারা। তিনি হিজরি ২০০ (৮১৫ খ্রি.)-তে পরলোকগমন করেন। তিনি আলী-মুসা-আর-রিদা থেকে তাঁর সমস্ত জ্ঞান ও গুণাবলি লাভ করেন। তিনি একজন সহজ-সরল খাঁটি সাধক ছিলেন। পার্থিব জগতের মোহ থেকে সরে পড়ে তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার অনুধ্যানে নিমগ্ন রাখেন। ইসলামি মরমিবাদের স্তম্ভ বলে সার্বজনীনভাবে পরিচিত সুবহান-বিন-ইব্রাহিম যুননুন মিশরি (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি ৮৫৯ খ্রি.) অচিরেই মারুফ কারখিকে অনুসরণ করেন। তাঁর উপরই মরমিবাদের মতবাদসমূহ আরোপ করা হয়। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত—সুফিসাধক ও দার্শনিক উভয়ই। তাঁর মরমিবাদের মূল কথা : "যে উত্তমরূপে আল্লাহকে জেনেছে, সে-ই উত্তমভাবে তাঁর মধ্যে সমাহিত হতে পেরেছে।" তাঁর মতে ওয়াজদ[১২] সমাধি বা ভাবোচ্ছ্বাস হচ্ছে জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ।

আমরা এখন বোস্তাম নগরের বায়যিদ (আবু ইয়াযিদ)-এর দিকে অগ্রসর হতে পারি। তিনি যুননুন মিশরির সমসাময়িক ছিলেন। মরমিবাদের উপর ফানা আত্মবিলোপ ও আত্মবিনাশন মতবাদ প্রবর্তন করে তিনি এর বিপুল উন্নতি সাধন করেন। এই মতবাদ, প্রকৃতপক্ষে, যুননুন মিশরি কর্তৃক প্রচারিত ওয়াজদ মতবাদের যৌক্তিক পরিণাম। বায়যিদ ঘোষণা করেন : যে পর্যন্ত না মানুষ নিজেকে আল্লাহ্র মধ্যে সমাহিত করতে পারে, সেই পর্যন্ত সে ঐশী সত্তার কোনো সূত্র লাভ করতে পারে না। আত্মবিলোপ ও আত্মবিনাশনের এই দুই ভাবধারা ইসলামি মরমিবাদে সর্বখোদা মতবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আল্লাহকে জানার জন্য মানুষ যখন নিজেকে ধ্বংস করে স্রষ্টার মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তখন এমন একটা স্তরে পৌঁছানো যায় যখন স্রষ্টা ও সৃষ্টি, প্রভু-দাসের পার্থক্য বিলীন হয়ে যায়।

ইসলামি যুগের প্রথম, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাচীন পণ্ডিত এবং একজন মরমিবাদীদের মধ্যে বাহ্যিক কোনো পার্থক্য ছিল না। বিশ্বাসীদের এই উভয় দলই সমভাবে ইসলামের নির্দেশ এবং আচার-অনুষ্ঠান অবলীলাক্রমে পালন করতেন। বাগদাদের জুনায়েদ (মৃত্যু ২৯৭ হিজরি ৯০৯ খ্রি.) একজন প্রখ্যাত সুফিসাধক। তিনি চাইতেন যে, বিশ্বাসীগণ সকলেই যেন ইসলামের প্রাচীন ও আধ্যাত্মিক দিক একইভাবে

www.pathagar.com

অনুসরণ করে চলেন। তিনি দৃঢ় মত পোষণ করেন যে ইসলামের বাহ্যিক পথ (শরিয়ত) এবং আভ্যন্তরীণ পথ (হাকিকত) মূলত একই বস্তুর দু'টো দিক। তারা পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ তো নয়ই, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক।[১৩] জুনায়েদই মরমি মতবাদকে কাগজে-কলমে সুশৃঙ্খল করে তুলেন। সে যাই হোক, মুসলিম সমাজের বিভিন্ন দলের মধ্যে মরমিবাদ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য গাযালি অবশিষ্ট থেকে যান। তিনি মরমিবাদকে ধর্মের বাহ্যিক রূপের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেন এবং উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে আন্তরিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার গৌরব অর্জন করেন।[১৪]

ইসলামের (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ) এই দু'ভাগ যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, তখন থেকে সুফিবাদের পতন ঘটতে থাকে। পরবর্তী সুফিগণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর গূঢ়বাদী। তাঁরা এর বাহ্যিক দিকের কথা ভাবেন নি। অনুরূপে, সনাতন পণ্ডিতগণ তাঁদের কাজে এত বেশি আত্মনিবিষ্ট হয়ে পড়েন যে তাঁরা ঈমানের আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। সাধকগণ যখন নিজেদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্ন দল গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন, তখনই অধঃপতনের কাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এই দলের শাখা-প্রশাখা পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। এই দল আবার কালক্রমে বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়—প্রতিটি উপদলেরই থাকে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, বিধি-বিধান।

সুফিদের প্রধান চারটি দল তাদের নেতাদের নামে পরিচিত। এই প্রধান দলগুলো হতেও বহু-সংখ্যক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। প্রধান চারটি দল হচ্ছে : (১) কাদিরিয়া (আবদুল কাদের জিলানির নামে : মৃত্যু : ৫২২ হিজরি, ১১৬৬ খ্রি. (২) সুহরাওয়ার্দিয়া (সিহাব-উদ্দিন সুহরাওয়ার্দির নামে : মৃত্যু : হিজরি ৬৩২, (৩) চিশতিয়া (আবু ইসহাক শামি এবং খাজা মঈন উদ্দিন চিশতির নামে : মৃত্যু : ৬৬৩ হিজরি, ১২৬৫ খ্রি.) এবং (৪) নকশেবন্দিয়া (বাহাউদ্দিন নকশে বন্দের নামে ; মৃত্যু : হিজরি ৯৭১)।

সুফিবাদ বিকাশের তৃতীয় বা শেষ যুগ শুরু হয় ৭ম হিজরি বা ১৩শ শতাব্দীতে। এ যুগের মরমিয়া কবি-দার্শনিকগণ ইরাক, আরব, সিরিয়া, মিশর, স্পেন, তুর্কিস্তান, ইরান, মধ্য এশিয়া ও বাংলাদেশ এবং পাক-ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত তাঁদের গ্রন্থাবলীতে গুহ্য ভাবধারা বা তাসাউফের ভাবগম্ভীর সৌন্দর্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ইবনুল ফরিদ, ইবনুল আরবি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, মৌলানা রুমি হাফিজ, নূর উদ্দিন জামি—এঁরা সবাই মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দেন। মহিউদ্দিন, ইবনুল আরবী (মৃত্যু ৬৩৮ হিজরি; ১২৪০ খ্রি.) স্পেনের প্রথম সুফি। তাঁর মধ্যে সর্বখোদাবাদ সুশৃঙ্খল ধারায় প্রকাশ লাভ করে। তৃতীয় শতাব্দীতে সর্বখোদাবাদী প্রবণতা এবং এই প্রবণতা বায়যিদ বোস্তামির মধ্যে দেখা গেলেও ইবনুল আরবিই পূর্ণাঙ্গ সর্বখোদাবাদী মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতবাদ ওয়াহাদুল ওজুদ নামে পরিচিত। পরবর্তী কোনো সুফি সাধকই ইবনুল আরবির প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। পারস্যের মৌলানা জালাল-দ্দিন রুমিও (১২০২—১২৭০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। মৌলানা রুমির রচিত "মনসবি" বিশ্বের মরমি-ইতিহাসের এক অনবদ্য সৃষ্টি। পারস্যের পরবর্তী সুফি ইরাকি, সাবিস্তারি, কাশানি, আল জিলি ওজামি প্রমুখ।

www.pathagar.com

এই যুগের ভারতীয় উপমহাদেশের সুফিদের মধ্যে খাজা মঈন উদ্দিন চিশতির (মৃত্যু ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) নাম উল্লেখযোগ্য। এই কালের অন্যান্য সুফি সাধক হলেন : বখতিয়ার কাফি (মৃত্যু ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দ), ফরিদ উদ্দিন শাকারগঞ্জ (মৃত্যু ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ও নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (মৃত্যু ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

ইবনুল আরবির 'ওজুদিয়া' এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জন্মলাভ করে 'শুহুদিয়া'। রুকন উদ্দিন আলাউদ্দৌলা এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতে, বহির্জগত ঐশী সত্তা থেকে নিঃসৃত হয় নি—এটা তার প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র। বাহাউদ্দিন (মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) 'শুহুদিয়া' দৃষ্টিকোণকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যান। পাক-বাংলাদেশ-ভারতের সুফিসাধক শেখ আহম্মদ সারহিন্দী (মৃত্যু ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) এই মতবাদকে পুনর্জীবন দান করেন। তিনি মোজাদ্দেদ-ই-আলফে সানি নামে খ্যাত।

সুফিবাদকে বিশ্লেষণ করলে এর তিনটি দিক লক্ষ্য করা যায়। যেমন[১৫] : এর সংযমের দিক, এর তাত্ত্বিক দিক এবং সর্বখোদাবাদী দিক। সুফিবাদের এই তিন দিকই ইসলাম হতে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ, সুফিবাদ কোরআন ও হাদিসের আধ্যাত্মিক শিক্ষারই স্বাভাবিক পরিণতি।

সুফি অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য

কাশফের মাধ্যমে অর্জিত পরম সত্তার জ্ঞান উপলব্ধিজাত। তাই সুফি অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। প্রাচ্যের প্রখ্যাত দার্শনিক ইকবাল সুফি অভিজ্ঞতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেন :

প্রথমত, সুফি অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষজাত। অন্যান্য বস্তুকে যেমন আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করে থাকি, সুফিগণও তেমনি আল্লাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তবে এ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জাত নয়—এ হচ্ছে হৃদয়ে উপলব্ধিজাত—হৃদয়ের প্রত্যক্ষ।

দ্বিতীয়ত, সুফি অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণধর্মী নয়—সংশ্লেষণধর্মী। এটা অখণ্ড বা সমগ্রতা নিয়ে উপস্থিত হয়। এখনে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য অনুভূত হয় না। এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যবধান বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইকবাল বলেন, "the mystic state brings us into contact with total passage of reality in which all the diverse stimuli merge into one another and form a single unanalysable unity in which the ordinary distinction of subject-object does not exist."—The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 19.

তৃতীয়ত, অভিজ্ঞতার নিবিড়ঘন মুহূর্তে, তন্ময়তার চূড়ান্তক্ষণে সুফি এক একক সত্তার অনুভূতি লাভ করেন—এ ক্ষণিকের জন্যে হলেও এইক্ষণে জ্ঞাতার ব্যক্তিগত সত্তা লোপ পায়—তবে এই অভিজ্ঞতা আত্মগত নয়—বিষয়গত বা বস্তুনিষ্ঠ।

চতুর্থত, সুফি অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎ ও সরাসরি হওয়ার কারণে এর যোগাযোগ অন্যের নিকট পরিবাহিত করা যায় না। সুফি তাঁর অনুভূত অভিজ্ঞতাকে অন্যের নিকট সুস্পষ্ট, সঠিক ও সার্থকভাবে পরিবাহিত করতে পারেন না। অনুভূতি হচ্ছে বর্হিপ্রেরণা যেমন ধারণা হচ্ছে অগ্রসরমান প্রতিবেদন এবং কোনো অনুভূতিই এত অন্ধ নয় যে, এর

www.pathagar.com

বিষয়বস্তুর ধারণা থাকবে না। Feeling is outward pushing, as idea is onward reporting and no feeling is so blind as to have no idea of its objct.—The Reconstruction of Religious thought in Islam. p. 21.

পঞ্চমত, সুফি অভিজ্ঞতায় স্থায়িত্বের যে নিবিড় অনুভূতি সৃষ্টি হয় তা ক্রমিক সময়ের অবাস্তবতায় ধারণা প্রদান করলেও ক্রমিক সময়ের সাথে সাথে এর সম্পূর্ণ ছেদ ঘটে না। সুফি তন্ময়তা সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। সুফি তন্ময়তা ক্ষণিকের জন্য স্থায়ী হয়ে বিলুপ্ত হয়—সাধক পুনরায় তাঁর পূর্বাবস্থা অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরম সত্তার সাথে মিলনের এই ক্ষণিক তন্ময়তা সুফির চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। বহিঃপ্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সাধারণ উপায়। সুফি সাধকগণ তাঁদের অন্তঃপ্রত্যক্ষের সাহায্যে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করেন। সুফি অভিজ্ঞতা কোনো অসাধারণ বা অলৌকিক অভিজ্ঞতার ফসল নয়। ইন্দ্রিয়ের পরিচ্ছন্নতা যেমন বহিঃপ্রত্যক্ষের জন্য প্রয়োজন, মস্তিষ্কের বিশুদ্ধতা যেমন চিন্তার জন্য প্রয়োজন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা কাশফের জন্যও তেমনি কালব বা হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতার প্রয়োজন। কালব বা হৃদয়শক্তির আন্তরিক অনুশীলনের দ্বারা সাধারণ মানুষও সুফির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও কালবের প্রত্যেকের রয়েছে সুনির্দিষ্ট অঞ্চল—তবে এদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই।

সুফিবাদ ও রক্ষণশীল মতবাদ

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে সুফিবাদ ও রক্ষণশীল মতবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নি। পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও মতবাদের উদ্ভব ঘটে, যেমন—রক্ষণশীল, সুফি ও বুদ্ধিবাদী গোষ্ঠী। কালক্রমে এসব গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য সূচিত হয়।

সুফিবাদ ও গোঁড়া বা রক্ষণশীল মতবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায় :

এক. ইসলামে জ্ঞানের উৎস সাধারণত তিনটি : আকল, নকল এবং কাশফ বা স্বজ্ঞা। এ তিন উৎসের উপরই ইসলাম সমান গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু কালপরিক্রমায়, সাধারণত মানুষ বা গোঁড়া মতবাদীগণ নকল অর্থাৎ, সামাজিক প্রথার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং অন্য উৎসগুলোকে গৌণ করে দেখে। লক্ষ্যণীয় যে সুফিগণ এখানে আকল ও নকলকে পরিহার করে কাশফ বা স্বজ্ঞার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

দুই. সাধারণ মুসলমানগণ কোরআনের বাণী ও আয়াতকে সাধারণ অর্থে বুঝে থাকেন এবং সেইভাবেই এর অর্থ পরিগ্রহণ করেন। কিন্তু সুফিগণ পবিত্র কোরআনের বাণী আয়াতের সাধারণ অর্থের সাথে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান করেন এবং অন্তর্নিহিত ও গূঢ় অর্থের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

www.pathagar.com

তিন. রক্ষণশীল ও গোঁড়া মুসলমানগণ আল্লাহকে ভয় করেন। তারা নরকে যাওয়ার ভয়ে এবং স্বর্গে যাওয়ার লোভে সাধারণত এবাদত করেন। তাদের মতে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। তিনি পাপীকে শাস্তি দেন এবং পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত করেন। পক্ষান্তরে, সুফিগণ আল্লাহ্র নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় এবাদত করেন—নরকের ভয় বা স্বর্গের লোভের জন্য নয়। তাঁদের মতে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু—তিনি প্রেমময়। মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভীতির নয়—প্রেমের।

চার. রক্ষণশীল মুসলমানগণ শরিয়তের বিধি-নিষেধ পালন করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা অর্জন করা যায় বলে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। অন্যদিকে সুফিগণ ধর্মীয় বা শরিয়তের বিধি-বিধানের উপর তেমন একটা গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁরা আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার জন্য একজন আধ্যাত্মিক সাধকের প্রয়োজন অপরিহার্য বলে মনে করেন, যাঁর তত্ত্বাবধানে ভক্ত তাঁর আরাধ্য সীমানায় পৌঁছাতে পারেন।

পাঁচ. মৃত্যুর পর আত্মা সম্পূর্ণরূপে তার স্বকীয়তা বজায় রাখবে বলে রক্ষণশীল মুসলমানগণ মনে করেন এবং পাপ-পুণ্য অনুসারে তার শাস্তি বা পুরস্কৃত হবে বলে বিশ্বাস করেন। সুফিদের মতে, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বিশ্ব-আত্মায় বিলুপ্ত হবে যা এর মধ্যে সমাহিত হয়ে যাবে।

সুফিবাদ ও মরমিবাদ

Mysticism বা মরমিবাদ একটি ব্যাপক শব্দ। কালে কালে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন দেশে মরমিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রত্যেক যুগে এমন গোষ্ঠী বা দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাস করেন এবং আত্মবিলুপ্তির মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে সম্মিলনে প্রয়াসী। মরমিবাদের এই ভাবধারা সুফিগণের মধ্যেও বিদ্যমান। আসলে, ইসলামি মরমিবাদই সুফিবাদ নামে পরিচিত। সুফিবাদ ও মরমিবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয় :

এক. মানবজীবনের দু'টো দিক রয়েছে : (ক) পার্থিব, (খ) অপার্থিব। মানবজীবনের সার্থক ও পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে পার্থিব-অপার্থিব, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে সুফিগণ মনে করেন। ইসলামি মরমিবাদীগণ, অর্থাৎ সুফিগণ দেহ ও আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না—তাঁরা এদেরকে অবিচ্ছিন্ন বলেই ভাবেন। কিন্তু, মরমিবাদীগণ মানুষের আত্মশুদ্ধির বিষয়ে পার্থিব ও দৈনিক প্রয়োজনের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান মরমিবাদীগণ আত্মনিগ্রহকেই মুক্তি বা মোক্ষলাভের উপায় মনে করেন।

www.pathagar.com

দুই. ইসলামি মরমিবাদীগণ জীবন-চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাঁরা জীবন-চেতনার প্রতিটি স্তর, যেমন—পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন। পক্ষান্তরে, মরমিবাদীগণ জীবনবিচ্ছিন্ন, সংসারত্যাগী সন্ন্যাস জীবন পরিচালনাতেই সাধারণত অভ্যস্ত। তাঁদের প্রায়শই নির্জন স্থানে জীবন-বর্জিত হয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ব্রত থাকতে দেখা যায়।

তিন. আল্লাহ্র সাথে সুফি সাধকের যোগাযোগ সরাসরি বা প্রত্যক্ষ—তৃতীয় ব্যক্তির স্থান এখানে নেই। অপরপক্ষে, মরমিবাদীগণ একজনের মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

চার. সুফি সাধকগণ আত্মবিলুপ্তি নয়, আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে আল্লাতে চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন। অন্যদিকে মরমিবাদীগণ ঐশী সত্তার মধ্যে অবলুপ্ত হওয়াকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করেন।

ঘ. সুফিবাদের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদসমূহ

ভনক্রেমার এবং ডোযার-এর ধারণা ভারতীয় বেদান্তবাদ থেকে সুফিবাদের উৎপত্তি। আর.এ. নিকোলসন মনে করেন নব্য প্লেটোবাদ ও ক্রিশ্চিয়ানিটি থেকে এর উদ্ভব। ব্রাউন সুফিবাদকে অনাবেগময় সেমেটিক ধর্মের[১৬] বিরুদ্ধে আর্যীয় প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বলে মনে করেন। এইসব মতবাদ ঐতিহাসিক কারণের ভাসাভাসা অভিমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐতিহাসক নিয়ন্ত্রণবাদে কারণ কেবলমাত্র তার অস্থায়ী পূর্ববর্তী পরিণাম দ্বারা নির্ধারিত হয় না। মানব মন তার স্বীয় উদ্যমেই নিজ থেকে ক্রমে সত্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম যা অন্যকর্তৃক পূর্বে ধারণা করা হয়েছিল। অধিকন্তু, সুফিবাদের[১৭] উৎপত্তি বা মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে যে কোনো ধারণা উদ্ভবের জন্য সংস্কৃতির নীতি বা সূত্র উপেক্ষা করা যায় না। কোনো ধারণাই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না যে পর্যন্ত না কোনো না কোনো অর্থে এটা তার স্বকীয় সংস্কৃতি হয়।[১৮] শুধু বাহির থেকে অন্যের মনে সংস্কতির ভাব বা ধারণা প্রবেশ করানো যায় না। এটা আসে অভ্যন্তর বা অন্তর থেকে। বহিঃপ্রভাব খুব বেশি হলে, গভীর অচেতন নিদ্রা থেকে এসব ভাবকে জাগিয়ে তুলতে পারে মাত্র। এসব সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে এ আলোকেই আমরা এবার সুফিবাদের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করতে পারি।

১. ক্রিশ্চিয়ানিটি : ইসলামি মরমিবাদের উপর খ্রিষ্টান প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ভন ক্রেমারকে অনুসরণ করে আমরা ইসলাম-পূর্ব সংস্কৃতি ও চিন্তনে খ্রিষ্টান প্রভাব উল্লেখ করতে পারি। খ্রিষ্টান সন্ন্যাসবাদ আরবের সিনাই ও সিরিয়া[১৯] মরুদেশে পরিচিত ছিল। প্রাক-ইসলাম কবিতায় এর সন্ধান মিলে। ইমরুল কায়েস তাঁর এক কবিতায় মরুভূমিতে খ্রিষ্টান সন্ন্যাস মঠের উল্লেখ করেছেন নিম্নরূপ : "বন্ধু, বিদ্যুৎ অবলোকন কর, অভিষিক্ত স্তম্ভের উপর দু'হাত উজ্জ্বল হওয়ার ন্যায় এটা প্রজ্জ্বলিত হয় ও চলে যায়।"

www.pathagar.com

"এর অগ্নিচ্ছটা কি প্রজ্বলিত হচ্ছিলো? অথবা এটা কি ছিল সন্ন্যাসীর প্রদীপ যিনি শলিতায় তৈল ঢেলে দিচ্ছিলেন?

ক. পশমি পোশাক যা প্রাথমিক সুফিগণ পরিধান করতেন এবং যা থেকে 'সুফি' নামের উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন, তা নিশ্চিতরূপেই খ্রিষ্টান প্রভাব। প্রাথমিক মুসলিম মরমিবাদীগণ নিজেদেরকে পশমি পোশাকে আচ্ছাদন করার এই অনুশীলন সম্ভবত খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের থেকে নেয়া। 'কারখাবাদ সাবাখী (১৬৮/৭৮৪) নিজেকে পশমি পোশাকে আচ্ছাদন করে রাখতেন। হিমাদ ইবনে সালাম তাঁকে এইভাবে ভর্ৎসনা করেছেন : 'খ্রিষ্টান এই প্রতীক খুলে ফেল।'

খ. কিছুসংখ্যক প্রাচীন তাযকিরাস (চরিতকথার সংকলন)-এ চারণরত মুসলিম তাপসবৃন্দকে উপদেশ-নির্দেশ দেয়ার জন্য প্রায়শ খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীগণকে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। মহান সুফি চরিত কাহিনীগুলোতে যিশুর বহু উপদেশও বাণী উল্লেখিত হয়েছে।

গ. নীরবতার ব্রত[২০] এবং যিকর-এর অভ্যাসও সুফিবাদে প্রবেশ করেছিল। প্রাথমিক মুসলিম সুফিগণের মধ্যে মরমি ও বৈরাগ্যের প্রবণতা অনেকাংশে খ্রিষ্টান ভাবের মেজাজ থেকে উদ্ভূত। ঐশীপ্রেমের মতবাদ যা সুফিবাদের প্রাথমিক স্তরে আবির্ভাব ঘটেছিল তা সন্দেহতীতভাবে, খ্রিষ্টান প্রভাব দ্বারা সুদৃঢ়ীভূত হয়েছিল।

ঘ. তাওয়াক্কুল মতবাদ, অর্থাৎ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আত্মবিনাশন ও বাস্তব জগৎ থেকে দূরে সরে থাকার প্রবণতা বিষয়টিও খ্রিষ্টান ভাবধারার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

খ্রিষ্টান প্রভাবে প্রাথমিক মুসলিম বৈরাগ্যবাদী সুফিগণের অতি আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক এই কারণে যে, তাঁরা খ্রিষ্টান ধর্মকে ইসলামেরই সহ-ধর্ম বলে মনে করত। নবি (স:) নিজেও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, তিনি মানবজাতির জন্য নতুন কোনো প্রত্যাদেশ আনয়ন করেন নি। তাঁর প্রত্যাদেশ ঈসা, মুসা ও অন্যান্য নবিদের[২১] প্রত্যাদেশেরই অব্যাহত ধারা। মূলত খ্রিষ্টান ধর্মের ভাব বা আদর্শ নয় বরং খ্রিষ্টান সন্ন্যাসবাদের বাস্তব জীবনই প্রাথমিক মুসলিম তাপসবৃন্দকে বিমোহিত করে। তবে সর্বদাই তাঁদের এই সূক্ষ্ম উপলব্ধি ছিল যে, খ্রিষ্টান সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণরূপে জগৎ বর্জন বিষয়টি যদিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তথাপি এটা ইসলামি ভাব ও আদর্শের পরিপন্থী, রাসূল (স:)-এর ব্যবহারিক জীবনেরও পরিপন্থী।[২২]

২. নব্য প্লেটোবাদ : নব্য প্লেটোবাদীদের ভাব, এমন কি ভাষাও প্রাচ্য খ্রিষ্টান গূঢ়বাদ অনেক পূর্বে গ্রহণ করেছিল। খ্রিষ্টান ধর্ম নব্য প্লেটোবাদ সম্পৃক্ত হয়ে ইসলামি মরমিবাদে রহস্যবাদী ভাব ও মেজাজ আনয়ন করে। মুসলিম দর্শন যেমন নব্য প্লেটোবাদের করায়ত্ত হয়, অনুরূপে, নির্গমন মতবাদ প্রজ্বলনের ভাষা, ভাবোচ্ছাস এবং আধ্যাত্মিক রহস্যাত্মক গুণ সুফি সাধকগণের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আরবগণ অ্যারিস্টোটল সম্বন্ধে তাদের প্রাথমিক জ্ঞান এইসব নব্য প্লেটোনিক ব্যাখ্যাকারদের মাধ্যমেই লাভ করেছিল। পরফিরি এবং প্লটিনাসের পদ্ধতির দ্বারাই আরব দার্শনিকগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অতি আগ্রহ সহকারে পঠিত

www.pathagar.com

অ্যারিস্টোটলের ধর্মতত্ত্ব যার আরবি ভাষ্য নবম শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল, তা প্রকৃত-পক্ষে, প্লটিনাসের 'দি ইনিয়াডের' শেষ তিন খণ্ডের ভাষান্তর। সন্দেহ নেই যে, মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট প্লটিনাস ও পরফিরি সুপরিচিত ছিলেন। নাদিম (৩৮৫/৯৯৫) রচিত বিশ্বকোষ 'আলফিখরিস্ট'-এ প্লাটিনাসের নাম প্রকাশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। শাহরিস্তিনী (৪৬৯-৫৪৮, ১০৭৬-১১৫০) তাঁর গ্রন্থ 'কিতাব-আল-মিওয়াল-নেহাল'-এ কয়েকবার প্লটিনাসের নাম উল্লেখ করে তাঁকে শেখ ইউনানি, অর্থাৎ গ্রিক শিক্ষক বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরফিরিও মুসলিমদের নিকট অতি ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সাত বা আটটি রচনা 'ফিখরিস্ট'-এ স্থান পেয়েছে।

নব্য প্লেটোবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে সংযোগ সাধারণ হলেও কতিপয় নিরুত্তর প্রশ্ন রয়েছে :[২৩]

ক. তাদের দর্শনের কোন কোন উপাদান নব্য প্লেটোবাদীগণ মৌলিকভাবে প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করে, পারস্য থেকে কি ধার করেছিলেন? এসব দেশে প্লটিনাস বাহ্যত দর্শন শিক্ষার পদ্ধতি জানার জন্য পরিভ্রমণ করেছিলেন কি? নব্য প্লেটোনীয় মূল মতবাদ যে পারস্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল আমরা এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারি না।

খ. এটা সত্য যে, সাতজনের একটি নব্য প্লেটোবাদী দার্শনিক দল অত্যাচারী জাস্টিনিয়ান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পারস্যে নওশেরওয়াঁর দরবারে (৫৩২ খ্রি.) আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আশ্রয়ী এই ক্ষুদ্র দলের পক্ষে স্বল্প সময়ে পারস্যে নব্যপ্লেটোবাদ দর্শন প্রতিষ্ঠা করা বা প্রচার করা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল?

এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ক, খ,-এর কারণ না হয়ে বরং খ-ই ক-এর কারণ। অর্থাৎ, উল্টোভাবে বলা যায় যে,[২৪] পারস্য থেকেই নব্য প্লেটোবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। যাই হোক, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আরো গবেষণা দরকার।

৩. **বৌদ্ধবাদ :** ১১ শতাব্দীতে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পূর্বে বৌদ্ধের শিক্ষা পূর্ব পারস্যে ও ট্রান্সক্সিয়ানাতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বলখে বৌদ্ধ সন্ন্যাস-মঠের জাঁকালো অবস্থার কথা আমরা জানি। বলখ ছিল প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ার রাজধানী—বহুসংখ্যক প্রখ্যাত দার্শনিকের জন্মস্থান। গলডিজিয়র একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করেন : 'মুসলিম লোককাহিনীতে সুফি সাধক ইব্রাহিম-বিন-আদহামকে বলখের রাজপুত্র হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। তিনি তাঁর সিংহাসনপরিত্যাগ করে দরবেশরূপে বিচরণ করতে থাকেন।' এটা বুদ্ধেরই গল্প বলে তিনি মনে করেন। মুসলমানগণ জপমালা এবং দম গ্রহণ পদ্ধতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসগণের[২৫] নিকট থেকে লাভ করেছিলেন বলে নিকলসন মনে করেন। উপরন্তু, মরমি তরিকায় মোকাম পদ্ধতি নির্বাণ আকারে ফানা মতবাদটিও বৌদ্ধিয় উৎপত্তি। নৈতিক আত্ম-সংস্কৃতি, মরমি নিয়ন্ত্রণ ও মানসিক অমূর্তকরণের দিক থেকে সুফিবাদের সাথে বৌদ্ধবাদের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু দুই পদ্ধতির মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ কোনক্রমেই মূল পার্থক্যকে বিদূরিত করতে পারে না। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজেকে নীতিবান করে গড়ে তুলেন অপরপক্ষে আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞান ও আল্লাহ্‌কে ভালবাসার মাধ্যমেই একজন সুফি নৈতিক হয়ে উঠেন। অধিকন্তু, নির্বাণ ও ফানার শনাক্তকরণ

www.pathagar.com

ভুল। উভয়পদই ব্যক্তিত্ব বিলীন হওয়াকে অর্থ করে; কিন্তু, যেখানে নির্বাণ প্রকৃতই নঞর্থক, সেখানে ফানা 'বাকা' এর সহগামী—অর্থাৎ আল্লাহ্র সঙ্গে চিরন্তন জীবন লাভের প্রত্যাশা থাকা। আসলে, ঐশী সত্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাব বিনিময়ে[২৬] ফানা ও বাকা-এর নীতি, অর্থাৎ আত্মা-নিষেধক ও আত্মা-হ্যাঁ-বোধক হচ্ছে একই সুফি অভিজ্ঞতার দু'দিক।[২৭] বৌদ্ধবাদের উপর হতে অনেক কিছুই আরোপিত হয়ে থাকতে পারে, যা সুনির্দিষ্টভাবে বৌদ্ধিক নয়, প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তিতে তা হচ্ছে বেদান্তিক বা ভারতীয় অর্থাৎ উল্লেখিত ফানা মতবাদটি বৈদান্তিক বা ভারতীয়দের নিকট থেকে প্রাপ্ত।[২৮]

ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানগণ অংশ নেয়ার সক্রিয় উৎসাহ আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় ধর্ম মুসলিম দেশসমূহে প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে দেখানো যায় না। ভারতীয় চিন্তা, সংস্কৃত ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠে প্রথম ব্যক্তিত্ব হচ্ছে আল-বিরুনী। কিন্তু সুফি পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিকশিত করার অনেক পরের ঘটনা হচ্ছে এসব বিষয়। সাধারণ মুসলিমের কথা ধরলে তিনি হিন্দু ভাবধারা গ্রহণের পরিবর্তে হিন্দু মূর্তিপূজককে ঘৃণাই করবেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধীয় গূঢ়বাদ আত্মার দেহান্তর ও পুনর্জন্ম ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ, এসব ধারণা ইসলামে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।[২৯]

৪. আর্যীয় প্রতিক্রিয়া মতবাদ : এই মতবাদ সুফিবাদকে মূলত পারস্যদেশীয় উৎপাদন বলে মনে করে। 'কিন্তু মহীউদ্দীন-আল-দীন-আল-আরবি এবং ইবনে-আল-ফরিদ-এর ন্যায় প্রখ্যাত এবং প্রভাবশালী সুফি সাধকগণ আরবি ভাষাভাষীর লোক ছিলেন যাদের শিরায় একবিন্দুও পারসীয় রক্ত ছিল না—এই বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।' সমগ্র মতবাদটি সন্দেহজনক জাতিগত প্রকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বহিঃপ্রভাবসমূহ, খুব বেশি হলে, ইসলামের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে শুধু জাগিয়ে তুলতে পারে মাত্র। বহিঃধর্ম ও দর্শন থেকে যদি ইসলমকে আবদ্ধ করে রাখা যায়, তবুও দেখা যাবে যে, ইসলাম ধর্ম থেকেই এক ধরনের মরমিবাদ উদ্ভব হয়েছে। এর কারণ, মরমিবাদের বীজ ইসলামের মধ্যেই অন্তর্নিহিত।[৩০] একটা একক কারণের অনুসন্ধানের বৃথা চেষ্টা না করে আমাদের উচিত হবে বিভিন্ন প্রভাবসমূহের আলোচনা করা। এই প্রভাবসমূহই মরমি মতবাদ বিকাশের পরিবেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক পরিবেশ সুফিবাদ ক্রমবিকাশের অনুকূল ছিল।[৩১]

সুফি আদর্শিক জীবনের অস্তিত্বকালের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সময়টা ছিল কম-বেশি রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। অষ্টম শতাব্দীর শেষে রাজনৈতিক বিপ্লব উমাইয়াদের বিতাড়ন করা ছাড়াও অন্যান্য আন্দোলন যথা : ইসলামীয়, বাতেনীয় ও কারামাতীয় আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসবই সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে 'ধর্মীয় ভাবধারার আবরণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গোপন রাখে।'

www.pathagar.com

নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা লক্ষ্য করি যে, মামুন ও তাঁর ভ্রাতা আমিন রাজ ক্ষমতার জন্য ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত। মামুনের রাজত্বকালে অপর একটি বড় ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিকভাবে ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় 'শুহুদিয়া' দ্বন্দ্ব-এর উদ্ভব ঘটে। স্বাধীন পার্সীয় পরিবার : তাহিরিদ, সাফারিদ, সামানিদ ও অন্যদের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠার সাথেই এই 'শুহুদিয়া' 'দ্বন্দ্বের' বিকাশ ঘটে। 'তাই এসব সংমিশ্রিত শক্তিসমূহএবং অনুরূপ প্রকৃতির অন্য অবস্থাসমূহ ধর্মীয় স্বভাববিশিষ্ট মানুষকে গভীর অনুধ্যানপরায়ণ[৩২] শান্ত জীবনের পানে টেনে নিয়ে আসে।

কোনো কোনো মুতাযিলা তাদের পদ্ধতিতে সংশয়বাদী ভাবধারা প্রদর্শন করে। বাসার-বিন-বাদি এবং আবু-আল-আলা-আল-মা'রী-এর কবিতাসমূহ এসব ভাবধারা প্রাথমিকভাবে প্রকাশ পায়। যরুস্ত্রীয় ভাবাপন্ন বাসার ছিলেন সংশয়বাদী। তিনি অগ্নিকে দেবতুল্য মনে করেন এবং অপারসীয় সকল প্রকার ভাবধারা বর্জন করেন। বুদ্ধিবাদে সুপ্ত সংশয়বাদের বীজ পরিণামে জ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ে বুদ্ধির অতিরিক্ত কিছুর নিকট আবেদন জানানোর প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে। আল-কুশাইরী[৩৩] ও আলহুজিরির ন্যায় প্রখ্যাত সুফি সাধকগণের রচনায় এইসব ভাবধারা প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কান্টের 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির বিচার'-এ নঞর্থক ফলাফল জেকোবি এবং স্লিমেকারকে নিগূঢ় অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাসের ভিত্ গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকটা একই কারণে ওয়ার্ডসওয়ার্থও মনের সেই রহস্যাত্মক অবস্থার প্রফুল্ল আবিষ্কারে পরিচালিত হয়েছিলেন যার মধ্যে 'আমরা সকল আত্মার উৎপাদন ঘটাই এবং বস্তুর জীবন লক্ষ্য করি।'[৩৪]

আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা, বিশেষ করে, আ'শারীয় ও মুতাযিলাদের মধ্যকার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বিরোধ ধর্মকে সংকীর্ণ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে। ফলে, ধর্মীয় কোন্দল ও যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মরমিবাদের আধ্যাত্মিক আশ্রয়ে আসার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।

আব্বাসীয় যুগের প্রথমদিকে বুদ্ধিবাদীর ভাবধারা দ্বারা ধর্মীয় উৎসাহ ক্রমে নমনীয় হয়ে আসে এবং মুসলিম সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধি নৈতিক শৈথিল্য ও ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্যভাব আনয়ন করে। ইসলামে সুফিবাদ বিকাশে এইসব হচ্ছে পূর্বতন কারণসমূহ।

এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পবিত্র কোরআন ও হাদিসে সুফি মতবাদের ভাবধারা যে অন্তর্নিহিত, তা অতি সহজেই প্রদর্শন করা যেতে পারে। যাই হোক, নবি (স:) হযরত আলী অথবা হযরত আবুবকরের নিকট রহস্যমূলক মতবাদ পরিবাহিত করেছিলেন— এমন বলা হয়তো অতিশয়োক্তি হবে। কারণ, এর সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য ঐতিহাসিক বা অন্য কোনো প্রমাণ নেই।[৩৫]

সুফি মতবাদ এবং জীবনদর্শন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের[৩৬] কিছু আয়াত এবং নবি (স:)-এর কিছু বাণী নিম্নে উল্লেখ করা গেল:

১. "... অতএব তোমরা (নামায) যে দিকে মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহর দিক রয়েছে। ..." (সুরা-২, আয়াত-১১৫)

www.pathagar.com

২. "তিনি ভিন্ন কেউই উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নয়। (কেননা, একমাত্র) তাঁর সত্তা ব্যতীত আর সব বস্তুই ধ্বংসশীল।" (সুরা-২৮, আয়াত-৮৮)

৩. "তিনিই (সকল সৃষ্টির) পূর্বে রয়েছেন এবং তিনিই (সকল সৃষ্টি) বিলীন হওয়ার পরও থাকবেন এবং তিনিই (প্রমাণে) প্রকাশ্য এবং (দুর্বোধ্যতায়) গুপ্ত।" (সুরা-৫৭, আয়াত-৩)

৪. "আর আমি মানুষের এত নিকটবর্তী যে, তার ঘাড়ের রগের চেয়েও অধিক নিকট।" (সুরা-৫০, আয়াত-১৬)

এইসব আয়াতের মধ্যে যে মরমিবাদের বীজ অন্তর্নিহিত, তা সুনিশ্চিতভাবেই বলা চলে। নিম্নের আয়াতগুলো থেকেও বিজ্ঞানীদের প্রকৃতিবাদী সর্বেশ্বরবাদের[৩৭] সমর্থন পাওয়া যেতে পারে :

১. "তবে কি তারা (কিয়ামত অবিশ্বাসকারীরা) উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে একে সৃষ্টি করা হয়েছে (কেমন বিচিত্র এর আকৃতি)?" (সুরা-৮৮, আয়াত-১৭)

২. "(আল্লাহ্‌তা'লার অসীম ক্ষমতার আরও প্রমাণ লাভের জন্য) তারা কি পক্ষীকুলকে লক্ষ্য করে নি যে, এরা (আল্লাহ্‌পাকেরই ক্ষমতার) বশীভূত রয়েছে— আসমানের (নিচে) শূন্যমণ্ডলে?" (সুরা-১৬, আয়াত-৭৯)

৩. অতঃপর চোষণ করে বেড়াও সর্বপ্রকার (ফুল) ও ফলাদি হতে (তোমার পছন্দমত) অতঃপর (মৌচাকে ফেরার জন্য) স্বীয় রাব্বের পথে চল যা (চলার বা স্মরণ রাখার পক্ষে) সহজ; অতঃপর (মৌচাকে পৌঁছলে) বের হয় এর উদর হতে একপ্রকার পানীয় বস্তু (মধু) যার রং বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, এতে মানুষের (বহুবিধ রোগরে) জন্য আরোগ্য রয়েছে; নিঃসন্দেহে এতেও (আল্লাহ্‌র একত্ব ও অনুগ্রহশীলতার) বড় প্রমাণ রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।" (সুরা-১৬, আয়াত-৬৯)।

এই ধরনের আরো বহু আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব আয়াত প্রকৃতিকে অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, প্রকৃতির ঘটনাবলি সুনিশ্চিতরূপেই আল্লাহ্‌র নিদর্শন। প্রকৃতির নিয়ম আল্লাহ্‌রই বিধান। এই ব্যাপারে কোরআনের শিক্ষা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মরমি কাব্যিক ভাবধারা অন্য একটি বর্ণনায় অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে :

তুমি কি লক্ষ্য কর নি কিভাবে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে আসমান এবং জমিন-মধ্যস্থিত সবকিছুই এবং পাখিগুলো যারা পাখা বিস্তার করে (ইতস্তত উড্ডয়ন), প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রার্থনা ও নিজ নিজ তস্‌বিহ্ সম্বন্ধে অবহিত। আর আল্লাহ্ পূর্ণজ্ঞান রাখেন তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে। "আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই নিকট সবাইকে ফিরে যেতে হবে।" (সুরা-২৪, আয়ত-৪১, ৪২)।

মরমি জীবনের ভাবধারা নিম্নে পবিত্র কোরআনে অতি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে :

তাঁর (হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক এমন ঘরে গিয়ে এবাদত করে) যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদেশ করেন যে, এদের সম্মান করা হউক এবং এতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হউক। এতে এমন লোকগণ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে সকাল-সন্ধ্যায়। তাঁদেরকে ভুলাতে পারে না ক্রয়-বিক্রয়সমূহও আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে ... (সুরা-২৪, আয়াত-৩৬, ৩৭)

www.pathagar.com

মুসলিম তাপসগণ পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ ও বিচরণ করে বেড়ান। কারণ, পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

আপনি বলে দিন, "তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টজগতকে; পরে আল্লাহ্ শেষবারেও সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান। ..." (সুরা-২৯, আয়াত-২০)।

বেহেশতে আশীর্বাদপুষ্ট তাপসগণের সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে : তিনি তাঁদের ভালবাসেন, তাঁরাও তাঁকে ভালবাসেন। (সুরা-৫, আয়াত-৫৪) এর মধ্যে সুফি প্রেমের মতবাদ অন্তর্নিহিত। মহান সুফি সাধ্বী রাবেয়া বসরি[৩৮] এর প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত।

বদর যুদ্ধের বিজয় সম্বন্ধে কোরআনের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি :

"অতএব, তোমরা তাদেরকে (কাফেরদের) হত্যা কর নি, আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন, আর (হে রাসুল) আপনি (তাদের প্রতি ধূলিমুষ্টি) নিক্ষেপ করেন নি বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন। ..." (সুরা-৮, আয়াত-১৭)

এই আয়াত হতে দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুসংখ্যক সর্বেশ্বরবাদী সুফি সাধক[৩৯] নিয়তিবাদকে সমর্থন করার সুযোগ লাভ করেন। নিম্নে উল্লেখিত আয়াতকে ভিত্তি করে ইশরাকি তাসাউফ অর্থাৎ 'অত্যুজ্জ্বল সুফিবাদ'[৪০] নামে একটি সুফি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। সিহাব-আল-দীন-আল-সহরাওয়ার্দি মাকতুল এর প্রতিষ্ঠাতা। 'আল্লাহ্ হচ্ছেন স্বর্গ-মর্ত্যের আলো। তার আলো কুলুংগির ন্যায় যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ—প্রদীপটি স্বচ্ছ কাঁচে আবদ্ধ, স্বচ্ছ কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ।' (সুরা-২৪, আয়াত-৩৫)

নবি (স:) বলেছেন বলে কথিত হয় : আল্লাহ্ বলেন, "প্রয়োজনাধিক কার্যের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নিকট আসা অব্যাহত রাখে যে পর্যন্ত না আমি তাকে ভালবাসি। এবং যখন আমি তাকে ভালবাসি আমি তার কান হয় যাই যদ্বারা সে শুনতে পায়, চক্ষু হয়ে যাই যদ্বারা সে দেখে, হাত হয়ে যাই যার ফলে আমার দ্বারা সে গ্রহণ করে।"

এ-ই হচ্ছে একক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে মানুষের অভিন্নতার সুফি মতবাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

নবি (স:) আল্লাহ্ বলেছেন বলে উল্লেখ করেন : আসমান-জমিন আমাকে ধারণ করে না, আমার বিশ্বস্ত বান্দার অন্তঃকরণই আমাকে ধারণ করে। পুনরায় নবি (স:) এর মতে, আল্লাহ্ বলেন :

'আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম এবং আমি প্রকাশিত হবার ইচ্ছা পোষণ করলাম, তাই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করলাম যাতে আমি নিজেকে পরিজ্ঞাত হতে পারি।'

এসব উক্তি থেকে সুফিগণ এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে, ইনসান-ই-কামিল[৪১] বা আদর্শ মানব হচ্ছে আল্লাহ্র গুণাবলির দর্পণ।

নবি (স:) তার কোনো এক অনুসারীকে বলেছিলেন বলে কথিত হয় :

'নিজ অন্তঃকরণকে জিজ্ঞেস কর, অন্তরের অভ্যন্তরীণ জ্ঞানই বলে দেবে আল্লাহ্র গুপ্ত বিধানসমূহ। এ-ই হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাস ও ঐশীত্ব।'

অধিকন্তুঃ 'যে নিজেকে জানে, সে তার প্রভুকে জানে।'

www.pathagar.com

নবি (স:)-এর এসব উক্তি মানুষের অন্তঃস্থিত প্রকৃতি ও ঐশী প্রকৃতির মধ্যে গভীর সম্বন্ধকে নির্দেশ করে। অধিকন্তু, তারা এমন এক প্রকারের জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করে যা হৃদয়ের গভীর থেকে আসে এবং এই জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও যুক্তি থেকে আগত জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মরমিবাদীগণ মনে করেন যে, অতি প্রাকৃতিক জ্ঞানসম্পন্ন মহান সুফি সাধক সম্বন্ধে নবি (স:) সাধারণ মানুষকে সতর্ক[৪২] করে দিয়েছেন কারণ, সুফি সাধকগণ আল্লাহ্‌র জ্যোতির দ্বারা আলোকিত, আল্লাহ্‌র জ্যোতির দ্বারা দর্শন করেন। মানুষের অতীত বা তার হৃদয়ের গভীর ও গোপন রহস্য অথবা প্রাকৃতিক মাধ্যম ব্যতীত দূর থেকে অন্যব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন বা ঘটনা ঘটার পূর্বে ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব।

আল্লাহ্‌র প্রেম ও জ্ঞানে নিমগ্ন সুফি সাধকগণ অলৌকিক শক্তিও অর্জন করতে পারেন, কারণ নবি (স:) বলেন : 'আল্লাহ্‌কে যেভাবে জানা উচিত, তুমি যদি তাঁকে সেভাবে জানতে পার তবে সাগরে হাঁটা এবং নির্দেশে পর্বত সঞ্চালন করাও তোমার পক্ষে সম্ভব।'

ঙ. সুফিপথ-পরিক্রমা

সুফি জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ প্রেম, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ। এর মূল লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সুফি সাধককে অনেক ত্যাগ, অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তাঁকে অতিক্রম করতে হয় এক দীর্ঘ পথ। অত্যন্ত সতর্কতায়, অতি সন্তর্পণে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাধ্যমে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। দীর্ঘ যাত্রাপথে তাঁকে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তর অতিক্রম করতে হবে।' যথা : (১) শরিয়ত (২)তরিকত (৩) মা'রেফাত (৪) হকিকত।

এসব আধ্যাত্মিক মনজিল অতিক্রমের মাধ্যমে একজন সুফিসাধক তাঁর আত্মার ক্রমউন্নতি ও বিশুদ্ধতা অর্জন করেন এবং চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হন।

১. **শরিয়ত** : শরিয়ত হচ্ছে সুফির যাত্রাপথের প্রাথমিক সূচনাপর্ব। শরিয়ত হচ্ছে ইসলামি জীবন-বিধান। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের ৪৫:১৮ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে : "অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের শরিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলাম। অতএব, তুমি উহা অনুসরণ কর এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের খেয়ালখুশী অনুসরণ করিও না।" এখানে শরিয়তের বিধি-বিধানকে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত, শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে মানুষের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি ঘটে। শরিয়তকে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সোপান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। উন্নততর ধর্মীয় জীবনযাত্রার জন্য একে একটি অপরিহার্য ভিত্তিরূপে মনে করা হয়। মানুষের মধ্যে রয়েছে দু'টো বৃত্তি—জীব বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। জীববৃত্তিকে সংযত করে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বিস্তার করাই মানুষের কাম্য। শরিয়ত বাস্তবে এই কার্যটিই সাধন করে। শরিয়তের বিধি : ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত পালনের মধ্য দিয়াই সুফিসাধক তাঁর জীববৃত্তিকে দমন করে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। আসলে, আত্মার বিকাশ গঠনে শরিয়ত হচ্ছে প্রাথমিক বা প্রস্তুতিপর্ব মাত্র।

www.pathagar.com

২, তরিকত : শরিয়তের বিধানাবলী যখন পরিপূর্ণভাবে পালন এবং যথাযথভাবে এর অনুশীলন করা হয়, তখন সুফিসাধকের নিকট আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্য একটি ধাপ উন্মোচিত হয়। এ ধাপটি হচ্ছে তরিকত। তরিকত শরিয়তের চেয়ে উন্নত ও উচ্চতর একটি স্তর। এ স্তরে সুফি মুর্শিদের আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। সুফি মুর্শিদ বা পিরের অধীনে এসে মুরিদী (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন। এখানে পির-মুরিদের একটা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুরিদকে বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা দ্বিধায় পিরের আদেশ-নিষেধ মেনে নিতে হয়। মুরিদ যদি তা পালনে সমর্থ হন, তবে তিনি ফানায়ে শেখ অর্থাৎ শেখের মধ্যে আত্মবিলোপ সাধন করেন। মুর্শিদের সন্তুষ্টি বিধানে মুরিদ যদি তরিকতের যাবতীয় বিধান যথাযথভাবে পালন করতে পারেন, তখন তাঁকে সুফি পোশাক প্রদান করা হয়।

৩. মা'রেফাত : তরিকতের পরবর্তী উচ্চতর স্তর হচ্ছে মা'রেফাত। মা'রেফাত আধ্যাত্মিক জ্যোতির স্তর। এ স্তরে সুফিসাধকের 'কলব' বা অন্তর আধ্যাত্মিক জ্যোতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তিনি বস্তুর নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। সৃষ্টিরহস্যের কালো পর্দা তাঁর নিকট হতে অপসৃত হয়। অপার জ্যোতির আলোকে তাঁর হৃদয় হয় প্রদীপ্ত। এখানে সাধক আল্লাহ্‌তে নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যান ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁর সমস্ত সত্তায় জেগে ওঠে : "আমার ধ্যান-উপাসনা, জীবন-মরণ সমস্তই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গীকৃত।" (সুরা-৬, আয়াত-১৬২)।

৪. হকিকত : মা'রেফাতের পরবর্তী উচ্চতর স্তর হচ্ছে হকিকত। এ স্তরে সুফি সত্য উপলব্ধি করেন। আল্লাহ্‌র অপার করুণার উপরইএ উপলব্ধি নির্ভর করে। আল্লাহ্‌র অসীম রহমত ব্যতীত কেউ তাঁর জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও অবহিত হতে পারে না। সুফিদের বিশ্বাস যে,শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি পালনের মাধ্যমেই সত্য উপলব্ধি হয় না—হৃদয়—অন্তর শুদ্ধিকরণের মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব। প্রেম, ভক্তি, সংযম ও সততার মাধ্যমেই তা সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুফিদের মতে আল্লাহ্ হচ্ছেন পরম সত্তা—বাকি সব তাঁর শক্তির প্রকাশ মাত্র। আল্লাহ্‌র সাথে মিলনই হচ্ছে সুফি জীবনের পরম কাম্য। আল্লাহ্‌র ধ্যান ও প্রেমে সুফিসাধক নিজেকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেন যে তিনি নিজ সম্বন্ধে সবকিছু বিস্মৃতি হয়ে যান। এ স্তরের নাম ফানা-ফি-আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মধ্যে আত্ম-বিলোপ। হকিকত স্তরে সুফির নিজের কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না, থাকে না কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই তাঁর ইচ্ছা সমর্পিত হয়। এরূপ বিশুদ্ধ ও পরিতৃপ্ত আত্মার প্রতিই আল্লাহ্‌র নির্দেশ : 'হে পরিতুষ্ট আত্মা, সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও ও বেহেশতে প্রবেশ কর।" (সুরা-৮৯, আয়াত-২৭-৩০)

চ. সুফিবাদের মূলনীতিসমূহ

সুফিবাদরে মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ। সুফিগণ বলন, অধ্যাত্মবিদ্যার প্রগতিশীল প্রকৃতি সাধকের আল্লাহ্ প্রাপ্তির সফরকে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং এ

www.pathagar.com

যাত্রাপথকে কয়েক মনযিল ও স্তরে বিভক্ত করে। সাধনার দ্বারা কতিপয় গুণ অর্জন করতে হয়—আবার আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহও তাঁর নিকট হতে লাভ করতে হয়। এ অর্জনযোগ্য গুণাবলি ও লভ্য অনুগ্রহরাজির তালিকায় বিভিন্ন লেখকের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, সব তালিকাতেই তওবা, সবর, তাওয়াক্কুল প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে চূড়ান্ত লক্ষ্যের পরিচয় প্রদান করাই হচ্ছে সুফিদের প্রধান উদ্দেশ্য। পার্থিব প্রলোভন এবং ইন্দ্রিয়াশক্তি হতে মুক্তিলাভ করে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের (ইনসানে কামেল) সাধনায় নিমগ্ন থাকতে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো সাহায্য করে থাকে।

১. তওবা (অনুতাপ, অনুশোচনা) : মূলত তওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন, (সুরা-২, আয়াত-৫৪-এ লেখা হয়েছে : তোমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও।) (২ : ২৭-এ লেখা হয়েছে; তখন আল্লাহ্‌ তাঁর (হযরত আদম আ.) প্রতি ক্ষমপরবশ হয়ে প্রত্যাবর্তিত হলেন, অর্থাৎ, মার্জনা করলেন।) কারণ, তিনি তাওয়াব-আর-রাহিম অর্থাৎ অত্যন্ত মার্জনাশীল—করুণাময়।

তওবার কার্যকারিতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

১. অন্তরে পাপের পূর্ণ প্রতীতী, (২) অনুতাপ বা জ্বালার অনুভূতি, (৩) ভবিষ্যৎ পাপকার্য হতে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প। এ তিন শর্ত পূর্ণ হলে আল্লাহ্‌ তওবা কবুল করেন—অবশ্য আল্লাহ্‌ তা' করতে বাধ্য নন।

সুফি মতানুসারে তওবার পরিভাষাগত তাৎপর্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ। যাঁরা সুফি পথ অনুসরণ করতে চান তাঁদের জন্য তওবা হচ্ছে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ এবং ঐশী অনুগ্রহের একটি প্রতীক নিদর্শন। গভীর তাত্ত্বিক তওবা পাপের স্বীকৃতি এবং পাপকার্য বর্জন ও তওবাকারীর সমগ্র সত্তাকে আল্লাহ্‌র দিকে উন্মুখ করাকে অর্থ করে। কারণ, একমাত্র এই অবস্থাতেই অনুতপ্ত তওবাকারীর পক্ষে আল্লাহ্‌র দিকে একাগ্রভাবে নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন সম্ভব।

২. তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা) : সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে থাকার নাম তাওয়াক্কুল। ইসলামি তৌহিদি ধারণা থেকে তাওয়াক্কুল আগত। আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান। তাঁর উপরই পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। সুফিদের বিশ্বাস, উচ্চতম স্তর থেকে মানুষের আগমন, সে তাঁর আদি মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গের সেই মাত্রা পুনঃ অর্জন করতে হলে তাঁকে আত্মার নিম্ন ও হীনতর বৃত্তির সাথে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। আত্মা দু'বিরোধ-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্রে—নিম্নতর বৃত্তি ও উচ্চতর প্রজ্ঞা। তাই দেখা যায় যে, মানুষের অর্ধেক পশুর চেয়েও হীন, অন্য অর্ধেক ফেরেশতাদের চেয়েও উন্নত। আল্লাহ্‌র মিলন লাভে প্রবৃত্তিসমূহ বিরাট বাধাস্বরূপ। তাই তাদেরকে দমন ও পরাভূত করতে হবে। এসব প্রবৃত্তিসমূহকে আয়ত্তে আনতে হলে নিজ আত্মাকে বিস্মৃত হয়ে আল্লাহ্‌র মধ্যে অবস্থান করতে হবে। এ স্তরই হচ্ছে তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা। এ পর্যায়ে এসে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ধ্যান ব্যতীত অন্যকিছুই করেন না—এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনও মেটাতে চান না। তাঁরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দয়া ও তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেন। পরবর্তী সুফিগণ

www.pathagar.com

অবশ্য এ মত সংশোধন করেন এবং বলেন যে, তাওয়াক্কুল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত বাসনা নিয়ে বেঁচে থাকার ধারণা সংগতিপূর্ণ। সুফিকে শুধু পরিত্যাগ করতে হবে অধিক সুখ ও বিলাসিতা। আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থেকেও আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ গঠন সুফিদের লক্ষ্য।

৩. পরিবর্জন (পরিহার, পরিত্যাগ) : পরিত্রাণ লাভের জন্য সুফি সাধকের ন্যূনতম পার্থিব বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয়। অভাব বা দারিদ্র্য সম্বন্ধে সুফিদের ধারণা : প্রকৃত সম্পদের অভাবের চেয়ে সম্পদ অভাবের ইচ্ছার অনুপস্থিতিকে অর্থ করে। শূন্য হৃদয়, শূন্য হাত এ হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। সত্যিকার দরিদ্র লোকের একটাই ইচ্ছে : সে ইচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রেম ও ধ্যান। আল্লাহ্‌র প্রেম ও ধ্যান নিমগ্ন সুফিসাধক পার্থিব জগতের সুখভোগ ও বিলাসিতা বর্জন করেন। এ পরিবর্জন দ্বিবিধ : (১) বাহ্যিক ও (২) আন্তরিক। বাহ্যিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সুফিগণ তাঁদের দৈহিক প্রয়োজন হ্রাস করেন, অপরের অনিষ্ট বা ক্ষতি করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। আন্তর পরিবর্জনের মাধ্যমে সুফিগণ ইন্দ্রিয়াবেদন হতে আত্মাকে বিমুক্ত করেন। কেবল আল্লাহ্‌র ধ্যান ও প্রেমে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

৪. সবর (ধৈর্য) : সবর বলতে প্রসন্ন বদনে দুঃখ-যন্ত্রণা বরণ করা, অবৈধ কার্যাবলী হতে বিরত থাকা অদৃষ্টের আঘাত নীরবে সহ্য করা, দারিদ্র্যের মধ্যে মানসিক শক্তি সংরক্ষণ করা, নীরবে নির্দ্বিধায় বিপদ গ্রহণ করে নেয়া, আল্লাহ্ প্রতি আস্থার দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত বিপদ হাসিমুখে পরম স্থৈর্যের সাথে পরিগ্রহণ করাকে অর্থ করে।

সবর দু'প্রকার : (১) দৈহিক (যেমন, শারীরিক পীড়া সহ্য করা; তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ—যেমন, আঘাত সহ্য করা ইত্যাদি)। এ শ্রেণীর ধৈর্য খুবই প্রশংসনীয়। (২) আত্মিক : এটা প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করে। সবরের ব্যাপক তাৎপর্যের আলোকে আমরা নিম্নোক্ত হাদিসটি অনুধাবন করতে পারি : "ঈমান হলো সবরের নাম।" এ শ্রেণীর সবর উত্তম এবং প্রশংসনীয়।

সবরের শক্তির তারতম্য ভেদে মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (১) অতি অল্পসংখ্যক, যাঁদের মধ্যে সবর স্থায়ীগুণ হিসাবে অবস্থিত, তাঁরা সিদ্দিকুন এবং মুকাররাবুন নামে অভিহিত। (২) যাঁদের মধ্যে পাশবিক বৃত্তি অধিক শক্তিশালী। (৩) যাঁদের দু'টো পরস্পরবিরোধী বাসনা অনবরত সংগ্রামরত—এ শ্রেণী মুজাহিদুন নামে পরিচিত। আশা করা যায় আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন।

৫. আনুগত্য (আত্মসমর্পণ) : আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে সুফিসাধককে একজন পির বা মুর্শিদের শরণাপন্ন হতে হয়। পির বা মুর্শিদের আশ্রয় ও নির্দেশ গ্রহণ অপরিহার্য। সুফিসাধক এ অবস্থায় পিরের মুরিদী (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করে থাকেন। পির-মুরিদের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে, মুরিদ পির বা মুর্শিদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেন এবং আনুগত্যে চরম নিষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকেন। বিনা দ্বিধায়, বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি মুর্শিদের আদেশ-নিষেধ পালন করে থাকেন। মুর্শিদের প্রতি এরূপে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুর্শিদ তাঁর মুরিদকে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ও

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সাধনার উচ্চমার্গে উঠে সুফি সাধক নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছায় বিলীন করে দেন। তাঁর অন্তরে জেগে ওঠে : "আমার নামাজ, আমার এবাদত, আমার জীবন-মরণ সবই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্র ইচ্ছায় সমর্পিত।"

৬. এখলাস (পবিত্রতা) : এখলাস শব্দের অর্থ পরিষ্কার, খাঁটি ও নির্মল রাখা, সংমিশ্রণ হতে মুক্ত রাখা। পবিত্র কোরআনে ১১২তম সুরা: আল্লাহ্র একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তার কোনো সমকক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এই অর্থে এটা শিরক বা ইশরাকের বিপরীতার্থক। এখলাস একমাত্র আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা এবং আদর্শ ও ধারণাকে যাবতীয় আনুষঙ্গিক চিন্তা হতে মুক্ত রাখা বুঝায়। এ অর্থে এটা রিয়া বা সামেয়া অর্থাৎ লোকদেখানো বা শোনানোর বাসনার বিপরীতার্থক। এখলাস চায়, যাবতীয় আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কার্যকলাপের নিঃস্বার্থপরতা এবং একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি আসক্তিতে বিঘ্ন উৎপাদক স্বার্থপর উপাদানের বিলোপ সাধন। এর সর্বোচ্চ পর্যায়ে এখলাসের চেতনাটিও অন্তর্নিহিত হতে হবে এবং ইহকাল বা পরকালে আল্লাহ্র পুরস্কারের সর্বপ্রকারের চিন্তা বিসর্জন দিতে হবে।

৭. ইশকে খোদা (আল্লাহ্-প্রেম) : সুফিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আল্লাহ্-ভক্তি ও আল্লাহ্-প্রেম। সুফিদের হৃদয় সর্বক্ষণ আল্লাহ্র চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকে। আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের জন্য তারা সর্বদা থাকেন উন্মুখ। জাগতিক কোনো বিষয়-সম্পদই তাঁদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্-ভক্তি ও আল্লাহ্-প্রেমের উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপের কারণে সুফিবাদকে প্রেম-ধর্ম বা প্রেম-দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়।

আল্লাহ্র সাথে ভক্তের প্রেমের রসঘন উচ্ছ্বাস পৃথিবীর বহু ভাষায় ও সাহিত্যে উচ্চারিত হয়েছে। সুফিদের ইশকের ধারণার দ্বারা বিশ্বের কবি, সাহিত্যিক,বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী-গুণী সবাই প্রভাবিত।

৮. যিকর (স্মরণ) : যিকর যখন মনে মনে হয় (বি-আল-কালব) তখন তার অর্থ স্মরণ করা। যখন জিহ্বা দ্বারা হয় (বি-আল-লিসান) তখন তার অর্থ উল্লেখ করা, বর্ণনা করা। যিকর শব্দটি যখন সুফিদের পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত তখন এর অর্থ হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ও বিশেষ ধরনের নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চস্বরে অথবা মনে মনে ধর্মীয় বাণীসংযোগে বারবার আল্লাহ্তায়ালার মহিমা প্রকাশসূচক শব্দ উচ্চারণ করার নাম যিকর। শব্দগুলো যখন ধ্বনি করে বলা হয় তখন তাকে অপ্রকাশ্য যিকর (যিকরে খাফি) বলা হয়। মনে মনে (বি-আল-কলব) যিকর সম্বন্ধে কোরআন শরিফে উক্ত হয়েছে : "এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালক প্রভুকে মনে মনে বিনয় ও ভয় সহকারে অনুচ্চ বাক্যে স্মরণ কর।" ৭ : ২০৫

"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।" ৩৩ : ৪১।

৯. শোকর (কৃতজ্ঞতা) : সর্বঅবস্থায় মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সুফি সাধনার আরেক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলব্যাপী যা কিছু আছে আল্লাহ্ই হচ্ছেন তার সবকিছুর মালিক। তিনি সর্ব-ক্ষমতাবান। তাঁর ইচ্ছামাফিক সবকিছুই ঘটছে। যা কিছু ঘটছে তা মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গলের জন্যই হচ্ছে সুতরাং সকল

www.pathagar.com

অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুফি তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকেন। তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ্-প্রেমকেও তিনি আল্লাহ্র রহমত বা করুণা বলে মনে করেন।

১০. কাশফ (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) : কাশফ শব্দের সাধারণ অর্থ উন্মোচন, অন্তর্দৃষ্টি। সুফিসাধক ও তাসাওউফ-পন্থীগণ শব্দটিকে আধ্যাত্মিক রহস্য উন্মোচন বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার অর্থে ব্যবহার করেন। সূক্ষ্ম বিচারে একে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) আকল বা যুক্তিলব্ধ জ্ঞান, (খ) ইলম বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, (গ) মুশাহাদা বা প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার (মা'রিফা) মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান। প্রথমটির দ্বারা আল-উলুম ইলম-আল-য়াকিনে পৌঁছা যায় : যুক্তি পর্যায়ভুক্ত কাশফ নয়। দ্বিতীয়টির দ্বারা আল উলুম-আয়ন-আল য়াকিনে পৌঁছা যায় এবং তৃতীয়টির দ্বারা আল-মারিফা-আল-হাক্ক-আল-য়াকিনে পৌঁছা যায়। শেষোক্তটি হচ্ছে সরাসরি আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ দর্শন এবং সময় সময় মুআয়ালা বা চাক্ষুস উপলব্ধি বলে অভিহিত হয়। এই পর্যায়ে সুফিসাধক পরমানন্দে নিজেকে বিস্মৃত হন—তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে তিনি অন্তর্লীন হয়ে থাকেন।

১১.সংগীত বা সামা : কোনো কোনো সুফিসাধক সংগীত অনুরাগী। তাঁদের ধারণা, সংগীতের সুর ও মূর্চ্ছনা অন্তরের সুপ্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে সক্রিয় করে তুলতে পারে এবং মনকে আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন করতে সহায়তা দান করতে পারে। চিশতিয়া তরিকার সুফিরা তাম্বুরা ব্যবহার করে সামা-সংগীত গেয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তুলেন। এই সংগীত তাদেরকে জজবার পর্যায়ে নিয়ে যায়। নিম্নস্তরের সংগীত মনে কলুষতা আনে—তাই এ ধরনের সংগীত নিষিদ্ধ। অন্যান্য তরিকার সুফিরা সংগীতের আবশ্যকতা আছে বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, আল্লাহ্র ধ্যানের জন্য যিকর-ই যথেষ্ট।

১২. ফানা ও বাকা : সুফি সাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ফানা ও বাকা। ফানা ও বাকা—এ দু'টি সুফিবাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পারিভাষিক শব্দ। নিম্নে এদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা গেল :

ফানা : ফানার অর্থ হচ্ছে বিলুপ্তপ্রাপ্তি বা ধ্বংসপ্রাপ্তি। মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছাতে বিলুপ্তকরণের অর্থ হচ্ছে ফানা। সুফিসাধক সমস্ত সৃষ্টবস্তু হতে দৃষ্টি পরিহার করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। আত্মবিলোপের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করে সুফিসাধক অনন্তজীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হন। মরমিবাদ অনুসারে মানবের আমিত্ববোধ যতগুলো মানবীয়গুণ (সিফাত) সমন্বয়ে গঠিত, সেই সিফাতগুলোর বিলোপ সাধন করে সুফি কেবলমাত্র আল্লাহ্র মাধ্যমে এবং আল্লাহ্তে পরম ধন্য হতে পারেন। প্রকৃত সুফি বলতে বুঝায় যার নিজস্ব বলতে কিছু নেই এবং নিজেও কারোর মালিকানা নন। এই হচ্ছে আত্মবিলুপ্তির সারকথা। এইরূপে অনুভূতি যখন চরম পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন তাঁকে ফান-ই-কুল্লী অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মবিলুপ্তি বলে।

www.pathagar.com

ফানা ও নির্বাণ : সুফি দর্শনের ফানা বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ-এর ধারণা থেকে উদ্ভূত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ ধারণা আদৌ সঠিক নয়। সুফি দর্শনের ফানা এবং বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ-এর মধ্যে কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে মৌলিক কোনো সাদৃশ্য নেই। উভয়ের মধ্যকার বিস্তর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে :

১. বৌদ্ধ মতের নির্বাণ আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে, সুফিবাদের ফানা আল্লাহ্ সম্পর্কীয় ধারণার সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

২.নির্বাণের সাথে আত্মার দেহান্তরবাদ অর্থাৎ, জন্ম-জন্মান্তরবাদের সংশ্রব আছে। নির্বাণ লাভের ফলে পুনর্জন্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে, মুসলিম মরমিয়াবাদের সাথে জন্মান্তরবাদের কোনো প্রশ্ন জড়িত নেই—বরং এতে সদা সর্বত্র বিরাজমান, এক একক সত্তার ধারণা প্রবলভাবে বিদ্যমান।

৩. বৌদ্ধদের নির্বাণ মতবাদ নঞর্থক, পক্ষান্তরে, সুফিবাদের ফানা সদর্থক। ফানা বা আত্মবিলোপসাধন সুফিবাদের আধ্যাত্মিক সাধনার শেষ স্তর নয়—ফানা ফিল্লাহের মাধ্যমে আল্লাহ্র চিরন্তন সত্তায় উপনীত হওয়াই এর লক্ষ্য। কিন্তু বৌদ্ধদের নির্বাণ আত্মবিলোপেই শেষ—পরবর্তী কোনো স্তর নেই। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ নিকোলসন বলেন, "আমরা বিনা শর্তে ফানা ও নির্বাণকে অভেদাত্মক মনে করতে পারি না—নির্বাণ নিছক নেতিবাচক, কিন্তু ফানার পরবর্তী স্তর বাকা (আল্লাহ্র চিরন্তন সত্তায় অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত)।"

বাকা : ফানা শব্দটি বাকা অর্থাৎ স্থিতি বা নিত্যতা শব্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। স্বকীয় ইচ্ছার বিলোপ সাধন করে আল্লাহ্র জীবিত বা অবস্থান করার নামই হলো বাকা। বাকা স্তরে সুফি তন্ময়তার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত চেতনা অবলুপ্ত করে ঐশী চেতনায় উন্নীত হন। এ স্তরে কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে সাধক ঐশী জ্যোতির প্রভায় প্রদীপ্ত হন। তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা আল্লাহ্র ধ্যান ও প্রেমে সমাহিত হয়। তিনি ঐশী সত্তায় স্থায়িত্ব লাভ করেন—আল্লাহ্র চিরন্তন সত্তায় অবস্থান করেন।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. সাইদুর রহমান : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসফি, পৃ. ১০১
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
৪. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম সংস্কৃতি ও দর্শন, পৃ. ১৪০
৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, পৃ. ৪৯৫
৬. ড. সৈয়দ এম. নাদিভি : মুসলিম থট অ্যান্ড ইট্স সোর্স, পৃ. ৭৫
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

www.pathagar.com

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
১৪. ড. রশিদুল আলম : সহজ মুসলিম দর্শন, পৃ. ২২০
১৫. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৩০
১৬. cf. শেখ মোহাম্মদ ইকবাল, 'দি ডেভোলপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স ইন পার্সিয়া', লুযাক অ্যান্ড কোং, লন্ডন, ১৯০৮, পৃ. ৯৭। এই রচনায় সুফিবাদের উপর লিখিত অধ্যায়টি সুফি মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বদান। প্রথম অংশ : 'দি অরিজিন অ্যান্ড কোরআনিক জাস্টিফিকেশন অব সুফিইজম' হচ্ছে সুফি ভাবধারার প্রধান উৎস যা নিম্নে উপস্থাপন করা গেল। আমরা আর. এ. নিকোলসন—এর 'মিস্টিক অব ইসলাম', লন্ডন, ১৯০৪-এর 'ইন্ট্রোডাকশন' এবং 'জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৬, পৃ. ৩০৩—৪৮'-এ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'এ হিস্ট্রিক্যাল ইনকুয়ারি কনসার্নিং দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভোলপমেন্ট অব সুফিইজম' দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত।
১৭. ইকবাল, op cit, পৃ. ৯৭-৯৮
১৮. Ibid.
১৯. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৩১-৩৩
২০. এম. সাঈদ শেখ: স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৩১
২১. পবিত্র কোরআনে আছে : "তার (মোহাম্মদ (দ:))—এর নিকট বলা হয় নি তা' ব্যতীত যা তার পূর্ববর্তী রাসুলগণের নিকট ব্যক্ত করা হয়েছিল ... (XII,৪৩)। তবু পরম সত্যের বাণী বলার পর (v-৪৪-৪৭) পবিত্র কোরআন এ-ও বলেছে : 'আমরা আপনার নিকট সত্যসহ পবিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করছি, যাতে করে এর পূর্বের কিতাবসমূহে কি ছিল তার যথার্থতা প্রমাণ করতে পারেন এবং আমরা আপনাকে এর সংরক্ষক নিযুক্ত করেছি (v, ৪৮)। পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতা যদিও পবিত্র কোরানে আছে, তবুও পবিত্র কোরআনকে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মীমাংসাকারী ও তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছে। সুফিবাদ ও ক্রিশ্চানিটির সম্বন্ধের জন্য cf, ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড-এর 'দি ইউনিটি অব দি মিস্টিক্যাল একসপেরিয়েন্স ইন ইসলাম অ্যান্ড ক্রিশ্চানিটি, দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড, VOL, XXV, ১৯৩৫, পৃ. ৩২৫-৩৫ এবং জে. ডব্লিউ. সুইটম্যান-এর সুফিইজম অ্যান্ড ক্রিশ্চান টিচিং, Ibid, ১৫৬-৬০।
২২. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৩২
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
২৫. c. f. তার প্রবন্ধ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৪তম সংস্করণ এবং মিস্টিক অব ইসলাম লন্ডন, ১৯১৪, পৃ. ১৭।
২৬. c. f. মীর ওয়ালিউদ্দিন অব দি কনসেপ্শন ইসলামিক মিস্টিসিজম, প্রসিডিংস অব দি ইনডিয়ান কংগ্রেস, ১৯তম সেশন, ১৯৪৪, পৃ. ১৪৯-৫২।
২৭. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৩৪
২৮. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৩৬
২৯. ভারতীয় ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার উপর সুফিবাদের ব্যাপক ও গভীর অবহেলা করা যায় না। c. f. এম. এম. শরীফ : মুসলিম-থট : ইটস অরিজিন অ্যান্ড এচিভমেন্ট, শেখ মোহাম্মদ আ'শরাফ লাহোর, ১৯৫১, পৃ. ৮৫—৮৭; তারাচান্দ, ইনফ্লুয়েন্স অব সুফিইজম ইন ইনডিয়ান কালচার; এনামুল হক, 'দি সুফি মুভমেন্ট ইন ইনডিয়া' ইনডিয়ান কালচার vol. 1. ১৯৩৪-৩৫, পৃ. ১৭—২২ এবং ৪৩৫-৪৬।
৩০. c. f. আর. এ. নিকোলসনের প্রবন্ধ 'সুফিইজম' : এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজন অ্যান্ড ইথিকস।

www.pathagar.com

৩১. ইকবালের ডেভোলপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স ইন পারসিয়া, লন্ডন, ১৯০৮. পৃ. ৯৮-১০১ গ্রন্থ থেকে প্রচুরভাবে গৃহীত হয়েছে।
৩২. Ibid. পৃ. ৯৯।
৩৩. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৩৭
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
৩৫. Ibid, পৃ. ১০১।
৩৬. পবিত্র কোরআন শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুফি মতবাদের পরিপূর্ণ সুন্দর আলোচনার জন্য c. f. ড. মরি ওয়ালিউদ্দীনের 'দি কোরআনিক সুফিইজম', মতিলাল, বনশ্রী দাস, দিল্লী, ১৯৫৯।
৩৭. c. f. সি. ই. উইলসন : 'রিমার্কস অন সুফিইজম অ্যান্ড ইটস রিলেশন টু প্যানথিজম অ্যান্ড ইসলাম, ইসলামিক কালচার, vol. v, ১৯৩১, পৃ. ১৪২-৬৫; এবং মীর ওয়ালিউদ্দীনের 'দি প্রবলেম অব দি ওয়ান অ্যান্ড মেনি ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম', হায়দ্রাবাদ একাডেমী স্টাডিজ, vol. II. ১৯৪০, পৃ. ৩৫-৬৭।
৩৮. c. f. মার্গারেট স্মিথ, 'রাবেয়া : দি মিস্টিক', লুযাক অ্যাড কোং, লন্ডন, ১৯৪৪।
৩৯. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৪০
৪০. c. f. ই. জে. জুরজি : 'ইল্যুমিনেশন ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম', প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন, ১৯৩৮, বিশেষ করে ভূমিকা : পৃ. ১-২৪।
৪১. ইসলামিক মিস্টিসিজমে ইনসান-ই-কামিল মতবাদের জন্য ctf প্রবন্ধ (আল-ইন, আল-কামিল, স্টার এনাসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, লিয়েডেন, ১৯৫৩; আবদ-আল-করিম-আল-জিলির ইনসান-ই-কামিলের বিখ্যাত ধারণার জন্য দ্রষ্টব্য : আর. এ. নিকোলসন, স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম, ক্যামব্রিজ, ১৯২১, পৃ. ৭৭-১৪২ এবং ইকবাল op, cit পৃ. ১৫০-৭৪।

প্রসঙ্গ উল্লেখ

আবদ-আল-কাদির-আল-জিলানী, ফুতুহ-আল গায়েব, ইংরেজি অনুবাদ : এম, আফতাব-উদ্দিন আহমদ, লাহোর, সিরকাত-ই-আদরিয়া, n. d; বহু উর্দু অনুবাদ।

আবদ-আল-করিম আল-জিলি, ইনসান-ই-কামিল, উর্দু অনুবাদ : যহির আহমদ যাহিরী, ফিরোজপুর, মাদানি কুতুব খানকায়, n, d. ফরিদ-আল-দীন 'আত্তার, মানতিক আল-তায়েব, ইংরেজি অনুবাদ : এস. সি. নট : কনফারেন্স অব দি বার্ডস, লন্ডন, জুনাস প্রেস, ১৯৫৪ ; তায্কিরাত-আল-আউলিয়া, উর্দু অনুবাদ ইনায়েত উল্লাহ, লাহোর, মালিক দীন মোহম্মদ h. d. 'আলী-ইবনে 'উছমান-আল-হুজুরি কাশফ-আল-মাহজুব, ইংরেজি অনুবাদ : (৩য় সংস্করণ) আর. এ. নিকোলসন, লন্ডন, লুযাক, ১৯৫৯; বহু উর্দু অনুবাদ। মহিউ-আল-দীন-ইবন-আল-আরবি ফুসুস আল-হিকাম, উর্দু অনুবাদ : মৌলভী মোহাম্মদ আবদ—আল-কাদির, হায়দ্রাবাদ, জামেয়া উছমানিয়া, ১৯৪২; তারজুমান-আল-আশুরাক, আর. এ. নিকোলসন, লন্ডন, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯১১ কর্তৃক ইবন্-আল-আরবির কিতাব আল-তাসাই-আল-আলাক এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদসহ আক্ষরিক অনুবাদ সম্পাদিত। 'উমর ইবনে আলী-আল-ফরিদ আল তা'য়্যেত আল কুবরা সম্পূর্ণ ৭৬১ আয়াতের মধ্যে ৫৭৪ আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ : আর. এ. নিকোলসন-এর স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস,

www.pathagar.com

১৯২১, পৃ. ১৭০-৯১। 'আল্লামা ইবনে জাওজি, তালবিস ইবলিস, উর্দু অনুবাদ : আবু মোহাম্মদ আবদ আল হক, করাচি, নূর মোহাম্মদ : কারখানা তিযারত-ই-কুতুব n. d. (সুফিবাদের বিরুদ্ধে)। কমর আল-দীন ইরাকি, উসসাহক নামেহ, ইংরেজি অনুবাদ, এ. জে. আরবেরি : দি সং অব লাভারস, লন্ডন, o.u.p. ১৯৩৯। 'আবদ-আল-রহমান জামি, লওয়া'ইহ ইংরেজি অনুবাদ : ই. এইচ. হুইনফিল্ড এবং মীর্জা এম. কাযিভিনি, লন্ডন, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯২৮। আবু বকর আল-কালাবাদী, কিতাব-আল-তা'আরুফ-বিন-মাযাহাব আহল আল-তাসাউফ, ইংরেজি অনুবাদ : এ. জে. আরবারি : দি ডকট্রিন অব দি সুফিস, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৫।

আহমদ ইবনে 'ইসা-আল-খাররাজ, কিতাব-আল-যিদ্‌ক : এ. জে. আরবারি-সম্পাদিত ও অনূদিত : দি বুক অব ট্রুথফুলনেস, লন্ডন, o.u.p. ১৯৩৭। 'আবদ-আল-জাব্বার-আল-নিকাইরি, দি মাউয়াকিফ অ্যান্ড মোখতাবাত উইথ আদার ফ্রেগমেটস, অনুবাদ, সমালোচনা এবং সহ এ. জে. আরবারি কর্তৃক সম্পাদিত. লন্ডন, লুযাক, ১৯৩৫।

জালার-আল-দীন আল-রুমী, দিওয়ান-ই-সামস্‌-ই-তাব্রিজ, আর এ. নিকোলসন কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত : সিলেকটেড পয়েমস ফ্রম দি দিওয়ানি শামসি তাব্রিজ, ২য় সংস্করণ, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫২,—ফিহি-মা ফিহি, উর্দু অনুবাদ আবদুল রসিদ তাবাস্যুম : মালফুযাত-ই-রুমী, লাহোর, ইদারাহ-ই-তাফাকাত-ই-ইসলামিয়া, ১৯৫৬ : এ. জে. আরবারি-কর্তৃক টীকাসহ ইংরেজি অনুবাদ : ডিসকোর্সেস অব রুমী, লন্ডন, জন মোরে, ১৯৬১; মসনবি, গিও মেমোরিয়েল নিউ সিরিজ, লন্ডন, লুযাক, ১৯২৫-৪০, ৮ vol-এ আর. এ. নিকোলসন কর্তৃক টেক্সট-এর সমালোচনামূলক সম্পাদনা, ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; ইংরেজিতে বহু আংশিক অনুবাদ এবং মনোনীত, এবং উর্দুতেও বহু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। আবু-নাসের-আল-সিরাজ, কিতাব-আল-লুমা, লন্ডন, লুযাক, ১৯৪৭। সা'দ আল-দীন মাহমুদ সাবিস্তারি, গুলসান-ই-রাজ, ইংরেজি অনুবাদ, এক লিডেবার কর্তৃক ভূমিকাসহ : দি সিক্রেট রোজ গার্ডেন, লন্ডন, জন মোরে ১৯২০ (উইসডম অব দি ইস্ট সিরিজ)। আবু-আল-মাওয়াহিব আল সাদিলী, রিসালা হিকাম-আল-ইশরাক, ইংরেজি অনুবাদ, ই. জে. জুরজি কর্তৃক ভূমিকা ও টীকাসহ: ইল্যুমিনেশন ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৮। আবু হাকম 'উমর আল-সহরাওয়ার্দী, কিতাব আউয়ারিফ আল মা'রিফ ইংরেজি অনুবাদ, কলকাতা, ১৮৯১; উর্দু অনুবাদ লক্ষ্ণৌ, নিওয়ান কিশোর, ১৯২৬। আল—সহরওয়ার্দী মাফতুল, কিতাব হিকমাত আল ইশরাক, উর্দু অনুবাদ এম. হাদি. হায়দ্রাবাদ জামেয়া উসমানিয়া; ইয়াসিন আলী লাহোর, এ. আর. কোং ১৯২৫ (তিনটি অংশ) : থ্রি ট্রিটাইজেস [আল-সহরওয়ার্দীর] মিস্টিসিজমের উপর, ও স্পাইস এবং এস. কে. খাট্টাক কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, স্টুটগার্ড, ১৯৩৫।

'আবদ-আল-মজিদ তাসাউফ-ই-ইসলাম ৩য় সংস্করণ, আযমগড়, মাওবা' মা'রিফ, ১৩৬৫/১৯৪৬ (উর্দু)। এ. ই. আফ্‌ফি, দি মিস্টিক্যাল ফিলসফি অব মহিউদ্‌-দিন-ইবনুল 'আরবি, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৯। আফযাল ইকবাল, দি লাইফ অ্যান্ড থট

www.pathagar.com

অব রুমী, লাহোর, বাযম-ই-ইকবাল। এ. জে. আরবারি, সুফিইজম, লন্ডন, জি. এলেন, অ্যান্ড আন-উইন, ১৯৫০; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬। এ. ই. এ. আর. গিব, মোহাম্মাদালিজম : এ হিস্ট্রিক্যাল সারভে, লন্ডন o.u.p. ১৯৪৯ cf অধ্যায় ৮ এবং ৯। খলিফা আবদুল হাকিম, হিকমাত-ই-রুমী, লাহোর, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক কালচার, ১৯৫৫ (উর্দু); মেটাফিজিক্স অব রুমী, ২য় সংস্করণ, লাহোর, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক কালচার, ১৯৫৯—তসবিহাত-ই-রুমী, লাহোর, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক ১৯৫৯ (উর্দু)। এস. এম, ইকবাল, দি ডেভোলপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স ইন পারসিয়া, লন্ডন, লুযাক, ১৯০৮ : লাহোর বাযম-ই-ইকবার n.d. রোম লেনডাউ, দি ফিলসফি অব ইবনুল আরবি. লন্ডন, জি. এলেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৫৯। মার্টিন লিংগম মোসলেম সেইন্টস অব টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি; শেখ আহমদ-আল-আলাউরী, লন্ডন, জি. এলেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৬১। আর. এ. নিকোলসন. আইডিয়া অব পারসনালিটি ইন সুফিইজম, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস; মিস্টিকস অব ইসলাম লন্ডন, জি. জি. বেল অ্যান্ড সন্স, ১৯১৪; রুমী : পয়েট অ্যান্ড মিস্টিক, নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান ১৯৬০; স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২১। সাঈদা-দাদা আল-সাফাকিনি, রাবিয়াহ-আল বসরি, উর্দু, অনুবাদ, 'আবদ-আল-সামাদ, লাহোর, মকতবাহ-ই জাদিদ, ১৯৬০। মার্গারেট স্মিথ, অ্যান আর্লি মিস্টিক অব বাগদাদ : হারিস-আল-মোহাইসিবি, লন্ডন, ১৯৩৫; আল-গাযালি : দি মিস্টিক, লন্ডন, লুযাক, ১৯৪৪; রাবিয়াহ : দি মিস্টিক অ্যান্ড হার ফেলো সেইন্টস ইন ইসলাম, ক্যাব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৮; রিডিংস ফ্রম দি মিস্টিক অব ইসলাম, লন্ডন, লুযাক, ১৯৫০; দি সুফি পাথ অব লাভ, লন্ডন, লুযাক, ১৯৫৪; (অ্যান এনথ্রোলজি)। মীর ওয়ালী উদ্দিন : কোরআন আউর তাসাউফ, নাদওয়াত আল-মোসান্নিকিন, ১৯৫৬ (উর্দু); দি কোরআনিক সুফিইজম, দিল্লি, মতিলাল বনশ্রী-দাস, ১৯৫৯। আর. সি. ম্যাহিনার, হিন্দু অ্যান্ড মুসলিম মিস্টিসিজম, লন্ডন, এ্যাথলোন প্রেস, ১৯৬০; এম. এম. জহুর-উদ-দীন আহমদ, অ্যান একজামিনেশন অব দি মিস্টিক টেনডেন্সিস ইন ইসলাম, ইন দি লাইট অব দি কোরআন অ্যান্ড ট্রেডিশনসএবাম্বে, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, পালি রোড, বান্দ্রা ১৯৩২।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

মুসলিম প্রাচ্যের দার্শনিকবৃন্দ

আল-কিন্দি
(৮০৩-৮৭৩ খ্রি.)

প্রথম আরব দার্শনিক, আরবকুলের একমাত্র মহান দার্শনিক আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইস্‌হাক আল-কিন্দি (১৮৮—২৬০/৮০৩—৮৭৩) অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকের ন্যায় বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কালের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য বিভিন্ন বিষয়, যেমন, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, বিশেষ করে চক্ষুবিজ্ঞান, আবহাওয়াবিদ্যা, ভূগোলবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ফার্মেসিবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি সক্রেটিস, প্লেটো অ্যারিস্টোটল এবং তাঁদের ভাষ্যকার বিশেষ করে এফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্ডার-এর মতবাদের সাথে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞানেরও ছাত্র ছিলেন। দর্শনে নব্য-প্লেটোবাদ ও নব্য-পিথাগোরীয়বাদ-এর প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল এবং মুসলিম ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেকালের প্রগতিশীল মুতাযিলাবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি সববিষয়েই লিখেছিলেন। তাঁর রচনাবলির সংখ্যা ২৬৫। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর অল্পসংখ্যক গ্রন্থই বর্তমানে বিদ্যমান।

তাঁর মূল প্রয়াস ছিল একদিকে দর্শন ও বিজ্ঞান, অন্যদিকে, এই উভয়কে ধর্মের সাথে সমন্বয় সাধন করা। এটা তাঁকে সমন্বয়ধর্মী দর্শন বা সমন্বয়বাদ বিকাশের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রায় সব মুসলিম দার্শনিকের মধ্যেই পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

বিজ্ঞান এবং দর্শন (Science and philosophy) : পিথাগোরীয় ও প্লেটোর অনুসরণে গণিতশাস্ত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপে তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, গণিতশাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান ব্যতীত কেউই দার্শনিক হতে পারে না। চিকিৎসাবিদ্যা, চক্ষুবিজ্ঞান, সংগীতবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পরিমাণগত পদ্ধতির গাণিতিক প্রয়োগ তাঁর এই মতবাদ সমর্থিত হয়। অন্ততপক্ষে, প্রাথমিক আকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালির আধুনিক বিকাশে তাঁর দাবির কিছুটা যৌক্তিকতা রয়েছে। ব্রিফল্ট রচিত 'দি মেকিং অব হিউম্যানিটি' গ্রন্থে তাঁর সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ স্মরণ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাসে পরিমাণগত পদ্ধতিসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করার ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তাবিদগণই প্রথম।

www.pathagar.com

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল-কিন্দির পরিমাণ গত পদ্ধতির প্রয়োগ তাঁকে ওয়েবার ফেকনার (Weber-Fechner) সূত্র[১] উপস্থাপনার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।[২] একটি ঔষধ উপকরণের যদি একটি বিশেষ উপাদান, তিনি বলেন, গাণিতিক অগ্রগতিতে এর কার্যকারিতার মূল্য থাকতে হয়, তবে সেই উপকরণে এর পরিমাণ জ্যামিতিক অগ্রগতিতে বাড়াতে হবে। শারীরিক আলোকবিজ্ঞানে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ তাঁর জন্য রোজার বেকনের (Roger Bacon) প্রশংসার বাণী নিয়ে আসে। উইটলো (Witelo) সহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যান্য চিন্তাবিদ তাঁদের স্বীয় মতবাদের[৩] চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আল-কিন্দি সংগীত বিষয়েও গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং এই সম্পর্কে সাতটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে চারটি আমাদের নিকট এসেছে। সংগীতের ক্ষেত্রে গাণিতিক এই অগ্রগতি আরবীয় সংগীত ইতিহাসে আল-কিন্দিকে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দান করে। ফারম্যারের মতে সংগীতশাস্ত্রের উপর আল-কিন্দির রচনাবলি প্রায় দু'শতাব্দী[৪] যাবৎ পরবর্তী লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মহান আল-ফারাবিও এ ব্যাপারে তাঁর নিকটা ঋণী ছিলেন।

ধর্ম এবং দর্শন (Religion and philosophy) : সমন্বয়বাদের প্রতি তাঁর আগ্রহ আল-কিন্দিকে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে, তাঁর ভাষায়, প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াসে পরিচালিত করে। পরম সত্তার জ্ঞানলাভের জন্য প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ উভয়ই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। তাদের একটাকে একমাত্র পথ বলে মনে করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তুলনামূলক ধর্ম পাঠকালে এটা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ধর্ম ও দর্শন একই সত্তাকে নির্দেশ করে। আদি কারণ, দার্শনিকদের এক ও চিরন্তন সত্তা, প্রকৃতপক্ষে, নবিদের প্রত্যাদিষ্ট আল্লাহ্রই সাক্ষ্য বহন করে।

আল্লাহ্র ধারণা (conception of God) : আল্লাহ্ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা হচ্ছে দর্শনের মূল লক্ষ্য। দর্শন নামটিই গ্রিক আলোচনাকে নির্দেশ করে। এ-কারণে আল-কিন্দি গ্রিক দর্শনকে আরবদের নিকট পরিবাহিত করার দুর্বার প্রচেষ্টা চালান। টলেমির (Ptolemy) আল-মাজেস্টে (Al-magest)-এর উপর থিওনের (Theon)-এর সমালোচনায় আমরা আল্লাহ্কে অপরিবর্তনীয়, অযৌগিক ও অদৃশ্য প্রকৃতি হিসেবে বর্ণিত দেখতে পাই। তিনি গতির সত্যিকার কারণ। আল-কিন্দি তাঁর আল-সিনায়াত-আল উয্মা (al-Sinaat-al ujma) গ্রন্থে অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্র জন্য সর্ববিধ প্রসংশা, তিনি প্রজ্ঞা ও গতির অধিকর্তা, চিরন্তন (কাদিম) হওয়ার কারণে তিনি অদৃশ্য; গতিহীন কিন্তু সবগতির কারণ। সরল ভাষায় তাঁকে যারা উপলব্ধি করতে পারেন তাঁদের জন্য তাঁর বর্ণনা হচ্ছে : তিনি অযৌগিক, তিনি অদৃশ্য, অবিভক্ত—তিনি দৃশ্যমান বস্তুর গতির প্রজ্ঞা।[৫] থিওনের মতে সরলতা, অবিভাজ্যতা ও অদৃশ্যতা ও গতির কারণ হচ্ছে ঐশী গুণাবলি। যখন আল-কিন্দি এগুলো উল্লেখ করেন, তখন তিনি আল্লাহ্র হেলেনিস্টিক ধারণাকেই পরিব্যক্ত করেন। নব্য-প্লেটোবাদের ভাবধারার সাথে আল্লাহ্ সম্বন্ধে ইসলামি ভাবধারার সমন্বয় সাধনের মধ্যেই আল-কিন্দির মৌলিকতা অন্তর্নিহিত।

www.pathagar.com

বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology) : আল-কিন্দির মতে, বিশ্বজগৎ[৬] নিয়ন্ত্রণমূলক সমগ্রবিশেষ। সমস্ত ঘটনা কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত। কিন্তু সত্তার ক্রম অনুসারে কারণেরও ক্রমান্তর রয়েছে। কারণসমূহ উচ্চতর অথবা নিম্নতর ক্রমের হতে পারে। কারণের ক্রমের এই ধারণা আমাদেরকে নিওপ্লেটোনিক নির্গমণ মতবাদ স্মরণ করিয়ে দেয় (Neoplatonic theory of emanation)। নিম্নতর কারণসমূহ উচ্চতর কারণসমূহের ফলশ্রুতি। সকল উচ্চতর অস্তিত্ব নিম্নতর অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে, কিন্তু নিম্নতর অস্তিত্বের প্রভাব উচ্চতর অস্তিত্বে নেই। বিশ্বজগতের ঘটনাসমূহের কার্যকারণের বন্ধন এবং তাদের ক্রমোন্নত সংগঠন ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে ভবিষদ্বাণী করতে আমাদেরকে সক্ষম করে তোলে অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যার গ্রহের অবস্থান জানতে আমাদেরকে সহায়তা করে। অধিকন্তু, একটা একক অস্তিত্বশীল বস্তুকে পুরোপুরি জানতে পারলে এ বিশ্বজগতের বস্তুর সমগ্র পরিকল্পনা অনুধাবন করা যায়। তাই প্রতিটি বস্তুই বিশ্বজগতের দর্পণ, একটি ক্ষুদ্র জগৎ, যদি অপরটি বৃহৎ জগৎ হয়।

পাঁচ-সারসত্তা (five essences) : যে মৌলিক নীতিসমূহ প্রাকৃতিক জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে আল-কিন্দি তাদের নাম দেন সারসত্তা (essence)। এগুলো হচ্ছে জড়, আকার, গতি, কাল ও দেশ। 'অন দি ফাইভ এসেনসেস' (on the five essences) গ্রন্থে তা' উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কিন্দির সারসত্তার পরিকল্পনা অ্যারিস্টোটলের ফিজিক্স ও মেটাফিজিক্সের উপর ভিত্তি করে আছে। ও' লিয়ারি আল-কিন্দির পাঁচ সারসত্তাকে নিম্নরূপে[৭] উল্লেখ করেন :

১. জড় (matter) : জড় হচ্ছে তাই যা অন্যান্য সারসত্তাকে গ্রহণ করে, কিন্তু গুণ হিসেবে একে গ্রহণ করা যায় না। অতএব, যদি জড়কে সরিয়ে ফেলা হয়,তবে অন্য চারটি সারসত্তাও অপরিহার্যভাবে সরে যায়। অন্য কথায় বলা যায় জড় হচ্ছে গুণের আধার, জড়ের মধ্যে গুণ অবস্থান করে, কিন্তু গুণের মধ্যে জড়ের অস্তিত্ব নেই। জড় থাকলেই গুণ থাকে।

২. আকার (form) : আকার দু'প্রকার। প্রথম, যা বস্তুর জন্য অপরিহার্য এবং যা জড়ের সাথে অবিচ্ছেদ্য। এটা অ্যারিস্টোটলের দশ প্রকারের সাহায্যে বস্তুকে বর্ণনা করতে সাহায্য করে। অ্যারিস্টোটলের দশটি জ্ঞানের প্রকার হচ্ছে : দ্রব্য (substance), পরিমাণ (quantity), গুণ (quality), সম্বন্ধ (relation), দেশ (space), কাল (time), অবস্থান (position), অবস্থা (condition), ক্রিয়া, (action), এবং অনুরাগ (passion)। দ্বিতীয়ত, আকার হলো শক্তি যার দ্বারা আকারহীন জড় থেকে বস্তু উৎপন্ন হয়। আকার ছাড়া জড় হচ্ছে একটি অমূর্ত ধারণা। কেবলমাত্র আকার গ্রহণের ফলেই জড় বস্তু হয়ে ওঠে।

৩. গতি (movement) : গতি ছয় প্রকার (১) দ্রব্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর গতি বর্তমান—সৃষ্টি ও ধ্বংস (generation and corruption), (২) পরিমাণের মধ্যে দুই প্রকার গতি যথা—বৃদ্ধি ও হ্রাস (increase and decrease), (৩) গুণের মধ্যে দুইটি গতি যথা—গুণের মধ্যে একটি পরিবর্তন, অবস্থানের[৮] মধ্যে একটি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

৪. কাল (time) :কাল গতির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। গতি যেখানে সর্বদিকে ধাবিত হয়, কাল সেখানে সর্বদা এবং কেবল একদিকে প্রবাহিত হয়। পূর্বাপর সম্পর্কের মাধ্যমে কালকে জানা যায়। তাই নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যার অনুক্রমের মাধ্যমেই কেবল একে প্রকাশ করা যায়।

৫. দেশ (space) : দেশ বা স্থান বলতে দেহের বাইরের অংশকেই বুঝায়। এটা দেহকে পরিবেষ্টন করে রাখে। দেহ সরিয়ে নিলেও দেশের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে না। শূন্য দেশ সাথে সাথে অন্য দেহ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়; যথা—বায়ু, পানি প্রভৃতি।

নব্য-প্লেটোবাদ (Neo-platonism) : 'অন দি ফাইভ এসেনসেস' গ্রন্থে উপস্থাপিত মূল ধারণাসমূহ যদিও অ্যারিস্টোটলীয় উৎপত্তি এবং যদিও অ্যারিস্টোটলের গ্রন্থাবলির অনুবাদ ও টীকা রচনার কারণে আল-কিন্দি অ্যারিস্টোটলের একজন পরিচিত অনুগামী, তবুও, তাঁর অ্যারিস্টোটলীয়বাদ নব্য-প্লেটোবাদের রূপ পরিগ্রহণ করে। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে আল-কিন্দি অ্যারিস্টোটলের থিয়োলজি[৯] অপ্রমাণিত গ্রন্থটিকে অ্যারিস্টোটলের মূল গ্রন্থ বলে ভুল করেছিলেন। এটা ছিল প্লটিনাস কর্তৃক রচিত ইনিয়াড্স (Enneads)-এর শেষ তিন খণ্ডের শব্দান্তর।

আল-কিন্দি নব্য-প্লেটোবাদ সাদরে[১০]গ্রহণ করেন। কারণ-এ-মতবাদ তাঁর সমন্বয়ধর্মী ভাবধারা পরিপূরণে সহায়তা করে। এর দ্বারা তিনি পিথাগোরীয় মতবাদ, প্লেটোবাদ এবং অ্যারিস্টোটলীয় মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং তাদের সকলকে আবার ধর্মের সাথে সমন্বয় করেন। এ-মতবাদ তাঁকে স্বচ্ছন্দ স্বস্তি এনে দেয় এই ভেবে যে স্বয়ং অ্যারিস্টোটলই তাঁর বিস্ময়কর থিয়োলজি রচনার দ্বারা তা' সম্ভব করে তুলেছিলেন। আল-কিন্দির বিভিন্ন মতবাদ, একদিকে নির্গমন মতবাদ, দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক, অন্যদিকে আল্লাহ্র সাথে আত্মার সম্পর্ক, আত্মার পরিত্রাণ, এর অমরত্ব, বুদ্ধির চার প্রকার বিভক্তিকরণ সবই নব্য-প্লেটোবাদ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নির্গমন মতবাদ (The theory of emanation) : আল্লাহ্র সাথে জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা ধর্ম-দর্শনের এক অতি জটিল সমস্যা। সর্বযুগের দার্শনিকগণ এ ব্যাপারে হোঁচট খেয়েছেন। এ সমস্যা সমাধান প্রায় অসম্ভব কার্য। আল-কিন্দি নির্গমন মতবাদে নব্য-প্লেটোনিক ভাবধারা গ্রহণ করেন। তিনি একে অ্যারিস্টোটলের উপর আরোপ করেন। কারণ, তথাকথিত দি থিয়োলজি অব অ্যারিস্টোটলে তা প্রদত্ত হয়েছিল। নব্য-প্লেটোনিক মতবাদ অনুসারে ইচ্ছা-ক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র জগৎ সৃষ্টি করেন নি। কারণ, এভাবে সৃষ্টি করার অর্থ হবে চৈতন্য ও ইচ্ছাকে স্বীকার করে নেয়া—পরম সত্তার ক্ষেত্রে চৈতন্য ও ইচ্ছা উভয় আরোপ করার অর্থ হবে তাঁকে সীমিত করা। জ্ঞান (knowing)বিষয়কে অর্থ করে। জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় বস্তু থেকে বাইরে রাখে। আল্লাহ্ অনন্ত ও পরমসত্তা হওয়ার কারণে তাঁর বাইরে কোনো সত্তা থাকতে পারে না। তাই তিনি ব্যতীত তাঁকে কিছুই সীমাবদ্ধ করতে পারে না। ইচ্ছা কামনা বা অভাবকে অর্থ

www.pathagar.com

করে। কামনা বা অভাব মানে হচ্ছে যা পরিপূর্ণ হয় নি বা পরিপূর্ণ হতে এখনও বাকি আছে। কিন্তু আল্লাহ্ কামনা বা অভাবের অনেক ঊর্ধ্বে। অতএব, ইচ্ছা বিষয়টিকে তাঁর উপর আরোপ করা যায় না।

বিশ্বজগৎ, আল-কিন্দি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ থেকে নির্গত। জগৎ তাঁর অনন্ত সত্তার অবশ্যম্ভাবী প্রবাহ অথবা তাঁর সৃষ্টির অপরিহার্য ফলশ্রুতি। আলো যেমন সূর্য থেকে, ত্রিভুজের তিন বাহু যেমন ত্রিভুজ থেকে নির্গত, জগৎও তেমনি আল্লাহ্ থেকে নির্গত।

আল্লাহ্ থেকে জগৎ সরাসরি নির্গত হয় না। মধ্যবর্তী আধ্যাত্মিক মাধ্যমে তা নির্গত হয়। ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এদেরকে ফেরেশতা বলে ধারণা করা যেতে পারে। এসব মাধ্যম বিভিন্ন স্তরের হয়। নিম্নতর স্তর উচ্চতর স্তর থেকে নির্গত হয়। অনুরূপে প্রতিটি পূর্ববর্তী উচ্চস্তর থেকে পরবর্তী নিম্নস্তর নির্গত হচ্ছে। এর মধ্যবর্তী মাধ্যমসমূহের শেষ স্তর এবং পার্থিব জগতের মধ্যবর্তী স্তর হলো বিশ্বাত্মা (The world-soul) । এ বিশ্বাত্মাই হলো শেষ সংযোগবন্ধন বা সংযোগসূত্র (last connecting link) ।[১১]

মানবাত্মা (hunman soul) : নির্গমনবাদের (Emanationism) এ উচ্চতর ধ্যান পরিকল্পনায় মানবাত্মাসমূহ বিশ্বাত্মা থেকে উদ্ভূত বলে ধারণা করা হয়। বাস্তব ক্রিয়াকলাপে মানবাত্মা, নিঃসন্দেহে, দেহের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু আধ্যাত্মিক সারসত্তা (spiritual essence) হিসেবে এটা দেহ থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশ্বাত্মার অতীন্দ্রিয় জগতের বাসিন্দা। মানবাত্মার অমরতা ব্যাখ্যার জন্য আল-কিন্দি কোনো জটিলতা দেখেন না। বিশ্বাত্মা থেকে নির্গত হওয়ার কারণে এবং দেহ থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য এটা অবিমিশ্র, অযৌগিক ও অবিনাশী।

মানবাত্মার মুক্তি বা পরিত্রাণের জন্য কমবেশি প্লেটোনীয় রূপরেখাই অবলম্বন করা হয়েছে। প্লেটোর ন্যায় আল-কিন্দি বিশ্বাস করেন যে, মানবাত্মা অতীন্দ্রিয় জগতে তার পূর্ব অস্তিত্বের কথা স্মরণ করে অবিরতভাবে ক্লেশে ভুগছে। এ জগতে মানবাত্মা স্বচ্ছন্দ বোধ করছে না কিংবা দৈহিক কামনা চরিতার্থে এর সত্যিকার সুখ লাভ হচ্ছে না। দৈহিক কামনা অসংখ্য ও অন্তহীন—একটা পূরণের সাথে সাথে আরেকটি পূরণের চেতনা জন্মলাভ করছে। অধিকন্তু, যা স্বতঃপরিবর্তনশীল মানবাত্মা তাতে পরিতুষ্ট নয়। আত্মা সর্বদাই স্থায়ী ও চিরন্তনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল।[১২] কিন্তু চিরন্তন ও স্থায়ীকে কেবল প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্ম জগতেই পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং সত্যিকার সুখ এবং মানবাত্মার পরিত্রাণ প্রজ্ঞাময় ও আধ্যাত্মিক জগতেই নিহিত, অর্থাৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অন্বেষায়, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেই স্থায়ী ও চিরন্তনের লাভ সম্ভব।

বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ (Theory of intellect) : বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় আল-কিন্দির মতবাদ তাঁর 'অন দি ইনটেলেক্ট' গ্রন্থে পরিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর এ মতবাদ অ্যারিস্টোটলের 'ডি অ্যানিমা'[১৩] গ্রন্থের উপর এফ্রোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডার কর্তৃক রচিত টীকার প্রায় সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছে। এ মতবাদ তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত যা আধ্যাত্মিক[১৪] ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আত্মার দ্বৈত সত্তার[১৫] উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহ বা আত্মা কিংবা ইন্দ্রিয় বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান অর্জিত হয়। যেহেতু ইন্দ্রিয়

www.pathagar.com

দৈহিক জগতে এবং প্রজ্ঞা আধ্যাত্মিক[১৬] জগতের বাসিন্দা, তাই ইন্দ্রিয় বিশেষ বা জড়ীয়কে অনুভব করে এবং প্রজ্ঞা সার্বিক বা পরম সত্যকে উপলব্ধি করে।

অ্যারিস্টোটল তাঁর 'ডি অ্যানিমা' (The Soul)[১৭] গ্রন্থে দুপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য করেন। একটি হচ্ছে সম্ভাব্য (possible) এবং অন্যটি হচ্ছে চালক (agent) বুদ্ধিবৃত্তি। সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি বোধ (Intellection) গ্রহণ করে এবং চালক বুদ্ধিবৃত্তি বোধযোগ্য (Intelligible) বস্তু সৃষ্টি করে। এফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্ডার তাঁর 'ডি ইনটেলেক্ট' গ্রন্থে[১৮] তিন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলেন, যথা—জড়ীয় (material), অভ্যাসজাত (Habitual) এবং চালক (agent) বুদ্ধিবৃত্তি। আল-কিন্দি বুদ্ধিবৃত্তির চার স্তরের কথা উল্লেখ করেন। এদের মধ্যে তিনটি আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি। অন্যটি আসে বাইরে থেকে এবং এটা স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ। আল-কিন্দির বুদ্ধিবৃত্তি বা আত্মার চারশ্রেণি হচ্ছে নিম্নরূপ :[১৯]

১. সুপ্ত বা সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি (আকল হায়য়ুলানি)
২. সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি (আকল বিল-ফিল)
৩ অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি (আকল মুসতাকাদ)
৪. চালক বুদ্ধিবৃত্তি (আকল ফা'ল)

১.সুপ্ত বা সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি (Latent বা Potential intellect) : সকল জীবের ন্যায় মানুষেরও এ সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে। এ সুপ্ত বুদ্ধির দ্বারা মানুষ পার্থিব বস্তুর প্রকৃতি ও স্বরূপ জানতে পারে। অনন্ত ও চিরন্তন সত্যকে জানার যে সুপ্ত শক্তি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত তা সক্রিয় সহায়তায় প্রকাশ লাভ করে ও বিকশিত হয়। তবে সকলের ক্ষেত্রে এ সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটে না।

২. সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি (Active intellect) : এ বুদ্ধিবৃত্তি মানুষ ও নিম্নতর জীব শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান। এ বুদ্ধিবৃত্তি সুপ্ত বা সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে, কর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং সক্রিয় করে তোলে।

৩. অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি (Acquired intellect) : চালক বুদ্ধিবৃত্তির অনুপ্রেরণায় অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি অর্জিত ও বিকশিত হয়। যে কোনো সময় আত্মা এ-বুদ্ধি ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারে। মানুষ নিজ ও স্বকীয় প্রচেষ্টার দ্বারা এ বুদ্ধিবৃত্তি অর্জন করে এবং এর স্ফূরণ ঘটায়।

৪. চালক বুদ্ধিবৃত্তি (Agent-intellect) : চালক বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে বিশ্বের অতি মানস (over-mind)।এটা প্লটিনাসের নাউস (Nous), ফিলোর লগোস (Logos) অথবা প্লেটোর সার্বিক জগতের (world of universals) অনুরূপ। এটা চিন্তার মৌলিক উৎস, গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ, চিরন্তন সত্য এবং আধ্যাত্মিক বিধি (spiritual verities) । বিশ্বাস করা হয় যে, সাধকের জ্যোতি, নবির প্রত্যাদেশ, কবি, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের অনুপ্রেরণা এ থেকে আসে। যেহেতু চালক বুদ্ধিবৃত্তি দার্শনিকের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, নবিগণের প্রত্যাদেশ এবং সাধকদের দূরদৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারে তাই এটা আশ্চর্য নয় যে, আল-কিন্দির ন্যায় সমন্বয়ধর্মী দার্শনিকের নিকট এর[২০] বিমুগ্ধকর আবেদন[২১] থাকবে।

www.pathagar.com

চালক বুদ্ধিবৃত্তি গতিশীল আত্মশক্তি। এ বুদ্ধিবৃত্তি দেহের উপর ক্রিয়া করেও এটা দেহ-নিরপেক্ষ, অমর ও অবিনশ্বর। আল-কিন্দি মনে করেন, মানুষের বুদ্ধিময় আত্মা নির্গমন বিধি অনুসারে চালক বুদ্ধিবৃত্তি থেকে মানবদেহে প্রবেশ করে। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথে তা আবার মূল উৎসে মিলিত হয়। কিন্তু জৈবিক আত্মা দেহ বিনাশের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ কারণে বুদ্ধিময় আত্মা অমর, চিরন্তন ও অবিনশ্বর। এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় : মৃত্যুর পর যদি সকল স্বতন্ত্র আত্মা বিশ্ব-আত্মায় মিশে যায়, তবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকে কি? মানুষের নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের কি হয়?

জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of knowledge) : আল-কিন্দির জ্ঞান-বিষয়ক মতবাদ আধ্যাত্মিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আত্মার দ্বৈত সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল-কিন্দির মতে, ইন্দ্রিয় (Senses) বা কল্পনার (Imagination) দ্বারা জ্ঞান পরিবাহিত হয়। কল্পনা হচ্ছে ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী শক্তি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বিশেষ বা জড়ীয় জ্ঞান লাভ করি এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে আমরা সার্বিক বা পরমসত্যকে উপলব্ধি করি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রজ্ঞা উভয়েরই সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। প্রজ্ঞা ভিন্ন ইন্দ্রিয় অন্ধ, ইন্দ্রিয় ব্যতীত প্রজ্ঞা শূন্য। আল-কিন্দি মনে করেন, কল্পনা আমাদেরকে সার্বিক-বিশেষ (universal-particular) জ্ঞান দান করে। অধুনা কান্ট (১৮০৪) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ ও প্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কল্পনাকে ভেবেছেন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে কান্টের ধারণাটি মৌলকতার প্রশ্নের সম্মুখীন। কারণ, এ বিষয়টি আমাদেরকে লর্ড ক্যামস[২২] (Lord Kames), ১৭৮২), ইটালিয়ান রেনেসাঁর সমালোচক মুরাতৃরি (Muratori, ১৭৫০) এবং পরিশেষে এডিসন (Addision, ১৭১৯)—এ নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এ বিশেষ কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে আল-কিন্দির নিকট যায়। তিনি কান্টের নয় শতাব্দীএবং এডিসনের আট শতাব্দী পূর্বে এ মতবাদের সুস্পষ্ট রূপদান করেন।

আল-কিন্দির সকল দার্শনিক মতবাদ, তাঁর আত্মার মতবাদ এবং এর চার শ্রেণীকরণ পরবর্তী সকল দার্শনিক যেমন, আল-ফারাবি, ইবনে সিনা,[২৩] ইবনে রুশ্দ এবং অন্যদের কর্তৃক উত্তরাধিকারীরূপে সমাদৃত হয়েছিল। আল-কিন্দি কর্তৃক নির্ধারিত দার্শনিক সমস্যাবলি পরবর্তী আরব্য দর্শন বিকাশের প্রারম্ভিক আলোচনার সূত্রপাত করে। তাই যথার্থভাবে দাবি করা যায় যে, ডেকার্ট যেমন আধুনিক দর্শনের জনক, আল-কিন্দিও তেমনি আরব্য-দর্শনের জনক।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১. আর-ব্রিফল্ট : দি মেকিং অব হিউম্যানিটি, লন্ডন, ১৯২৮, পৃ. ১৯১-৯৪
২. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা—১৯৮৪ পৃ. ৩৯৫ এ মতবাদ অনুসারে উদ্দীপকগুলোর প্রগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং সংবেদন সমান্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়।
৩ তুলনীয়, সারটন : ইনট্রোডাকশন টু দি হিস্ট্রি অব সায়েন্স, বাল্টিমোর, ১৯২৭, ভল্যুম, ১, পৃ. ৫৫৯
৪. এইচ জি., ফারম্যার : হিস্ট্রি অব এরাবিয়ান মিউজিক, লন্ডন, পৃ. ১২৭-২৮

www.pathagar.com

৫. এম.এম. শরীফ :এ হিস্ট্রি অব মুসলিম ফিলসফি পৃ. ৪২৮, ভল্যুম ১, ১৯৬৩
৬. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি পৃ. ১৯৬২ পৃ. ৫৭
৭. ডিই লেসি ও লিয়ারি : এরাবিক থট্স অ্যান্ড ইটস প্লেস ইন হিস্ট্রি, লন্ডন, ১৯২২, পৃ. ১৪১-৪৩
৮. অ্যারিস্টোটলের গতির প্রামাণিক ধারণার জন্য ডব্লিউ ডি রস : অ্যারিস্টোটল, লন্ডন, ১৯২৩, পৃ. ৮১-৮৩
৯. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩৯৭
১০. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, ১৯৬২, পৃ. ৫৯
১১. নিচে দ্রষ্টব্য :
ইবনে সিনার উপর অধ্যায় পৃ. ৯৬ et. sqq.
নির্গমন মতবাদের সমালোচনা : গাযালির উপর অধ্যায় পৃ. ১২১-১২ এবং ইবনে খালদুন পৃ. ১৯২-৯৩
১২. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, ১৯৬২, পৃ. ৬১-৬২
১৩. অ্যারিস্টোটলের 'ডি. অ্যানিমা' গ্রন্থের উপর এফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্ডারের সমালোচনার (commentaries) দ্বারা মুসলিম দার্শনিকগণ প্রভাবিত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তির সমস্যার নতুন দ্বার সূচনা করার প্রয়াস পান। তাঁরা এর মধ্যে নব্য-প্লেটোবাদের উপকরণ, স্টোয়িক দর্শন, খ্রিস্টান প্রাচীন যুগের মিশ্র হেলেনীয়বাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির এক দুর্বোধ্য ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেন যা সম্ভবত অ্যারিস্টোটল বা তাঁর সমালোচকদের ধারণারও অতীত।
১৪. এখানে খুব মৌলিক বিষয়ে প্লেটোর সাথে আল-কিন্দির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও আল-কিন্দি সাধারণত ইসলামের প্রথম অনুগামী হিসেবে পরিচিত।
১৫. ড.রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪০১।
১৬. প্রফেসর এম.এম. শরীফের মতে, আল-কিন্দি কান্টের বহুপূর্বে কল্পনাকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ও প্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী শক্তি হিসেবে ধরে নেয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বিশেষের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে সার্বিকের জ্ঞান লাভ করা যায় এবং কল্পনাশক্তির সার্বিক বিশেষের জ্ঞান দান করে।
১৭. এম. এম. শরীফ : এ হিস্ট্রি অব মুসলিম ফিলসফি, ১৯৬৩, পৃ. ৪৩২
১৮. এম. এম. শরীফ : এ হিস্ট্রি অব মুসলিম ফিলসফি, ১৯৬৩, পৃ. ৪৩২
১৯. প্রফেসর সাইদুর রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলোসফি এন্ড কালচার, ১৯৬৩, পৃ. ৫৩
২০. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, ১৯৬২, পৃ. ৫৯
২১. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, ১৯৮৮, পৃ. ১১১
২২. এম.এম.শরীফ : মুসলিম থটস ইটস অরিজিন অ্যান্ড এচিভমেন্ট, ১৯৫০, পৃ. ৭৯
২৩. এফ. রহমান : প্রফেসি ইন ইসলাম, লন্ডন, ১৯৫৪ পৃ. ১১-২০ et spp.

www.pathagar.com

আল-ফারাবি
(৮৭০-৯৫০ খ্রি.)

আল-ফারাবি (২৫৭-৩৩৯/৮৭০-৯৫০) ল্যাটিন স্কলাসটিক্‌সে আল ফারাবি ফারাবিয়স-এর পূর্ণ নাম মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে তারখান ইবনে উমলাক আবু নসর আল-ফারাবি। তিনি ফারাবের সন্নিকটে ওয়াসিজ গ্রামে (২৫৭/৮৭০) জন্মগ্রহণ করেন। প্রধানত বাগদাদেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি আলেপ্পোতে সায়েফ-আল-দৌলা-আল-হামদানি (রাজত্ব : ৩৩৩-৩৫৭/৯৪৪-৯৬৭)-এর উজ্জ্বল দরবারে সুফি হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি একজন উল্লেখযোগ্য প্রথম তুর্কি দার্শনিক। অ্যারিস্টোটলের যুক্তিবিজ্ঞানের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা হওয়ার কারণে তাঁকে 'মুয়াল্লিম-আল সানি' (দ্বিতীয় শিক্ষক) অর্থাৎ, দ্বিতীয় অ্যারিস্টোটল বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ম্যাকডোনাল্ড যথার্থভাবেই উল্লেখ করেন যে, আল-ফারাবি ছিলেন মুসলিম দর্শন পিরামিডের[১] ভিত্তি স্বরূপ। ইবনে খাল্লিকানের মতে, কোনো মুসলিম চিন্তাবিদই দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে[২] আল-ফারাবির ন্যায় অনুরূপ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন নি। তাঁর পদ্ধতি 'প্লেটোবাদ, অ্যারিস্টোটলবাদ এবং সুফিবাদের সৃজনমূলক সমন্বয় (creative synthesis) বিশেষ।

তুর্কির আল-ফারাবি ইসলামের ভাবধারার সাথে গ্রিক দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। আরবের আল-কিন্দি কর্তৃক (১৮৮-২৬০/৮০৩-৮৭৩) এ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এটা পার্সীয় চিন্তাবিদ ইবনে সিনার (৩৭০-৪২৮/৯৮০-১০৩৭) জন্য দর্শন-সৌধ নির্মাণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। আল-ফারাবির রচিত গ্রন্থ পাঠে এবং তাঁর দার্শনিক পদ্ধতি-গঠন অনুকরণের দ্বারাই ইবনে সিনা এত সুখ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল-ফারাবির মধ্যে যে সারসংক্ষেপ ও দুর্বোধ্যতা ছিল ইবনে সিনা তা-ই সুস্পষ্টীকরণ করেন এবং একে বোধগম্য করে তোলেন। ইবনে সিনার সমকালীন ইতিহাসবিদ দার্শনিক ইবনে মাস্‌কাওয়াহ্ (৩৩৪-৪২২/৯৪৫-১০৩০) কম খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি তাঁর ক্ষুদ্র রচনা আল-ফাউসাল আল-আসগার (ক্ষুদ্রতর পরিত্রাণ)-এ কম বেশি আল-ফারাবির যুক্তিগুলোরই পুনর্ব্যক্ত করেছেন, বিশেষ করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলি[৩] বিষয়ক অংশগুলোকে। পরবর্তীতে মহান খ্রিষ্টান পাণ্ডিত্যবাদী আলবার্ট দি গ্রেট এবং সেন্ট টমাস একুইনাস তাঁদের পদ্ধতি বিকাশের জন্য আল-ফারাবির নিকট তাঁদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গেছেন। কোনো কোনো সময় তারা তাঁকে উদ্ধৃতি দেন (adverbum)[৪]। আল-ফারাবির রাষ্ট্রতত্ত্বে আমরা স্পেনসার ও রুশোর মতবাদের আভাস পাই। আল-ফারাবির পদ্ধতি স্পিনোজার ন্যায় অবরোহত্মাক এবংএর গঠনরীতিও তাঁর ভাববাদের সাদৃশ্যস্বরূপ।

www.pathagar.com

দর্শন বিষয়ে যুব-শিক্ষার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে ন্যায়নিষ্ঠভাবে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য আল-ফারাবি কিছু নিয়ম-বিধি লিপিবদ্ধ করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের সাথে সম্যক পরিচিত লাভ না করা পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীর দর্শন পাঠ শুরু করা উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন। মানব প্রকৃতি ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে, অপরিপূর্ণ থেকে পরিপূর্ণে ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়। যুবক দার্শনিকের মনমানসিকতা গড়ে তোলার জন্য গণিত শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা তাকে ইন্দ্রিয় থেকে বোধে যেতে সহায়তা করে এবং তার মনকে সঠিক জ্ঞানের নির্দেশ দান করে। অনুরূপভাবে, যুক্তিবিদ্যা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশ করে, তাই যথার্থ দর্শন পাঠ করার পূর্বে যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন অতি প্রয়োজনীয়। সর্বোপরি, দর্শনরাজ্যে প্রবেশ করার পূর্বে যে বিষয়টি অতীব আবশ্যক তা হচ্ছে স্বীয় চরিত্র গঠন। পরিশোধিত আত্ম-সংস্কৃতি ব্যতীত একজন শিক্ষার্থী উচ্চতর সত্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে। কারণ, তার মন-মানিসকতা তখন তা অপরিশোধিত ইন্দ্রিয় সংবেদন দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে।

আল-ফারাবির মূল মতবাদগুলো নিম্ন শিরোনামে উল্লেখ করা যেতে পারে :

১. দর্শন
২. যুক্তিবিদ্যা
৩. অধিবিদ্যা
৪. নীতিদর্শন
৫. রাষ্ট্রদর্শন

১. দর্শন (philosophy) : আল-কিন্দির ন্যায় ফারাবিও তথাকথিত অ্যারিস্টোটলের থিয়োলজিকে মূলগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এ সত্য আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন যে এটা ছিল নিও-প্লেটোনিক চিন্তাবিদদের ভাষ্য মাত্র। নব্য-প্লেটোনিক পণ্ডিতদের ন্যায় তিনিও প্লেটোর দর্শনকে অ্যারিস্টোটলের দর্শনের সঙ্গে সমন্বয় করার প্রয়াস পান। তিনি ইসলামি শিক্ষাকে প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলের দর্শনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালান। প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলের মৌলিক মতবাদের নিখুঁত সাদৃশ্য বিদ্যমান বলে তিনি মনে করেন। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পদ্ধতিতে, ভাষায় এবং বাস্তব জীবনের সম্পর্কের বিষয়ে। আল-ফারাবি তাঁদের উভয়কেই দর্শনের উচ্চতর কর্তৃত্বের অধিকারী বলে মনে করেন।[৫]

আল-ফারাবির মতে,আত্মার বিশুদ্ধতা লাভ করাই হচ্ছে দর্শনের লক্ষ্য। দর্শন পাঠের জন্য এরূপ বিশুদ্ধীকরণ একান্ত আবশ্যক। কারণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের পক্ষে মানব জীবনের প্রধান সমস্যাগুলোর অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। আল-ফারাবি ছিলেন সত্যের একজন একনিষ্ঠ সাধক। তাই তিনি মনে করেন যে, ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত ঘটনাবলির বিপরীতে হলেও একজনকে সত্যের অনুসন্ধানী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সত্যানুসন্ধান মহান শিক্ষক অ্যারিস্টোটলের মতবাদের বিরুদ্ধে হলেও তা চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং, প্রাকৃতিক ও মানবিক বিজ্ঞান-সমূহের জ্ঞানার্জনের জন্য পূর্বাহ্নে যুক্তিবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্র পাঠ দ্বারা বিচারশক্তির পুরোপুরি প্রশিক্ষণ লাভ করা অপরিহার্য। গণিতশাস্ত্র, বিশেষ করে, শিক্ষার্থীর মতকে মূর্ত থেকে অমূর্ত বিষয়ে অগ্রসর

www.pathagar.com

হতে সহায়তা করে।[৬] গণিতশাস্ত্র শিক্ষার্থীদেরকে সূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা-ভাবনা করতে সাহায্য করে। অনুরূপে, যুক্তিবিদ্যাও শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যুক্তিবিদ্যা চিন্তন প্রণালিকে সত্য-মিথ্যা নিরূপণে সাহায্য করে। সুতরাং, দর্শন-চর্চার প্রাক-প্রস্তুতি হিসেবে গণিতের ন্যায় যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। দর্শন অনুশীলনের পূর্বশর্ত হিসেবে চরিত্র গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আল-ফারাবি মনে করেন।[৭] "আত্মোৎকর্ষ ব্যতিরেকে জীবনের গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব—কেবল বুদ্ধিময় সত্তায় প্রদীপ্ত হতে পারলেই দর্শনের গভীর তত্ত্ব মানুষের চিন্তায় উদ্ভাসিত হতে পারে—অন্য পথে নয়।"[৮]

গণিত ও যুক্তিবিদ্যা ও চরিত্র-গঠন বিষয় আলোচনার পরে আল-ফারাবি দর্শনের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হন। তাঁর মতে, দর্শন হচ্ছে সকল বিজ্ঞানের আদি বিজ্ঞান।[৯] মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে দার্শনিক জ্ঞান অর্জন। আল-ফারাবি মনে করেন, দর্শন আমাদেরকে জীবন ও জগতের প্রকৃত জ্ঞান দান করে এবং বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়। বিশ্বজগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে দর্শন এক অখণ্ড ও সামগ্রিক ঐক্যসূত্র স্থাপন করে।

আল-ফারাবি মুতাযিলা ও ফালাসিফা উভয় গোষ্ঠীর মতবাদের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, মুতাযিলা চিন্তাবিদেরা নির্বিচারবাদী। তাঁরা যুক্তিকৌশল, বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর তাঁদের মতবাদের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে, ফালাসিকা গোষ্ঠীর চিন্তাবিদগণ জগতের অবভাসিক রূপকে ধরে নিয়ে জীবন ও জগৎ ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। অবভাসিক জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগৎ, দৃশ্যমান ও অপ্রকাশ্যকে নিয়েই যে পূর্ণ সত্তার ধারণা নিহিত তা' তাঁরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। ফলে, আল-ফারাবি চিন্তাকে একটি উপযুক্ত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়াসী হন এবং যৌক্তিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই তিনি সব অস্তিত্বশীল সত্তার আদি কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালান। আল-ফারাবির দার্শনিক চিন্তাধারায় তাই যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন অন্তর্ভুক্ত হয়।

২. যুক্তিবিদ্যা (logic) : আল-ফারাবির যুক্তিবিদ্যা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিশ্লেষণ নয়। তাঁর যুক্তিবিদ্যা ব্যাকরণের (grammer) উপর মন্তব্য ও টীকা এবং জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যুক্তিবিদ্যা থেকে ব্যাকরণ পৃথক। কারণ, ব্যাকরণ একটা বিশেষ স্থানের লোকদের ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে, যুক্তিবিদ্যা মানবজাতির চিন্তার প্রকাশ 'ভাষাকে' নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালায়। যুক্তিবিদ্যা চিন্তার উপাদান নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে অতি জটিল ধারণায় প্রবেশ করে, অর্থাৎ শব্দ থেকে বাক্যে এবং বাক্য থেকে যুক্তিতে প্রবেশ করে।

তিনি যুক্তিবিদ্যাকে দু'ভাগে ভাগ করেন। এদের প্রথমটি ধারণা সম্পর্কীয় মতবাদ (doctine of ideas) এবং এটি সংজ্ঞার (definition) সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়টি অবধারণ, অনুমান এবং প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করে। প্রকৃত বস্তুর সাথে ধারণার কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। ধারণাবলি শুধু মনেই অবস্থান করে। ধারণাকে দু'টো শিরোনামে শ্রেণীকরণ করা হয়। ধারণার প্রথম শ্রেণীকরণ বস্তুর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ থেকে উদ্ভূত হয়।

www.pathagar.com

তারা বস্তুর সরলতম মানসিক উপাদান—জ্ঞাতার মনে বস্তুর মানসিক প্রতিফলন। ধারণার দ্বিতীয় শ্রেণীকরণ হচ্ছে সে-সব যা মনে সহজাত (Innate) ধারণা। সূচনা থেকেই এসব ধারণা মনে মুদ্রিত থাকে। কোনো মাধ্যম ব্যতীত আত্মা সহজাত ধারণাগুলোকে 'আত্ম চেতনায়' জানতে পারে। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের সাথে এদের কোনো সাদৃশ্য নেই। তাই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত ধারণার দ্বারা এদেঁরকে ব্যাখ্যা করা যায় না। নিজেরাই অতি সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে আত্মচৈতন্যে স্বজ্ঞারূপে তাদেরকে জানা যায়।[১০]

অবধারণ হচ্ছে ধারণার সংযোগকরণের ফলশ্রুতি। অবধারণ হয় সত্য অথবা মিথ্যে হতে পারে। অবধারণের বৈধতা বিচারে আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে উক্ত অবধারণটি স্বতঃপ্রমাণিত যুক্তিবাক্য হতে নিঃসৃত অনুমানের উপর কতটুকু প্রতিষ্ঠিত। অতএব, যুক্তিবিদ্যার কাজ হচ্ছে এ ধরনের স্বতঃসিদ্ধ বাক্য দিয়ে শুরু করা এবং তাদের বিশ্লেষণ করা। গণিত, অধিবিদ্যা এবং নীতিবিদ্যায় এ ধরনের অনেক স্বতঃসিদ্ধ বাক্য রয়েছে। যুক্তিবিদ্যার কাজ হচ্ছে জ্ঞাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা দিয়ে শুরু করা এবং তাদের থেকে এমন কিছু নিঃসৃত করা যা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। যুক্তিবিদ্যা এভাবে জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতের দিকে অগ্রসর হয়। এটা সম্প্রত্যয় দিয়ে শুরু করে এবং সম্প্রত্যয়কে অবধারণ ও অনুমানে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু উচ্চতর স্তরে যুক্তিবিদ্যা সার্বিক বা মূর্ত সত্যের দিকে ধাবিত হয়। এখানে এটা সার্বিক সত্যের (Universal truth) মানদণ্ড (norm) অথবা নীতি নির্ণয়ের প্রয়াস চালায়। এভাবে যুক্তিবিদ্যা দর্শনে পরিণতি লাভ করে।

ব্রাডলির ন্যায় আল-ফারাবি বিরোধ-বাধক নিয়মকে (Law of contradiction) এসব নীতির সর্বোচ্চ নীতি বলে মনে করেন। একটি একক জ্ঞানীয় ক্রিয়ার দ্বারা আমরা সত্য এবং যৌক্তিক বাক্যের অনিবার্যতা বিষয়ে অবহিত হতে পারি এবং এর বিরুদ্ধে বাক্যের মিথ্যাত্ব ও অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও এ-নিয়ম দ্বারা অবহিত হওয়া যায়। অ্যারিস্টোটলীয় 'পলিটমি' (Polytomy) পদ্ধতির চেয়ে আল-ফারাবি প্লেটোর 'দ্বিকোটমি" (Dichotomy) পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেন।[১১]

আল-ফারাবির মতে, যুক্তিবিদ্যা শুধু চিন্তার সামঞ্জস্যতার বিজ্ঞান নয়, কিংবা কেবলমাত্র পদ্ধতি-বিজ্ঞানও (methodology) নয়, এটা এর চেয়েও বেশি কিছু। এটা সত্য নির্দেশের প্রয়াস চালায়, অর্থাৎ ধারণার ভিত্তি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করে। এটা সহানুমানের উপাদান হিসেবে অবধারনকে নিয়েই আলোচনা করে না, বিশেষ বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে সত্যানুসন্ধানও করে। এটা দর্শনের কেবল পরিপূরকই নয়, দর্শনের এক অপরিহার্য অংশও বটে। এভাবে যুক্তবিদ্যা দর্শনে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, উচ্চতর যুক্তিবিদ্যাই হচ্ছে স্বয়ং দর্শন।

আল-ফারাবি জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা (১) নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান (necessary knowledge) এবং (২) সম্ভাব্য জ্ঞান (possible knowledge)। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যথার্থ, সুস্পষ্ট এবং কোনো শর্তের অধীন নয়। প্রজ্ঞা সরাসরি এ জ্ঞান লাভ করে। এ জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানের অসম্ভাব্যতাকেও প্রমাণ করতে পারে। সম্ভাব্য সত্য নিশ্চয়াত্মক সত্যের উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। নিশ্চয়াত্মক ও সম্ভাব্য জ্ঞানের মধ্যে

www.pathagar.com

যেরূপ পার্থক্য, নিশ্চয়াত্মক বস্তু ও সম্ভাব্য বস্তুর মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য রয়েছে। বস্তু দু'প্রকার : নিশ্চয়াত্মক ও সম্ভাব্য। বস্তুর অবস্থান হয় বাইরের জগতে, নতুবা অন্তর্জগতে।[১২]

আল-ফারাবি বিশেষ (particular) এবং সার্বিক (universal)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, বিশেষ বস্তুসমূহ কেবল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মধ্যে বিদ্যমান নয়, চিন্তনেও তারা অস্তিত্বশীল। সার্বিকসমূহও অবান্তর লক্ষণ (accident) হিসেবে বিশেষ বস্তুর মধ্যে বিরাজ করে না, দ্রব্য হিসেবেও তারা মনে অস্তিত্বশীল। মানব মন বিশেষ থেকে সার্বিকের ধারণায় উপনীত হতে পারে—তবে তার মানে এই নয় যে, এ সত্যে পৌঁছানোর পূর্বে সার্বিকের ধারণার অস্তিত্ব ছিল না।[১৩] কাজেই সার্বিকসমূহ নিছক মানসজাত প্রতীতি নয় বরং বিশেষ বস্তুর মধ্য দিয়ে সার্বিক সত্ত্য বাস্তব সত্তা লাভ করে। সার্বিক বিশেষের পূর্ব হতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সার্বিকের অস্তিত্ব সম্পর্কে আল-ফারাবি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, "অস্তিত্ব" কথাটি একটা ব্যাকরণগত বা যৌক্তিক সম্বন্ধবিশেষ এবং তা' বাস্তবতার কোনো প্রকার বা ক্যাটিগরি নয়, অস্তিত্ব ছাড়াও একটি বস্তু বাস্তব হতে পারে।[১৪] আসলে অস্তিত্ব মাত্রই বস্তুর এক ধরনের সম্বন্ধ। আল-ফারাবির এ মতের সাথে জার্মান দার্শনিক কান্টের দেশ-কাল বিষয়ক মতের অনুরূপতা রয়েছে।

৩. অধিবিদ্যা (metaphysics) : আল-ফারাবি বস্তুজগৎকে দু'টো স্তরে বিভক্ত করেন—সম্ভাব্য সত্তা ও অনিবার্য সত্তা। তৃতীয় প্রকারের কোনো সত্তা নেই। প্রতিটি সম্ভাব্য সত্তাই পূর্ববর্তী একটি কারণকে মেনে নেয় যার থেকে এ সত্তার উদ্ভব। এ কারণও স্বয়ং পূর্ববর্তী অন্য একটি কারণের ফলশ্রুতি। এভাবে কার্যকারণ প্রবাহ চলতেই থাকে যে পর্যন্ত না আমরা আদিকারণ (First cause) যার আর কোনো কারণ থাকে না এবং যার পশ্চাতে কার্যকারণ অনুক্রম আর ঠেলে দেয়া যায় না, তথায় উপনীত হই। কার্যকারণের যৌক্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কার্যকারণের অনুক্রমের শেষ পর্যায়ে আমরা এক অনিবার্য সত্তাকে মেনে নিতে বাধ্য হই যা স্ব-কারণিত (self-caused)। যেহেতু কারণ-প্রবাহ অনন্তকাল যাবৎ চলতে পারে না, তাই অনিবার্য সত্তা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অনিবার্য সত্তার ভিত্তি সে নিজেই। সে নিজেই তার সত্তা ও অস্তিত্বের কারণ।[১৫] এটা এক, এর কোনো কারণ নেই। এটা আত্ম-পর্যাপ্ত (self-sufficiant), পূর্ণতার সর্বোচ্চ মাত্রার অধিকারী এবং এর কোনো পরিবর্তন নেই। এর আদিকারণ নিজের মধ্যে চিন্তন প্রক্রিয়া এবং চিন্তন বিষয়কে সমন্বয় করে। এ আদিকরণ নিজেই এর চিন্তার বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই(subject and object of its thought)। এর মধ্যে কর্তা (subject) ও বিষয়ের (object) পার্থক্য তিরোহিত হয়। পুনরায়, এই আদিসত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না—কারণ, এর অস্তিত্বের কারণ সে নিজেই। নিজেই যে নিজ অস্তিত্বের কারণ, এটাই তার অস্তিত্বের প্রমাণ। এটা অনিবার্য বা নিশ্চয়াত্মক সত্তা যার অস্তিত্ব অন্যসব বস্তুর অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। এর মধ্যে সত্য ও বাস্তবতা, চিন্তন এবং সত্তা একাকার হয়ে আছে। এমন সত্তা এক এবং কেবল একই হতে পারে। যদি একের অধিক অন্যসত্তা থাকে, তবে সে

www.pathagar.com

সত্তার দ্বারা একক এর সরলতা সীমায়িত হয়ে যাবে। এটা একাধারে বাহ্য ও অন্তর (external and internal), অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী (immanent and transcendent)।

এ আদি সত্তাকে আল্লাহ্ বলা হয়। তাঁর মধ্যে জগতের বিভিন্ন বস্তু একীভূত হয়ে আছে। এ সত্তার কোনো সংজ্ঞা দেয়া যায় না। কিন্তু মানুষ জগতের যা কিছু মহত্তর, উচ্চতর ও সর্বোৎকৃষ্ট তা' এ সত্তার উপর আরোপ করে। যাই হোক, এসব কিছু তাঁর আবশ্যিক প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। অন্যগুলো জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ককে নির্দেশ করে। এসব গুণ তাঁর ঐক্যের (His unity) মূল সার (essence)-কে বিঘ্নিত করে না। রূপক অর্থেই এসব গুণকে বুঝতে হবে। আমাদের অপূর্ণ ও অপরিপক্ব বোধের দ্বারা এ সত্তাকে পুরোপুরি জানতে পারি না। তাঁকে জানার সর্বোত্তম পন্থায় এতটুকু জানা যে তিনি অপ্রবেশ্য[১৬] (inaccessible)। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ অজ্ঞেয়, কিন্তু অনিবার্য; কারণ, তিনি সবজ্ঞানের ঊর্ধ্বে। অন্য অর্থে, আমাদের সবজ্ঞানের মূলেই তিনি। এ জগতের সববস্তুর মূলে তিনিই হচ্ছেন আদিসত্তা। বস্তু সম্পর্কীয় জ্ঞান, প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্র জ্ঞানই প্রদান করে। এভাবে আল-ফারাবি সর্বখোদাবাদী মতবাদে উপনীত হন এবং জগতের বস্তুর জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্কে জানার প্রয়াস পান। জাগতিক বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলি আল্লাহ্রই প্রকাশ। আল্লাহ্ অতি পূর্ণাঙ্গ। তাই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা উচিত। আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞান হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ। দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে আদিকারণ, অর্থাৎ আল্লাহ্কে জানা। যেহেতু আল্লাহ্ সববস্তুর কারণ, তাই তাঁকে উপলব্ধি ও জানার মধ্য দিয়েই প্রত্যেক বস্তুকে বুঝা যায় এবং প্রত্যেক বস্তুকে ব্যাখ্যাও করা যায়। আল্লাহ্কে সরাসরিভাবে জানা যায় না। সৃষ্টির জ্ঞান স্রষ্টার সর্বোচ্চ শক্তি। নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেজন্যই সৃষ্টির কারণ স্রষ্টার ইচ্ছা (will) নয়, বরং স্রষ্টার চিন্তাই সৃষ্টির কারণ।

উচ্চতম থেকে নিম্নতম ক্রমিকে সত্তার বিভিন্ন স্তর আল-ফারাবি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[৭] এ স্তরের সংখ্যা ছয়টি। আদিসত্তা যিনি অনন্তকাল থেকে অস্তিত্বশীল তাঁর মধ্যে সববস্তুর আকার অস্তিত্বশীল ছিল বলে তিনি মনে করেন। তাঁর প্রতিবিম্ব 'দ্বিতীয় সব' (second all) হলো তাঁর প্রথম সৃষ্ট চিদাত্মা (spirit)। এটা অনন্তকাল ধরে তার নিকট থেকে আসে এবং বহিঃস্থ স্বর্গীয় মণ্ডলসমূহকে সঞ্চালিত করে। এ প্রথম চিদাত্মা থেকে পরপর আসে একটি থেকে আরেকটি মণ্ডলসমূহের আটটি চিদাত্মা। এ আটটি চিদাত্মা স্বর্গীয় পদার্থসমূহের গঠনকারী (creator)। আল-ফারাবির প্রথম চিদাত্মাসহ সর্বমোট এ ন'টি চিদাত্মাকে বলা হয় 'স্বর্গীয় দূত' বা ফেরেশতা এবং এদের সমবায়ে গঠিত হয় সত্তার দ্বিতীয় স্তর। সত্তার তৃতীয় স্তরে আছে প্রজ্ঞা (reason) যা মানুষের মধ্যে বর্তমান। একে পবিত্র আত্মাও বলা হয় যা স্বর্গ-মর্ত্যকে সংযুক্ত করে। আত্মার অবস্থান চতুর্থ স্তরে। প্রজ্ঞা ও আত্মা এক থাকে না। ব্যক্তি মানব সত্তায় তারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্তার পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্তরে আধ্যাত্মিক স্তরের অনুক্রম পরিসমাপ্ত হয়। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছয়টি স্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরসমূহ (যথা : আল্লাহ্, সৌরমণ্ডলসমূহ এবং প্রজ্ঞা) বিশুদ্ধ চিদাত্মা হিসেবে পরিগণিত, কিন্তু শেষ

www.pathagar.com

তিনটি স্তর (যথা : আত্মা, আকার ও জড়) অশরীরী হলেও শেষ পর্যন্ত দেহের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।[১৭]

অস্পষ্ট আকারের হলেও আল-ফারাবি বার্গসঁ-র[১৮] ন্যায় মনে করতেন যে, দেহধারী সত্তার উৎপত্তি চিদাত্মার কল্পনা থাকে। বিশুদ্ধ চিদাত্মা তাদের কল্পনায় দেহধারী ও শরীরীর উৎপত্তি ঘটায়। চিদাত্মার ন্যায় দেহকেও ছয়টি স্তরে ভাগ করা হয়, যথা : স্বর্গীয় দেহ, মানবীয় দেহ, নিম্নতর জীবশ্রেণির দেহ, উদ্ভিদ দেহ, খনিজ পদার্থের দেহ এবং অপরাপর বস্তুর দেহ।

জগতের সৃষ্টি একটি অনন্ত বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায়। আল্লাহ্ নিজেকে চিন্তা করে প্রথম চিদাত্মা সৃষ্টি করেন। পরে প্রথম চিদাত্মা নিজের স্রষ্টার কথা ভেবে দ্বিতীয় চিদাত্মা সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় চিদাত্মা নিজের ও স্রষ্টার কথা চিন্তা করে প্রথম দেহ বা সর্বোচ্চ স্বর্গীয় মণ্ডল (first body of uppermost celestial sphere) সৃষ্টি করেন। এভাবে প্রক্রিয়ার ধারা উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যায়ে চলে আসছে। এসব পর্যায় একত্রে মিলে এক অবিচ্ছিন্ন (unbroken) অবাধ শৃঙ্খল গঠন করে এবং এভাবে ঐক্য (unity) সৃষ্টি হয়। জগতের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ একই প্রক্রিয়ায় ঘটে। জগতের সমন্বয়ী শৃঙ্খলার মধ্যে সত্তার ঐক্য সুস্পষ্ট। জগতের সৌন্দর্যের শৃঙ্খলার মধ্যেও ঐশীসত্তার বিদ্যমানতা প্রকাশিত। জগতের যৌক্তিক বিন্যাস একই সাথে নৈতিক বিন্যাসও বটে। আল-ফারাবির মতে, প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ আধ্যাত্মিক। পদার্থকেও তিনি আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলে অভিহিত করেন। একটি মাত্র ঐশী ঐক্য সমগ্র জগতের মধ্যে প্রকাশমান। জগৎ পরিকল্পনার মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন ঐশী মহত্ত্ব বিরাজমান। এ পর্যায়ে লাইবনিজের (Liebnitz)[১৯] দর্শনের সাথে আল-ফারাবির দর্শনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

জগৎ নিঃসন্দেহে স্বর্গীয় মণ্ডলসমূহের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এ জগতের ঘটনার গতি-প্রকৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর সম্বন্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ জগতে যা ঘটে তা' অভিজ্ঞতাভিত্তিক নিয়মানুসারেই ঘটে। এটা বিশ্বাস করা অমূলক যে কোনো কোনো নক্ষত্র সৌভাগ্য আবার কোনো কোনো নক্ষত্র দুর্ভাগ্য আনয়ন করে। স্বর্গীয়মণ্ডল সর্বত্রই কল্যাণকর এবং এজন্য সেখান থেকে যা আসে তাই মঙ্গলজনক। অমঙ্গলের উৎপত্তি এই জগতেই, স্বর্গীয়মণ্ডলে-এর কোনো স্থান নেই।[২০]

আত্মা : আল-ফারাবি মনে করেন, মানুষ দু'টি উপাদান দ্বারা গঠিত—দেহ ও আত্মা[২১] (body and soul)। দেহ অংশ দ্বারা গঠিত, স্থান দ্বারা সীমিত, পরিমাপযোগ্য এবং বিভাজ্য। অন্যদিকে, আত্মা এসব দৈহিক গুণাবলির অতীত। প্রথমটি সৃষ্টি জগতের ফল, পরবর্তীটি অতীন্দ্রিয় জগতের শেষ স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। আত্মা সকল উপকরণ, দেহ সকল আধার। আত্মা অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়। আত্মা জড়ের মধ্যে গতি পরিবর্তন আনয়ন করে। আত্মার জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না। তবে দেহের ক্রিয়াকে পূর্ণতা দানের জন্য আত্মা বিভিন্ন শারীরিক অংশকে ব্যবহার করে থাকে। আত্মা দেহকে পূর্ণতা দান করে, অন্যদিকে, মন বা চিদাত্মা (mind or spirit) আত্মাকে পরিপূর্ণতা দান করে। আত্মার অভিব্যক্তি নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরের পানে। প্রকৃত মানুষ হচ্ছে চিদাত্মা।

www.pathagar.com

আল-কিন্দির ন্যায় আল-ফারাবিও মনে করেন যে, মানবাত্মা চার শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

১. সুপ্ত বা সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি
২. সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি
৩. অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি
৪. চালক বুদ্ধিবৃত্তি

এসব বুদ্ধিবৃত্তি ঊর্ধ্বগামী অনুক্রম গঠন করে। নিম্নস্তর বৃত্তি উচ্চস্তর বৃত্তির জন্য উপাদানবিশেষ। প্রথম বৃত্তিকে সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি বলা হয়। এটা হচ্ছে সেই শক্তি বা ক্ষমতা যার সাহায্যে মানুষ মানসিকভাবে বস্তু হতে বস্তুর গুণকে পৃথক করে বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি বলা হয়। এটা প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিকে সক্রিয় করে তোলে এবং অমূর্ত ধারণাকে সম্ভব করে তোলে। তৃতীয় বৃত্তির নাম অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি। এটা চালক বুদ্ধির অনুপ্রেরণায় অর্জিত ও পরিস্ফুটিত হয়। চেষ্টার দ্বারা মানুষ এ বৃত্তি অর্জন করে থাকে। চতুর্থ বৃত্তির নাম চালক বুদ্ধিবৃত্তি। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বৃত্তি। এ চালক বুদ্ধিবৃত্তি আল্লাহ্ থেকে সরাসরি মানবদেহে প্রবেশ করে এবং মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। এ বৃত্তি মানুষকে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় এবং ইষ্ট ও অনিষ্টের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশে সাহায্য করে। মৃত্যুর পর এ চালক বুদ্ধিবৃত্তি তাঁর মূল উৎস আল্লাহ্তে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর সাথে মিশে যায়। আল-ফারাবির আত্মা সম্পর্কীয় দর্শনে আত্মার অমরত্ব স্বীকার করা হলেও মানবাত্মার ব্যক্তিগত অমরতার স্থান নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে মানুষ ও ইতর প্রাণি উভয়ই সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী : কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের মধ্যে চালক বুদ্ধিবৃত্তি আছে যা পশুতে অনুপস্থিত।

মানুষের মধ্যে চিদাত্মার তিনটি স্তর রয়েছে। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জন দ্বারা সম্ভাব্য চিদাত্মা বাস্তবায়িত হয়।এ সম্ভাব্য চিদাত্মা পরিণামে অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞানে পরিচালিত করে যা সকল অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী। এটা মানুষকে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞান। এ আল্লাহ্র জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌছানো পর্যন্ত নিম্নতর চিদাত্মা সর্বদা ঊর্ধ্বারোহণের প্রচেষ্টায় রত থাকে। প্রশ্ন হতে পারে, মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত এ ধরনের জ্ঞান লাভ কতটুকু সম্ভব। এ জীবনে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক (rational) জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।[২২] এভাবে দেখা যায় যে, মরমিবাদী হিসেবে আল-ফারাবির দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[২৩]

৪. নৈতিক দর্শন (moral philosophy) : আল-ফারাবি একজন বুদ্ধিবাদী মুসলিম চিন্তাবিদ। স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমান, তাঁর নৈতিক দর্শনে ইসলামের মূল শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলের দর্শনও তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।[২৪]

আল-ফারাবির মতে, যুক্তিবিদ্যা (logic)জ্ঞানের মূল নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। আর নীতিবিদ্যা আলোচনা করে আচরণের মৌল নীতি বা নিয়মাবলি নিয়ে।

www.pathagar.com

তিনি দৃঢ়তার সাথে স্বীকার করেন যে, একটা আচরণ ভাল কি মন্দ প্রজ্ঞাই (reason) তা নির্ধারণ করবে। জ্ঞানই হচ্ছে উচ্চতম নৈতিক উৎকর্ষ। নৈতিক বিধানাবলি সম্পর্কীয় জ্ঞানকে উচ্চমর্যাদা দেয়া উচিত বলে আল-ফারাবি মনে করেন। যে ব্যক্তি নৈতিক নীতি জেনে শুনে তদানুযায়ী কাজ করেন, তিনি সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যিনি নৈতিক নিয়মের অর্থ অনুধাবন না করেই অন্ধভাবে তা' অনুসরণ করেন।

নৈতিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি (peace) লাভ করা। শান্তি হচ্ছে মনের একটি আনন্দদায়ক বা সুখকর অবস্থা যা সৎ ও মহৎ কাজের পরিণতি হিসেবে আমাদের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে। আল-ফারাবি তাঁর নীতিবিদ্যার শান্তিকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ঐহিক ও পারত্রিক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

মানুষ তার কার্যাবলির শুভ পরিণতি আশা করে। এ শুভ পরিণতিই হচ্ছে শান্তি। আল-ফারাবি মনে করেন, মানবজীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য হচ্ছে এ শান্তি অর্জন। "শান্তি হচ্ছে সর্বোত্তম শুভ এবং সর্বোত্তম পরিপূর্ণতা। শান্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিনা বিচারেই শুভ, ইহা জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়।"[২৫] সদ্‌গুণ (virtue) অর্জনের দ্বারা শান্তি লাভ করা যেতে পারে। ব্যক্তি মানুষের কার্যাবলি সঠিক ও ন্যায় হলে সে খ্যাতিলাভ করে, অন্যদিকে, কাজ অযথোচিত ও অন্যায় হলে সে দুর্ভোগের অংশীদার হয়। শুভ বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে ব্যক্তি সত্যের সন্ধান পায় এবং তা তাকে ভুলভ্রান্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অপরদিকে, অশুভ বুদ্ধিবৃত্তি তাকে বিপথে পরিচালিত করে। অব্যাহতভাবে 'শুভবুদ্ধিকে'[২৬] সঠিক পথে পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে পারে।

আসল কথা, শুভবুদ্ধির সহায়তায় প্রকৃত শান্তি অর্জনের অভ্যাসই হচ্ছে সদ্‌গুণ। সদ্‌গুণ আত্মার এমনএক অবস্থা যার দ্বারা মানুষ সৎ ও ভাল কাজ করতে পারে। মানুষের পক্ষে এ শান্তি অর্জন সম্ভব কিনা, এ এক বিরাট প্রশ্ন। আল-ফারাবি এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইহকাল ও পরকালে শান্তি অর্জন সম্ভব। কিন্তু শান্তি প্রাপ্তির বিভিন্ন মাত্রা আছে। আল-ফারাবি মনে করেন, দার্শনিক এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহৎ ব্যক্তিবর্গ এ শান্তি অর্জনে সক্ষম। দার্শনিক এবং প্রেরিত মহাপুরুষদের অনুসারী ও অনুগত হলে সাধারণ মানুষের পক্ষেও এ শান্তি অর্জন করা সম্ভব। তাই সাধারণ মানুষের উচিত দার্শনিকের সাথে প্রেরিত মহান পুরুষের জীবন ও আদর্শকে অনুসরণ করে চলা।[২৭]

আল-ফারাবির নৈতিক মতবাদ সদ্‌গুণের উপর ভিত্তি করে রচিত। সদ্‌গুণে সমৃদ্ধশীল ব্যক্তিবর্গই পার্থিব ও পরজগতের শান্তি লাভে সমর্থ। প্লেটোকে অনুসরণ করে আল-ফারাবি এমনও মন্তব্য করেন যে, সদ্‌গুণসম্পন্ন মহান ব্যক্তিগণই পরজগতে শান্তি পাবেন। শান্তি, সদ্‌গুণ, শান্তি পাওয়ার উপায় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে আল-ফারাবির নীতিদর্শনে অ্যারিস্টোটলের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[২৮]

৫. রাষ্ট্র দর্শন (Political philosophy) : রাষ্ট্র দর্শনে আল-ফারাবি 'এ ট্রিটাইজ অন দি অপিনিয়নস অব দি পিউপোল অব দি আইডিয়াল সিটি' এবং

www.pathagar.com

'পলিটিক্যাল ইকোনমি'[২৯] শিরোনামে দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখেছেন। প্রথম গ্রন্থটি হবসীয় প্রকৃতির নিয়ম (Law of nature)-এর বর্ণনা দিয়ে শুরু। প্রতিটি জীবদেহ অপর সকল জীবদেহের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামে রত। প্রতিটি সজীব বস্তু শেষ বিশ্লেষণে অপর সকল সজীব বস্তুর মধ্যে স্বীয়উদ্দেশ্য সাধনের উপায়[৩০] দেখতে পায় যা প্রকৃতির নিয়মের সূত্র। মানব সমাজ উন্মেষের জন্য আল-ফারাবি দু'টো মত বিবেচনা করেন : একটি কমবেশি রুশোর (Rousseau) সামাজিক চুক্তি (social contract theory) মতবাদের ন্যায়, অন্যটি নিট্শের (Nietzsche) 'ক্ষমতার ইচ্ছা' (will to power)-এর সাদৃশ্যানুরূপ[৩১]। আল-ফারাবি নিট্শের মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি জনসাধারণের জন্য এ আবেদন রাখেন যে, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষমতা ও সংগ্রাম দিয়ে নয়, বরং প্রজ্ঞা, ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে যাতে তারা সমাজ গঠন করেন। কেবলমাত্র এ ধরনের সমাজ দিয়েই আদর্শ রাষ্ট্র সৃষ্টি করা সম্ভব যার বিস্তারিত বিবরণ আল-ফারাবি প্রদান করেন। আদর্শ নগরের প্রশাসনের বিভিন্ন দিক বর্ণনায় তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) অনুরূপে রাষ্ট্রকে মানবদেহের 'ক্রমোচ্চ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের[৩২] সাথে তুলনা করেন। সুষ্ঠু মানবদেহের জন্য যেমন হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে, সুষ্ঠু ও আদর্শ রাষ্ট্রের জন্যও তেমনি প্রয়োজন হৃৎপিণ্ডের ন্যায়[৩৩] একজন দক্ষ শাসক ও তার সহযোগীবৃন্দ। শাসককে অবশ্যই সৎ, মহৎ, আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। তাঁদেরকে হতে হবে বিজ্ঞ, সাহসী ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন। আল-ফারাবির এ বর্ণনায় আমাদেরকে প্লেটোর দার্শনিক রাজার সদ্গুণাবলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অধিকন্তু, শাসকের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক দক্ষতার উপর আল-ফারাবি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে বিজ্ঞ, চরিত্রবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকের উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের স্থায়ী কল্যাণ এবং জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি। ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য, সামাজিক ন্যায়নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল দার্শনিক রাজার প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাষ্ট্রে যথার্থ কল্যাণ, জনসাধারণের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব।[৩৪]

ন্যায়পরতা বিষয়েও আল-ফারাবি তাঁর মত প্রকাশ করেন। লক্ষণীয় যে, এখানেও তিনি প্লেটোকে অনুসরণ করেন। ন্যায়পরতা বলতে আল-ফারাবি যা অর্থ করেন তা' হচ্ছে : রাষ্ট্রের সার্বিক ও অভিন্ন কল্যাণকে জনগণের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেয়া। জনস্বার্থে রাষ্ট্রে অভিন্ন কল্যাণ সংরক্ষণও তাঁর মতে ন্যায়পরতা। এককথায়, মানুষের মধ্যে সদ্গুণ সৃষ্টি করাই হচ্ছে ন্যায়পরতা। হারানো সম্পদ ও রাজ্যের পুনরুদ্ধারের যথাযথ ব্যবস্থা, অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান প্রভৃতি বিষয়ও ন্যায়পরতার অন্তর্ভুক্ত বলে আল-ফারাবি মনে করেন। আল-ফারাবি যুদ্ধবিগ্রহ অনুমোদন না করলেও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করা সমর্থন করেন তবে জোরপূর্বক রাষ্ট্রদখল বা সাম্রাজ্যবাদকে তিনি সমর্থন করেন নি।

আল-ফারাবি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেন। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলির উপর নির্ভর করে এ পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়। তিনি আদর্শরাষ্ট্র ও দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। আদর্শরাষ্ট্রে মানব-জীবনের কল্যাণ,

www.pathagar.com

শুভ ও সুখ পরিচর্যা হয়, অন্যদিকে, দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্র অকল্যাণ, অশুভকে উৎসাহিত করে। আল-ফারাবির বর্ণনায়[৩৫] চার প্রকার দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখা যায় :

১. অজ্ঞতার নগরী : এখানে নাগরিকগণ কখনও যথার্থ সুখ অবলোকন করেন নি এবং এর অনুসন্ধানও করেন নি।
২. একগুঁয়ে নগরী : এ নগরীর বাসিন্দাদের সুখের ধারণা জানা থাকা সত্ত্বেও তারা সেই অনুযায়ী জীবযাপন করতে পারেন নি।
৩. স্বধর্মত্যাগী নগরী : এ নগরীর অধিবাসীগণ প্রথমে আদর্শবাদী থেকে পরে বিচ্যুত হয়েছেন।
৪. ভ্রান্তিকর নগরী :এ নগরের অধিবাসিগণ আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে সক্ষম হয় নি।

উপসংহারে, আল-ফারাবির দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর দর্শন প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলের দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে, নৈতিক এবং রাজনৈতিক মতবাদে তিনি ইসলামি আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি। আল-ফারাবি একজন কাল-অতিক্রান্ত মহান চিন্তানায়ক। দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতি ও রাষ্টদর্শনে তাঁর সৃজনশীল চিন্তা ও ধ্যানধারণা পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মুসলিম দর্শনের ক্রমোন্নতির পথে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড : ডেভোলপমেন্ট অব মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল থিওরি, লন্ডন, ১৯০৬, পৃ. ২৫০
২. Cf. ইবনে খাল্লিকান : কিতাব ওয়াফাত আল আ'য়ান সম্পাদিত ওয়েস্টার্ন ফিল্ড, গটিনজেন, ১৮৩৫-৫০, ভল্যুম-২, পৃ. ৪৯৯, ইংরেজি অনুবাদ, এম. সি. সেন. ভল্যুম৩, পৃ. ৩০৭
৩ cf আল-ফাউয়াল আল-আসগার : ইংরেজি অনুবাদ খাজা আবদুল হামিদ, শেখ মোহাম্মদ আশরাফ, লাহোর, ১৯৪৬, পৃ. ৭-৩২
৪. রবার্ট হামন্ড : দি ফিলসফি অব আল-ফারাবি অ্যান্ড ইটস্ ইনফ্লুয়েন্স অন দি মেডিয়েভাল থট্‌স, নিউইয়র্ক, ১৯৪৭, পৃ. ৫৫ এবং ডি সালমান : 'দি মেডিয়েভল্ ল্যাটিন ট্রান্সলেশনস অব আল-ফারাবি'স ওয়ার্ক, নিউ স্কলাসটিসিজম, ১৯৩৯ পৃ. ২৪৫-৬১
৫. প্রফেসর এম. এ. হাসেম : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, পৃ. ১১৮
৬ গাণিতিক সত্তার ক্ষেত্রে বস্তুর সারসত্তা (Essence)ও অস্তিত্বের (Existence) মধ্যকার পার্থক্য আরো সহজভাবে ব্যাখ্যায়িত হতে পারে; যেমন, ত্রিভুজ। ত্রিভুজের সারসত্তা সহজেই ধারণা করা যায়, যদিও বাস্তবে এ প্রতীকের পূর্ণ দৃষ্টান্ত কোথাও নেই।
৭ ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৭২
৮. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, পৃ. ১১৮
৯. প্রফেসর সাঈদুর রহমান : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু মুসলিম ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, ১৯৬৩ পৃ. ৫৮
১০. ডি. ব্যুওর : হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, পৃ. ১১৬

www.pathagar.com

১১. প্রফেসর সাঈদুর রহমান : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু মুসলিম ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, পৃ. ৫৯
১২. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৪১২
১৩. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৭৬
১৪. অনিবার্য সত্তা ও সম্ভাব্য সত্তার মধ্যকার পার্থক্যের আরো বিবরণের জন্য এবং অধিবিদ্যায় এর তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য ইবনে সিনার উপর অধ্যায় পৃ. ১০১-০৩, ১০৯-১০দ্রষ্টব্য : সাঈদ শেখ, স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি।
১৫. আল-ফারাবির নির্গমনবাদের পূর্ণ বর্ণনার জন্য সাঈদ শেখের ইবনে সিনার উপর অধ্যায় পৃ. ৯৪-৯৮ দ্রষ্টব্য।
১৬. প্রফেসর সাঈদুর রহমান : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইসলামি ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, ১৯৬৩ পৃ. ৫৪-৫৫
১৭. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, ১৯৬২, পৃ. ৭৫-৫৬
১৮. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪০৬
১৯. ডি ব্যুওর :হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, পৃ. ১০০
২০. ডি ব্যুওর : হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, পৃ. ১১৭
২১. আল ফারাবি অভিজ্ঞতাভিত্তিক মনোবিদ্যার (Psychology) বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য : মুতাযিদ ওয়ালিউর রহমান-এর 'দি সাইকোলজি অব আল-ফারাবি', ইসলামিক কালচার, ১৯৩৭, পৃ. ২২৮-৪৭।
২২. আল-ফারাবির ব্যক্তিগত আত্মার অমরতা বিশ্বাসের আরো সমর্থনের জন্য দ্রষ্টব্য : আল-মদিনা-আল-ফাদিলা, আল কুদী কর্তৃক সম্পাদিত, কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৮, পৃ.-৬৪
২৩. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, ১৯৯১, পৃ. ১৭২
২৪. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিত, পৃ. ১২১
২৫. মুহাম্মদ শাহ্জাহান : আল-ফারাবির নীতিবিদ্যা।
২৬. আল-ফারাবি, তানবীহ্ ৫-৬ সেকশন
২৭. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, পৃ. ১২২
২৮. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, ১২৩
২৯. অর্থাৎ, কিতাব-আরা আহ্লে মদিনা আল-ফাদিলা এবং কিতাব-আল সিয়াসত-আল-মদিনা। আল-ফারাবির রাষ্ট্রদর্শনর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ই. আই. জে. রোসান্থল, পলিটিক্যাল থট্স ইন মেডিয়েভল ইসলাম, অধ্যায় ৬।
৩০. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৮৬
৩১. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৮৬
৩২. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৮৬
৩৩. cf আল-মদিনা আল-ফাদিলা, কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৮, পৃ. ৫৩-৫৪
৩৪. ড. আবদুল হামিদ ; মুসলিম দর্শন পরিচিতি, পৃ. ১২৩
৩৫. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, পৃ. ১২৪

www.pathagar.com

ইবনে মিসকাওয়াহ
(মৃত্যু : ১০৩০ খ্রি.)

ক. জীবনী

ইবনে মিসকাওয়াহ্‌র পূর্ণ নাম আবু আলী মুহাম্মদ ইয়াকুব। তবে তিনি ইবনে মিসকাওয়াহ নামেই সমধিক পরিচিত। আল-ফারাবির দর্শন যখন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল এবং ইবনে সিনারও যখন আবির্ভাব ঘটে নি সেই যুগসন্ধিক্ষণে মুসলিম দর্শনে ইবনে মিসকাওয়াহ্‌র আগমন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক আল-কিন্দি ও আল-ফারাবির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলেন। তবে মতবাদের দিক থেকে আল-কিন্দির চেয়ে আল-ফারাবির সাথে তাঁর সাদৃশ্য বেশি। তাঁর জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু একটা জানা যায় না। ধারণা করা হয় যে, তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। একজন ইতিহাসবিদ, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তাজারাব উল-উমান', 'তাজীব আল আহ্‌লাক', 'যাউজুল আসগার' ও 'যাউজুল আকবার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খ. দার্শনিক চিন্তাধারা : ইবনে মিসকাওয়াহ্‌র রচিত যাউজুল আসগার' গ্রন্থে তাঁর দার্শনিক মতবাদের সন্ধান মিলে। গ্রন্থের তিনটি অংশে তিনি, যথাক্রমে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ,আত্মা এবং নবুয়ত সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং এর বিচার-বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন।

১. আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব : ইবনে মিসকাওয়াহ মনে করেন যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব বিষয়ে প্রাচীন দার্শনিকগণ যে যুক্তি ও মতবাদ প্রদান করেছেন তা' অত্যন্ত গঠনমূলক ও সদর্থকমূলক এবং তাদের মতাবলি নবি-পয়গম্বরদের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১] আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য তিনি অ্যারিস্টোটলের গতিবিষয়ক যুক্তির সাহায্য নেন। আল্লাহ্‌কে সংজ্ঞায়িত করার সদর্থক ও নঞর্থক উভয় পদ্ধতির বিষয়গুলো তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এগুলো পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সদর্থকের চেয়ে নঞর্থক পদ্ধতিই আল্লাহ্‌র সংজ্ঞা নির্দেশের একমাত্র সম্ভাব্য উপায়। আল্লাহ্‌র নঞর্থক গুণাবলি ও সত্তা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হচ্ছে, "আল্লাহ্ একজন অচালিত চালক। তিনি অপরিবর্তনীয় এবং অন্যসব রকমের সত্তা থেকে স্বতন্ত্র। এ কারণেই তাঁকে কেবল সদর্থক শব্দ দ্বারা যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু, যেহেতু, তাঁর উপর সর্বোচ্চ পূর্ণতা আরোপ করা আবশ্যক, সেজন্যই এ ক্ষেত্রে আমাদের উচিত শাস্ত্রীয় বিধান এবং সামাজিক ঐক্যমত সত্য দ্বারা পরিচালিত হওয়া।"[২]

www.pathagar.com

বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বস্তুসমূহ আল্লাহ্ থেকে নির্গত হয় বলে ইবনে মিসকাওয়াহ মনে করেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম যে সত্তার বিকিরণ হয়, তা হচ্ছে আদি বুদ্ধি। একে তিনি সক্রিয় বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন। এই আদি বুদ্ধি বা সক্রিয় বুদ্ধি চিরন্তন (eternal), আকারহীন (formless) ও পরিপূর্ণ (perfect)। শুধু আল্লাহ্‌র প্রেক্ষাপটে এটি অপরিপূর্ণ। এরপর, যথাক্রমে, বিকিরণ ঘটে আত্মা ও নভোমণ্ডলের (heavens)।

২. আত্মা : ইবনে মিকাওয়াহ মনে করেন, আত্মা হচ্ছে এক সরল ও অজড়ীয় সত্তা। আত্মা তার নিজ অস্তিত্ব, জ্ঞান ও ক্রিয়াপরতা সমন্ধে সচেতন। আত্মা এমন একটি আধ্যাত্মিক সত্তা যা বিরুদ্ধ বস্তু ও গুণাবলিকে একই সঙ্গে ধারণ করতে পারে। আত্মা, আবার একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক সত্তার ধারণাবলি সম্পর্কেও সচেতন থাকতে পারে। ইন্দ্রিয়জগতের বাইরে ও ভিতরে আত্মার জ্ঞান বিস্তৃত থাকে। আত্মা এমন সব বস্তুর যৌক্তিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম যা ইন্দ্রিয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মার এই বৌদ্ধিক বৃত্তি (rational faculty) আমাদের অভিজ্ঞতার অভিন্ন উপাদানকে সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানে একীভূত ও সমন্বিত করে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সত্য-মিথ্যা আত্মা এভাবে যাচাই করতে সক্ষম।

আত্মা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় আত্মচেতনায়। এখানে চেতনার বিষয়ী (subject) ও বিষয় (object) এক ও অভিন্ন রূপ লাভ করে। এটা হচ্ছে মানব-আত্মার (human soul) বৈশিষ্ট্য। আত্মার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে যৌক্তিক অনুধ্যানের (rational speculation) ভিত্তিতে আত্মা আত্মবিচার করতে সক্ষম। যৌক্তিক অনুধ্যানের মাধ্যমে আত্মা ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করে। এতে করে ব্যক্তির নৈতিক সত্তার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই যৌক্তিক অনুধ্যানের মাধ্যমে মানুষ মহৎ ও কল্যাণের দিকে প্রধাবিত হয়।

বিবর্তন বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া : ইকবাল ইবনে মিসকাওয়াহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কীয় মতবাদকে দু'টো অংশে ভাগ করেছেন : ক. পরমসত্তা বা আদিকারণ শূন্যতা হতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি, এবং খ. সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

ক. পরমসত্তা বা আদিকারণ শূন্যতা হতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি : ইবনে মিসকাওয়াহ একজন ইসলাম ধর্মের অনুরাগী। এই কারণে বিকিরণবাদের সমর্থক হয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত বিশেষ সৃষ্টিবাদে (Theory of special creation) বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, শূন্য থেকে আল্লাহ্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই ধারণার পেছনে মূল যুক্তি হচ্ছে : আকারসমূহের একটি অপরটির পরিবর্তিত রূপ। তবে তাদের নির্যাস অপরিবর্তিত থাকে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় : পূর্ববর্তী আকারটি পরবর্তী আকারে রূপান্তরিত হবার পর পূর্ববর্তী আকারটি যায় কোথায়? প্রথমত, আকার দু'টো একসঙ্গে থাকতে পারে না, কারণ, এরা স্বতন্ত্র ও পৃথক। দ্বিতীয়ত, প্রথম আকারটি অন্যত্রও যেতে পারে না। কারণ, শুধু জড় বস্তুর ক্ষেত্রে দৈহিক গতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখন থাকে তৃতীয় সম্ভাবনার এবং সেটি হচ্ছে, প্রথম আকারটি অসত্তা (not being) বা শূন্যে পর্যবসিত হয়ে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাবনাগুলো অসম্ভব বলে তৃতীয় বিকল্পটিই

www.pathagar.com

একমাত্র সত্তা। এর অর্থ হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী আকারটি যদি অসত্তায় পরিণত হয়, তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রভৃতি সব পূর্ববর্তী আকারসমূহ অসত্তা বা শূন্য থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ, বস্তু শূন্য থেকে সৃষ্ট, আল্লাহ্ শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

খ. সৃষ্টিপ্রক্রিয়া : ইবনে মিসকাওয়াহ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার যে বর্ণনা প্রদান করেন তা' সাধারণভাবে ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ডারউইনের প্রায় নয়শত বৎসর পূর্বে ইবনে মিসকাওয়াহ বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ ধারণা পোষণ করে গেছেন। মওলানা শিবলি তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ইলমুল কালাম'-এ ইবনে মিসকাওয়াহর বিবর্তনবাদের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

আদিম দ্রব্যসমূহ মিলে প্রাণের নিম্নতর রূপ খনিজ জগৎ সৃষ্টি করেছিল। এর উচ্চতর পর্যায়ে হলো উদ্ভিদ জগৎ। প্রথমে স্বতঃস্ফূর্ত তৃণ, তারপর লতাগুল্ম এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষরাজি। বৃক্ষশ্রেণির কোনো কোনো বৃক্ষ প্রাণিজগতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে পৌঁছে গেছে এবং এদের মধ্যে কিছু জৈবিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এমন প্রাণের উদ্ভব ঘটে যা প্রাণী বা উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এর মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন, প্রবাল ও কীট। প্রাণের মধ্যবর্তী স্তরের পরবর্তী প্রথম স্তর হলো গতিশক্তির বিকাশ এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে হেঁটে চলে এমনসব ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের মধ্যে স্পর্শ-সংবেদনের বিকাশ। পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে স্পর্শ সংবেদন অন্যান্য সংবেদনে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে যে পর্যন্ত না আমরা উচ্চতর প্রাণীতে উপনীত হই যার মধ্যে ক্রম উচ্চগতিতে বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। এই অবস্থার ক্রমবিকাশ চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে খাড়া দেহ এবং মনুষ্যোচিত বুদ্ধিবৃত্তি অভিব্যক্তি ঘটে।

এই স্তরে পশুত্বের অবসান এবং মনুষ্যত্বের সূচনা হয়।[৩] মানবীয় পর্যায়ে বিবর্তন প্রক্রিয়া পরিণতি লাভ করে নবি-পয়গম্বরদের জীবনে এবং তাঁদের জীবনেই আত্মা অর্জন করে পরিপূর্ণতা।

৩. নৈতিক মতবাদ : তাহজিব আল-আখলাক' নৈতিকতার অনুশীলন গ্রন্থে ইবনে মিসকাওয়াহ তাঁর নৈতিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, মানুষের আত্মা সরল ও আধ্যাত্মিক দ্রব্য। আত্মা নিজ অস্তিত্ব, জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন। আত্মা আধ্যাত্মিক সত্তা। কারণ, আত্মা একই সঙ্গে বিরোধী গুণাবলি ধারণ করতে পারে।[৪] এতদ্ব্যতীত আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের ধারণা করতেও সক্ষম। ফলে, জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আত্মার জ্ঞান ও ক্রিয়া দেহের সীমা অতিক্রম করে বহু উর্ধ্বে উন্নীত হয়। আত্মার সহজাত বিচারশক্তির জ্ঞানও রয়েছে। এই বিচারশক্তির দ্বারাই আত্মা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সুসংহত, সুসংবদ্ধ ও সমন্বিত করে। প্রজ্ঞাই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করতে পারে। আত্মসচেতনতার মধ্যেই আত্মার ঐক্য অনুভূত হয় এবং বিষয়ী ও বিষয় অর্থাৎ কর্তা ও কর্মের ব্যবধান ঘুচে যায়। এটা মানবাত্মার বৈশিষ্ট্য। মানবাত্মার আত্ম-বিবেচনা শক্তি রয়েছে। এই শক্তি দ্বারাই মানুষ ন্যায়-অন্যায় এবং ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে। এই কারণেই মানুষ হচ্ছে এক নৈতিক সত্তা। বুদ্ধি হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্যসূচক আচরণ নিয়ামক শক্তি।

www.pathagar.com

এই শক্তির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ তার জন্য বয়ে আনে কল্যাণ বা শুভ। মানুষের বিচার-বিশ্লেষণ, বিবেচনা ও কল্পনাশক্তি রয়েছে বলেই সে পূর্ণ আদর্শের কথা চিন্তা করতে পারে। কল্যাণ বা শুভ অর্জন করতে হলে সেই পূর্ণ আদর্শের বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য। সকল মানুষের শক্তি সমরূপ না থাকার কারণে কল্যাণের ধারণার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। জন্মলগ্ন থেকে মানুষ দু'টো সম্ভাবনার অধিকারী : (১) মানুষ উচ্চ ও মহৎ নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে। (২) মানুষ আবার পশুর নিম্নস্তরেও অবনমিত হতে পারে। মানুষের উন্নতি বা অবনতি, আবার, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, সমাজ ও শিক্ষাই মানুষকে নৈতিক উন্নতি বা অবনতি দান করে।[৫]

শুভ বা কল্যাণ বিশেষ অথবা সার্বিক হতে পারে। সার্বিক কল্যাণ মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। পরিণামে পরম সত্তার জ্ঞান সব বিশেষ শুভ কর্মের চরম লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষ স্বভাবতই তার নিজের কল্যাণ কামনা করে। কিন্তু সে যখন পরম ও চরম লক্ষ্যে অগ্রসর হয়, তখন তার ব্যক্তিগত এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। কারণ, প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হলেই মানুষ ভাল হতে পারে, পারে সুখী হতে। প্রজ্ঞা ব্যতীত মানুষ যদি ভাবাবেগ ও চিন্তাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়, তখনই তার জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়, অধঃপতন। এই কারণেই সদ্‌গুণ হচ্ছে মানবীয় উৎকর্ষতা।

বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ বা অবস্থার মধ্যে বাস করে। এই কারণে তারা অসম নৈতিক শিক্ষা ও প্রগতি প্রাপ্ত হয়। ফলে, শুভ ও সুখ সম্বন্ধে তাদের ধারণাও ভিন্নতর হয়ে আছে। নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য মানুষকে সমাজেই বসবাস করতে হয়, কারণ, সমাজই নৈতিক প্রশিক্ষণের সত্যিকার ক্ষেত্র। যে ব্যক্তি বা মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মস্বার্থ বা আত্মসুখ নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, তার নৈতিক বিকাশ বা উৎকর্ষ সাধন ঘটে না। প্রেম বা ভালবাসাই হচ্ছে নৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি। আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ নয়, বরং সমাজের মঙ্গল সাধন হওয়া উচিত প্রতিটি মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য। আত্মবাদ (egoism) যত বর্জনীয়; নৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনাও তত অধিক। মানবতার জন্য প্রেম, ভালবাসা, অনুরাগ সবরকম সদ্‌গুণের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মস্বার্থের উপর সামাজকি কল্যাণের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তবেই কেবল সমাজে নৈতিক পূর্ণতা অর্জন করা যেতে পারে। নৈতিকতাকে অপরিহার্যভাবেই সামাজিক নৈতিকতা হতে হবে।

অ্যারিস্টোটল মনে করেন, বন্ধুত্বের অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রেমের বিস্তৃতি সাধন। কিন্তু এই মতবাদ সঠিক নয়। বন্ধুত্ব, প্রকৃতপক্ষে, আত্মপ্রেমের সীমিতকরণ, কিংবা, প্রতিবেশীকে ভালবাসার প্রচেষ্টা। সমাজের সঙ্গে যে নির্জন সাধুর সম্পর্ক নেই তা' সদ্‌গুণ বা নৈতিকতা বিকাশের পক্ষে উপযোগী নয়। একজন নিঃসঙ্গ সাধু ধর্মপ্রাণ হতে পারেন, কিন্তু তিনি নৈতিক ব্যক্তি নন। কারণ, সামাজিক অমঙ্গল, অকল্যাণ ও অশুভের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন না। জগৎ বা সংসার পরিত্যাগী মনোভাব একধরনের নৈতিক পরাজয়। সমাজের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই নৈতিক অগ্রগতি

www.pathagar.com

অর্জন করতে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, সব ধর্মীয় নিয়মই আসলে নৈতিক নিয়ম। কারণ, ধর্ম মাত্রই জনগণের নৈতিক প্রশিক্ষণস্বরূপ। ইবনে মিসকাওয়াহর নৈতিক মতবাদে ইসলাম ধর্মের নিয়ামবলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই মতবাদ সুফিদের সন্ন্যাসবাদের (asceticsim) বিরোধী।

নৈতিকতার উপর সমাজের গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে প্রাচ্যের মহান দার্শনিক ইকবাল বলেন, ব্যক্তির পক্ষে সমাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকা একটা আশীর্বাদ। কারণ, সামজেই ব্যক্তির মূল্য পূর্ণতা লাভ করে। সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি তার উচ্চতর লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্মৃত থাকে এবং সে প্রধাবিত হতে থাকে অধঃপতন বা অবক্ষয়ের দিকে। সমাজজীবন ব্যক্তিকে প্রদান করে অন্যান্য ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত, একত্রে মিলেমিশে চলার অবিরত সংগ্রামের ফলেই সম্ভব হয় নৈতিক উন্নতি বা প্রগতি। নির্জন, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী মাত্রই ধর্মবিরোধী। কারণ, তিনি সংগ্রামের মুখোমুখি হন না। বস্তুত মানুষ যে সামাজিক জীব এবং সামাজিক কল্যাণ যে তার নৈতিক জীবনের অন্যতম লক্ষ্য,ইবনে মিসকাওয়াহ বারবার এই সত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, ১৯৮৫, পৃ. ২০৯
২. মূল : যাউজুল আসগর : আমিনুল ইসলাম : ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, পৃ. ২০৯ এম. ফখরি : এ হিস্ট্রি অব ইসলামিক ফিলসফি, ১৯৮৩, পৃ. ১৪৭
৩ ইকবাল : ডেভোলপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স ইন পারসিয়া, পৃ. ৩১.
৪. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, ১৯৮৪, পৃ. ২১১
৫. ডি. ব্যুওর :হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, পৃ. ১৩০

www.pathagar.com

ইবনে সিনা
(৯৮০-১০৩৭ খ্রি.)

সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি

ইবনে সিনার পূর্ণ নাম আবু আলী হুসায়ন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। ল্যাটিন আবি সিনা (Avicenna) এবং হিব্রুতে আবেন্‌ সিনা (Avensina) নামে তিনি সুপরিচিত। তিনি সর্ববিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি একজন দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ। তিনি মুসলিম বিশ্বে একজন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী, প্রাচ্যজগতে তিনি যথার্থভাবে[১] "আল-শায়খ আল-রাঈস" বা প্রধান শায়খ নামে পরিচিত। তিনি সবজাতি, সবদেশ ও কালের জ্ঞানী-গুণীদের অন্যতম।[২] ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতার সাথে বোখারায় যান এবং সেখানে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেন। তারপর বিভিন্ন উস্তাদের নিকট ফিক্‌হ ও কালাম শিক্ষা করেন। এর পূর্বে তিনি সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ইসমাঈলীগণের সাথে সংশ্রবের ফলে আত্মা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি তাদের আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে কথিত হয়। যুক্তিবিদ্যা, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা তিনি আবদুল্লাহ নাতিলীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। শিষ্যের মানসিক বৃত্তির এত দ্রুত স্ফুরণ ঘটতে থাকে যে, অতি অল্প সময়েই তিনি শিক্ষকের জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যান। এ সময়ে তিনি পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠ করতে থাকেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি স্বল্প সময়েই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং চিকিৎসা কার্যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। হিপোক্রেটিস কর্তৃক সৃষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞান গ্যালন পুনরুজ্জীবন দান করেন, আল-রাযী একে সুসংবদ্ধ করেন এবং ইবনে সিনা একে পূর্ণতা দান করেন বলে জানা যায়। আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি নিজেকে লেখাপড়ার কাজে ব্যাপৃত রাখেন। বারবার চেষ্টা করেও প্রথমে তিনি দর্শনশাস্ত্র বুঝে উঠতে পারেন নি। অ্যারিস্টোটল পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করেও তা' তাঁর নিকট বোধগম্য হয়ে ওঠে নি। অবশেষে, আল-ফারাবির একখানা গ্রন্থ[৩] আল-ইবানা' পাঠ করে তিনি দর্শনশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় অনুধাবন করতে সক্ষম হন। আল্লাহ্‌র নিকট তিনি শোকরানা আদায় করেন।

১৬-১৮ বৎসর বয়সে ইবনে সিনা বোখারার শাসনকর্তা নূহ ইবনে মানসুরের চিকিৎসা করেন এবং এতে তিনি পূর্ণ সফলতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তাঁরই অনুকম্পায় তিনি বাদশাহি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এখানে তাঁর মেধা ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। এ সময়ে তাঁর পিতা ও বোখারার শাসনকর্তার মৃত্যু

www.pathagar.com

তাঁকে সংকটের মধ্যে ঠেলে দেয়। বোখারার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে তাঁকে বোখারা পরিত্যাগ করতে হয়। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি খাওয়ারিযম পৌঁছেন। সেখানে তিনি আল-বেরুনি, আল-ইরাকি এবং আবুল খায়ের প্রভৃতি জ্ঞানী ও সুফি সাধকদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। কিছুদিন খাওয়ারিযম অবস্থানের পর তিনি ইরাক-ই-আজমে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি প্রচলিত ধর্মীয় মতের বিপরীত মত প্রকাশ করার দরুণ গযনীর সুলতান মাহমুদের রোষানলে পড়েন এবং প্রাণভয়ে জুরজানে প্রস্থান করেন। এ সময়ে তিনি কখনও মন্ত্রী, কখনও দার্শনিক, কখনও চিকিৎসক, কখনও বা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন, আবার কখনও তাঁকে রাজনৈতিক অপরাধী বলেও গণ্য করা হতো। ১০২২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে তিনি আমির আলা-আল-দাওলা আবু জাফরের সাহায্য লাভ করেন। তিনি স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদের পোষক ছিলেন এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা সিনাকে নিজের কাছে রাখতেন। এ-সময়ে ইবনে সিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আলা-আল-দাওলার সাথে হামদানে যাত্রাকালে তাঁর পুরাতন শূলবেদনা তীব্রভাবে শুরু হয়। ফলে ২১শে জুন ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র সাতান্ন বৎসর বয়সে এ অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ঘটে। হামদানে তাঁর কবর এখনও বিদ্যমান।[৪]

রচনাবলি : অতি অল্প বয়সেই ইবনে সিনার রচনাবলির কাজ শুরু হয়েছিল। তাঁর রচনাবলি গদ্য ও পদ্য—উভয়ই : অধিকাংশ রচনাই আরবিতে এবং কিছুসংখ্যক ফারসিতে। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ, ইলমুল কালাম এবং ভাষাতত্ত্ব, সংগীত বিষয়ের উপর লিখেছেন। 'আল-শিফা' অল্প বয়সের রচনা হলেও এটা অত্যন্ত ব্যাপক প্রকৃতির। এতে তিনি সমগ্র দর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং অধিবিদ্যার উপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মুসলিম বিশ্বে 'আল-শিফা' গ্রন্থটি আজও মুসলিম দর্শনের একটি প্রামাণ্য পুস্তক হিসেবে বিবেচিত। 'কানুন-ফিত-তিব্ব' চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর রচিত তাঁর অমর গ্রন্থ। এতে প্রাচীন ও সমসাময়িক চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে ইসলামি লব্ধ জ্ঞানসমূহ সুশৃংখলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্বাদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থটি প্রতীচ্য বিশ্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে। ইউরোপে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ গ্রন্থটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত। ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থখানি এক প্রামাণ্য পুস্তক। ড. অসলার (Dr. Oslar) তাঁর 'ইভোলিউশন অব মেডিক্যাল সায়েন্স' গ্রন্থে ইবনে সিনার রচিত 'কানুন-ফিত-তিব্ব'-কে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) বা বাইবেল বলে উল্লেখ করেছেন। 'আল-শিফা' এবং 'কানুন-ফিত-তিব্ব' ব্যতীত তাঁর রচিত 'সাদিদিয়া' 'ওয়ুন-আল-হিকমাত', 'দানেশনামা', 'হিকমাত-ই-শারেকিয়া' (philosophy of the east). 'আন-নাজাহ' 'কিতাবুল ইনসাফা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ইবনে সিনা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পান করতে চেয়েছেন।[৫] তাঁর মধ্যে ভোগস্পৃহা ও জ্ঞানস্পৃহা সমানভাবে কাজ করেছে। তাঁর জ্ঞানসাধনা ও সাফল্য যে কোনো জাতি ও কালের জন্য গর্বের বিষয়।

www.pathagar.com

দর্শন : মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ইবনে সিনা জ্ঞানের গভীরতায়, চিন্তার বিশালতায় এবং সার্বজনীন উদার মনোভাবের জন্য বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অ্যারিস্টোটলের দর্শনের তিনি একজন খ্যাতনামা ভাষ্যকার। ইসলামি শিক্ষার সাথে অ্যারিস্টোটলের দর্শনের সমন্বয় সাধনের যে প্রয়াস আল-কিন্দি ও আল-ফারাবি কর্তৃক সূচিত হয়েছিল, ইবনে সিনা তাকে পূর্ণতা দান করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সফল প্রচেষ্টার জন্যই অ্যারিস্টোটলের দর্শনচর্চা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং চরম বিকাশপ্রাপ্ত হয়। অ্যারিস্টোটলীয় দার্শনিকদের মধ্যে আল-ফারাবির মৌলিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখাই ইবনে সিনাকে অ্যারিস্টোটলের দর্শন অনুশীলনের অনুপ্রেরণা যোগায়। অ্যারিস্টোটলের উপর টীকা ও ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি আল-ফারাবির রচনাকে ভিত হিসেবে গ্রহণ করেন।

তাঁর পূর্ববর্তীদের অসদৃশে (unlike), ইবনে সিনা বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞানের উপাদান (materials) সংগ্রহ করেন এবং তাঁর নিজস্ব দর্শন-পদ্ধতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করেন। তিনি সংগতিপূর্ণভাবে কোনো দর্শনমতকেই অনুসরণ করেন নি। তাঁর নিজস্ব দর্শনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত উপকরণের সমন্বয় সাধন করেছেন। বস্তুত বিভিন্ন দর্শনমতের সমন্বয় সাধনই হচ্ছে ইবনে সিনার দর্শন। ও' লিয়ারি তাঁকে সমগ্র বিশ্বের সারসংক্ষেপ রচনাকারীদের অগ্রদূত বলে বর্ণনা করেন। অন্যদের মতবাদের ভাষ্য রচনার পরিবর্তে তিনি নিজ দর্শনকে বিকশিত করেন যাতে পুরোনো মতবাদ নতুন রূপ লাভ করে। ডি বুয়ের অভিমত পোষণ করেন যে, অ্যারিস্টোটলের ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি আল-ফারাবির ন্যায় নিজেকে সাধারণ জীবন থেকে সরিয়ে রাখেন নি এবং কেবল অ্যারিস্টোটল নিয়েই নিমগ্ন থাকেন নি। তিনি গ্রিক দর্শনের সাথে প্রাচ্যের জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেন।

ইবনে সিনা দর্শনকে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে মনে করেন। প্রজ্ঞার (reason) সাথে বিশ্বাসের (faith) সমন্বয় করা দর্শনের কাজ নয়। প্রজ্ঞার সহায়তায় জীবনের মূল সমস্যাবলিকে ব্যাখ্যা করাই হচ্ছে দর্শনের কাজ। আল-ফারাবির পর সকল মুসলিম চিন্তাবিদের একটা সাধারণ মনোভাব ছিল দর্শনকে ধর্ম থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে ভাবা। যুগের এ প্রবণতার অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিনিধি ছিলেন ইবনে সিনা। তিনি তাঁর রচনায় এ ভাবধারার জোর সমর্থন জানান।

তাই দেখা যায় যে, দর্শন হচ্ছে এক সর্বব্যাপী বিষয় যা নিজের পরিসরের মধ্যে সকল অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেবলমাত্র তারাই পূর্ণতা অর্জন করতে পারেন যারা এর সর্বব্যাপী বিষয়ে নিজেকে নিমগ্ন রাখেন। অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানসমূহের চর্চা আমাদেরকে জ্ঞান দান করতে পারে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র দর্শন পাঠেই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত দর্শন অনুশীলন করা।

ইবনে সিনার অতি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক মতবাদ নিয়ে তিনটি শিরোনামে সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া যেতে পারে।[৭] (১) যুক্তিবিদ্যা, (২) মনোবিদ্যা, (৩) অধিবিদ্যা। এতদ্ব্যতীত তিনি পদার্থবিদ্যা ও বিবর্তনবাদ সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

১.যুক্তিবিদ্যা : অ্যারিস্টোটলের ন্যায় ইবনে সিনার রচনাবলির শুরু হয়েছে যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র দিয়ে। ইব্রাহিম মাকদুর মনে করেন, দর্শনে তিনি অ্যারিস্টোটল অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁর দর্শন এক হিসেবে নতুন ন্যায়ের অগ্রদূত। মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে একটি চিন্তামূলক শিল্প। 'আল-নাযাত' শিরোনামে তাঁর রচিত সংক্ষিপ্তসার (compendium)-এর কিছু অংশে আমরা তাঁর যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক ব্যাপক আলোচনার সাক্ষাৎ পাই। 'আল-ইশারাত' নামক তাঁর অন্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশে যুক্তিবিদ্যা আলোচিত হয়েছে।

তিন প্রকারের অস্তিত্ব রয়েছে—বৌদ্ধিক (Intellectual), জড়ীয় (material) এবং আধ্যাত্মিক (spiritual)। যুক্তিবিদ্যা বৌদ্ধিক বা মানসিক প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে, পদার্থবিদ্যা আলোচনা করে জড়ীয় বিষয়কে নিয়ে এবং অধিবিদ্যা আলোচনা করে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে নিয়ে। পদার্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দেহধারী (corporeal) বস্তুসমূহ। অন্যদিকে, অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বসমূহ। আধ্যাত্মিক বাস্তব সত্তাসমূহ আধ্যাত্মিক এবং অতীন্দ্রিয় স্বভাবের, ফলে তারা জড়-বিবর্জিত। যুক্তিবিদ্যা মানসিক ধারণাসমূহ (mental concepts) নিয়ে আলোচনা করে। এ ধারণাসমূহ বাস্তব অস্তিত্ব হতে বিমূর্তীকৃত (abstracted from realities)। এসব ধারণার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, মানসিক উপাত্ত হিসেবে এরা বিদ্যমান। গণিতের ন্যায় যুক্তিবিদ্যা বিমূর্ত (abstraction)-কে নিয়ে আলোচনা করে। তবে, গণিতের বিমূর্তীকরণ এবং যুক্তিবিদ্যার বিমূর্তীকরণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গাণিতিক বিমূর্তীকরণ বা ধারণাসমূহকে অভিজ্ঞতার আকারে প্রদর্শন ও গঠন করা যায়। কিন্তু যুক্তিবিদ্যার ধারণাবলিকে কখনও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রদর্শন করা যায় না।

এভাবে দেখা যায় যে, যুক্তিবিদ্যা চিন্তার নিয়ন্ত্রণমূলক সূত্র বা নীতির বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তিবিদ্যার কাজ সদর্থকের চেয়ে নঞর্থকই বেশি। যুক্তিবিদ্যা মূলত নিয়ম ও নীতি গঠন করে, যার অনুসরণে চিন্তনের ভুলভ্রান্তি পরিহারে সাহায্য করে এবং পরোক্ষভাবে সত্য অর্জনের পথনির্দেশনা দেয়।[৮]

সুষ্ঠু চিন্তা সঠিক সংজ্ঞায়নের দ্বারা আরম্ভ করা উচিত যাতে করে চিন্তনের কোনো ভুলভ্রান্তি থাকতে না পারে। ইবনে সিনা সংজ্ঞায়নের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ, সংজ্ঞা সকল সুষ্ঠু চিন্তার ভিত্তিস্বরূপ। এ পর্যায়ে ইবনে সিনা সংজ্ঞা (definition) এবং বর্ণনা (description)এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। সংজ্ঞা বস্তুর আবশ্যিক ও অপরিহার্য দিক দিয়ে আলোচনা করে, অন্যদিকে, বর্ণনা আলোচনা করে বস্তুর অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় দিক নিয়ে। অ্যারিস্টোটলের ন্যায় ইবনে সিনাও মনে করেন যে, প্রতিটি বচনের দু'টো পদ রয়েছে : এক, উদ্দেশ্য পদ : দুই, বিধেয় পদ। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পাঁচ প্রকার সম্বন্ধের কথাও তিনি উল্লেখ করেন,[৯] যথা—জাতি, প্রজাতি, বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ।

অ্যারিস্টোটলের সদৃশে ইবনে সিনা যুক্তিবিদ্যার ন্যায়ানুমান বা সহানুমানের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। সহানুমান হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে দু'টি সত্যের বিচারের ভিত্তিতে তৃতীয় কোনো সত্যকে অনুমান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, যৌক্তিক

www.pathagar.com

কাঠামোর মূল হচ্ছে সহানুমান। ইবনে সিনা কোনো ঘটনার পশ্চাতে চারটি কারণ রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন যথা : উপাদান কারণ, রূপগতকারণ, নিমিত্ত কারণ এবং পরিণতি কারণ। বলা বাহুল্য, এগুলো আমাদেরকে অ্যারিস্টোটলের কার্যকারণ তত্ত্বের চার কারণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইবনে সিনার ধারণা, বস্তু বা ঘটনা সংজ্ঞায়নের মধ্যে উল্লেখিত চার প্রকার কারণ একই সাথে উপস্থিত থাকতে পারে। যেমন, ছুরি : ছুরিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে : ছুরি হচ্ছে একটি লোহা যা বস্তু কাটার নিমিত্তে কামার তাকে একটা নির্দিষ্ট আকার দান করে।[১০]

যুক্তিবিদ্যার সাধারণ ধারণাবলি (general concepts) মানসিক সত্তা বৈ আর কিছু নয়। তাদের বস্তুগত (objective reality) বাস্তব সত্তা নেই। যেসব বাস্তববাদী মনে করেন যে, বিশেষের পূর্বে (before the particulars) সাধারণ ধারণাবলির অস্তিত্ব ছিল ইবনে সিনা তার বিরোধিতা করেন। সার্বিকসমূহ বিশেষের পূর্বে শুধু এ অর্থে যে, বিশেষ বস্তু গঠন হওয়ার পূর্বে সাধারণ ধারণাগুলো স্রষ্টার মনে অস্তিত্ব ছিল, যেমন ছবি বাস্তবায়নের পূর্বে ছবির চিত্র চিত্রকরের মনে বিদ্যমান থাকে। বিশেষকে বাদ দিয়ে সার্বিকসমূহ হচ্ছে শুধু মানসিক সত্তা। তাই দেখা যায় যে, সার্বিক শুধু চিন্তা বা মানসিক জগতেই বিরাজ করে—এই হিসেবে ইবনে সিনা একজন ধারণাবাদী।[১১]

ইবনে সিনার যুক্তিবিদ্যা আল-ফারাবির[১২] যুক্তিবিদ্যার চেয়ে খুব বেশি একটা ভিন্ন নয়। তিনি মনে করেন, যুক্তিবিজ্ঞানের সফল প্রয়োগে মানব প্রজ্ঞার ভুল ভ্রান্তি[১৩] সংশোধন ও উন্নয়ন করা সম্ভব। প্রজ্ঞাশক্তির যৌক্তিক বিকাশের মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। শুধু অনুপ্রাণিত ব্যক্তিবর্গ (inspired men) যুক্তিবিদ্যা ব্যতিরেকে চলতে পারেন। কারণ, তাঁদের জ্ঞান স্বজ্ঞাসঞ্জাত ও প্রত্যক্ষ।[১৪]

২. মনোবিদ্যা : মনোবিদ্যাতে ইবনে সিনা তাঁর প্রারম্ভিক সূচনা শুরু করেন দেহমনের দ্বৈতবাদ দিয়ে। দেহের সাথে আত্মার কোনো আবশ্যিক বা অনিবার্য সম্পর্ক নেই। আদি বা মৌল উপাদানের সংযোগের দ্বারা নক্ষত্রের প্রভাবে সমস্ত দেহ গঠিত। তবে মানবদেহে এ উপাদানের সংযোগ অত্যন্ত বিশোধিত। আকস্মিকভাবে আত্মা মানবদেহের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তাই এটা দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। প্রতিটি দেহ বিশ্বাত্মা (world-soul) থেকে আত্মা প্রাপ্ত হয় যা বিশেষভাবে এ দেহে এবং কেবলমাত্র এ দেহেই মানিয়ে নেয় (adapt)। আত্মা একটি ব্যক্তিক দ্রব্য (Individual substance)। দৈহিক জীবনে অবস্থানকালে আত্মার ব্যক্তিত্বের বা স্বাতন্ত্র্যের (individuality) অভিব্যক্তি ঘটে। আত্মার রয়েছে বিভিন্ন অবস্থা বা ক্রম-স্তর। ইবনে সিনার মনোবিদ্যাতে অতি সুশৃংখলভাবে আত্মার বিভিন্ন প্রকার এবং তাদের শক্তিসমূহের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ক্রমবিন্যাসের ধারায় তাদেরকে থরে থরে সাজানো হয়েছে।[১৫] ক্রম-উন্নয়নের চমৎকার বর্ণনার সাধারণ পরিকল্পনা নিম্নরূপ :[১৬] ইবনে সিনার মতে তিন প্রকার আত্মা রয়েছে :

(ক) উদ্ভিদআত্মা (vegetable soul)
(খ) জীবআত্মা (animal soul)
(গ) মানবআত্মা (human soul)

www.pathagar.com

(ক) উদ্ভিদআত্মার তিনটি বৃত্তি বা শক্তি রয়েছে :

১. উদ্ভিদ আত্মার পুষ্টিসাধক শক্তি (nutritive power) রয়েছে। এ শক্তি যখন দেহে অবস্থান করে, তখন অন্য দেহকে পূর্ব আকারে পরিবর্তন করতে পারে।

২. উদ্ভিদআত্মার বর্ধনশক্তি (power of growth) রয়েছে। পূর্ণতা প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এ শক্তির দ্বারা নিজের আকার ঠিক রেখে অব্যাহতভাবে নিজেকে বৃদ্ধি সাধন করতে থাকে।

৩. উদ্ভিদআত্মার পুনরুৎপাদন শক্তি (reproductive power) রয়েছে। এ শক্তি দেহ হতে তার নিজ অনুরূপে কিছু শক্তি নিয়ে বাস্তবে তার সদৃশে অন্যদেহ উৎপাদনে সক্ষম।

(খ) জীবআত্মা : জীবআত্মার দু'প্রকার বৃত্তি বা শক্তি রয়েছে :

১. প্রেষণামূলক বৃত্তি (motive faculties)

২. প্রত্যক্ষণমূলক বৃত্তি (perceptive faculties)

১. প্রেষণামূলক বৃত্তি দু'ভাবে শক্তিরূপে প্রকাশিত হয় : (ক) ক্ষুন্নিবৃত্তির শক্তি, এবং (খ) ক্রিয়াশক্তি (appetitive and efficient power)। ক্ষুন্নিবৃত্তি স্বয়ং আকর্ষণীয় অথবা প্রতিক্রিয়ামূলক হতে পারে। আকর্ষণীয় হলে তার প্রকাশ ঘটে শুধু কামনা (desire) দ্বারা, প্রতিক্রিয়ামূলক হলে তার অভিব্যক্তি ঘটে রুক্ষ মেজাজে (irascibility)। ক্রিয়াশক্তি যা দৈহিক গতি বা সঞ্চালনের উৎপাদক তা' স্নায়ু ও পেশী সঞ্চালনের মধ্যে অবস্থান করে।[১৭]

২. জীবাত্মার প্রত্যক্ষণমূলক বৃত্তিসমূহ দু'প্রকার : (ক) বাহ্য (external) এবং (খ) আন্তর (internal)। বাহ্য বৃত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ এবং স্পর্শ। আন্তর শুরু হয় সাধারণ জ্ঞান দ্বারা এটা হচ্ছে একটা কেন্দ্রবিন্দু। উচ্চ বৃত্তির দ্বারা বিশ্লেষিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত সকল প্রত্যক্ষণ এখানে জড়ো (assemble) হয়। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে সাধারণ জ্ঞান অবস্থান করে। প্রত্যক্ষণের উপর প্রথম যে শক্তি ক্রিয়া করে তা' হচ্ছে গঠনমূলক শক্তি বা কল্পনাশক্তি। এরা মস্তিষ্কের মধ্যভাগে অবস্থান করে। কল্পনাশক্তি ইন্দ্রিয়মূলক প্রত্যক্ষণকে দেশ-কাল ও পরিমাণের অবস্থা থেকে মুক্ত করে এবং মনকে বস্তুর প্রতিরূপ গঠনে সক্ষম করে তোলে। ইন্দ্রিয়ের উপর বস্তুর তখন আর তেমন প্রভাব থাকে না।[১৮]

গঠনমূলক শক্তির পর হচ্ছে জ্ঞান বা চিন্তামূলক শক্তি। এ শক্তি প্রত্যক্ষণ ও প্রতিরূপ থেকে সাধারণ উপাদানমূহ বিমূর্ত করে এবং তাদের থেকে ধারণাগত ধারণা (conceptual notion) গঠন করে।

এরপর আসে মূল্যায়নিক শক্তি (estimative faculty)। এ শক্তি ধারণাসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ (groups) করে যাকে আমরা অবধারণ (judgement) বলে অভিহিত করি। এসব অবধারণকে ইবনে সিনা বৌদ্ধিক শক্তি না বলে সহজাত শক্তি (instinctive)

www.pathagar.com

বলে চিহ্নিত করেন। এ মূল্যায়নিক শক্তিই জীবকূলের বুদ্ধি গঠন করে। অর্থাৎ, এ শক্তির দ্বারাই মেষ অবহিত হতে পারে যে তাকে ব্যাঘ্র থেকে পলায়ন করতে হবে। জীব-আত্মার শেষ বৃত্তি হচ্ছে স্মৃতিশক্তি (memory)। এ শক্তি মস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করে।

(গ) একমাত্র মানবাত্মারই প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি রয়েছে। ইবনে সিনা কান্টীয় রূপরেখায় প্রজ্ঞা বা 'বুদ্ধিকে' বিবেচনা করেন। প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির দু'রূপ : যথা ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি (practical reason ও তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি (theoretical reason)।ব্যবহারিক বুদ্ধি অথবা সক্রিয় বুদ্ধি হচ্ছে তা-ই যার উপর নৈতিকতা নির্ভর করে। তাত্ত্বিক বুদ্ধি অথবা অনুধ্যানপরায়ণ বুদ্ধি হচ্ছে তাই যা আমাদেরকে অমূর্ত চিন্তা করতে সক্ষম করে তোলে (enables us to have abstract thinking)[১৯]

নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ইবনে সিনার সমগ্র মনোবিদ্যার পরিকল্পনা, গঠনপ্রকৃতি, আত্মার বিভিন্ন শক্তি ও স্তরকে প্রতীকায়িত করা যেতে পারে।

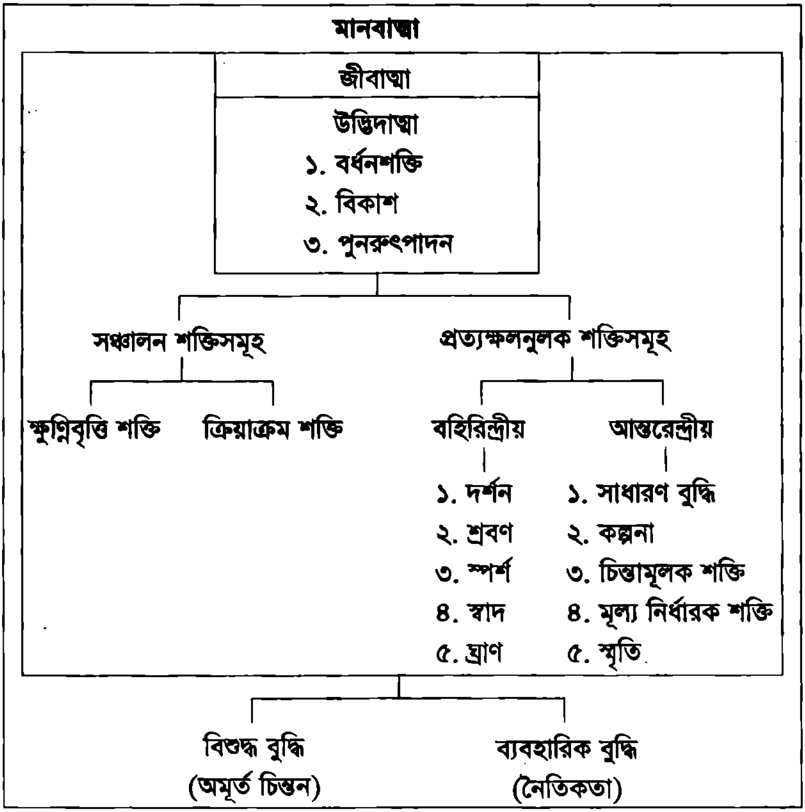

এম সাঈদ শেখের চিত্র অবলম্বনে

www.pathagar.com

নিম্নতর প্রাণির ন্যায় মানুষও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষ বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করে। কিন্তু মানুষ তার প্রাজ্ঞিক অনুধ্যানের শক্তি দ্বারা সার্বিককেও প্রত্যক্ষণ করে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাজ্ঞিক আত্মা তার ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং তাঁর অস্তিত্ব বিষয়েও সচেতন। এর অর্থ হচ্ছে, আত্মা যদিও দেহের সাথে সংযুক্ত, তবু এটা দেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জন্য আত্মা দেহের উপর নির্ভরশীল। যাকে সে সংশ্লেষণ (synthesises) এবং সমন্বয় (co-ordinates) করে। প্রাজ্ঞিক আত্মা এভাবে অন্যান্য শক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এ আত্মা মানুষের সারসত্তা (essence) এবং অমরও বটে। এর অমরত্ব এভাবে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা-চৈতন্যে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা এর একত্ব বিষয়ে সরাসরি সচেতন হয়ে উঠি। আত্মার নিকট দেহ এবং সমগ্র বস্তুর জগৎ উপস্থিত হয়। আত্মার প্রশিক্ষণের জন্য এটি ক্ষেত্র স্বরূপ। প্রতিটি সজীব সত্তারই কেবল একটি আত্মা রয়েছে। কিন্তু দেহের পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না। দেহের উদ্ভব প্রক্রিয়ার সাথে যুগপৎভাবে চালক বুদ্ধি (active intellect) থেকে এর উদ্ভব ঘটে। দেহের মৃত্যুর পর আত্মা তার উৎস বিশ্বাত্মার সাথে কমবেশি ঘনিষ্ঠ সংযোগে অস্তিত্বশীল থাকে। এর অর্থ এই নয় যে বিশ্বাত্মাতে এর সম্পূর্ণ মিলন (union) ও নিমজ্জন (absorption) ঘটে। এভাবে নির্দিষ্ট আত্মার পৃথক স্বাতন্ত্র্য (individuality) কোনো না কোনোভাবে সংরক্ষিত হয়। দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালীন সময়ে আত্মা যে আধ্যাত্মিক অগ্রগতির মাত্রা ও স্তর অর্জন করে, তাই নির্ধারণ করে আত্মার পূর্ণতার পরিব্যাপ্তি এবং পরকালে এর পুরস্কার ও শাস্তির পরিমাণ। শুধু স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই আত্মার সর্বোচ্চ বিকাশ অর্জিত হতে পারে এবং সর্বোচ্চ স্তরে মানুষ পরমসত্তার এক আভ্যন্তরীণ জ্ঞান লাভ করে থাকে।

অধিবিদ্যা : ইবনে সিনা তার শিক্ষক আল-ফারাবির[২০] অসদৃশে (unlike) আল্লাহ্ থেকে জড় দ্রব্যকে টেনে আনেন নি। তাঁর মতে, আল্লাহ্ আধ্যাত্মিক সত্তাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং তিনি সব জড়ীয় পদার্থের উর্ধ্বে। তিনি আত্মার এবং পার্থিব উভয় সত্তায় অংশগ্রহণ গ্রহণ করে। আত্মার মধ্যে জড় ও আধ্যাত্মিক উভয়ের প্রকৃতিই বিদ্যমান। আত্মার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকই রয়েছে।[২১]

দু'প্রকারের অস্তিত্ব রয়েছে—সম্ভাব্য এবং অনিবার্য। সম্ভাব্য অস্তিত্ব বলতে সসীম ও সাপেক্ষ সত্তাকে অর্থ করে। সম্ভাব্য অস্তিত্ব অন্যান্য সত্তার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, অনিবার্য অস্তিত্ব বলতে বুঝায় এমন সত্তা যার উপর অন্যান্য সত্তা নির্ভরশীল। এ জগতে বা স্বর্গে যা কিছু আছে তা' সবই হচ্ছে সম্ভাব্য অস্তিত্ব। এসব সম্ভাব্য অস্তিত্ব এক অনিবার্য সত্তার অস্তিত্বের আভাস বহন করে। এ অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব ও গুণ এক ও অভিন্ন।[২২] ইবনে সিনা এ অনিবার্য সত্তাকেই আল্লাহ্ বলেছেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয় : অনিবার্য সত্তা—যার মধ্যে বহুত্ব নেই, তা' হতে বহুত্ব ও বৈচিত্রের জগৎ কিভাবে উদ্ভব হলো? ইবনে সিনার মতে, বিশ্বাত্মার (world soul) মধ্যেই নিহিত রয়েছে বহুত্বের ধারণা এবং সেখানে থেকেই বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের উদ্ভব। বিশ্বাত্মা নিজ কারণ চিন্তা করে তৃতীয় শক্তি (third spirit) সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছেন, তৃতীয় শক্তি স্বীয় কারণ চিন্তা করে আত্মা সৃষ্টি করেছে—এভাবে একের পর এক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। চালকশক্তি বিশুদ্ধ শক্তির সর্বশেষ[২৩] শ্রেণী—এটা জড়জগৎ ও মানবাত্মার উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ হতে প্রথম শক্তির উদ্ভব, তাই, প্রথম শক্তির সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক সরাসরি, প্রত্যক্ষ, অন্যান্য শক্তির সাথে তাঁর সম্পর্ক পরোক্ষ।

মুতাযিলাদের ন্যায় ইবনে সিনাও মনে করেন, আল্লাহ্ কোনো অন্যায় বা অমঙ্গল কাজ করেন না। মুতাযিলাগণ মনে করেন, কোনো অন্যায় বা অমঙ্গল কাজ করা আল্লাহ্‌র স্বভাব বা প্রকৃতির বিরোধী। ইবনে সিনা মুতাযিলাদের এ অভিমতের চেয়ে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে উল্লেখ করেন যে, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল কাজ করার সম্পূর্ণ শক্তি বা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর প্রকৃতি বা স্বভাববিরোধী কাজ করেন না বা করতে পারেন না।

ইবনে সিনার মতে, আল্লাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে প্রত্যেক সত্তা তার অস্তিত্ব লাভ করে। জগতের ঐশী পরিকল্পনার মধ্যে ভালমন্দ উভয়েরই স্থান রয়েছে। মন্দ আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমিত করে না, এটা সসীম জগতের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ্‌র প্রেক্ষাপট থেকে মন্দ একটা অনস্তিত্বশীল সত্তা, কিন্তু, জগতে সসীম জীবনের প্রেক্ষাপটে এ মন্দ হচ্ছে একটা মৌল অপরিহার্যতা।[২৪] পৃথিবীতে যদি মন্দ-অকল্যাণ না থাকত, তবে, বোধহয় সেটাই হতো আমাদের জন্য অকল্যাণ। বর্তমান পৃথিবী যে অবস্থায় বিদ্যমান, তাই সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর-এর চেয়ে বেশি ভাল বা সুন্দর হতে পারতো না। আল্লাহ্ এবং বিশুদ্ধ চিদাত্মা কেবল সার্বিককে (universal) জানেন, বিশেষকে নয়। স্বর্গীয় মণ্ডলসমূহের আত্মা যাদের উপর ব্যক্তিসত্তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত, তাঁরাই বিশেষের খোঁজখবর রাখেন।

পদার্থবিদ্যা : ইবনে সিনার পদার্থবিদ্যা এ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, জড় সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল এবং তা' কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। তার কোনো ক্রিয়াপরতা নেই, কেবলমাত্র গ্রহণীয়তা আছে। শুধু চিদাত্মাই (spirit) সক্রিয় এবং সবকিছুর কারণ বা মূল। চিদাত্মা হচ্ছে একটা শক্তি অথবা এ হচ্ছে শক্তি ও ক্রিয়াপরতার উৎস। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিসমূহ এবং আত্মার নিয়মাবলি ইবনে সিনা কর্তৃক বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রাকৃতিক জগতে অগণনীয় শক্তিসমূহ রয়েছে। ইবনে সিনা এদেরকে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তরে ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করেছেন—যথা প্রকৃতির শক্তিসমূহ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর শক্তিসমূহ, মানবাত্মা এবং বিশ্বাত্মা।

বিবর্তনবাদ : অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ডারউইনের বহু পূর্বে ইবনে সিনা বিবর্তন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দান করেছিলেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ 'যোগ্যতমের বেঁচে থাকার' নীতির উপর ভিত্তি করে আছে। ইবনে সিনার বিবর্তন-ক্রিয়া ভিত্তি করে আছে 'আদর্শভিত্তিক আত্মবিকাশের'[২৫] নীতির উপর। ইবনে সিনা মনে করেন, জগতের প্রত্যেক বস্তু অপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। অপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বস্তু পূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা অর্জন করতে প্রয়াসী। ফলে বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি হয় গতিশক্তি যা তাদেরকে আত্মবিকাশে প্রধাবিত করে।

www.pathagar.com

পূর্ণতা লাভের ব্যাকুলতাই বিকাশ বা অভিব্যক্তির মূল রহস্য। এরই নাম প্রেম (Love)। ইবনে সিনার মতে, প্রেমই বিবর্তনের অনুপ্রেরণা। প্রেমের শক্তি সমস্ত বিশ্বজগৎকে ক্রমোচ্চ স্তরে আকর্ষণ করছে। সমগ্র জগৎই এ প্রেমের আকর্ষণে পরম সুন্দর, পরম সত্য ও পরম মঙ্গলময় আল্লাহ্‌র পানে পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুজগৎ প্রেমের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। বস্তুজগৎ বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমোন্নতি লাভ করছে : প্রথমে পাথর, তারপর উদ্ভিদ, এরপর প্রাণী এবং শেষে মানুষ—এ ক্রম-উর্ধ্বগতি ধারায় বিবর্তন প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে—আরো উচ্চতর পর্যায়ে এর স্বরূপ যে কি হবে তা' আমাদের অজানা।

ইবনে সিনার মূল্যায়ন

মুসলিম দর্শনে ইবনে সিনার নাম অবিস্মরণীয়। তিনি মুসলিম বিশ্বের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে অদ্বিতীয় স্থান দখল করে আছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং সেকালে ও সে যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠিত প্রামাণিক পণ্ডিত বলে স্বীকৃত। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায়, "তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের প্রতিভূ ছিলেন। গোঁড়া ও স্বার্থান্বেষীদের বিরোধিতার মুখেও তিনি তাঁর পরবর্তী যুগের চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি তাঁর অসাধারণ মননশীলতার পরিচয় বহন করে। তিনি অ্যারিস্টোটলের দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন এবং এ্যারিস্টোটলের অসম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ধারণার মধ্যে খোদা ও মানুষের মধ্যস্থিত যে শূন্যতা ছিল তা' বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে জাগতিক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় মতবাদের সাহায্যে পূরণ করেন।"২৬

ইবনে সিনা অ্যারিস্টোটলের একজন প্রখ্যাত টীকাকার ও ভাষ্যকার। তিনি অ্যারিস্টোটলের চিন্তাধারার সাথে ইসলামি শিক্ষার সমন্বয় সাধনে প্রয়াস পান। আবার, অন্যদিকে, অ্যারিস্টোটলের মতবাদ এবং নব্য-প্লেটোবাদের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করেন। তাঁর দর্শন চিন্তাধারার দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত সুফি-সাধক মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী এবং কবি-দার্শনিক মোহাম্মদ ইকবাল তাঁর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর রচিত 'হিকমাত-ই-মাশরেকিয়া'-এর সাথে রোজার বেকনের পরিচয় ছিল। আলবার্ট ও উলরিচ এবং সেন্ট টমাস একুইনাস তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম প্রাচ্যে আল-গাযালির পর কোনো চিন্তাবিদই ইবনে সিনার ন্যায় এত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হন নি। ওস্‌লার উল্লেখ করেন, ইবনে সিনার 'কানুন' চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বইবেল হিসেবে দীর্ঘকাল যাবৎ সমাদৃত হয়েছিল।

জি. এম. ওয়িকেনস উল্লেখ করেন যে, ইবনে সিনার অধিবিদ্যার কিছু দিক আধুনিক দর্শনের কয়েকটি মতবাদের পূর্বাভাস বহন করে। ডেকার্ট, কান্ট ও

www.pathagar.com

বার্গসোঁ[২৭]-এর মূল দর্শনের সাথে ইবনে সিনার চিন্তাধারার সাদৃশ্য লক্ষণীয়, পার্থক্য শুধু ভাষাগত।

ইবনে সিনা ও ডেকার্ট : আধুনিক দর্শনের জনক রেনে ডেকার্টের নিম্নআলোচ্য বিষয়গুলো ইবনে সিনা কর্তৃক পূর্বেই অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে আলোচিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন :

১. ডেকার্টের সংশয় পদ্ধতি (methodological doubt)
২. ডেকার্টের নিশ্চয়াত্মক উক্তি 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি অস্তিত্বশীল।'
৩. এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিষয়ে ডেকার্টের তত্ত্বমূলক (ontological) এবং বিশ্বতাত্ত্বিক (cosmological) যুক্তির সাথে ইবনে সিনার পদ্ধতি, নিশ্চয়াত্মক সত্তা এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের পূর্বাভাস সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

ইবনে সিনা ও কান্ট : পূর্বে আলোচিত ইবনে সিনার 'মনোবিদ্যায়' ইবনে সিনা যে (১) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন, এবং (২) বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিরুদ্ধ বাদকতা (antinomies of pure reason) যে সুস্পষ্ট বর্ণনা তিনি প্রদান করেন, এতে আমরা আধুনিক দার্শনিক কান্টেরই যেন সাক্ষাৎ পাই।

ইবনে সিনা ও বার্গসোঁ : যদিও আমরা নিশ্চিতভাবেই বার্গসোঁ-এর স্বজ্ঞামূলক মতবাদ এবং সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ পূর্বাভাস ইবনে সিনার মধ্যে খুঁজে পাই, তবু, এ দুয়ের মধ্যকার আরো ঘনিষ্ঠ সমান্তরাল সাদৃশ্য সন্ধানের জন্য দার্শনিকদের কর্তৃক আরো গবেষণার[২৮] প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে ইবনে সিনার গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। তিনি শুধু তাঁর কালের চিন্তাধারার অগ্রদূত ছিলেন না, তাঁর দর্শন, মনোবিদ্যা, অধিবিদ্যা, পদার্থ ও বিবর্তনবাদ আধুনিক দর্শনে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ইনট্রোডাকশন টু দি হিস্ট্রি অব সায়েন্স, বাল্টিমোর, ১৯২৭ ভল্যুম ১, পৃ. ৭০৯ cf., ডি. কোওরটয়িস 'আবিসেনা, দি প্রিন্স অব দি লারনেড', ইনডোইরানিকা, ১৯৫২-৫৩, ভল্যুম ৬, নং ৩ পৃ. ৪৬-৫৩
২. সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, পৃ. ১৫২, ই. ফা. (১ম খণ্ড)।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৪. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, ৪৩০
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২
৭. এম. সাঈদ, শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৮৭
৮. ড. ব্যুওর : হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, পৃ. ১৩৪-১৩৫
৯. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, পৃ. ১২৮
১০. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৯১
১১. প্রফেসর সাঈদুর রহমান : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, পৃ. ১৬৮

www.pathagar.com

১২. ইংরেজিতে আল-ফারাবির যুক্তিবিদ্যার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : এইচ, ব্লামবার্গ, আল—ফারাবি'স ফাইভ চাপটার অন লজিক, প্রসিডিংস্ অব দি আমেরিকান একাডেমী ফর জুইস রিসার্চ, ১৯৩৪-৩৫, পৃ. ১১৫-২১, এবং ডানলপ : আল-ফারাবি'স ইনট্রোডাকটার সেকশনস অন লজিক' ইসলামি কোয়ার্টারলি, ১৯৫৫, পৃ. ২৬৪-৮২
১৩. দ্রষ্টব্য : কিতাব ইশারাত ওয়া আল-তান্‌বিহাত, জে. ফরগেট লেইডেন সম্পাদিত, ১৮৯২, পৃ. ২
১৪. ডি ব্যওর : হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, পৃ. ১৩৫ ও প্রফেসর সাঈদুর রহমান : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলোসফি অ্যান্ড কালচার, পৃ. ১৬৭
১৫. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৯২
১৬. ইংরেজিতে ইবনে সিনার মনোবিদ্যার পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : এফ. রহমান : আবিসিনা'স সাইকোলোজি, লন্ডন, ১৯৫২, cf. মুতাযিদ ও ওয়ালিউর রহমান : 'দি সাইকোলাজি অব ইবনে সিনা', ইসলামিক কালচার, ১৯৩৫, পৃ. ৩৫৫-৫৮
১৭. এম, সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৯২
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. প্রাগুক্ত।
২০. cf. টি. জে. ডি. ব্যওর : দি হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, লন্ডন, ১৯৩৩, পৃ. ১১৫-১৮, ১৩৬-৪৩, ডি লেসি ও' লিয়ারি, এরাবিক থটস্ অ্যান্ড ইট্স প্লেস ইন হিস্ট্রি লন্ডন, ১৯২২, পৃ. ১৫২-৫৬, ১৭৮-৭৯
২১. ডি ব্যওর হিস্ট্রি অব ফিলসপি ইন ইসলাম, পৃ. ১৩৫; প্রফেসর সাঈদুর রহমন : অ্যান ইনট্রোডাকশন ইসলামিক ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, পৃ. ১৭০
২২. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৪৪০
২৩. ডি. ব্যওর : হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, পৃ. ১৩৬-১৩৭
২৪. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৮৬; প্রফেসর সাঈদুর রহমান : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলসফি অ্যান্ড কালচার, পৃ.-৭১
২৫. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৪৪২
২৬. প্রফেসর আমীর আলী : দি স্পিরিট অব ইসলাম, পৃ. ৪২৭
২৭. cf. জি. এম. ওয়িকেন্স্ (সম্পাদিত) op, cit, অধ্যায় ১১, 'আবিসিনা প্লেস ইন এরাবিক ফিলসফি'।
২৮. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১০০

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

মুসলিম পাশ্চাত্যের দার্শনিকবৃন্দ

ইবনে হাজম

(৯৯৪-১০৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)

ক. পরিচিতি

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট মুসলিম দার্শনিক ইবনে হাজম ৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের করডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম আবু মোহাম্মদ আলী ইবনে হাজম। তাঁর পিতা উমাইয়া খলিফার একজন পরামর্শক ছিলেন। সুতরাং জন্মলগ্ন থেকেই তিনি একজন সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে হাজম কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং সেখান থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তিনি আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অধ্যবসায়ী ও উচ্চাভিলাসী। ফলে, অল্প বয়সেই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালে তিনি বহুবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। পরে উমাইয়াদের পতন ঘটলে তিনিও সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে পড়েন এবং জ্ঞান সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এ-সময়ে তাঁর সৃজন প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি ছিলেন সে যুগের একজন অদ্বিতীয় চিন্তাবিদ। "কল্পনার প্রসারে, গভীর রসানুভূতির সূক্ষ্মতায়, দার্শনিক অর্ন্তদৃষ্টি ও চিন্তাশক্তির বিশালতায়, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসায় এবং প্রগাঢ় ধর্মানুভূতিতে ইবনে হাজম যুগের অতুলনীয় চিন্তাবিদ ছিলেন।"[১১]

ইবনে হাজম একজন কবিও ছিলেন। তাঁর রচিত ঐশী প্রেমমূলক কাব্য 'তওক্কুল হামাশাহ' অনবদ্য। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কিতাবুল মিলান ওয়ান নিহাল'। এই কিতাবের মধ্যে ইহুদি খ্রিষ্টান, জোরোয়াস্তার, অগ্নিপূজক, নক্ষত্রপূজক প্রভৃতি এবং বিভিন্ন ধর্মমতের বিজ্ঞানসম্মত উন্নতমানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। ইসলামের জাহেরি, বাতেনি তুলনামূলক সমালোচনা, মুসলিম চার মাজহাবের উৎপত্তির কারণ এবং তাদের মতবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। মুতাযিলা, খারেজি ও মারযিয়ারি প্রভৃতি সম্প্রদ্রায়ের শিক্ষার চমৎকার বর্ণনা রয়েছে।

www.pathagar.com

খ. দার্শনিক মতবাদ

ইবনে হাজমের চিন্তাধারার মধ্যে তৎকালীন মুসলিম স্পেনের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ইসলামের চারটি প্রতিষ্ঠিত রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং দাউ-আল-জাহিরি প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মতবাদ সমর্থন করেন। এই সম্প্রদায় এই অভিমত পোষণ করে যে, কোরআন ও হাদিসের বাণীসমূহকে অত্যন্ত কঠোর আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা উচিত। ধর্মীয় মত অনুসরণে এই সম্প্রদায় অবরোহণ (deduction), সাদৃশ্যানুমান (analogy) কিংবা অভিনব প্রথা (innovation)-এই তিনটির কোনোটিই অনুমোদন করে নি। এই সম্প্রদায় ইসলামের পূর্বতন শুদ্ধাচারী পর্যায়ে ফিরে আসার প্রয়াস চালায়।

সাদৃশ্যানুমানের মাধ্যমে অনুমান এবং তাকলিদ—এ উভয় পদ্ধতিকে ইবনে হাজম প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অন্যের ভাষার উপর নির্ভর না করে প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজে কোরআন ও হাদিস পাঠ করা এবং নিজেই তা অনুধাবন করা। ইসলামের বিভিন্ন ইমামের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রত্যেকের উচিত মূলগ্রন্থ পাঠ করে তা অনুধাবন করা। বিভিন্ন ইমামের প্রভাবের ফলে কোরআনের যে প্রত্যক্ষ পাঠ ও অনুশীলন প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, ইমাম হাজম তা পুনরুজ্জীবিত করেন।

ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইবনে হাজম এক মৌলিক মতবাদ প্রচার করেন। এখানে তিনি আশারীয়দের মুখালিফা নীতি অর্থাৎ, অন্যান্য সব সৃষ্টজীব থেকে আল্লাহ্র পার্থক্যকরণ গ্রহণ করেন। মানব গুণাবলি আল্লাহ্র উপর আরোপ করা যায় না। আমরা জানি যে, কোরআন আল্লাহ্র উপর বিভিন্ন গুণাবলি আরোপ করে। ইবনে হাজম মনে করেন যে, মুতাযিলারা যেখানে আল্লাহ্র গুণাবলিকে অস্বীকার করে তাঁকে গুণবিবর্জিত এক শূন্য ধারণায় পর্যবসিত করেছেন, সেখনে আল্লাহ্র গুণাবলিকে সমর্থন করে আশারীয়গণ সঠিক কাজই করেছেন। তবে, তিনি আশারীয়দের চেয়ে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে অভিমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ্র গুণাবলিকে বুঝতে হবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অর্থে। অর্থের উপর আশারীয়গণও গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তাঁরা যুক্তি দেন যে, আল্লাহ্র গুণাবলি আল্লাহ্র স্বরূপকেই ব্যাখ্যা করে। আলোচ্য পার্থক্যের সমগ্র ঘটনাটি এই নির্দেশ করে যে, গুণাবলিকে আল্লাহ্র উপর যে অর্থে আরোপ করা হয় তা আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র উপর আরোপিত নিরানব্বইটি গুণ এক স্বতন্ত্র ও ভিন্ন অর্থ বহন করে যখন এগুলো সৃষ্টবস্তুর উপর আরোপিত হয়। এইসব গুণাবলি থেকে আমরা আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে কিছুই নিঃসৃত করতে পারি না। এসব গুণাবলীকে আমরা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র উপর আরোপ করতে পারি—কিন্তু, এর অর্থ সর্বদাই আমাদের নিকট অ-বোধগম্য থেকে যায়। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে, সৃষ্টবস্তুর গুণাবলির সাথে এগুলোর কোনো সাদৃশ্য নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্লাহকে 'পরম দয়ালু' বলা হয়। কিন্তু, প্রকৃতির জগতে অমঙ্গল ও দুঃখ-দুর্দশা দেখে আমরা তাঁকে দয়ালু বলতে পারি না। এই কারণেই মানবীয় অর্থে দয়া বলতে যা বুঝায়, আল্লাহ্র উপর তা আরোপ করা যায় না। এসব গুণ যে আল্লাহ্র স্বরূপকে বর্ণনা করে তা বিশ্বাস করার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। আমরা এগুলো বিশ্বাস করি এজন্য যে, এসব গুণাবলির বিষয় কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে নয় যে বিশ্বাস যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

ইবনে হাজম মুতাযিলাদের উদার মতবাদ বা আশারীয়দের রক্ষণশীল মতবাদ কোনোটাই স্বীকার করেন নি। এমন কি, আবু হানিফা-এর ন্যায় মুসলিম আইনবিজ্ঞানীদের সাথে তাঁর মতানৈক্য রয়েছে। তাঁর মতে, ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের জন্য শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং সর্বপ্রকার বিচার-বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ পরিহার করতে হবে।

নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে ইবনে হাজম উল্লেখ করেন যে, ভাল ও মন্দ উভয়ই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন যে, সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় নিরূপণের কোনো বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নেই। কেবল প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই ভাল-মন্দ বা শুভ-অশুভের পার্থক্যের জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে কাজটি করতে নিষেধ করেছেন তা মন্দ বা অন্যায় এবং যে কাজটি করার নির্দেশ দিয়েছেন তা ভাল বা ন্যায়। আল্লাহ্‌র অনুমোদন বা অননুমোদনই হচ্ছে সত্য-মিথ্যা বা ভাল-মন্দের একমাত্র মাপকাঠি। তবে আল্লাহ্ স্বেচ্ছাচারী নন। কারণ, ঐশী ইচ্ছামাত্রই ন্যায়বোধের সাথে সংগতিপূর্ণ।

ইবনে আল-হায়সাম
(৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.)

ক. পরিচিতি

ইবনে আল-হায়সামের পূর্ণ নাম আবু আলী মোহাম্মদ আল হোসান আল-হায়সাম। ল্যাটিনে আল-হাজান। তিনি কর্ডোভার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারিক জীবন সমন্ধে কিছুই জানা যায় না। কর্ডোভার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উর্বর পরিবেশ ইবনে আল-হায়সামকে জ্ঞানানুসন্ধানে আনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশুনা করেন। চিকিৎসক পরিবারে জন্ম বলে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং অচিরেই তিনি এই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সুদূর মিশর পর্যন্ত তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায়ও তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। গণিতশাস্ত্রে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। গাণিতিক জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি নীলনদের প্লাবন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম—তাঁর এ দাবির কথা ছড়িয়ে পড়লে মিশরের তদানীন্তন খলিফা তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে, তাঁকে রাজরোষে পতিত হতে হয়। তিনি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। অতঃপর ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি দর্শন, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

খ. দার্শনিক চিন্তাধারা

ইবনুল হায়সাম অ্যারিস্টোটলীয় দর্শনের একজন অনুরাগী। তাঁর মতে, সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে দর্শন। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জ্ঞানে পরিণত করাই হচ্ছে দর্শনের লক্ষ্য। তিনি

www.pathagar.com

দেকার্তের ন্যায় সংশয়-পদ্ধতি (method of doubt) প্রয়োগ করেন। সত্যে উপনীত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়কেই বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা যাচাই করে নেওয়া উচিত।

ইবনে হায়সামের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদে কান্টের বিচারবাদের পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়। কান্টের মতো তিনিও মনে করেন যে, ইন্দ্রিয় সংবেদন জ্ঞানের উপাদান এবং বুদ্ধি জ্ঞানের আকার সরবরাহ করে। প্রজ্ঞা ও সংবেদনের সমন্বিত রূপই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। ইবনে হায়সামে কান্টের অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয় নীতির ভাবধারা পরিদৃষ্ট হয়।

ইবনে হায়সামের প্রত্যক্ষণ বিষয়ক (theory of perception) মতবাদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদে আধুনিক কালের প্রতিক্রিয়া কাল (reaction-time)-এর ধারণাটি প্রতিভাসিত হয়েছে। তাঁর মতে, মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রত্যক্ষণের কয়েকটি স্তর রয়েছে—যেমন, সংবেদন, তুলনা ও স্বীকৃতি। প্রথমত, ইন্দ্রিয়সমূহ উপাত্তজগুলোকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে। পরে বুদ্ধি এসব ইন্দ্রিয় উপাদানকে তুলনা ও চিহ্নিত করে। প্রত্যক্ষণের এই সমন্বয় ক্রিয়া অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয়। প্রত্যক্ষণের এই সমন্বয় ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই। পরে চিন্তার মাধ্যমে আমরা এর সম্বন্ধে সচেতন হই। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ চিন্তার সাহায্যে জ্ঞানে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ এবং চিন্তার সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-এ দু'য়ের মধ্যে সময়ের একটা ফাঁক বা বিরতি রয়েছে। এই বিরতি অর্থাৎ, উদ্দীপনা এবং সংবেদনের মধ্যকার এই ব্যবধানকে প্রতিক্রিয়া কাল বলা হয়।

ইবনে হায়সাম তাঁর প্রত্যক্ষণ তত্ত্বে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এই সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য যে, হায়সামের এই তত্ত্বের সত্যতা মাত্র বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগৎ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর এই তত্ত্ব আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নব সংযোজন—এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইবনে হায়সামই প্রথম ব্যক্তি যিনি দৃষ্টিশক্তির প্রতিফলন ও প্রতিসরণ বিষয়ে গ্রিক চিন্তাবিদদের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত করেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, পদার্থ হতে আলোকরশ্মি আমাদের চক্ষুতে প্রতিফলিত হয়। বাহ্য পদার্থের উপর পতিত আলোক আমাদের চক্ষুর রেটিনাতে প্রতিফলিত হয় এবং দৃষ্টি সংবেদন উৎপন্ন করে। এই সংবেদন অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছলে বস্তুর সম্পর্কে প্রত্যক্ষণ হয়।

তিনি বায়ু ও পানির ন্যায় স্বচ্ছ ও তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিশক্তি ও প্রতিফলিত আলোকের বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং ম্যাগানিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেন। তিনি জানালার ঝিলমিলিতে ছিদ্র করে বিপরীত দিকের দেয়ালে প্রতিফলিত সূর্যের কিরণের খণ্ডিতরূপ দর্শন করেন। একে ক্যামেরা অবস্কিউরার (camera obscura) আদিম রূপ বলা যায়। গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন। বেগ, স্থান, দূরত্ব ও পতনশীল দ্রব্যের সাথে এদের সম্বন্ধ বিষয়েও তিনি তাঁর অনুসন্ধান কার্য চালান। ইবনে হায়সাম মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। এটা এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পরবর্তী কালের বিজ্ঞান ক্রম-উন্নয়নের অনেক বিষয়ই তাঁর জ্ঞানে ছিল।

www.pathagar.com

ইবনে বাজা
(১১০৬-১১৩৮ খ্রি.)

আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে আল সাইগ (৫০০-৫৩৩/১১০৬-১১৩৮ খ্রি.) সাধারণভাবে ইবনে বাজা নামে পরিচিত। ল্যাটিন ও ইংরেজিতে তিনি এভেমপাস বা এভেনপাস নামেও অভিহিত। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত স্পেনিশ দার্শনিক, অ্যারিস্টোটলের সমালোচক, বিজ্ঞানী (অর্থাৎ চিকিৎসক, গাণিতিক এবং জ্যোতির্বিদ), কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ।[১] ইবনে বাজার শিরোনামের তাৎপর্য অজ্ঞাত। ইবেন খাল্লিখান এটাকে ফ্রাংকীয় শব্দ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন যার অর্থ রৌপ্য। আরবি শব্দ 'ইবনে সাইগ'-এর শাব্দিক অর্থও হচ্ছে রৌপ্যকারের পুত্র।

তিনি পঞ্চম শতাব্দী অর্থাৎ ১১০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সারগোসায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সঠিক জন্মতারিখ অজ্ঞাত। তিনি তাঁর জন্ম শহরে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন এবং খ্রিষ্টানদের হাতে সারগোসার পতন ঘটলে তিনি সেভিল ও জেটিনায় (Xatina) বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মরক্কোর ফেজ-এ গমন করে এবং সেখানে তিনি আল মোরাভিড দরবারে উযির নিযুক্ত হন। এখানে নাস্তিকতাবাদের[২] জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকারে তাঁকে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

বহু প্রতিভাসম্পন্ন ইবনে বাজা চিকিৎসাবিজ্ঞান[৩], জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন ও দর্শন বিষয়ের উপর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির কোনো কোনো ধারণার সমালোচনা করেন এবং এভাবে ইবনে তোফায়েল ও আল বিতরুজীর জন্য পথ তৈরি করেন। আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, বিতরুজীর টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদের সমালোচনা কোপারনিকাসকে সূর্যকেন্দ্রিক (heliocentric) মতবাদ[৪] প্রচার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। সঙ্গীতের উপর তাঁর রচনা পাশ্চাত্যে বহু প্রশংসিত হয় যেমন নাকি প্রাচ্যে আল ফারাবীর সঙ্গীত প্রশংসিত। আল ফারাবীর ন্যায় তিনি সঙ্গীত যন্ত্রের উপর খেলতে দক্ষ ছিলেন বিশেষ করে উদ (ud) অর্থাৎ বাঁশিতে (lute)।

দর্শনে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন—এদের অনেকগুলো যুক্তিবিদ্যার উপর (on logic), একটি আত্মার (on soul) এবং অন্যটি মানবের সঙ্গে সঠিক আত্মার সম্মিলন (union of the universal soul with man)-এর উপর। একটি বিদায়ী পত্র এবং নির্জন শাসনের উপর[৫] এর সাথে যোগ করা যেতে পারে পদার্থবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং অ্যারিস্টোটলের অন্যান্য গ্রন্থের উপর সমালোচনা। তাঁর রচিত প্রখ্যাত দার্শনিক প্রবন্ধ যা আমাদের নিকট এসেছে তা হচ্ছে নির্জন রাজত্ব এবং বিদায়ী পত্র যা তিনি তার বন্ধু মিশরের উদ্দেশ্যে স্পেন ত্যাগের সময় লিখেছিলেন। উভয় প্রবন্ধই হিব্রু অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের নিকট এখন মৌলিকভাবে পরিচিত। বিদায়ী পত্রটি ল্যাটিন[৬] ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্ভবত তাঁর প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং অস্বাস্থ্যকর

www.pathagar.com

পরিবেশ তাঁর নির্জন রাজত্ব লিখার পটভূমি যুগিয়ে ছিল। তাঁর সময়টি ছিল উদার মনোভাবের চেয়ে বরং গোঁড়ামিতে ভরা। দার্শনিক এবং স্বাধীন চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি সূক্ষ্ম নির্জনতাবোধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে 'নির্জন শাসন'।

তাত্ত্বিক মতবাদে তিনি একত্ববাদীর চেয়ে একজন গুণগত বহুত্ববাদী। তাঁর মতে তিন প্রকার সত্তা রয়েছে যাকে আদি বলে বিবেচনা করা যায়। যথা জড়, আত্মা এবং বুদ্ধি। আধুনিক দর্শনের ভাষা কমবেশি এগুলো জড়, প্রাণ এবং মনকে নির্দেশ করে। এ তিনের মধ্যে পার্থক্য সূচনা করতে ইবনে বাজা লক্ষ্য করেন যে, জড় বাইর থেকে গতিশীল হয়, বুদ্ধি বা আত্মা স্বয়ং অনড় কিন্তু অন্যকে গতিশীল করে তোলে। আত্মার অবস্থান হচ্ছে এ দুয়ের মধ্যবর্তী যা স্বয়ং গতিশীল। তাই জড় মুক্ত নয়; এর গতি নিজ দ্বারা ব্যাখ্যায়িত নয়। কিন্তু বুদ্ধি বা আত্মার প্রসঙ্গ দ্বারা ব্যাখ্যায়িত। অপরপক্ষে আত্মা তার কার্যাবলীতে মুক্ত ও স্বাধীন। আত্মা এবং বুদ্ধি উভয়ই জড়ের উপর গতি সঞ্চার করে। আত্মা নিজ দ্বারা গতিশীল কিন্তু বুদ্ধি স্বয়ং অনড়। তাতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটা নিখুঁত (perfect)। এর আকার এবং নীতি চিরন্তন—বলতে গেলে তাদের কার্যাবলীতে এক প্রকার উচ্চতর নিয়ন্ত্রণবাদ রয়েছে। ফলে তাঁর তত্ত্ববিষয়ক মতামতের ভিত্তিতে ইবনে বাজা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণবাদ, মানুষের অহং-এর স্বাধীনতা এবং প্রজ্ঞার নিয়ন্ত্রণবাদকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

যে সমস্যা নিয়ে ইবনে বাজা দীর্ঘ আলোচনা করেন তা হচ্ছে আত্মা ও বুদ্ধি বা শক্তির মধ্যকার সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদ। তাঁর মতে জড়ের আকার হচ্ছে জড়ের আধ্যাত্মিক সত্তা। এটা জড় বা জড়বস্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে। জড়ীয় বিশেষ (material particulars), থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে সার্বিক (universals) থাকতে পারে। সার্বিক অনুধ্যান আমাদের শক্তির জগতের সাথে সংস্পর্শ ঘটিয়ে দেয় (gives us a contact with the realm of the spirit)। এটা পরম সত্তাকে জানার জন্য আমাদেরকে সহায়তা করে। মানুষের মধ্যে সার্বিক বিকাশের প্রথম স্তর নির্ভর করে আধ্যাত্মিক বোধের উপর অর্থাৎ জড় জগতের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার উপর। পরবর্তী স্তর হচ্ছে দেশ এবং কালের ন্যায় অভিজ্ঞতা-পূর্ব প্রত্যক্ষণের আকার উপলব্ধি করা। আরো উর্ধ্বস্তরে উন্নীত হলে মানবাত্মা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে চিনতে পারে এবং উপলব্ধি করতে পারে অভিজ্ঞতা-পূর্ব নীতিকে, যেমন যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মগুলো, গণিতের স্বতঃসিদ্ধগুলো। ইবনে বাজার মতে, স্বজ্ঞার মাধ্যমেই (through intuition) বিশেষের মধ্যে সার্বিক, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার পূর্বত সিদ্ধ আকার, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অভিজ্ঞতা-পূর্ব নীতি, স্বজ্ঞার উপলব্ধি হয়। কেননা বিচারমূলক বুদ্ধির মাধ্যমে নয়, এসবের উপলব্ধি আসে উর্ধ্ব থেকে অর্থাৎ চালক বুদ্ধি থেকে (from the active intellect)। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক বা বৌদ্ধিক বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক সত্তার সাথে অথবা আত্মার বিশুদ্ধ চিন্তা; অর্থাৎ চালক বুদ্ধির[৮] সাথে মানবাত্মার সাক্ষাৎ যোগাযোগ ও উপলব্ধি।

www.pathagar.com

অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিকের ন্যায় ইবনে বাজা ইত্তিসাল বর্ণনা করেন, অর্থাৎ চালক বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মানব বুদ্ধির মিলনের বিষয় বর্ণনা করেন। চালক বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মানব বুদ্ধির মিলনই হচ্ছে মানব জীবনের পরম সৌন্দর্য ও পরম কল্যাণ। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সুপ্ত বুদ্ধির উপর চালক বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য মানুষের সুপ্ত বুদ্ধি জাগ্রত হয়। চালক বুদ্ধির সাথে মানব বুদ্ধির পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে অনন্ত জীবন। এই ধরনের একটি মতবাদের উপর নির্ভর করে অভিযোগ আনয়ন করা হয় যে, এতে ব্যক্তিগত অমরতার কোনো অবকাশ থাকে না। কিন্তু ইবনে বাজা বলেন, এই জগতে স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়ার অস্তিত্বে যে ঘোষণা আত্মা প্রদান করে তা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে এবং পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করতে পারে। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি যা সকলের মধ্যে সমরূপে বিদ্যমান তাই কেবল পরবর্তী জীবনে চালক বুদ্ধির সাথে মিশে যাবে এবং তার কোনো নিজস্ব স্বকীয় অস্তিত্ব থাকবে না। পরবর্তীকালে ইবনে রুশদের[৯] মধ্যে অনুরূপ মতাবদের পুনরুল্লেখ দেখা যায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হেগেলীয় মতবাদের ন্যায় ইবনে বাজা বিশ্বাস করেন যে, চিন্তন (thought) হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ ক্রিয়া (function)। চিন্তার মাধ্যমেই মানুষ পরমসত্তাকে[১০] উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আত্মসচেতনতা (self consciousness) অর্থাৎ, স্বয়ং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সচেতনতা। এই পর্যায়ে চিন্তন সত্তার সাথে অভিন্ন হয়ে ওঠে। প্লেটোবাদীদের ন্যায় তিনি বলেন যে, সার্বিকের বিশুদ্ধ ধারণাগত অভিজ্ঞতার তুলনায় বিশেষের প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতাগুলো প্রতারণামূলক। মরমি তন্ময়তা হচ্ছে আবেগমূলক স্বভাবের এক অভিজ্ঞতা যা কল্পনা ও রূপকের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। তিনি আল গাযালির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। কারণ, আল গাযালি দর্শনের বিনিময়ে মরমিবাদ ও প্রত্যাদেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইবনে বাজা প্রত্যাদেশের শিক্ষাকে সত্যের রূপক উপস্থাপন বলে অভিহিত করেন। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার[১১] মাধ্যমেই সত্যকে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর এই ভাবধারা হেগেলীয় চিন্তনের ভাবধারার অনুরূপ। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এ ধরনের ভাবধারার জন্য নাস্তিকতাবাদের অপরাধে তাঁকে বিষপানে হত্যা করা হয়।

ইবনে বাজার নৈতিক মতবাদ তাঁর 'নির্জন শাসন' থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাঁর মতে নৈতিক কাজ হচ্ছে সে-ই কাজ যা মানুষের সত্যিকার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। প্রজ্ঞা নির্দেশিত কাজই হচ্ছে স্বাধীন কাজ। এটা বৌদ্ধিক উদ্দেশ্যের চেতনার দ্বারা প্রণোদিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, কেউ যদি পাথরে হোঁচট খেয়ে পাথরটিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার আচরণ হবে উদ্দেশ্যবিহীন শিশু বা পশু সদৃশ। কিন্তু, এই কাজটিই সে যদি এই ভেবে করে থাকে যাতে করে অন্য কেউ আর হোঁচট না খেতে পারে, তবে এই আচরণটি হবে মনুষ্যচিত এবং এটা প্রজ্ঞার দ্বারা নির্দেশিত।

www.pathagar.com

নীতিবিজ্ঞানে ইবনে বাজা নিজেকে অধিকাংশ সময়ই সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিষয়কে নিয়ে জড়িত রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিসম্মতভাবে কাজ করতে হলে মানুষকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে—দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ইতরজাত আনন্দানুভূতি হতে। জ্ঞানী এবং বিজ্ঞজনেরাই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভেতর সুবিধাজনকভাবে[১২] বাস করতে পারেন। গাযালির তত্ত্ববিধান ব্যতীত উন্মুক্ত হাওয়ায় বর্ধিত উদ্ভিদের ন্যায় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মানুষগণ আদর্শ সমাজ গড়ে তুলবে। এই আদর্শ সমাজে চিকিৎসাবিদ, মনোবিদ ও বিচারকের প্রয়োজন হবে না। তারা প্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একে অপরের বন্ধু হয়ে কাজ করবে। পরম সত্যের অব্যাহত অন্বেষায় তাঁরা আল্লাহ্‌র হাবিব বা বন্ধুরূপে পরম সুখ ও শান্তি লাভ করবে।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. মুকাদ্দিমাহ গ্রন্থে ইবনে খালদুন প্রদত্ত একটি গল্পের উল্লেখ রয়েছে : ইবনে বাজার রচিত কিছু গ্রন্থের দ্বারা সারগোসার গভর্নর এত অভিভূত হন যে, তিনি তাঁর আচ্ছাদন প্রায় ছিঁড়ে ফেলেন এবং শপথ নেন যে, যুবক দার্শনিককে স্বর্ণের উপর দিয়ে হেঁটে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। পাছে না এটা কার্যে পরিণত হয়ে যায়, এই ভয়ে ইবনে বাজা তাঁর প্রতিটি পাদুকায় একটি করে স্বর্ণমুদ্রা স্থাপন করে তার উপর দিয়ে হেঁটে চলে আসেন। (cf. দি মুকাদ্দিমাহ) ফ্রাঞ্জ রোমানসন কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, নিউইয়র্ক, ১৯৫৮ ভ্য. ৩ পৃষ্ঠা ৪৪৩-৪)। অন্যবিষয়ের মধ্যে 'শিকার'-এর উপর ইবনে বাজা একটি কবিতা রচনা করেন: তার দিয়াহ; cf. জিসারটন, ইনট্রোডাকশন টু হিস্ট্রি অব সায়েন্স' বাল্টিমোর, ১৯৩১ ভ্য. ২ পার্ট-১ পৃঃ ১৮৩। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে তার সুখ্যাতির জন্য দ্রষ্টব্য এইচ. জি. ফারমার, এ হিস্ট্রি অব এরাবিয়ান মিউজিক, লন্ডন ১৯২৯, পৃ. ২২২।

২. কোনো কোনো মুসলিম জীবনীকার ইবনে বাজাকে নাস্তিক বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এর কারণ হচ্ছে তাঁর অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদ। cf. ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাত আল আয়াল, ওসটেনফিল্ড সম্পাদিত, গটিনজেন, ১৮৩৫-৫, ভ্য. পৃ. ৩৭২।

৩. চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর রচিত ইবনে বাজার গ্রন্থগুলো মুসলিম পাশ্চাত্য জগতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। গ্রন্থগুলো বর্তমানে অবলুপ্ত। ইবনে আবি উসবিয়াহ ইবনে রুশদকে ইবনে বাজার একজন শিষ্য মনে করেন। বিখ্যাত মুসলিম উদ্ভিদবিদ ইবনে আল-বায়তার প্রায়শই ইবনে বাজার মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেন cf. জি. সারটন op-cif.

৪. গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা যায় যে, কোপারনিকাস তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দি বিভোলিউ শনিবাস ওর রিয়াম কলেসটিয়াম গ্রন্থে আল-বিতরোজী থেকে উদ্ধৃত করেন।

৫. শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থ বর্তমানে মূল আরবিতে পাওয়া যাচ্ছে। এম. আসীন প্যালাসিওম কর্তৃক সম্পাদিত।

৬. এটি হিব্রু থেকে ল্যাটিন অনুবাদ করা হয় আব্রাহাম ডি. ব্রেইমস্ কর্তৃক।

৭ দ্রষ্টব্য তদবির-আল-মুতাওয়াহিদ, এম আসীন প্যালসিওম কর্তৃক সম্পাদিত, মাদ্রিদ, ১৯৪৬, পৃ. ১৯।

৮. ইবনে বাজার মরমিবাদ হচ্ছে অনুধ্যান পলায়ন মরমিবাদ, কঠোর তপস্যামূলক মরমিবাদ নয়। আল্লাহ্‌র মুখোমুখি হওয়ার জন্য চালক বুদ্ধির সাথে মিলন হচ্ছে মরমি সাধকের অপরিহার্য শর্ত। এই ভাবধারা প্রকাশ করার নিমিত্তে তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন, যথা : কিতাব ইত্তিসাল আল-আক্তাশ বি-ইনসান'।

www.pathagar.com

৯. চালক বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মানবাত্মার মিলন বিষয়টিকে ইবনে রুশদ এত উচ্চমর্যাদা দেন যে, তিনি এর উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন।

১০. ই. আই. জে. রোসেনসন উল্লেখ করেন যে, অন্যান্য ফলাসিফাদের ভাবধারাকে যদি বুদ্ধিবাদ বলে আখ্যায়িত করা যায়, তবে তাঁর (ইবনে বাজার) বুদ্ধিবাদ হচ্ছে অপরিণত বুদ্ধিবাদ। দ্রষ্টব্য : পলিটিক্যাল থটস ইন মেডিয়েভল ইসলাম, কেম্ব্রিজ, ১৯৫৮, পৃ. ১৬৩। পরম সত্তার জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপে ইবনে বাজা মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে একই এক অনন্য স্থান দখল করে আছেন। পরবর্তীতে শিনোজার মধ্যে বৌদ্ধিক সহানুভূতি যেমন লক্ষণীয়, ইবনে বাজার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বৌদ্ধিক অনুরাগের জন্য তাঁর গভীর অন্বেষার বিষয়টি খুঁজে পেতে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন।

১১. ইবনে বাজা নবি প্রত্যাদেশের সত্যতা ও মহান গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি। তিনি পবিত্র কোরআনকে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র এক মহান অনুগ্রহ বলে মনে করেন। কিন্তু তথাপি তিনি ধর্মের সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষের 'প্রাকৃতিক পথ' অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির আলোকে সত্যকে বলার সম্ভাব্যতার ওপর দৃঢ় আস্থাশীল ছিলেন। নবি অভিজ্ঞতার জন্য ইবনে বাজার ধারণা দ্রষ্টব্য, সিপির হাসান আল মাসুমী, নবুওয়াতের উপর ইবনে বাজা, 'অষ্টম সেশন, পাকিস্তান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস (১৯৬১ লাহোর (১৯৬২), পৃ. ৫৩-৫৯।

১২. দার্শনিক সমাজ ও ব্যতিক্রমধর্মী মানুষের সমাবেশের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে ইবনে বাজা এক ধরনের বৌদ্ধিক অভিজাততন্ত্র গঠনে সম্মতি প্রদান করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। রোসানসল মনে করেন, বৌদ্ধিক পূর্ণতার জন্যই এর সৃষ্টি। op. cit পৃ. ১৬২।

ইবনে তোফায়েল
(১১১০-১১৮৫ খ্রি.)

ক. জীবনী ও রচনাবলী

আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে আবদ-আল-মালিক ইবনে মোহাম্মদ ইবনে তোফায়েল আল-কায়সী সংক্ষিপ্তভাবে ইবনে তোফায়েল হিসেবেই সমধিক পরিচিত। ল্যাটিন ভাষায় তিনি আবুবকর হিসেবে পরিচিত। তিনি একজন স্পেনীয় মুসলিম দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, গাণিতিক, কবি এবং বিজ্ঞানী। তিনি গ্রানাডায় চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি শাসক আবু ইয়াকুব ইউসুফ (রাজত্ব ৫৫৮-৫৮০/১১৬৩-১১৮৪)-এর প্রধান রাজকীয় চিকিৎসক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আবু ইয়াকুব ইউসুফের উযির ছিলেন বলেও কথিত হয়।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক রম্যোপন্যাস (celebrated philosophical romance) গ্রন্থ হাই ইবনে ইয়াকযান-এর প্রণেতা হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। এটা ছিল মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১] ৭৫০/১৩৪৯-এ নারকেনের একজন ইহুদী তাঁর স্বীয় মন্তব্যসহ এটাকে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৬৭১-এ অক্সফোর্ড এডওয়ার্ড পোকক কর্তৃক মূল আরবিসহ এটা প্রথমবারের মতো ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। মূল আরবি তাঁর পিতা কর্তৃক পূর্বেই সম্পাদিত হয়েছিল।[২] তারপর এটা বহু ইউরোপীয় ভাষায়

যেমন, ডাচ,[২] রুশ,[৩] স্পেনিশ[৪], ইংরেজি ও ফরাসি ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়। ১৬৭৪-এ জি. কিথ, ১৮৮৬-তে জি, আসওয়ান এবং ১৭০৮ সাইমন ওকলী[৫] কর্তৃক এর ইংরেজি অনুবাদ হয়। ১৯০০[৬]-এ আলজিরিয়ায় প্রকাশিত ফরাসি অনুবাদসহ গাথিয়রের সমালোচনামূলক সম্পাদনাটি আরবি ভাষভাষী পাঠকদের জন্য অতি উত্তম।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬)—এডওয়ার্ড পোককের ল্যাটিন সম্পাদনার মাধ্যমে ইবনে তোফায়েলের গ্রন্থ সম্বন্ধে অবহিত হন এবং এর সম্পর্কে অতি উচ্চধারণা পোষণ করেন। অধুনা এমনও অনুমান করা হচ্ছে যে, ১৭১৯-এ রচিত বিখ্যাত উপন্যাস রবিনসন ক্রুশো-এর মূল ভাবধারা হাই ইবনে ইয়াকযান গ্রন্থ থেকে ডেনিয়েল ডিফো গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত ১৭০৮-এর প্রকাশিত সাইমন ওকলী কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি এ গ্রন্থের সাথে পরিচিত হন। এমনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ডেনিয়েল ডিফো তাঁর রচনার অবকাঠামোর জন্য প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে তোফায়েলের নিকট ঋণী ছিলেন।

হাই ইবনে ইয়াকযানের আক্ষরিক অনুবাদ :"প্রানবন্ত সত্তা" (The living one) 'দ্রষ্টার সন্তান' (The son of the vigilant) বা 'জীবন্ত জাগরণের সন্তান' (The Alive the son of The Awake)। এই শিরোনামের একটা বিরাট প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে : প্রাণবন্ত সত্তা হচ্ছে মানুষ বা তার বুদ্ধির প্রতীক, দ্রষ্টা হচ্ছে আল্লাহ্ বা ঐশী বুদ্ধির প্রতীক। এটা পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে যাতে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে ধরতে পারে না (ii ২২৫)। মানব প্রজ্ঞা ঐশীবুদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। তাই ঐশী সত্তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ জানার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ নবির প্রত্যাদেশ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে মানুষ সত্যের অন্তরতম রূপ লাভ করতে পারে। হাই ইবনে ইয়াকযান গ্রন্থখানি এই মূল ভাবধারাকেই প্রতীকভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে। ইবনে তোফায়েল বুদ্ধি কথাটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন, অনেকটা প্রায় মরমিবাদের 'দিব্য দর্শনের' ন্যায়। নব্য প্লেটোবাদ দর্শনের সাথে গ্রন্থখানির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

আসরার আল-হিকমাত আল-আসরাকিয়া 'আলোকদায়ক দর্শনের গোপন রহস্য' নামে গ্রন্থটির উপ-শিরোনাম রয়েছে। একটা অবশ্য ইবনে সিনা রচিত গ্রন্থের শিরোনাম। হাই ইবনে ইয়াকযান গ্রন্থটিও ইবনে সিনা রচিত সংক্ষিপ্ত মরমিবাদী রূপকের শিরোনাম। প্রকৃত-পক্ষে, ইবনে তোফায়েল তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের জন্য ইবনে সিনার নিষ্প্রাণ গল্পের নামগুলো যথা, হাই, সালমান আফসাল বা আসাল প্রভৃতি নামগুলো ধার করেছেন। নাসির আল-দীন আল-তুসি এবং জামী[৭] কর্তৃক রচিত অনুরূপ রচনায় নামগুলো আবার পরবর্তীতে ফিরে আসে।

ইবনে তোফায়েলের গ্রন্থ এবং ইবনে বাজা রচিত তদাবির আল মুতাওয়াহিদ (নির্জনবাসীর শাসন) গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। ইবনে তোফায়েল তাঁর উৎসাহ শুধু ইবনে বাজা থেকে নয়, আল ফারাবি থেকে শুরু করে পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

দার্শনিকদের নিকট থেকে লাভ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় ইবনে তোফায়েল তাঁর পূর্ববর্তীদেরকে প্রশংসা করেন, বিশেষ করে, আল ফারাবি, ইবনে সিনা, আল-গাযালি এবং ইবনে বাজাকে। অবশ্য কোনো কোনো বিষয়ে তিনি তাঁদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন।

খ. হাই ইবনে ইয়াকযান

পিতামাতাহীন এক মানব শিশু নাম তার হাই। নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিকটে গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় এক নির্জন দ্বীপে (সম্ভবত সিংহল দ্বীপে)[৮] এর জন্ম। একটি হরিণী তাকে সেখানে লালন-পালন করে। এই হরিণীটিই হচ্ছে তার জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু। হরিণীটির দুগ্ধপানে শিশুটি পশুদের সাথে থেকে ক্রমশ বেড়ে ওঠে এবং তাদের ভাষা ও শিক্ষা লাভ করে। এক পর্যায়ে সে একটি যষ্ঠি বা লাঠির সন্ধান পায়। এবং পরে সে এ লাঠির কার্যকারিতা ও হাতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। লাঠি ও হাতের গুরুত্ব অনুধাবন করার পর সে এবারে নিজেকে শিকারীরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। এর মধ্যে স্তন্যপায়ী হরিণীটির মৃত্যু ঘটে। হাই ধারাল প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা হরিণীটির দেহ বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। দেহ বিচ্ছিন্ন করতে করতে সে এই ধারণায় উনীত হয় যে, হৃদয় হচ্ছে সমগ্র দৈহিক অঙ্গের কেন্দ্র এবং জীবন বা প্রাণের মূলভিত্তি। হরিণীটির ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে কালক্রমে সে এ ধারণাও লাভ করে যে নিশ্চয়ই এমন এক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যা মৃত্যুর পর প্রাণীদেহ পরিত্যাগ করে চলে যায়। হরিণীর দেহ ক্রমশ শুকাতে থাকে। দাড়-কাকের নিকট হাই এ ধারণাও লাভ করতে পারে কিভাবে একে মৃত্তিকায় পুঁতে রাখতে হয়। আকস্মিকভাবে সে আবিষ্কার করে যে, শুষ্ক ডালের ঘর্ষণের ফলে মৃত গাছে আগুন জ্বলে ওঠে। সে অগ্নিকে তার স্বীয় বাসস্থানে নিয়ে আসে এবং প্রজ্বলন করে রাখে। এই আবিষ্কার প্রাণীর মধ্যে অদাহ্য অগ্নি বা তাপ সম্পর্কে তাকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

তার দক্ষতা আরো বৃদ্ধি পায়। সে নিজেকে চর্ম দ্বারা আবৃত করে। সে পশম ও শন ব্যবহার করতে শেখে এবং সুচশিল্পের দক্ষতা অর্জন করে। পুচ্ছবিশিষ্ট প্রাণী অবলোকনে সে অবহিত হয়, কেমন করে গৃহ নির্মাণ করা চলে। তার নিজস্ব শিকারের জন্য সে শিকারী পশুকে প্রশিক্ষণ দেয়। সে পাখির ডিম ও পশুর শিং-এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অনুধাবন করে। সে দ্বীপের জীবজানোয়ার, এর উদ্ভিদ, খনিজ পদার্থ এবং এর পরিবেশগত ঘটনাবলীকে পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞানের সর্বোচ্চ মাত্রায় উপনীত হয় যা সাধারণত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের[৯] কর্তৃকই অর্জিত হয়ে থাকে। এইভাবে হাই প্রকৃতি থেকে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান থেকে দর্শনে প্রবেশ করে এবং পরিণামে মরমিবাদে উপনীত হয়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিচিত্রতা দেখে সে বিস্ময়াভিভূত হয় এবং সকল প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঐক্য বা সংগতি লাভের প্রয়াস চালায় এবং পরিশেষে সমগ্র জগতের মধ্যে এক সর্বব্যাপী ঐক্যের আত্মসন্ধানে সে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। প্রকৃতির স্বভাব পাঠে সে প্রতিটি স্তরে জড় ও আধ্যাত্মিক আকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে সমর্থ হয় এবং এই থেকে সব বস্তুর কারণ হিসেবে 'সে এক বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় আকারের অস্তিত্ব অনুভব করে।' এই জগৎ পরিকল্পনার পশ্চাতে সে এক পরমসত্তার

ক্রিয়া অবলোকন করে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও গভীর চিন্তার মাধ্যমে হাই এবার প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত পরম সত্তাকে জানার দুর্বার অভিলাষ করে। তাঁর নিকট এ প্রতীত হয় যে আল্লাহ্র ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তিনি পরমজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাতা ও করুণাময়।

এই পর্যায়ে হাই এখন তার স্বীয় আত্মাকে জানার দিকে অগ্রসর হয় : আত্মিক শক্তি হলো সেই মাধ্যম যার দ্বারা জ্ঞান, এমনকি আল্লাহ্র গুণাবলি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। এই স্তরে সে এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, সে এমন এক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যা পশুরাজ্য থেকে উন্নততর এবং সে সেই শক্তি সদৃশ (akin) যা স্বর্গীয় মণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সে বিবেচনা করে যে, তার দেহ হচ্ছে শুধু এই জগতের অন্তর্গত, তার আত্মা বা শক্তি যা তার মধ্যে সর্বোচ্চ গুণ তা স্বর্গীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। যে আত্মিক শক্তির মাধ্যমে সে পরমসত্তাকে উপলব্ধি করে, তা স্বয়ং সেই পরমসত্তারই অংশ বলে সে ভাবতে শেখে।

এসব অনুধ্যাবনসমূহ তার ভবিষ্যৎ স্বভাব নির্ধারণের জন্য বিশেষ বিধিবিধান প্রণয়ন করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। একান্তভাবেই যা অপরিহার্য তা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের জন্য সে তার জৈবিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে পাকা কলা ও সবজি খেতে নির্বাচন করে নেয় এবং কেবল প্রয়োজনবোধে মাংস গ্রহণ করে এবং প্রায় সময়েই অনাহারে থাকার চেষ্টা করে। সে এই দৃঢ় মত পোষণ করে যে, তার দ্বারা আর কোনো পশু বা উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত না হয়। সে চলাফেরায় পরিচ্ছন্নতার পানে লক্ষ্য রাখে এবং দ্বীপতীরে ভ্রমণকালে নৈসর্গিক ক্রিয়াকলাপ অনুকরণ করে। এইপন্থা অবলম্বনে হাই তার সত্যিকার আত্মাকে ক্রমান্বয়ে স্বর্গ-মর্ত্যের ঊর্ধ্বে উন্নত করতে সক্ষম হয় এবং এইভাবে সে ঐশী আত্মায় উপনীত হয়। এই পর্যায়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বে তার পূর্বকার দার্শনিক অনুধ্যানের পরিবর্তে যে দিব্যদর্শন (beautific vision) অনুভব করে এবং সুফির বা মরমিবাদীর পরম মিলনে উপনীত হয়। মরমি ভাবোচ্ছ্বাসের আনন্দ অনুভব করার পর একজন পরিদর্শকের দ্বারা হাই-এর নির্জনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। নির্জন দ্বীপের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই বাস করত এক দল লোক। তারা ইসলামি বিশ্বাসের স্বীকৃত অনুসারী হলেও জাগতিক আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এই বসতিপূর্ণ রাজ্যের রাজা ছিলেন সালমান আসাল (আফসাল)[১০] নামে সালমানের এক বন্ধু। ধর্মীয় অনুশীলন ও নৈতিক আত্ম-উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে হাই-এর দ্বীপকে নির্জন ধারণা করে তথায় গমন করেন। এখানে হাই-এর সাথে আসালের সাক্ষাৎ ঘটে। হাই আসালের সাথে মেলামেশার ফলে অচিরেই মনুষ্য ভাষা শিখে ফেলে। পরবর্তীকালে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের প্রায়শই আলাপ-আলোচনা হতে থাকে। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা উভয়েই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও দর্শনের স্বাধীন চিন্তার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই; তারা উভয়েই মূলত এক ও অভিন্ন। উভয়েই পরমসত্তার ধারণায় উপনীত। ধর্মবিশ্বাসের এই সত্য ঘটনাটি সহজ-বিশ্বাসী জনসাধারণের নিকট প্রচার করার জন্য আসালকে সাথে নিয়ে হাই প্রতিবেশী বসতিপূর্ণ দ্বীপে গমন করেন। কিন্তু তাদের উভয়ের প্রচারই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। পরিবেশেষে উভয় বন্ধুই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, জনসাধারণের নিকট রূপক ভাষার আবরণে সত্যাসত্য প্রচারে নবিগণ

www.pathagar.com

সঠিক ও বিজ্ঞানোচিত কাজটি করেছিলেন। অতঃপর তাঁরা নির্জন দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখানেই তারা আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিজেদেরকে আরো গভীরভাবে মনোনিবেশ করে রাখেন।

হাই ইবনে ইয়াকযানের[১১] গুরুত্ব : সূক্ষ্ম বিচারে ইবনে তোফায়েলের দার্শনিক উপন্যাস দার্শনিক সমস্যার উৎসাহব্যাঞ্জক মতবাদ প্রচার করে।

প্রাকৃতিক ধর্ম, অর্থাৎ প্রত্যাদেশ ব্যতীত ধর্ম কি সম্ভব? উপন্যাসটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাষায় এই সম্ভাবনাকে সমর্থন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ যদি তাঁর নবিদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ নাও করতেন তবে, বিজ্ঞানী, মরমিসাধক এবং দার্শনিকগণ প্রকৃতি, মানব আত্মা ও বিশ্বজগতকে অনুধাবনের মাধ্যমে তাঁকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন। প্রকৃতি-পর্বে আল্লাহ্‌র গুণাবলি, যেমন, তাঁর বিজ্ঞতা ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে প্রমাণ এবং আল্লাহ্‌কে জানার এ-ই হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি। আল্লাহ্ হচ্ছেন বিশ্বজগতের ঐক্য বিধায়ক শক্তি—এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য দার্শনিকদেরকে মোটেই অপেক্ষা করতে হয় না। মরমি সাধকগণ তন্ময়তার দ্বারা আল্লাহ্‌র দিব্যদর্শন লাভ করে থাকেন। তাঁর নিকট এটা শুধু দিব্যদর্শনই নয়—এ হচ্ছে পরমসত্তার সাথে এক সজীব বা জীবন্ত সংস্পর্শ—আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ স্থাপন। আল্লাহ্ এবং মানবাত্মা যে সমগোত্রীয় এই বিষয়টি তখন তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানবাত্মা নিশ্চিতরূপেই ঐশী আত্মায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই কারণেই হাই ইবনে ইয়াকযান শিরোনামটি দেয়া হয়েছে।

ইবনে তোফায়েল তাঁর উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবেই দু'প্রকার জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন, যৌক্তিক ও অনুমানলব্ধ জ্ঞান এবং স্বজ্ঞাজাত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান। স্বজ্ঞাজাত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই আমরা কেবল পরমসত্তার সজীব সংস্পর্শ লাভ করতে পারি। ভাষায় প্রকাশ করার জন্য এবং অন্যের নিকট সংবাদ পরিবহনের জন্য যৌক্তিক ও অনুমানলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—কিন্তু স্বজ্ঞাজাত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কল্পনা ও দৃষ্টান্ত ব্যতীত অন্যকোনো অবলম্বন নেই—তাই দার্শনিক রূপকের সৃষ্টি।

ধর্ম ও দর্শনের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সত্যতা প্রতিপাদন করাই হচ্ছে উপন্যাসটির মূল সুর। দার্শনিক তার দিব্যদর্শনের মাধ্যমে রূপক ভাষার অন্তরালে পরিব্যক্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সত্যের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধিকারী দার্শনিককে তার দর্শন তত্ত্বের ব্যাখ্যা জনসাধারণের নিকট প্রচার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কারণ, সাধারণ মানুষ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার দ্বারা পীড়িত। তারা বিমূর্ত সত্য (absolutet truth) উপলব্ধি করতে অক্ষম। তারা দার্শনিকের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা অনুধাবন করতে সক্ষম নয় ইবনে তোফায়েল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পবিত্র কোরআনের ভাষা অবলম্বনে ধর্মের সত্য জনসাধারণের নিকট প্রচার করে নবি পয়গম্বরগণ সঠিক কাজ করেছেন। ধর্মের রূপক, অলৌকিক ঘটনা, আনুষ্ঠানিকতা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তির শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতির দ্বারা কেবল সাধারণ মানুষকে নৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব এবং এভাবেই তাদের নৈতিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সাধারণ লোক উদার দার্শনিক

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী নয়। সাধারণ মানুষকে তাদের সহজ ও সরল ধর্মীয় জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর মাধ্যমে ইবনে তোফায়েল যতদূর সম্ভব অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তিন স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষের চিত্র অংকন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। যথা (১) হাই—দার্শনিক সম্প্রদায়, (২) আসাল—ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়, (৩) সালমান—সাধারণ মানুষ।

১. **দার্শনিক সম্প্রদায় :** প্রাকৃতিক গুণ, অনুধ্যান এবং আত্ম-কল্পনার মাধ্যমে দার্শনিকগণ উর্ধ্বস্তর থেকে আলো বা জ্যোতি লাভ করতে সমর্থ হন। তারা ধীরে ধীরে সক্রিয় বুদ্ধির (active intellect) সাথে রহস্যাত্মক মিলনে উপনীত হন এবং পরিশেষে স্বয়ং ঐশীসত্তার সাথে মিলিত হন। উপন্যাসের নায়ক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র হাই-কে এইভাবেই রূপায়ণ করা হয়েছে। হাই দার্শনিক শ্রেণীর প্রতিভূ।

২. **ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় :** অনুধ্যানপরায়ণ ধর্মতাত্ত্বিকগণ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দ্বারা পবিত্র কোরআনের রূপক ভাষার বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালান। উপন্যাসে আসাল চরিত্রটিকে এইভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। আসাল ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

৩. **সাধারণ মানুষ :** গোঁড়া মতবাদী সাধারণ মানুষ সনাতন পদ্ধতির প্রতি দৃঢ় আস্থাবান। তারা প্রচলিত ধর্মের রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। উপন্যাসে জনবসিতিপূর্ণ দ্বীপের রাজা সালমান হচ্ছেন এই সাধারণ মানুষ বা গোঁড়া ধর্মবিদদের প্রতিভূ।

আধ্যাত্মিক স্তর অনুযায়ী তিন শ্রেণীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ইবনে তোফায়েল স্বয়ং নিজেকে হাই-এর সাথে শনাক্ত (Identifies) করেন। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা যায় যে, উপন্যাসে আসালের শ্লেষ উন্মোচন হয় তখনই যখন সে হাই-এর সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে আসে। এই ঘটনা থেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ধর্মের জন্য দর্শন কত গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, গ্রন্থটিতে যে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তা হচ্ছে, নবিদের প্রত্যাদেশের সাহায্য ব্যতীত মানুষ কেবলমাত্র তার আভ্যন্তরীণ জ্যোতির দ্বারা পরম পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। নব্য প্লেটোবাদী অনুসরণে ইবনে তোফায়েল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মরমি দার্শনিক অনুধ্যানের (mystico-philosophical meditation) মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে মিলন লাভ (union with god) সম্ভব। উপন্যাসটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে নব্য প্লেটোবাদ। তবে এর মধ্যে আমরা পিথাগোরীয়বাদ, জৈনবাদ এবং যুরাস্ত্রবাদের[১২] কিছু কিছু উপাদান রয়েছে বলেও লক্ষ্য করি। হাই-এর মাংস ভক্ষণ পরিহার, তার নিরামিষ ভোজন, তার মানসিক এবং দৈহিক পরিচ্ছন্নতা এবং স্বর্গীয় মণ্ডলের গতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলাফেরা—এসবই তার ওপর পিথাগোরীয় প্রভাবকে নির্দেশ করে। জৈন এবং বুদ্ধের ন্যায় হাই একজন সতর্ক নিরামিষভোজী। শুধু প্রাণিকূলের জন্যই নয়, উদ্ভিদজীবনের জন্যও রয়েছে তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ। সে শুধু পাকা ফল ভক্ষণ করে। সে অত্যন্ত পবিত্রভাবে বীজকে মৃত্তিকায় ন্যস্ত করে যাতে কোনো প্রকার বীজের মৃত্যু না ঘটে। হাই-এর বিস্ময়ের প্রথম ধর্মীয় অনুভূতি জাগে অগ্নি প্রজ্বলনের ঘটনাকে পরিদর্শন করে এবং সে সর্বদাই অগ্নি

www.pathagar.com

প্রজ্বলন করে রাখে। এই ঘটনাটি আমাদেরকে পারস্যের অগ্নি উপাসনা ধর্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সবই ইবনে তোফায়েলের মিশ্র ও সমন্বয়ধর্মী প্রয়াসকে নির্দেশ করে যা মুসলিম দার্শনিকগণের পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য।

টীকা ও তথ্য সংকেত

১. অন্যান্য বহুবিষয়ের উপর ইবনে তোফায়েলের রচনা রয়েছে বলে কথিত হয়, বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দু'টো গ্রন্থ এবং অ্যারিস্টোটলের মেটিওলজিকার উপর ভাষ্য। এদের অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর রচনার জন্য cf. ইবনে উসাবিয়্যহর 'উনুন আল-আসবা ফি তাবাকাত আল-আতিব্বা, এ. মূলার সম্পাদিত, কোনিগসবার্গ, ১৮৮৪, ভ্য. ২, পৃ. ৭৮।

২. উল্লেখ্য যে ডাচ ভাষায় হাই ইবনে ইয়াকযানের প্রথম অনুবাদকারী জে. বোখয়েষ্টার স্পিনোজার বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন। এ অনুবাদটি এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ১৭০১-এ এটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩. জে. কুজমিন কর্তৃক ১৯২০-এ লেনিনগ্রাড থেকে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৪. জে. জর্জ প্রিটিয়াস (ফ্রাঙ্কফোর্ট, ১৭২৬) কর্তৃক একটি এবং জে. জি. আইকহর্ণ (বার্লিন, ১৭৮২, ১৭৮৩) কর্তৃক অন্য একটি জার্মান অনুবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৫. সাইমন ওকলীর অনুবাদ বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ১৯২৯-এর লন্ডন থেকে এ. এস. ফার্ল্টন কর্তৃক এর নব-সংস্করণ সম্পাদিত হয়।

৬. বহু প্রতীক্ষিত উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয় : জাফর আহমেদ সিদ্দিকী, হাই ইবেন ইয়াকযান, আলিগড়, ১৯৫৫ এবং ড. সাঈদ মো. ইউসুফ জিত জাগতা, করাচি, ১৯৫৫।

৭. হাই ইবনে ইয়াকযানের কাল্পনিক কাহিনী বেশ প্রাচীন : আলেকজান্ডার অ্যান্ড দি স্টোরি অব দি আইডল' নামক প্রাচীন গল্পে এর আভাস পাওয়া যায়। হুনায়েন ইবনে ইসহাক কর্তৃক গ্রিক-উৎস থেকে অনুরূপ গল্প অনূদিত হয়েছিল। নিও-প্লেটোনিক ও হারমিটিসকিস থাকলেও এর উৎসের সন্দান পাওয়া যায় cf. হেনরি করবিন; আবিসিনা অ্যাণ্ড দিক ভিশনারি রিসিটাল, নিউইয়র্ক, ১৯৬০, পৃ. ২০৮-২৩। এটা সত্য যে ইবনে তোফায়েল এতে প্রথমবারের মতো নতুন ভাবধারা প্রবিষ্ট করার এবং বিশুদ্ধ দার্শনিক-তত্ত্বে একে পূর্ণতা দান করেন।

৮. cf. ড. এম গালাব 'ইবনে তোফায়েল' মাজাল্লাহ্ আযহার ঈজিপ্ট ১৩৬১/১৯৪২।

৯. কাহিনীর এই অংশ বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রদান করে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক শ্রেণীকরণকে বর্ণনা করে।

১০. এই নামের দু'টি ভিন্নরূপ। জামীর প্রখ্যাত কবিতায় সম্ভবত সত্য নামটি 'আবসাল' বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

১১. হাই ইবনে ইয়াকযানের দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : জাফর আহমেদ সিদ্দিকী; ফালাসিফা-হাই ইবনে ইয়াকযান, আলিগড়, ১৯৫৫ (উর্দু); ড. সাঈদ মো. ইউসফ op. cit পার্ট—১; খাজা আবদুল হামিদ 'দি ফিলসফি অব হাই ইবনে ইয়াকযান' (প্রসিডিংস অব) ফিফথ নেশন পাকিস্তান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস (১৯৫৮), লাহের (১৯৫৯) পৃ. ৩২৭-৩৪); এম. ইউনুস ফারাংগী—মাহাল্লী 'ইবনে তোফায়েল' মা'রিফ আযমগড়, ১৯২২, পৃ. ১৮-২৮ প্রভৃতি।

১২. এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে মানব সভ্যতার ক্রমোন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় ; 'অন্ধকারে প্রথম হাতড়ানো থেকে শুরু করে দার্শনিক অনুধ্যানে সর্বোচ্চ শীর্ষ পর্যন্ত মানবজাতির বিবর্তন এখানে লক্ষণীয়।'

www.pathagar.com

ইবনে রুশদ

ক. ভূমিকা

আবু আল-ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে রুশদ[১] ৫২০/১১২৬-এ করডোভাতে জন্মগ্রহণ করেন। ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর পরিবারের সুখ্যাতি ছিল। তাঁর পিতা এবং প্রপিতাগণ আন্দালুসের প্রধান বিচারকের দায়িত্বপালনে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ধর্মীয় বংশোদ্ভব তাঁকে উচ্চমানের ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। নির্ভরযোগ্য প্রখ্যাত আলিম-এর নিকট থেকে মৌখিকভাবেই তিনি পবিত্র কোরআন এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, নবি (দঃ)-এর হাদিস, ফিকাহবিজ্ঞান, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে পাঠ করা মালেকীয় গ্রন্থ 'আল—মুয়াত্তা' পুনরধ্যয়ন করেন এবং এটি মুখস্ত করে ফেলেন।[২] তিনি গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান শিক্ষাও লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে সময় করডোভা ছিল দর্শন-চর্চার কেন্দ্রভূমি এবং সেভিল ছিল শিল্প ও সাহিত্য চর্চার প্রাণকেন্দ্র। ইবনে রুশদ তাঁর জন্মনগরীর বৈজ্ঞানিক পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন , "সেভিলে যদি কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তবে তাঁর গ্রন্থগুলো বিক্রয়ের জন্য করডোভাতে প্রেরণ করা হয়; এবং করডোভাতে যদি কোনো গায়কের মৃত্যু ঘটে অবে তাঁর সংগীত যন্ত্রগুলো সেভিলে প্রেরণ করা হয়।"[৩] প্রকৃতপক্ষে, করডোভা তৎকালীন দামেস্কাস, বাগদাদ, কায়রো এবং প্রাচ্য ইসলামের অন্যান্য বড় বড় নগরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

তিনি পাশ্চাত্যের দুই প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে বাজা এবং ইবনে তোফায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইবনে তোফায়েল তাঁর হাই-বিন-ইয়াকযানের কাহিনীতে দেখান যে, পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত গণিতশাস্ত্রে উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা অ্যারিস্টোটলের গ্রন্থের মাধ্যমে দর্শনের সাথেও পরিচিত ছিলেন। প্রাচ্যের দুই দার্শনিক আল-আরাবি ও ইবনে সিনার দর্শন তেমন সন্তোষজনক ছিল না। দর্শনের উপর মূল্যবান কিছু অবদান রাখতে পারতেন এমন প্রথম দার্শনিক ছিলেন ইবনে বাজা। কিন্তু, তিনি জাগতিক ব্যাপারে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কার্যসম্পাদনের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। আল-গাযালি তাঁর 'তাহাফুতে' মুসলিম দার্শনিকদের মতবাদকে সমালোচনা করেছেন এবং সত্য লাভের উপায় হিসেবে তিনি রহস্যবাদকেই বেছে নিয়েছেন। 'আল-শিফা' গ্রন্থে ইবনে সিনা অ্যারিস্টোটলের মতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তিনি অ্যারিস্টোটলের মতবাদের সাথে তাঁর নিজস্ব মতামত মিশিয়ে ফেলেছেন। প্রাচ্যের ইসলামে দার্শনিক আলোচনার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যাখ্যা করে কেন ইবনে তোফায়েল অ্যারিস্টোটলের উপর ভাষ্য রচনার জন্য ইবনে রুশদকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইবনে রুশদ বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করছিলেন। তিনি আল মোরাভিদ-এর রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল-মোরাভিদ আল-মোহাদেস কর্তৃক মারাকাশে (৫৪২/১১৪৭) বিতাড়িত হন। আল-মোহাদেস ৫৪৩-১১৪৮-এ করডোভা জয় করেন। আল-মোহায়েদ আন্দোলন ইবনে তোমার্ত কর্তৃক শুরু হয়েছিল। আল-তোমার্ত নিজেকে মাহদি বলে অভিহিত করেন। তিনি ফাতেমীয়দের অনুসরণ করেন। ফাতেমীয়গণ মিশরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গূঢ় ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর পরবর্তী তিনজন আল-মোহাদীয় উত্তরাধিকারী আবদ আল-মুমিন, আবু ইয়াকুব এবং আবু ইউসুফ বিজ্ঞান ও দর্শনে তাঁদের পরম উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং ইবনে রুশদ এ তিনজনের অধীনেই কর্মে রত ছিলেন।

আবু ইয়াকুব যখন আমির নিযুক্ত হন, তখন তিনি অ্যারিস্টোটলের উপর ভাষ্য রচনার জন্য ইবনে রুশদকে নির্দেশ দেন। মারাকুশী অন্তত তা-ই উল্লেখ করেন। ইবনে রুশদ বলেন, "বিশ্বাসীদের যুবরাজের সম্মুখে যখন আমি প্রবেশ করি, আমি তাঁকে দেখেছিলাম শুধু একমাত্র আবু বকর ইবনে তোফায়েলের সঙ্গে। আবু ইয়াকুব তখন আমার পরিবার ও বংশধরকে উল্লেখ করে আমাকে প্রশংসা করে যাচ্ছিলেন। প্রথম যে বিষয়টি তিনি আমাকে বলেন, 'বেহেশত সম্বন্ধে তাঁদের (দার্শনিকদের) ধারণা কি?' 'এগুলো চিরন্তন না সৃষ্ট?' অসংলগ্ন চিন্তা ও ভীতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে...বিশ্বাসীদের যুবরাজ আমার ভয়ভীতি লক্ষ্য করে ইবনে তোফায়েলের দিকে তাকান এবং এসব বিষয়ে প্লেটো—অ্যারিস্টোটল এবং অন্যান্য দার্শনিকের কি অভিমত তা জানতে চান..."[৫] অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, ইবনে রুশদ বলেছেন, একদিন ইবনে তোফায়েল তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, বিশ্বাসী যুবরাজ অ্যারিস্টোটলের প্রকাশকে জটিল বলে অভিযোগ করেন; তাঁর অনুবাদ ও বিষয়ের দুর্বোধ্যতাকে উল্লেখ করে বলেন, "কেউ যদি গ্রন্থগুলোকে বিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত করে এবং পুরোপুরি বুঝে এদের উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে, তবে সাধারণ লোকের জন্য তা পাঠ করা সহজতর হয়।" সরকারি কাজে নিয়োজিত থাকা এবং বার্ধক্যজনিত কারণে ইবনে তোফায়েল এ কাজ করা থেকে অব্যাহতি পান এবং ইবনে রুশদকে এ কাজটি সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ জানান।

এভাবে ইবনে রুশদ অ্যারিস্টোটলের গ্রন্থের উপর তাঁর ভাষ্য রচনা শুরু করেন। এ কাজের জন্য তিনি সত্যিকার অর্থে "ভাষ্যকার"[৬] শিরোনামে ভূষিত হন এবং মধ্য-ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দান্তে তাঁর 'ডিভাইন কমেডি'তে তাঁকে ইউক্লিড, টলেমি, হিপ্পোক্রেটস, আভিসিনা এবং গ্যালেন-এর নামের সাথে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁকে একজন উঁচুমানের ভাষ্যকার বলে অভিহিত করেন।

বর্ণিত আছে যে, তিনি তিন ধরনের ভাষ্য রচনা করেছিলেন; যথা বৃহৎ, মধ্যম ও স্বল্প বা সংক্ষিপ্ত ধরনের ভাষ্য। বৃহৎ ভাষ্যগুলো "তফসির" বলে অভিহিত। এগুলো পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যার আদর্শকে অনুসরণ করে রচিত। তিনি অ্যারিস্টোটল থেকে একটি প্যারাগ্রাফ-এর উদ্ধৃতি দেন এবং পরে এর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রদান করেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে আরবিতে রচিত তাঁর মেটাফিজিক্সের বৃহৎ ভাষ্য আমাদের রয়েছে। এ গ্রন্থটি বাউসেজ (১৩৫৭-১৩৭১/১৩৩৮-১৯৫১) কর্তৃক সম্পাদিত। তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনাগুলো 'তখমিস' নামে পরিচিত। আরবি ভাষায় তখমিস শব্দের অর্থ হচ্ছে সারসংক্ষেপ। এসব ভাষ্য যদিও অ্যারিস্টোটলীয় আকারে রচিত, তবুও এগুলো রুশদীয় দর্শনের অভিব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হয়। মাজমুয়াহ অথবা জাওয়ামি নামে পরিচিত সারসংক্ষেপ গ্রন্থটি ছয়টি পুস্তকের সমন্বয়ে রচিত। এটি বর্তমানে আরবিতে প্রকাশিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এসব ভাষ্যে ইবনে রুশদ অ্যারিস্টোটলের মৌলিক গ্রন্থের অনুসরণ করেন নি কিংবা অ্যারিস্টোটলের ভাববিন্যাসে এটি রচিত হয় নি। ১৩৫৭/১৯৩২-এর বাউজেস সম্পাদিত 'ক্যাটেগরিসে' মধ্যম ধরনের ভাষ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। প্যারাগ্রাফের প্রারম্ভেই ইবনে রুশদ বলেন, "qala" (dixit) অর্থাৎ অ্যারিস্টোটল এবং কোনো কোনো সময় (সর্বদা নয়) মৌলিক গ্রন্থেরও উদ্ধৃতি প্রদান করেন।[৭] প্রাচ্য-ইসলামে এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং ইবনে সিনা তাঁর 'আল-শিফা' গ্রন্থে এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এতে তিনি বহু জায়গায় অ্যারিস্টোটলের আরবি অনুবাদের বাগধারা পুনর্ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে ইবনে সিনা ঘোষণা করেন যে, "তিনি তাঁর 'আল-শিফা' গ্রন্থে প্রথম শিক্ষককে অনুসরণ করেছেন।"

এটা সত্য যে, অধিকাংশ ভাষ্যই ল্যাটিন অথবা হিব্রু অনুবাদে পাওয়া যায়। কিন্তু মূল আরবি গ্রন্থ অধিকতর নিশ্চিত ও নিখুঁত। মোটের উপর ইবনে রুশদ-এর ভাষ্যের মূল্য ঐতিহাসিক। অবশ্য, সংক্ষিপ্তাকারে রচিত তাঁর ভাষ্যগুলো তাঁর স্বীয় ভাবের কিছুটা প্রতিফলন ঘটায়। তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে তাঁর স্বীয় দার্শনিক মতবাদ পরিব্যক্ত হয়েছে, যথা : ফসূল, কাশফ এবং তাহাফুত গ্রন্থে। আল-ইত্তিসাল নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থেও তাঁর মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। ইবনে রুশদের 'কুল্লিয়াত' (Coliget, Kulliyat) গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটা অনেকটা ইবনে সিনা রচিত 'কানুন' গ্রন্থের ন্যায়। উল্লেখিত গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু ইবনে সিনার 'কানুন'-এর ন্যায় এটি তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে নি। আইনবিজ্ঞানে (ফিকাহ) তাঁর গ্রন্থ 'বিদায়েত আল-মুজতাহিদ' আরবির একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত।

বহুবিধ কারণে তিনি প্রাচ্যের চেয়ে মধ্য ইউরোপে অধিকতর সুপরিচিত ও প্রশংসিত হয়েছিলেন। প্রথমত, তাঁর অসংখ্য লেখা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং এগুলো যথাযথভাবে প্রচারিত ও সংরক্ষিতও হয়েছিল। কিন্তু মূল আরবি গ্রন্থগুলো হয় পুড়িয়ে ফেলা হয় অথবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, কারণ, এগুলো ছিল দর্শন ও দার্শনিকদের বিরুদ্ধে রচিত। দ্বিতীয়ত, ইবনে রুশদ কর্তৃক লিখিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে রেঁনেসাঁ ইউরোপ তখন মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অপরদিকে, মরমি ও ধর্মীয় আন্দোলনের জন্য প্রাচ্যের দর্শন ও বিজ্ঞানকে বর্জন করা হয়। আসলে তিনি স্বয়ং বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের দ্বন্দ্বের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরিশেষে, প্রাচ্যে ধর্মই জয়লাভ করে এবং প্রতীচ্যে বিজয় লাভ হয় বিজ্ঞানের।

www.pathagar.com

৫৯৩/১১৯৬-এর তাঁর অপমান, নির্যাতন ও নির্বাসন হচ্ছে এ দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি। ধর্ম ও দার্শনিক প্রতিনিধিদের মধ্যকার রাজনৈতিক ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব নবম শতাব্দী থেকে চলে আসছিল তা কখনও নিঃশেষ হয়ে যায়। আল-কিন্দি তাঁর গ্রন্থে এ দ্বন্দ্বের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তিনি দার্শনিকদের সমর্থন করেছেন। ধর্মীয় পণ্ডিতগণ (ফুকাহা ও উলামা) সাধারণের অতি নিকটে যারা তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মুসলিম শাসকগণ তাঁদের সমর্থনের প্রয়োজনে সাধারণের রোষ বা ক্রোধের ফলে দার্শনিকদের বর্জন করেন। কর্ডোভার নিকটে লুসিনাতে ইবনে রুশদের নির্বাসনের ব্যাপারে বিভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। ইবনে রুশদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি নাকি তাঁর কোনো গ্রন্থে বার্বার রাজার বাগানে জিরাফ দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে ইবনে রুশদ বলেন, তিনি দু'স্থানের রাজার কথা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় কাহিনী এই যে, তিনি নাকি ভেনাস ঐশী শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় অভিযোগ হচ্ছে তিনি কোরআনে উল্লেখিত আদ সম্প্রদায়ের লোকদের ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করেছিলেন।

ধর্মীয় দলগুলোর ষড়যন্ত্র এতটুকু সাফল্য অর্জন করে যে, তাঁরা ইবনে রুশদকে শুধু নির্বাসন দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর গ্রন্থগুলোকেও প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। দর্শন ও দার্শনিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আইন জারি করা হয় এবং আন্দালুস ও মারাকুশে সর্বত্র তা প্রচার করা হয়। তথাকথিত বিপজ্জনক দর্শন অধ্যয়ন নিষেধ করা হয় এবং এসব বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট পুস্তক জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। যাই হোক, ইবনে রুশদের এ-অবমাননা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মারাকুশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল-মনসুর তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। ইবনে রুশদ মারাকুশে গমন করেন এবং সেখানে ৫৯৫/১১৯৮-এ মৃত্যুবরণ করেন।

খ. ধর্ম ও দর্শন

ধর্ম ও দর্শনের মধ্যকার সামঞ্জস্য বিষয়টি মুসলিম দর্শনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ইবনে রুশদ এক চমৎকার উদ্ভাবনীক্ষমতা প্রদর্শন করেন। আল-গাযালির নিন্দেজ্ঞাপক গ্রন্থে 'দার্শনিকদের অসংগতি' প্রকাশিত হওয়ার পর ইবনে রুশদ ফকিহ ও ধর্মবিদদের তীব্র আক্রমণ থেকে দার্শনিকদের রক্ষা করা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। দার্শনিকদেরকে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী (heresy, kufr) অথবা অ-ধর্মীয় বলে নিন্দা করেছেন। তাঁর এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে যে-পর্যন্ত না দার্শনিকগণ তাঁদের দর্শনচর্চা থেকে বিরত থাকছেন অথবা তাঁদের মতবাদের অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন সে-পর্যন্ত দার্শনিকদেরকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত বলে ইবনে রুশদ মনে করেন। একই সাথে তিনি মনে করেন, দার্শনিকদেরকে তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের মতবাদ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। 'ফস্ল-আল-মাকাল ফি মা বায়েন আল-হিকমাল ওয়াল শারীআহ মিন আল-ইত্তিআল' শিরোনামে ইবনে রুশদের এ গ্রন্থখানি দর্শনকে সমর্থন করে লেখা। এতে তিনি দর্শনের সাথে ধর্মের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

www.pathagar.com

শারী'আর (ইসলামি বিধান) দ্বারা দর্শনচর্চা অনুমতি প্রাপ্ত, নিষিদ্ধ, সুপারিশকৃত, অথবা নির্দেশিত কিনা এ জিজ্ঞাসা নিয়ে ইবনে রুশদ তাঁর গ্রন্থের সূচনা করেন। শুরুতেই তাঁর উত্তর হচ্ছে : ধর্ম দ্বারা দর্শন পাঠ নির্দেশিত, ন্যূনপক্ষে সুপারিশকৃত (শারী'আ-এর সমার্থকরূপে ধর্ম কথাটি এখানে ব্যবহৃত, সুনির্দিষ্টভাবেই এটা ইসলামকে নির্দেশ করে)। কারণ, দর্শনের কাজই হচ্ছে সত্তা সম্পর্কীয় চিন্তা। সত্তা সম্পর্কীয় চিন্তাই স্রষ্টার[১০] জ্ঞানে আমাদেরকে পরিচালিত করে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের বৌদ্ধিক জ্ঞান অর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন : 'এসব হচ্ছে নির্দশন, তাঁদের জন্য যাঁরা চিন্তা করে, যাঁরা জ্ঞানবান।' 'আল-ইতিবার' একটি কোরানিক শব্দ—বিশুদ্ধ চিন্তন বা অনুধ্যান (নযর)-এর চেয়েও এটা আরো বেশি অর্থবহ।

ইবনে রুশদ ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে প্রচেষ্টা চালান তা জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কীয় (epistemoiogical) মতবাদে। পবিত্র কোরআনের আলোচনা যৌক্তিক ভাষায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে উপনীত হওয়াকে অর্থ করে। যুক্তিবিদ্যায় এ ধরনের যুক্তিকে অবরোহ বলে। প্রতিপাদন (demonstration, burhan) হচ্ছে অবরোহের সর্বোত্তম আকার (best form)। প্রতিপাদনের মাধ্যমে আল্লাহকে জানার জন্য আল্লাহ্ যেহেতু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন, তা-ই প্রমাণমূলক ও দ্বান্দ্বিক (demonstrative and dialectical)। আলংকারিক ও কূটতর্ক (rhetorical and sophistical) অবরোহের মধ্যকার পার্থক্য কি সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। প্রতিপাদন হচ্ছে আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের হাতিয়ার। এ হচ্ছে চিন্তনের যৌক্তিক পদ্ধতি যা আমাদেরকে নিশ্চিত জ্ঞানলাভে পরিচালিত করে।

ইবনে রুশদের মতে, ধর্ম ও দর্শন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধর্ম শুধু দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, ধর্ম দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মহাগ্রন্থ কোরআন জীবন, জগৎ এবং জগতের বিভিন্ন সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। দার্শনিক ভাষায় ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে : সত্য তত্ত্ব ও সত্য অনুশীলন অর্জন করা (to attain true theory and true practice, al-ilm al-haqq w-al amal al-haqq)।[১১] এ বিষয়টি আল-কিন্দি ও তাঁর অনুসারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত দর্শনের সংজ্ঞার কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যা অদ্যাবধি মুসলিম দর্শনে প্রবহমান। আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞানই হচ্ছে সত্য-জ্ঞান।[১২] জ্ঞান অর্জনের পথ দু'প্রকারের : বোধ-জাত (apprehension) এবং সম্মতিমূলক (assent)। সম্মতি হয় : (১) প্রমাণমূলক (demonstrative), (২) দ্বান্দ্বিক (dialectical) অথবা (৩) আলংকারিক (rhetorical)।

পবিত্র কোরআনে এ তিন প্রকার সম্মতির (assent) কথা পরিব্যক্ত হয়েছে। ইবনে রুশদ তিন শ্রেণীর জ্ঞানের অধিকারী তিন শ্রেণীর মানুষকেও চিহ্নিত করেন : (১) দার্শনিকবৃন্দ, (২) ধর্মতত্ত্ববিদ এবং (৩) সাধারণ মানুষ (জুমহুর)। দর্শনিকগণ প্রমাণমূলক ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মতত্ত্ববিদগণ—অর্থাৎ আশারীয়গণ যাঁদের মতবাদ ইবনে রুশদের সময় প্রচলিত ছিল তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে অন্তর্ভুক্ত। কারণ,

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক সত্য দিয়ে নয় বরং দ্বান্দ্বিক যুক্তির দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হন। সাধারণ মানুষ "আলংকারিক সম্প্রদায়ের" অন্তর্ভুক্ত (people of rhetoric)। তাঁরা কেবল দৃষ্টান্ত, প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করে থাকেন।

এ পর্যন্ত ধর্ম দর্শনের সাথে সংগতিপূর্ণ। দর্শনের লক্ষ্য ও কর্ম ধর্মেরই অনুরূপ। এবারে আসে তাদের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর আলোচনা। সনাতনপন্থীগণ কর্তৃক তীব্র সমালোচনার মুখে ইবনে রুশদ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অবস্থান নিরূপণের জন্য সচেষ্ট হন। তাঁর প্রখ্যাত দু'টো গ্রন্থ (১) 'এ ডিসাইসিভ ডিসকোর্স অন দি রিলেশন বিটুইন রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফিলসফি' এবং (২) 'অ্যান এক্সপজিশন অব দি মেথডস্ অব আরগুমেন্ট কনসার্নিং দি ডকট্রিন অব রিলিজিয়ন'[১২]-এ মূলত তিনি ধর্ম ও দর্শন সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রথম মূলনীতি হচ্ছে দর্শনকে অবশ্যই ধর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, সকল মুসলিম দার্শনিকই এটা বিশ্বাস করেন এবং এটা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশাও বটে। ফ্রান্সিস বেকনের ন্যায় ইবনে রুশদ বিশ্বাস করেন যে, অল্প ও অস্পষ্ট দর্শনজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। অপরদিকে, দর্শনে গভীর জ্ঞান ধর্মকে পুরোপুরি ও উত্তমরূপে বুঝতে মানুষকে সহায়তা করে। ইবনে রুশদ দু'টো সত্যের বিধি (formula of two truths), বলতে গেলে, দু প্রত্যাদেশ উপস্থাপন করেছেন বলে বিশ্বাস করা হয় : একটি দার্শনিক, অন্যটি ধর্মীয়—শেষ বিশ্লেষণে উভয়কেই মিলিত হতে হবে। নবিগণ জনসাধারণের নিকট আবেদন জানানোর জন্য রূপক, দৃষ্টান্ত ও প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন। দার্শনিকগণ উচ্চতর আকারে ও ন্যূন জড়ীয় আকারে নিজেদেরকে প্রকাশ করেন। ধর্মগ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে আক্ষরিক ও রূপক অর্থের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনের কোনো আয়াতে যদি এমন কিছু পাওয়া যায়, যা দর্শনের[১৩] বিপরীত, তবে আমাদের বুঝতে হবে আয়াতটির বাহ্য ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই আমাদেরকে এর গভীর ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে হবে। আক্ষরিক ও সাধারণ অর্থেই জনগণকে পরিতুষ্ট থাকতে হবে। শুদ্ধ ব্যাখ্যা তাবিল (tawil) অনুসন্ধান করা দার্শনিকদের কাজ। একটি মূর্ত দৃষ্টান্ত দেয়া যাক : "আল্লাহ্ স্বর্গে আছেন"—সাধারণ মানুষ এ বাক্যটিকে এর আক্ষরিক ও বাহ্যিক (zahir) অর্থে গ্রহণ করে এবং নভোমণ্ডলের কোনো স্থানে তাঁর অবস্থান আছে বলে ধরে নেয়। পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ জানেন যে, স্থানে আল্লাহ্‌র কোনো দৈহিক সত্তা নেই। ফলে, তিনি এ বাক্যের ব্যাখ্যা করেন এর গূঢ় ও অন্তর্নিহিত অর্থে (batin) অর্থাৎ তিনি ভাবেন আল্লাহ্ পার্থিব ও মানবীয় আকারের অনেক উর্ধ্বে—তাঁরা ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহ্ সর্বত্রই বিরাজিত, কেবল স্বর্গেই নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র সর্ববিদ্যমানতাকে (omnipresence) যদি স্থানিক অর্থে (spatial sense) ধরে নেয়া হয়; তবে দার্শনিকদের ব্যাখ্যাকে ভুল বুঝা হবে। ইবনে রুশদ মনে করেন, দার্শনিকগণ 'আল্লাহ্ স্বর্গে আছেন' বাক্যটিকে এই অর্থে ব্যবহার করেন যে, আল্লাহ্ নিজ ব্যতীত অন্য কোনোখানে নেই। দার্শনিকদের এ অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করে। "আল্লাহ্ স্বর্গে আছেন"—একথা না বলে

www.pathagar.com

দার্শনিকদের বলা উচিত "স্বর্গ আল্লাহতে আছেন"—এভাবে যুক্তিসংগতভাবেই প্রদর্শন করা যায় যে, আল্লাহ্ কোনো স্থানে নেই বরং স্থানই আল্লাহ্-তে অবস্থান করছে।

সাধারণের নিকট এসব উক্তি নিশ্চিতরূপেই ধাঁধাবিশেষ। এগুলো তাদেরকে পথনির্দেশনা দেয়ার চাইতে তাদেরকে অস্পষ্টতার আলোকে ঢেকে দেবে এবং এতে ভুল পথে পরিচালনা করার সম্ভাবনাই বেশি। তাই দার্শনিকদেরকে অনুশীলন (practice) করতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের লব্ধ গূহ্য-জ্ঞান জনসাধারণের[১৪] নিকট প্রকাশ না করেন।

ইবনে রুশদ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাসকে মানুষের মেধার বিভিন্ন মাত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করা উচিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম ও বৃহত্তম শ্রেণী হচ্ছে তাঁরা যাঁরা তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধর্মোপদেশ (sermon) থেকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সাধারণত ধর্মীয় বাগ্মিতার (oratorial) দ্বারা অভিভূত হন। এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নির্ভেজাল ধর্মবিশ্বাসীগণ (unsophisticated orthodox), দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছেন তাঁরা যাঁদের ধর্মবোধ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার উপরে নির্ভরশীল কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নির্বিচারে কিছু আশ্রয়বাক্য (premise) গ্রহণ করে নেন যার থেকে প্রজ্ঞা অগ্রসর হয়। কালামটিকস এবং ধর্মবিদগণ এ শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয় এবং শেষ শ্রেণীর লোক হচ্ছেন স্বল্পতম। এ শ্রেণী সে সব মানুষকেই তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে, ধর্ম সম্বন্ধে যাঁদের বৌদ্ধিক বোধ রয়েছে, যাঁদের বিশ্বাস প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত—যে প্রমাণ আশ্রয়বাক্য থেকে আসে এবং সে আশ্রয়বাক্য পুরোপুরিভাবে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন দার্শনিকগণ যাঁদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা চরমভাবে বিকশিত হয়েছে। মানুষের বৌদ্ধিক স্তর বা মাত্রানুযায়ী ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যা ইবনে রুশদের তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির[১৫] পরিচয় বহন করে।

কিন্তু ইবনে রুশদের এ মতবাদ ধর্মবিদদের মনে সংশয়ের উদ্রেক করে এবং তাঁরা তাঁকে আন্তরিকহীনতার (insincerity) দায়ে অভিযুক্ত করেন সত্যের এ দ্বিমুখি মতবাদ, এক ধর্মবিশ্বাসীগণের জন্য, অন্যটি দার্শনিকদের জন্য। তাঁরা উল্লেখ করেন, এ হচ্ছে ইবনে রুশদের প্রতারণা এবং তাঁর দ্বৈত কৌশল অবলম্বন। যাই হোক, নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, তিনি অন্যকোনো ধর্মবিদদের[১৬] চেয়ে কম আন্তরিক এবং কম ধর্মপরায়ণ ছিলেন না। তিনি সততার সাথেই বিশ্বাস করতেন যে, একই সত্য বিভিন্ন আকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর গভীর অর্ন্তদৃষ্টি এবং উদার দার্শনিক উদ্ভাবনীশক্তিই তাঁকে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে, বিশেষ করে ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় ঘটাতে সহায়তা করে যা অসাধ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। দু'ভাজ সত্য-মতবাদের সংকীর্ণতার ও ভুল ব্যাখ্য তিনি প্রকাশ্যভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন।[১৭]

ইবনে রুশদ দর্শনের যৌক্তিক পদ্ধতির সাথে ধর্মের ঐতিহ্যগত ফিকাহ-বিজ্ঞানের তুলনা করেন। চারটি উৎসের উপর ফিকাহর মূলনীতি নির্ভর করে : (১) কোরআন, (২) হাদিস, (৩) ইজমা (মতৈক্য, (concencsus) এবং (৪) কিয়াস (আইনসিদ্ধ ন্যায়ানুমান legal syllogism)। পবিত্র কোরআনকে যুক্তিসংগতভাবে ব্যাখ্যা করা

www.pathagar.com

উচিত। একটা বিশেষ কালে যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমদের মতামতের ঐক্যের ভিত্তিতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মতাবাদের ব্যাপারে কোনো সময়ই ঐক্যমত অর্জিত হয় না। কারণ, কোনো কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি মনে করেন, কিছু কিছু বিষয় আছে যা গোপন রাখা উচিত। এ মত পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা সমর্থনপুষ্ট। শুধু "যাঁদের জ্ঞানের ভিত বা শিকড় শক্ত" তাঁদেরই জানার অধিকার রয়েছে। যেহেতু মতবাদের ব্যাপারে কোনো ঐক্যমত নেই তাই ইজমার ভিত্তিতে দার্শনিকদেরকে অধর্মীয় বলে নিন্দে করার কোনো অধিকার আল-গাযালির নেই। তিনটি বিষয় : (১) জগতের নিত্যতা, (২) বিশেষ সম্পর্কে (particular) আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অস্বীকার, এবং (৩) দৈহিক পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির জন্য আল-গাযালি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন এবং তাঁদেরকে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী (takfir) বলে অভিযুক্ত করেন। ইবনে রুশদ তাঁর 'তাহাফাতুল তাহাফুত' (অসংগতির অসংগতি) গ্রন্থে আল-গাযালির এ অভিযোগ খণ্ডন করেন।

ইবনে রুশদের মতে, তিনটি মূলনীতির উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। উপরে উল্লেখিত তিন শ্রেণীর প্রতিটি মুসলমানকেই তা বিশ্বাস করতে হয়। এগুলো হচ্ছে : (১) আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, (২) নবুওয়াত, এবং (৩) পুনরুত্থান।[১৯] এ তিন নীতি ধর্মের বিষয়বস্তু গঠন করে। যেহেতু নবুওয়াত প্রত্যাদেশের (revelation) উপর নির্ভরশীল; তাই প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দর্শন ধর্ম থেকে পৃথক থাকে। এ বিষয়টি ইবনে রুশদ তাঁর অন্য একটি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ তিন নীতির কোনো একটিকে অস্বীকার করলে একজন অ-ধার্মিক (kafir) বলে গণ্য হবেন। প্রমাণ, দ্বান্দ্বিক অথবা আলংকারিক যেভাবেই হোক না কেন তাঁকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

দার্শনিকদেরকে তাঁদের গূহ্য ব্যাখ্যা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ, এতে সাধারণের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোনো কোনো ধর্মবিদ এরূপ করেছেন বলেই ইসলামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে এবং একে অপরকে অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করেছেন বলেই ইবনে রুশদের ধারণা। দর্শন ধর্মের যমজ বোন, তাঁরা দু'বন্ধু—প্রকৃতিগত ও স্বভাগত কারণেই তাঁরা একে অপররের পরিপূরক।

গ. আল্লাহকে জানার প্রণালি

সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মের বাহ্যিক এবং জ্ঞানবাদের জন্য এর অভ্যন্তরীণ অর্থ রয়েছে এ মত প্রতিষ্ঠার পর ইবনে রুশদ তাঁর 'আল-কাশফ এন মানহিজ আল-আদিল্লাহ্' গ্রন্থে আল্লাহ্‌কে জানার উপায় নির্ধারণের প্রচেষ্টারত থাকেন। পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর গুণাবলি সম্পর্কীয় জ্ঞান বাহ্য অর্থেই কিভাবে লাভ করা যায় তা জানার অধিকার প্রতিটি বিবেকবান মানুষের রয়েছে। যেহেতু গ্রন্থটি ধর্মীয় আকারে রচিত, তাই ইবনে রুশদ বিদ্যমান ইসলামি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। আশারীয়া, মুতাযিলা, বাতেনীয়, হাসাওয়াই এবং সুফি।[২০] স্বাভাবিক কারণে আশারীয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত তিনি

www.pathagar.com

মুতাযিলাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন, কিন্তু তিনি বাতেনীয়দের সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নি।

হাসাওয়াইগণ উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্‌কে জানার মাধ্যম প্রজ্ঞা নয়, বরং বাচনিক পরিবাহনের মাধ্যমে শ্রবণ[২১] (listening through oral transmission)। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস নবিদের থেকে প্রাপ্ত—এখানে প্রজ্ঞার করার কিছুই নেই। তাঁদের এ বক্তব্য কোরআনে উল্লেখিত আয়াতের পরিপন্থী। কারণ, সাধারণ মানুষকে তাদের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য মহাগ্রন্থ উদ্বুদ্ধ করে।

আশারীয়গণ অভিমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ্‌কে জানার মাধ্যম হচ্ছে প্রজ্ঞা (reason)। কিন্তু, তাঁদের পদ্ধতি কোরআনে বর্ণিত ধর্মীয় পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তাঁরা কতকগুলো দ্বান্দ্বিক আশ্রয়বাক্য (dialectical premises) গঠন করেন : যেমন, জগৎ অনিত্য, দেহ পরমাণু দিয়ে তৈরি, পরমাণু সৃষ্ট, জগতের কর্তা (agent of the world) নিত্যও নয় অনিত্যও নয় প্রভৃতি। তাঁদের যুক্তিগুলো সাধারণ লোকের বোধের অতীত এবং যুক্তিগুলো অসংগতিপূর্ণ ও অপ্রত্যায়িত (unconvincing)।[২২] আবু আল মা'লী[২৩] নামে অন্য একজন আশারীয়-এর পদ্ধতি দু'টো আশ্রবাক্যের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ তাঁর মতে, জগৎ হচ্ছে (১) সম্ভাব্য (jaiz) এবং (২) যা সম্ভাব্য তা অনিত্য। এ পদ্ধতিতে জীবন সৃষ্টির বুদ্ধিমত্তাকে (wisdom) অস্বীকার করা হয়। ইবনে সিনার পদ্ধতিও[২৪] আবু-আল-মা'লীর অনুরূপ। সুফিগণ[২৫] মরমি (mystic) পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিলাভের পর ঊর্ধ্ব থেকে আল্লাহ্‌র জ্ঞান আত্মায় বিক্ষেপিত হয়। কিন্তু এ পন্থা সকল মানুষের নিকট বোধগম্য নয়। এটা মানুষের অনুধ্যানপরায়ণ চিন্তাকে অস্বীকার করে। কিন্তু পবিত্র কোরআন অনুধ্যানপরায়ণ চিন্তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

তা'হলে আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞানলাভের সত্যিকার পন্থা কি যা মানুষের উপযোগী? ইবনে রুশদ বলেন, দু'টো পথ পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে : (১) দূরদর্শিতার প্রমাণ (proof of providence), (২) সৃষ্টির প্রমাণ (proof of creation)। প্রথমটি উদ্দেশ্যমূলক, দ্বিতীয়টি বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক। উভয়ের যাত্রাই মানুষ ও অন্যান্য সত্তা দিয়ে শুরু হয়েছে, অখণ্ড জগৎ দিয়ে নয়।

দু'টো নীতির উপর দূরদর্শিতার প্রমাণ ভিত্তি করে আছে, (১) সকল সত্তাই মানুষের অস্তিত্বের জন্য উপযোগী, এবং (২) যেহেতু এ-উপযুক্ততা (suitability) আকস্মিকভাবে লাভ করা যায় না, তাই কর্তার ইচ্ছার প্রয়োজনেই এ উপযুক্ততা আসে। মানুষের সেবার জন্য সকল সত্তার সৃষ্টি: মানুষের পথনির্দেশনার জন্য তারকারাজি রাতে আলো ছড়ায়, মানুষের দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তাঁর অস্তিত্ব ও জীবনরক্ষার জন্যই যেন তৈরি। এ মত থেকে সমগ্র মূল্য সম্পর্কীয় মতবাদই বিকশিত হতে পারে।

সৃষ্টি সম্পর্কীয় প্রমাণও দু'টো নীতির উপর ভিত্তি করে আছে : (১) সকল সত্তাই সৃষ্ট, এবং (২) যা সৃষ্টি হয়েছে তা স্রষ্টার প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে। জীবসত্তা থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। মৃতকে জীবন লাভ করতে যখন আমরা লক্ষ্য করি, তখন প্রয়োজনেই আমরা জানি যে, জীবনদানকারী একজন স্রষ্টা রয়েছেন, অর্থাৎ, আল্লাহ্

www.pathagar.com

স্বর্গও তাঁর সঞ্চালনের জন্য নির্দেশিত এবং এ নির্দেশনায়ই তিনি নক্ষত্রজগৎ পরিচালনা করেন। পবিত্র গ্রন্থে আল্লাহ্ বলেন : "নিশ্চয়ই আমাকে ব্যতীত তোমরা যাকে আল্লাহ্ বলে ডাক তাঁরা সবে একত্রে মিলেও একটা মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে না।[২৬] যারা আল্লাহ্‌কে জানতে চান তাঁরা বস্তুর সারবত্তা ও ব্যবহারের জ্ঞানলাভের মাধ্যমেই তা অর্জন করতে পারেন।

জ্ঞানবান এব‹ সাধারণের নিকট এ উভয় পদ্ধতিই পরিচিত। কেবল জ্ঞানের মাত্রানুযায়ী[২৭] তাদের পার্থক্য। সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানেই পরিতৃষ্ট থাকে যা বিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ। জ্ঞানবান বা পণ্ডিতগণ প্রতিপাদনেই কেবল দৃঢ় প্রত্যয়ী।

সাতটি গুণাবলি (attributes)[২৮] দ্বারা আল্লাহ্ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ : জ্ঞান, জীবন, শক্তি, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন এবং কথন। আল্লাহ্‌র সারবত্তা ও গুণাবলির মধ্যে তিনটি অবস্থান থাকতে পারে : (১) সমস্ত গুণাবলি অস্বীকার করা (negate)। এটা হচ্ছে মুতাযিলাদের অভিমত। (২) পূর্ণাঙ্গরূপে সমস্ত গুণাবলিকে স্বীকার করা, এবং (৩) গুণাবলিকে অতিবর্তী (transcendent) মনে করে মানবজ্ঞানের অতীত বলে ভাবা। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র গুণাবলির বর্ণনা দেয়, আবার এটাও বলে, "তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই"।[২৯] এর অর্থ হচ্ছে তিনি অজ্ঞেয় (unknowable)। সাধারণ মানুষ আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ তিনি দেখেন, শুনেন ও কথা বলেন। প্রমাণমূলক ব্যক্তিগণের সাধারণের নিকট তাঁদের ব্যাখ্যাকে প্রকাশ করা উচিত নয়। মুতাযিলা ও আশারীয়গণের মতবাদ সন্তোষজনক নয়। ইবনে রুশদ তাঁর 'আল-মানাহিজ' গ্রন্থে তাঁদের সমাধানের সমালোচনা করেছেন এবং 'তাফুতে'এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, গুণাবলিকে স্বীকার বা অস্বীকার না করে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বাহ্যিক অর্থই অনুসরণ করা উচিত। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলো গোপন রাখা উচিত।

আল্লাহ্‌র কার্যাবলীতে পাঁচটি প্রধান বিষয়ে ভাগ করা হয় : সৃষ্টি, নবি প্রেরণ, নিয়তি, ন্যায়বিচার এবং পুনরুত্থান।[৩০] এগুলো জগৎ ও মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কার্য। আকস্মিকভাবে নয়, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সাথে আল্লাহ্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগৎ সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গরূপে নিয়ন্ত্রিত—এটাই বিজ্ঞ স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কার্যকারণ পূর্বানুমিত (presuppused)। কারণ ছাড়া কোনো কিছু হয় না বলে ইবনে রুশদ মনে করেন। প্রথম কারণ থেকে কারণের নির্দিষ্ট ক্রমবিন্যাস বয়ে চলেছে। তিনি বলেন, "কারণের উপর নির্ভরশীল কার্যজগতের অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করেন, তাঁরা জ্ঞানবান স্রষ্টাকেই অস্বীকার করেন।"[৩১]

নবি প্রেরণের প্রমাণ দু'টো নীতির উপর ভিত্তি করে আছে বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, এটা সেই ধরনের লোককে নির্দেশ করে যাঁরা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন (prescrilbe) করেন। নবির কার্য হচ্ছে বিধি প্রণয়ন যার অনুসরণ শাশ্বত সুখ আনয়ন করে। দ্বিতীয় হচ্ছে, যিনি যোগ্যতা সহকারে এ বিধি প্রণয়ন কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন, তিনি নবি বলে অভিহিত। নবিগণ অলৌকিক বা

www.pathagar.com

অতি-প্রাকৃতিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারেন—এ বিশ্বাসই নবিদের সত্যতা প্রমাণ করে বলে ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। কিন্তু পবিত্র কোরআন পূর্বেকার ধর্মের এ সাধারণ ধারণাকে অস্বীকার করে। যখন আরবগণ শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে ঝর্ণা প্রবাহ সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তাঁরা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নবি বলে বিশ্বাস করবে না বলে উল্লেখ করেছিল, তখন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নবি (দঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি কেবল একজন মানুষ, একজন প্রেরিত পুরুষ।।"[৩২] ইসলামে একমাত্র অলৌকিক ঘটনা হচ্ছে পবিত্র গ্রন্থ কোরআন যা মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়ম-বিধি দ্বারা পরিপূর্ণ। অতি-প্রাকৃতিক বলতে কিছু নেই।[৩৩] সবকিছু কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

নিয়তি একটি জটিল সমস্যা। মুসলিম চিন্তাবিদগণ ভাগ্য ও ইচ্ছার চরম স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। নিয়তি বা ভাগ্য মানুষের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, মানুষের স্বাধীনতাকে নির্বাসন দেয়। ফলে, কার্যের উপর মানুষের কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না। মুতাযিলাগণ স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থক। মানুষের ভালমন্দ কার্যের জন্য তাঁর মানুষকেই দায়ী করে থাকেন। তাঁদের মতবাদকে যদি মেনে নেয়া হয়, তবে মানুষের কার্যাবলীর জন্য আল্লাহ্‌র কিছু করার থাকে না। আশারীয়গণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা বলেন যে, যদিও মানুষ ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবুও কার্য করার ক্ষমতা সে অর্জন করে। ইবনে রুশদের মতে, আশারীয়দের এ মতবাদ স্ববিরোধী।

মানুষ নিয়তি বা ইচ্ছার স্বাধীনতার দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত নয়। মানুষ নিয়ন্ত্রিত যথার্থ কারণের দ্বারা, নিয়ন্ত্রণবাদ কার্যেরই ফলশ্রুতি। কারণ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়ই আমাদের ইচ্ছা এবং বহিঃঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়েই আমাদের কার্যসাধিত হয়। মানুষের ইচ্ছা বহিঃউত্তেজনা (stimuli) এবং আল্লাহ্‌র সঠিক ইচ্ছার সুশৃংখল আকার ধারণ করেই নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু বাইরের থেকেই আমাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাঁরা ভিতরেও কারণের সাথে সম্পর্কিত। বহিঃ ও আভ্যন্তরীণ কারণের নিয়মিত নিয়ন্ত্রণই পূর্ব নির্ধারণ[৩৪] বলে অভিহিত। এসব কারণ এবং তাঁর থেকে যা আসে সবই আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং সত্তার অস্তিত্বের কারণ।

আল্লাহ্ ন্যায়ী (just), তিনি কখনও মানুষের প্রতি অবিচার করেন না—পবিত্র কোরআনে তাই উল্লেখ রয়েছে। মানুষের স্বভাব পরিপূর্ণভাবে কল্যাণজনক নয়, যদিও কল্যাণের প্রভাব বেশি। অধিকাংশ মানুষই ভাল। আল্লাহ্ মূলতই ভাল সৃষ্টি করেছেন, মন্দ সৃষ্টি করেছেন আকস্মিকভাবে কল্যাণেরই প্রয়োজনে। ভালমন্দ অগ্নির অনুরূপ : অগ্নি কল্যাণের কাজেই নিয়োজিত, কিন্তু তবুও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনিষ্টকর বটে। রুশদীয় এ মতবাদ জগতে বিদ্যমান আশাবাদেরই (optimism) প্রতিপালন।

পুনরুত্থানের বাস্তবতা নিয়ে সব ধর্মই ঐক্যমত পোষণ করে। তবে, এ পুনরুত্থান দৈহিক না আধ্যাত্মিক এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আত্মা বেঁচে থাকে বা আত্মা জীবিত থাকে—এ ধারণাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান। দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাসই সাধারণ মানুষের বোধের অধিকতর উপযোগী। আত্মার আধ্যাত্মিক অমরতা তাঁরা কম বুঝেন।

www.pathagar.com

ঘ. জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রণালি

ইউরোপের মধ্যযুগীয় দর্শন ইবনে রুশদের সমালোচনার মাধ্যমে অ্যারিস্টোটল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইবনে রুশদ 'প্রথম শিক্ষক' অ্যারিস্টোটলের একজন বিশ্বস্ত অনুরাগী। গিলসন যথার্থই বলেন, "আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধ্যযুগীয় দর্শনের জনপ্রিয় ধারণা (popular notion) গঠনে এভারোজের চেয়ে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট ব্যক্তি খুবই স্বল্পসংখ্যক ছিলেন—এটা এখন ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত।"[৩৫] এটা সত্য যে তাঁর প্রধান পদ্ধতি অ্যারিস্টোটলীয়, কিন্তু বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত ভাবের প্রভাবের দ্বারা তিনি এ পদ্ধতিকে এক নতুন রূপ দান করেন।

জ্ঞান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইবনে রুশদ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আত্মা (soul) ও বুদ্ধি (Intellect)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। এ দু'সত্তার অবস্থান বুঝতে গেলে সত্তার ক্রমোচ্চ বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। এ কারণেই ইবনে রুশদ তাঁর 'তাখলিস কিতাব-আল-নাফস' গ্রন্থে সত্তার গঠন, তাদের আচরণের উৎস এবং জ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছেন। আত্মার প্রকৃতিকে (substance) বুঝার জন্য পূর্বানুমিত নীতিগুলো হচ্ছে : (১) লয়প্রাপ্ত সকল সত্তা জড় ও আকার দ্বারা গঠিত। জড় ও আকার স্বয়ং দেহ নয়, তবে তাদের সংযোগে দেহ অস্তিত্ব লাভ করে। (২) আদি জড়ের বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কেবল গ্রহণের ক্ষমতা বা শক্তি আছে (৩) প্রথম সরল দেহ যার মধ্যে আদি জড় বাস্তবায়িত (actualized) তা হচ্ছে চার উপাদান : অগ্নি, বায়ু, পানি এবং মৃত্তিকা। (৪) উপাদানসমূহ মিশ্রণের মাধ্যমে অন্যসকল দেহ গঠনে প্রবেশ করে। এ মিশ্রণের দূরবর্তী কারণ হচ্ছে স্বর্গীয় দেহসমূহ। (৫) আসল বা প্রকৃত সংযোগের নিকট—কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক তাপ। (৬) প্রাকৃতিক তাপের মাধ্যমে তাদের ধরন অনুযায়ী সজীব ব্যক্তি থেকে জৈব (organic) সত্তার সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির নিকট-কারণ হচ্ছে আত্মা, দূরবর্তী কারণ হচ্ছে বুদ্ধি বা মণ্ডলসমূহকে সঞ্চালন করে।

ইবনে রুশদের প্রশ্ন : জড়[৩৬] থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কি আকার থাকতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই জ্ঞানের সত্যিকার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

জড়ীয় আকার জড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনও থাকতে পারে না—কারণ প্রাকৃতিক আকার[৩৭] জড়ীয় আকারেরই অন্যপ্রকাশ, জড়ের মধ্যেই এ অবস্থান করে। তাই তাঁরা অস্থায়ী ও পরিবর্তনের অধীন। এ থেকে এটা অনুসরণ করে যে বিচ্ছিন্ন আকার হচ্ছে জড়ীয় আকার থেকে অন্যকিছু (something other than material form)। বৌদ্ধিক আত্মার পৃথকীকরণকে (separateness of the rational soul) শুধু প্রতিপাদিত (demonstrated) করে দেখানো যায় যে, এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ আকার। আত্মা পৃথক নয়, কারণ এটা হচ্ছে "একটি জৈব প্রাকৃতিক দেহের আকার।"[৩৮] কার্য অনুসারে আত্মাকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায় : পুষ্টিকর, ইন্দ্রিয়মূলক, কল্পনাত্মক, জ্ঞানমূলক এবং স্ফুলিঙ্গমূলক। শেষেরটি কল্পনাত্মক ও ইন্দ্রিয়মূলক[৩৯] আত্মার পশ্চাদ্‌নুসারী বলে প্রতীয়মান হয়।

উপরে উল্লেখিত জড়ীয় আকারের বিন্যাসের উপর ধীশক্তিসমূহের ক্রমোচ্চ স্তর নির্ভরশীল। পশু জ্ঞানলাভ করে ইন্দ্রিয় ও কল্পনার দ্বারা, মানুষ জ্ঞানলাভ করে বুদ্ধির

www.pathagar.com

দ্বারা। অতএব, দেখা যায় জ্ঞানের দুই মাধ্যম ইন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধি যা বিশেষ অথবা সার্বিক জ্ঞানে পরিচালিত করে। "জ্ঞান" শব্দটি দ্ব্যর্থবোধকরূপে পশু, মানুষ এবং আল্লাহ্র উপর আরোপিত হয়। ইন্দ্রিয় ও কল্পনার দ্বারা পশুর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। মানবজ্ঞান সার্বিক। পশুকুলের সংরক্ষণের জন্য পশুর মধ্যে ইন্দ্রিয় ও কল্পনার অস্তিত্ব বিদ্যমান। সংবেদন উপস্থিত থাকলে তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোধগম্য হয়, অনুপস্থিত থাকলে প্রতিরূপ (representation) তাদের স্থান গ্রহণ করে। সংবেদন হচ্ছে প্রতিরূপেই শর্ত। "প্রতিটি সত্তা যার প্রতিরূপ রয়েছে, অপরিহার্যভাবেই তাঁর সংবেদন[৪০] রয়েছে।" যেহেতু মানুষের উন্নতির ধীশক্তি রয়েছে, যথা বুদ্ধি ; তাই চিন্তা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সে প্রতিরূপ লাভ করে। প্রতিরূপ স্বভাবগত[৪১] বা প্রকৃতিকগতভাবেই অস্তিত্বশীল। অধিকন্তু, পশু কর্তৃক প্রত্যক্ষিত আকার নির্দিষ্ট, কোনো কোনো সময় মানুষ কর্তৃক প্রত্যক্ষিততে তাঁরা প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। যারা ভাবেন যে পশুর প্রজ্ঞাশক্তি আছে তাঁরা সার্বিক প্রতিরূপককে সঠিক ধারণার সাথে গুলিয়ে ফেলেন। মানুষ কর্তৃক প্রত্যক্ষিত আকার (form perceived by man) অনির্দিষ্ট এই অর্থে যে তাঁরা যে বিশেষকে নির্দেশ করে তা' নির্দিষ্ট। সঞ্চালনের যান্ত্রিক কারণ হিসেবে প্রতিরূপ (representation) ধারণার সহায়তার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কার্য সৃষ্টি করে।

ঐশীজ্ঞানের সাথে মানুষের জ্ঞান গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। কারণ "মানুষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ (perceive) করে এবং সার্বিক অস্তিত্বকে (universal existence) প্রত্যক্ষ করে তার বুদ্ধির মাধ্যমে। প্রত্যক্ষীয় বস্তুর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রত্যক্ষণের কারণও পরিবর্তন হয়, এবং প্রত্যক্ষণের বহুত্ব, বহু বস্তুর[৪২] অস্তিত্বকে অর্থ করে।" আল্লাহ্র জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের অনুরূপ—এটা অসম্ভব; কারণ, "আমাদের জ্ঞান অস্তিত্বের কার্য (effect of existent), অন্যদিকে আল্লাহ্র জ্ঞান তাদের কারণ।"[৪৩] আল্লাহ্র জ্ঞান চিরন্তন, মানুষের জ্ঞান অস্থায়ী। "আল্লাহ্র জ্ঞান অস্তিত্বের সৃষ্টি করে, অস্তিত্ব তাঁর (আল্লাহ্র) জ্ঞানকে সৃষ্টি করে না।"[৪৪]

জ্ঞান বিশেষ এবং সার্বিক। প্রথমটি ইন্দ্রিয় ও কল্পনার ফল, দ্বিতীয়টি বুদ্ধির ফলশ্রুতি। বুদ্ধির কাজ হলো ধারণা প্রত্যক্ষণ করা, সার্বিক ধারণা ও সারবত্তা (essence) সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। বুদ্ধির তিনটি মূল ক্রিয়া (operation) রয়েছে : অমূর্তকরণ (abstraction), সংযোগকরণ (combination) এবং বিচারশক্তি (judgement)। একটি বস্তুর মধ্যে এটা অধিকতর সুস্পষ্ট-জড় থেকে দূরে ও আবরণমুক্ত যেমন : বিন্দু ও রেখা (point and line)[৪৫] এ ক্রিয়ার প্রথমটিকে বলা হয় বোধ (apprehension), দ্বিতীয়টি হচ্ছে সম্মতি (assent)। তিনটি পর্যায়ক্রমিক ক্রিয়া হচ্ছে নিম্নরূপ : বুদ্ধিতে প্রথমে রয়েছে সম্পূর্ণ জড় বিবর্জিত একক (single) ধারণা (ইচ্ছা)—একে বলা হয় অমূর্তকরণ। দ্বিতীয়ত, দুই বা অধিক ধারণার একত্র মিলনে আমরা পাই 'সম্প্রত্যয়' (concept)। যেমন, মানুষের 'সম্প্রত্যয়' তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি, জাতি ও বিভেদক লক্ষণ দ্বারা গঠিত। সম্প্রত্যয় একটি বস্তুর সারবত্তা (essence) গঠন করে। সম্পূর্ণ সারবত্তা আবার সংজ্ঞা (definition) গঠন করে। যেহেতু সম্প্রত্যয় সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই নয়, তাই একটি বাক্যে যখন এদের স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তখনই আমরা বিচার (judgement) পাই।

www.pathagar.com

বুদ্ধি আবার তাত্ত্বিক (theoretical) এবং ব্যবহারিক (practical)। ব্যবহারিক বুদ্ধি সকলের নিকট সাধারণ (common)। মানব অস্তিত্বের প্রয়োজনে এবং ব্যবহারে এই শক্তিই শিল্পের (arts) উৎস। সদ্‌গুণ ব্যবহারিক বুদ্ধিরই সৃষ্টি।

তাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রসঙ্গে প্রধান প্রশ্নের সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক, এর নিত্যতা (Its eternity), দ্বিতীয়ত, চালকবুদ্ধি (agent intellect)-এর সঙ্গে এর যোগাযোগ (communication)। প্রথম প্রশ্নটি অন্যভাবে উত্থাপন করা যায়। তাত্ত্বিক বুদ্ধিসমূহ কি সর্বদা বাস্তবতায় থাকে, নাকি তারা প্রথমে সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল থাকে, পরে বাস্তবতায় রূপ নেয়, অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে জড়ীয় হয়ে পড়ে?[৪৬] এ বিষয়টি ইবনে রুশদকে কল্পনাত্মক আত্মার দ্বারা সৃষ্ট প্রতিরূপের জড়ীয় আকারে (অর্থাৎ, চার উপাদানের আকারে) ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাদের সকলের মধ্যেই চারটি বিষয় সাধারণ : (১) তাদের অস্তিত্ব পরবর্তীতে পরিবর্তনীয়, (২) বস্তুর বহুতা ও বিভিন্নতার সাথে তারাও বহু ও বিভিন্ন, (৩) তারা কিছু জড় ও কিছু আকার দ্বারা গঠিত, (৪) প্রত্যক্ষিত বিষয় অস্তিত্ব থেকে ভিন্ন (The perceieved different from the existent)।

মানুষের মধ্যে বুদ্ধির আকার অন্যসব জড়ীয় আকার থেকে ভিন্ন : (১) তাদের বৌদ্ধিক অস্তিত্ব এক এবং তাদের বস্তুগত অস্তিত্বের অনুরূপ, (২) তাদের প্রত্যক্ষ অনির্দিষ্ট, (৩) বুদ্ধি হচ্ছে বোধির (Intellectible) বিষয় এবং প্রত্যক্ষণ হচ্ছে প্রত্যক্ষিত বিষয়, (৪) বয়সের সাথে বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়।[৪৭]

বুদ্ধির ক্রিয়া ঘটেছে এইরূপ : প্রথমে রয়েছে বুদ্ধি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষণ (perceive) করে, তারপর রয়েছে বোধিত বিষয় (object of intellection) যা বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষিত হয় (perceived)। বোধিত বিষয়কে অবশ্যই অস্তিত্বশীল[৪৮] হতে হবে। এসব বোধিত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ, সার্বিকসমূহ প্লেটোর মত অনুসারে হয় আত্মাতে অস্তিত্বশীল অথবা আত্মার বাইরে বাস্তবতায় অস্তিত্বশীল। ইবনে রুশদ ভাববাদের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। তাই সার্বিক বাস্তবতায় অস্তিত্বশীল এবং তাদের অস্তিত্ব বিশেষের সাথে জড়িত যা জড় ও আকার দ্বারা গঠিত। অমূর্ত মাধ্যমে জড়ের আকার আবরণমুক্ত করে (denudes the forms of matter)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বোধিত বিষয় (Intellectibles) অংশত জড়ীয় এবং অংশত অজড়ীয়। সম্ভাব্য বুদ্ধিকে সম্ভাব্য বুদ্ধি থেকে বাস্তবে পরিণত করে চালক বুদ্ধি agent intellect)। চালক বুদ্ধি সম্ভাব্য বুদ্ধি থেকে উচ্চতর ও মহত্তর (nobler)। এটা স্বয়ং অস্তিত্বশীল। আমাদের দ্বারা অনুভূত হোক বা না হোক এটা সর্বদা বাস্তবতায় (actuality) বিদ্যমান। সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই চালক বুদ্ধি এক ও অনুরূপ থাকে।

মানুষ তাঁর জীবিতকালেই চালক বুদ্ধি লাভ করতে পারে। যেহেতু পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে যে, বুদ্ধি বোধিত বিষয়ের চেয়ে অন্যকিছু নয়, তাই বোধিত বিষয়সমূহ অর্জন করাই হচ্ছে বুদ্ধির কাজ যাকে মিলন (union) অথবা যোগাযোগ (communication) বলা হয়। এ মিলন, সুফিদের মিলনের অনুরূপ নয়। কারণ, চালক বুদ্ধি ঐশী সত্তা নয় এবং এটা আত্মাসমূহকে প্রজ্জ্বলিত করে না, যেমন কোনো কোনো নিও-প্লেটোনীয়গণ

www.pathagar.com

মনে করে থাকেন। মিলন হচ্ছে বৌদ্ধিক ক্রিয়া যা জ্ঞানবিদ্যার বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যায়িত।এটা সম্ভাব্য বুদ্ধির দ্বারা সার্বিক আকার অর্জনের উপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয় বিশেষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসব সার্বিক আকারের বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

ঙ. বিজ্ঞানকে জানার উপায়

বাস্তবে বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ রয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান আমাদের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে আছে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মানবসমাজে ধর্মের অবস্থান আরো মৌলিক। বার্গসঁ বলেন, "অতীতে এবং বর্তমানে বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শন ব্যতীত মানবসমাজের সন্ধান আমরা পাই—কিন্তু ধর্ম ব্যতীত সমাজ কখনও ছিল না।"[৪৯] দর্শন হচ্ছে সত্যেরই অনুসন্ধান এবং যথার্থভাবেই বলা হয় মানুষ হচ্ছে আধিবিদ্যক (metaphysical) জীব। মানুষ তাঁর নিজ প্রয়োজনেই এ তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালিয়েছে। প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ডেকার্ট, কান্ট-এর ন্যায় প্রখ্যাত দার্শনিকদের মহত্ব এখানেই যে তাঁরা জ্ঞান ও কার্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনকে তাদের যথার্থ স্থানে স্থাপন করেছেন। প্রথম স্তরের মুসলিম দার্শনিক ধর্মকে অবমূল্যায়ন না করে বিজ্ঞানকে যথার্থ মূল্য দিয়েছেন। আল-কিন্দি, আল-ফারাবি এবং ইবনে সিনা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা ছাড়া তাঁরা সবাই অকৃত্রিম ও আন্তরিক মুসলিম ছিলেন।

আল-গাযালি দার্শনিকদের মতবাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর 'দার্শনিকদের অসংগতি' নামক গ্রন্থে দার্শনিকদের তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন এবং বিশটি অভিযোগে তাঁদেরকে অভিযুক্ত করেছেন। ইবনে রুশদ একটি একটি করে তা' খণ্ডন করেন। এই দু'প্রখ্যাত দার্শনিকের আলোচনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল। আসলে এ বিতর্ক ছিল একদিকে ধর্ম এবং অন্যদিকে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের। দার্শনিক হিসেবে ইবনে রুশদ সত্যের লক্ষ্যে বাহ্যত এ তিন ভিন্ন জগৎ বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। পবিত্র কোরআনের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি দর্শনের সাথে ধর্মের সংগতি স্থাপন করেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নির্দেশানুযায়ী তিনি ধর্মের সত্যিকারের পথ উন্মুক্ত করেন।

ইবনে রুশদ বিজ্ঞানের পথ সুগম করেন। ধর্ম রক্ষার্থে আল-গাযালি অনিচ্ছাকৃত-ভাবেই বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ করেছেন। আল-গাযালি কর্তৃক প্রণীত সুফি বিধিগুলো বিজ্ঞানের বৌদ্ধিক পদ্ধতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিমগণ আল-গাযালিকে "ইসলামের কর্তা" (authority of Islam) বলে অনুসরণ করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিজ্ঞান পাঠে অমনোযোগী হয়ে ওঠে। তাঁদের এককালের সভ্যতা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইবনে রুশদ বিজ্ঞান সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং মধ্যযুগের ইউরোপ তাঁর প্রদত্ত বিজ্ঞানবিধি অনুসরণ করে চরম সফলতা অর্জন করে। ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণীকরণের উপর নির্ভর করে এর শৃংখলাযুক্ত ও সংগঠিত রূপ দান করাই হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞানের সত্যের চেয়ে বিজ্ঞানের পদ্ধতি হচ্ছে

www.pathagar.com

অধিকতর মৌলিক; কারণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্তাসমূহ এবং তার অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনার ক্ষেত্রে কার্যকারণ-তত্ত্ব এক প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কার্যকারণ নীতির ভিত্তিতেই কেবল বৈজ্ঞানিক চিন্তা (scientific thought) প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হিউম কার্যকারণ নিয়মকে সমালোচনা করেছেন, কান্ট বৌদ্ধিক ভিত্তি খুঁজে বের করার প্রয়াস চালান যার উপর কার্যকারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—তিনি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অতিবর্তী পূর্বতসিদ্ধ আকারের মাধ্যমে বিজ্ঞান সংরক্ষিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন এবং স্টুয়ার্ট মিলের আরোহণ পদ্ধতি প্রক্রিয়া সার্বিক কারণকে স্বীকার করে নেয়। কেবল সাম্প্রতিক বিজ্ঞান "কারণের" ধারণাকে "কারণিক বিধি"তে (causal laws) রূপান্তরিত করে।

আল-গাযালি কার্যকারণের অনিবার্য সম্বন্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করার কারণে ইবনে রুশদ বিজ্ঞানকে সংরক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য লাভের উপায় নির্ধারণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। আল-গাযালি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন, যথা : যাদুবিদ্যা, রাসায়নবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা প্রভৃতি। ইবনে রুশদ এসব ছদ্ম-বিজ্ঞান (pseudo science)-কে প্রত্যাখ্যান করেন। যাদুবিদ্যা বৃথা, রসায়নবিদ্যার সত্যিকার অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহজনক এবং জ্যোতিষবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে তিনি মনে করেন।[৫০]

আল-গাযালির কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ককে অস্বীকার করার আসল কারণ হচ্ছে "একে নিষেধ করার উপর নির্ভর করে আছে অলৌকিক ঘটনার অস্তিত্বের-স্বীকৃতির সম্ভাব্যতা, যা প্রকৃতির সাধারণ গতিধারাকে ব্যাহত করে, যেমন, দণ্ডকে সর্পে পরিণত করা ..."[৫১] ইবনে রুশদের মতে, অলৌকিক ঘটনাকে প্রশ্ন করা উচিত নয় বা দার্শনিকদের কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। "যাঁরা এদেরকে সন্দেহ করেন, তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত।" যাই হোক, ইসলামে অলৌকিক ঘটনা দণ্ডকে সর্পে পরিণত করার মধ্যে নিহিত নয়, কিন্তু পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে "যার অস্তিত্ব প্রকৃতির গতিধারা ব্যাহত করে না.. কিন্তু এর অলৌকিক প্রকৃতি প্রতিটি মানুষের প্রত্যক্ষণ ও বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়... এবং এই অলৌকিক ঘটনা অন্যসবের চেয়ে অনেক অনেক গুণে উত্তম।[৫২] ইবনে রুশদ এখানে, প্রকৃতপক্ষে, তাঁর দুই গ্রন্থ 'ফসল' ও 'কাশফ'-এ যা বর্ণনা করেছেন তারই পুনর্ব্যক্ত করেন। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ মোহাম্মদ আমীর আলী এবং অন্যরা রুশদীয় এ অভিমত গ্রহণ করেছেন যা বর্তমানে মুসলিম সমাজে প্রবহমান। ইবনে রুশদের মতবাদে প্রত্যাবর্তন প্রাচ্যের রেঁনেসাঁর অনুপ্রেরণার একটি উৎস। আমীর আলী বলেন, "জগতে বিদ্যমান কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্ককে অস্বীকার করা মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব।"[৫৩]

কার্যকারণ সম্পর্কে আল-গাযালি যে অভিমত প্রকাশ করেন তা' "আমরা সাধারণত সম্বন্ধ হিসেবে যাকে একটা কার্য এবং কারণ বলে বিশ্বাস করি, আসলে এ সম্বন্ধ অনিবার্য সম্বন্ধ নয়; এদের প্রত্যেকেরই স্বকীয় স্বাতন্ত্রতা রয়েছে...তৃষ্ণা অনিবার্যভাবে পান করাকে অর্থ করে না কিংবা অগ্নি অনিবার্যভাবে প্রজ্জ্বলকে বুঝায় না...এসব বিষয়ের

www.pathagar.com

মধ্যকার সম্পর্ক আল্লাহ্র পূর্ব-ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্ তাদের পরম্পরাগত বিন্যাসে সৃষ্টি করেছেন।"

সাধারণ জ্ঞান থেকে ইবনে রুশদ এর প্রত্যুত্তর দেন : "পর্যবেক্ষিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর নিমিত্তকারণের (efficient cause) অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে কুতর্ক করা এবং যিনি এদের অস্বীকার করেন তিনি তাঁর মনে যা আছে তা' হয় জিহ্বার দ্বারা অস্বীকার করেন নতুবা কুতার্কিক সন্দেহের দ্বারা তাড়িত..."[৫৪]

কিন্তু দর্শন সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাবাদ (practical empiricism) এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাস করে—পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথমটি কম নিশ্চিত, পরেরটি অধিক নিশ্চিত। বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে ; যখন একটা কারণ দেয়া হয়, তখন ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে আগাম বলা (predict)। কার্যকারণের অনিবার্যতার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ বলার সক্ষমতা এবং এ থেকে উদ্ভূত হয় বিজ্ঞান ও তাঁর শক্তির প্রতি বিশ্বাস। সংক্ষেপে, কার্যকরণের প্রতি আস্থা হচ্ছে একটি বিশ্বাসের ব্যাপার। প্রকৃতির উপর ইবনে রুশদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, জগতে প্রতিটি ঘটনা একটি নিখুঁত নিয়ম অনুসারে ঘটে যাচ্ছে—কার্যকারণের নীতির দ্বারা একে বুঝা যায়।

প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে ইবনে রুশদের ধারণা এবং কিভাবে একে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানা যায়—এ বিষয়টি এখানে প্রসংগক্রমে এসে যায়। জগৎ হচ্ছে বস্তুর অনবচ্ছেদ (continuous) বিষয় এবং অনিবার্য কারণের মাধ্যমে একের সাথে অন্য সম্পর্কিত। দু'টি নীতি এখানে পূর্বানুমিত : একটি বস্তুর স্থায়িত্ব, অন্যটি কার্যকারণ নিয়ম। ইবনে রুশদ উল্লেখ করেন : বস্তুর স্থায়িত্ব আমাদেরকে বস্তুর সারবত্তা, সংজ্ঞা এবং নামকরণ জানতে সাহায্য করে। "কারণ, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বস্তুর সারবত্তা ও গুণাবলি রয়েছে যা তাদের প্রত্যেককে তার বিশেষ কার্য নির্ধারণ করে দেয়। ফলে তাদের সংজ্ঞা ও নামকরণ ভিন্নতর হয়। যদি একটা বস্তুর তার সুনির্দিষ্ট স্বভাব না থাকত, তবে এর বিশেষ নাম বা সংজ্ঞা থাকত না—সব জিনিস এক হয়ে যেত।"[৫৫]

কার্যকারণ নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "প্রতিটি ঘটনার চারটি কারণ রয়েছে : নিমিত্ত, আকার, উপাদান ও পরিণত কারণ।" মানুষের মন বস্তু প্রত্যক্ষণ করে, কারণ সম্বন্ধে ধারণা করে।" বুদ্ধি কারণ বস্তুর প্রত্যক্ষণ বৈ আর কিছু নয়—এর দ্বারাই বোধের অন্যান্য বৃত্তি থেকে সে নিজেকে আলাদা করে থাকে; যিনি কারণকে অস্বীকার করেন, তিনি বুদ্ধিকেই অস্বীকার করেন।

যুক্তিবিদ্যা কার্যকারণের অস্তিত্বকে অর্থ করে। কারণের পরিপূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল কার্যের জ্ঞানলাভ করা যায়। কারণের অস্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে জ্ঞানকে অস্বীকার করা।[৫৬] কার্যকারণ নিয়মকে অনেকে অভ্যাস বলে অভিহিত করেন, কিন্তু অভ্যাস হচ্ছে একটি দুর্বোধ্য শব্দ; অভ্যাস বলতে কি (১) নিমিত্তের অভ্যাস, (২) অস্তিত্বশীল বস্তুর অভ্যাস, (৩) এসব বিষয়ে অভ্যাস গঠনে আমাদের অভ্যাসকে কি অর্থ করে? ইবনে রুশদ প্রথম দু'টো অর্থকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেষেরটিকে গ্রহণ করেন। কারণ,

www.pathagar.com

এটা তাঁর ধারণাবাদের (conceptualism) সাথে সংগতিপূর্ণ। অস্তিত্বশীল বস্তুর অভ্যাসই হচ্ছে তাদের প্রকৃত স্বভাব।

মোটের উপর, বিশ্বাসের পথ ধরেই বিজ্ঞান অভিমুখে যাত্রা। এটা নিশ্চিতের ভিত্তি (basis of certitude)। সংশয়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের কোনো স্থান বিজ্ঞানে নেই। জগৎ অস্তিত্বের এ বিশ্বাস ধারণ করেই বুদ্ধি বস্তুর কারণসমূহ আবিষ্কার করে। কারণসহ বস্তুর জ্ঞানলাভ করাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

চ. সত্তা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার উপায়

সত্তা কি এবং কি উপায়ে সত্তা লাভ করা যায়—এ উদ্দেশ্য নিয়েই অধিবিদ্যার উপর ইবনে রুশদের সংক্ষিপ্ত তালখিস (Talkhis) গ্রন্থ রচিত। এ গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অ্যারিস্টোটলের অধিবিদ্যা থেকে তাঁর তাত্ত্বিক (theoretical) মতবাদ অনুসন্ধান করা।"[৫৭]

অ্যারিস্টোটলের একজন বিশ্বস্ত অনুসারি হিসেবে তিনি অধিবিদ্যাকে সত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেন। অধিবিদ্যা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের একটি অংশ। অধিবিদ্যা সত্তা নিয়ে চরমভাবে যেমন, ঐক্য, বহুত্ব, শক্তি, বাস্তবতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিশেষ সত্তার কারণসমূহ নিয়ে জড়িত। এ বিশেষের চরমতম কারণ নিয়ে আলোচনা করে অধিবিদ্যা।

অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত : (১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এবং তাদের জাতি (genera) অর্থাৎ দশ ক্যাটাগরি বা প্রকার। (২) দ্রব্যের সত্তা, পৃথক সত্তাসমূহ এবং কিভাবে তাঁরা আদি সত্তার সাথে সম্পর্কিত—যে আদি সত্তা হচ্ছে পরম পূর্ণাঙ্গ এবং আদিকারণ। (৩) কূটতর্ক সংশোধনে নিয়োজিত বিজ্ঞানসমূহ। স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় যে, দ্বিতীয় বিভাগটি অতি মৌলিক এবং অপর দু'টো এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই, ইবনে রুশদ অধিবিদ্যার অধিকতর এক বিস্তৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন। "অধিবিদ্যা হচ্ছে বিভিন্ন অস্তিত্বের সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ক আলোচনার বিজ্ঞান। পরম কারণে (Supreme Cause) উন্নীত হওয়ার কারণসমূহের ক্রমোচ্চ শৃংখলের বিজ্ঞান।"[৫৮] সত্তা শব্দটির দু'টো সুস্পষ্ট অর্থ রয়েছে : এক জ্ঞানবিদ্যা-বিষয়ক অর্থ এবং অন্যটি এর তত্ত্ববিষয়ক অর্থ। এদের কোনটি একটি আরেকটির উৎপত্তি : সারবত্তা (essence) না অস্তিত্ব (existence)? এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনে রুশদের পদ্ধতিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। বাহ্যিক অস্তিত্ব (external existence) হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। আমাদের মনে যদি কোনো সত্তার অস্তিত্ব থাকে, বাইরে যার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই—তবে সেটা সত্তা নয়, এটা হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ, অদ্ভুত অসার কল্পনা (chimera) মাত্র।[৫৯] সত্তা ও অস্তিত্ব এক এবং অনুরূপ (being and existence are one and the same)। অস্তিত্ব মানেই বাস্তব। সত্তার মানদণ্ড হচ্ছে এর বাস্তব অস্তিত্ব—সে অস্তিত্ব শক্তিতেই হোক বা কাজেই হোক। আদি জড়ের (prime matter) সত্তা আছে, যদিও আকার ব্যতীত এর অস্তিত্ব কখনও নেই। বাহ্য অস্তিত্বে যখন বুদ্ধি সংযোজিত হয়, বাহ্য সত্তা তখন সম্প্রত্যয়ের (concept) আকারে বা সারবত্তার আকারে (essence) মনে অবস্থান করে। সুতরাং, সত্তার মধ্যে অস্তিত্ব পূর্বানুমিত (presupposed)।

www.pathagar.com

বহিঃঅস্তিত্বগুলো দ্রব্য (substance) নামে অভিহিত। দ্রব্য হচ্ছে দশ ক্যাটাগরির প্রথম, অবশিষ্টগুলো গৌণ দ্রব্য। গৌণ দ্রব্যের চেয়ে আদি দ্রব্যত্ব (substantiality) বেশি। আমরা যখন বলি, "সক্রেটিস একজন মানুষ" তখন এটা সক্রেটিসের দ্রব্যত্বকে অধিক অর্থ করে। এটা সক্রেটিসের মানব, মানবতা বা মানবত্বের চেয়ে তাঁর দ্রব্যকে প্রধানত নির্দেশ করে। এরমধ্যে মানবত্বও সক্রেটিসের ন্যায়ই বাস্তব। সার্বিক এবং বিশেষ উভয়ই দ্রব্য। বিশেষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব আছে, এবং সার্বিকের রয়েছে বৌদ্ধিক অস্তিত্ব। কিন্তু ব্যক্তি বা বিশেষ দ্রব্য হচ্ছে ইবনে রুশদের সমগ্র অধিবিদ্যার যাত্রা-বিন্দু (starting point)।

সাধারণভাবে বলা হয় যে, প্রাকৃতিক দেহ দু'ই সত্তা, অর্থাৎ, জড় ও আকার দ্বারা গঠিত। এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, দেহ কেবল জড় নয় অথবা কেবল আকারই নয়—এটা হচ্ছে এ দু'য়ের দ্বারা গঠিত সমগ্র বিশেষ (whole)। এটা হচ্ছে যৌগিক (composite)। সুতরাং এই সমগ্র হচ্ছে সত্তার (being) দু'ই সত্তার (two principles) অতিরিক্ত।[৬০] এ কারণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের সত্তা তিন-এ দাঁড়ায়। দেহ হচ্ছে একক (unity), এর বহু অংশ রয়েছে। দ্রব্য বলতে আমরা জড় এবং আকারে গঠিত সমগ্রকে অর্থ করি।

কোনো কোনো দার্শনিক, যেমন ইবনে সিনা, ধারণা করেন যে প্রাকৃতিক দেহের দু'টো আকার ; নির্দিষ্ট আকার (specific form) এবং দেহধারী আকার (corporeal form) রয়েছে। দেহধারী আকারে তিন দিক (three dimensions) রয়েছে যা স্থানে দেহকে বিস্তৃতি দান করে (give the body extension in space)। ইবনে সিনার মতে, দেহধারী আকার দ্রব্য এবং প্রাকৃতিক সত্তার বহুত্বের কারণ। ইবনে রুশদ এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, ইবনে সিনা সম্পূর্ণরূপে ভুল করেছেন।[৬১] বিশেষ দ্রব্যগুলো জড় এবং কেবল একটি আকার দ্বারা গঠিত। তাদের দু'প্রকার অস্তিত্ব আছে : একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরটি বৌদ্ধিক। দেহের কারণ হচ্ছে জড়, বুদ্ধির কারণ হচ্ছে আকার।

একটি বস্তু তাঁর সংজ্ঞার দ্বারা পরিচিত। সংজ্ঞা বস্তুর সারবত্তা প্রদান করে। সংজ্ঞা অংশে গঠিত : জাতি ও বিভেদক লক্ষণ দ্বারা সংজ্ঞা গঠিত। জাতি, প্রজাতি ও বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে সার্বিক। সার্বিক বা সারবত্তা কি বিশেষ বস্তুর অনুরূপ না ভিন্ন? সার্বিক বিশেষের সাথে অভিন্ন, কারণ তারা তাদের সারবত্তাকে নির্দেশ করে। যারা ভাবেন যে সার্বিকের পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে এবং সার্বিক তাদের নিজেদের মধ্যে অবস্থান করে তাঁরা বিরুদ্ধপূর্ণ কথা বলেন যার সমাধান অত্যন্ত জটিল। তাদের মতে, মানব জ্ঞান তখনই সম্ভব হতে পারে যখন সার্বিকের পৃথক বাস্তব অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, সারবত্তার বোধের জন্য (for the intellection of essences) আমাদের সার্বিকের পৃথক বাস্তব অস্তিত্বের ধারণা করার প্রয়োজন নেই।[৬২] জড় বর্জিত হয়ে সম্প্রত্যয় হিসেবে সার্বিক আমাদের মনে অস্তিত্বশীল হয়ে থাকতে পারে। এ কারণে এই মতবাদ বাস্তববাদ ও নামবাদের বিপরীত সম্প্রত্যয়বাদ বা ধারণাবাদ নামে পরিচিত। মানবমন প্রকৃতির এক সম্মানজনক স্থান দখল করে আছে এবং জ্ঞানাহরণে এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

প্লেটোর ভাববাদের ধারণার ন্যায় এ সার্বিকগুলো চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নয়। তবে এটা সত্য যে, সারবত্তা হিসেবে সার্বিকগুলো চিরন্তন, কারণ সারবত্তা স্বয়ং বিকৃত নয় (not corruptible)। কিন্তু বিশেষ হিসেবে এগুলো বিকৃত। তাই জড়ও আকারের গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে অবিশুদ্ধ ও পরিবর্তনীয়। প্রথম দ্রব্য হচ্ছে 'এ-ই' (this) অর্থাৎ, যাকে নির্দেশ করা যাচ্ছে (which is pointed out)।

সার্বিকগুলো চিরন্তন এবং একই সময়ে বিকৃত হয় কিভাবে? অথবা ইবনে রুশদ যেভাবে উপস্থাপন করেন, "চিরন্তন সত্তা কিভাবে বিকৃত বস্তুর নীতি হতে পারে?"[৬৩] (how can eternal entities be the principle of corruptibles things?)' সম্ভাব্য শক্তি (potencey) ও বাস্তবতার (actuality) প্রসঙ্গ টেনে এই জটিল সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। বিশুদ্ধ সম্ভাব্যতা (pure potency) থেকে বিশুদ্ধ বাস্তবতা (pure actuialilty) দিয়ে সত্তার মানদণ্ডে (scale of being) স্তর-বিন্যাস করা হয়েছে। আদি জড় (prime matter) হচ্ছে বিশুদ্ধ সম্ভাব্যতা; আকারের সাথে সংযুক্ত হয়েই এটা কেবল এক সত্তায় অস্তিত্বশীল হতে পারে। সর্বনিম্ন অস্তিত্ব হচ্ছে চার উপাদান যার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু গঠিত। প্রথম দ্রব্য (first substance) বাস্তবতার বা সম্ভাব্যতার মধ্যে অস্তিত্বশীল হতে পারে। দ্রব্যের মধ্যে জড়ের সহজাত সংলগ্নতা (inherent) হচ্ছে এর সম্ভাব্যতা। নিকট ও দূরবর্তী অনুসারে এই সম্ভাব্যতা বিভিন্ন মাত্রার (degree) হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুষ; শুক্রাণুর মধ্যে সম্ভাব্যরূপে মানুষ অস্তিত্বশীল এবং চার উপাদানের মধ্যেও সে অস্তিত্বশীল। প্রথম সম্ভাব্যতা হচ্ছে নিকটতর, পরবর্তীটা দূরের।

একটা বস্তুর অস্তিত্বের জন্য চারটি শর্তের প্রয়োজন : (১) নিকটতম কর্তা, (২) এর স্বভাব (dispostion), (৩) গতিদায়ক কারণ, (৪) বাধা দেয়া কারণসমূহের অনুপস্থিতি। একজন পীড়িত মানুষের দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। সব পীড়িত লোকেরই আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা থাকে না, যার সম্ভাবনা থাকে তার অবশ্যই স্বভাব থাকতে হবে—এ দু'শর্ত ব্যতীতও তাঁর একটা নিমিত্ত কারণ থাকতে হবে যার ফলে সে ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারে—এটা আবার নির্ভর করে যদি না সে বাহ্য বাধার[৬৪] সম্মুখীন হয়। প্রাকৃতিক বস্তুর ঘটনাও কৃত্রিম বস্তুর অনুরূপ।

যেহেতু প্রাকৃতিক বস্তু জড় ও আকার দ্বারা গঠিত, তাই সর্বদা সম্ভাব্য শক্তি (potency) জড়ের এবং বাস্তবতা (actuality) আকারের পশ্চাদগামী (subsequent)। আকার যা কার্য তা জড়ের পূর্বে থাকে, কারণ আকার নিমিত্ত ও পরিণতি (efficient and final cause) কারণও বটে। পরিণতি কারণ হচ্ছে অন্যসব কারণের কারণ। কালে (time) সম্ভাব্যতা কার্যের পূর্বে নয়, কারণ কার্য বর্জিত কখনও সম্ভাব্যতা থাকে না। সত্তার মধ্যে জড় ও আকার যুগপৎভাবে অস্তিত্বশীল থাকে। প্রাকৃতিক বস্তুর গতিদায়ক কারণ বাহ্যত বস্তুর অস্তিত্বের পূর্বে থাকে। গতিদায়ক কারণ প্রয়োগ হয় শুধু স্থানিক পরিবর্তনে (change in place) যেমন, স্থানান্তরণের গতি (movement of translation)। অন্য সব পরিবর্তন, বিশেষ করে, সৃষ্টি (generation) ও পাপ (corruption) নিমিত্ত কারণ দ্বারা সাধিত হয়। স্বর্গীয় মণ্ডল (celestial bodies) চালিত হয় গতিদায়ক কারণ দ্বারা: নিমিত্ত কারণ দ্বারা নয়।

www.pathagar.com

গতিদায়ক কারণ ও নিমিত্ত কারণ হচ্ছে বিশুদ্ধ কাজ ও অস্তিত্বের মধ্যবর্তী অস্তিত্ব যা কোনো কানো সময় সম্ভাব্যে, কোনো কোনো সময় কার্যে অস্তিত্ব থাকে। তাদের চিরন্তনতা ও অবিনশ্বতার মধ্যে কার্যের অস্তিত্বে তাদের সাদৃশ রয়েছে। (their similarity to the existenty in act lies in their eternity and incorruptibility)। সম্ভাব্য অস্তিত্বে এবং বাস্তবে পরিণত হওয়ার মধ্যেই তাদের সাদৃশ্যতা। ইবনে রুশদ এ আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, "ভেবে দেখ, ঐশী সত্তা দু'প্রকার অস্তিত্বকে সমন্বয় করার ব্যবস্থা করেছেন। বিশুদ্ধ কার্য ও বিশুদ্ধ সম্ভাব্যতার মধ্যে এ প্রকার সম্ভাব্যতা কাজটি হয়েছে। স্থানের সম্ভাব্য শক্তির দ্বারা চিরন্তন ও অবিশুদ্ধ অস্তিত্ব সম্বন্ধমুক্ত।"[৬৫]

মর্যাদা ও পূর্ণতার দিকে থেকে কার্য (act) সম্ভাব্যের পূর্বে, কারণ, অসৎ (evil) হচ্ছে অভাব। বিশুদ্ধ কার্য (pure act) হচ্ছে পরম শুভ (absolute good)।[৬৬] সুতরাং যে বস্তু আদিসত্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধ কার্যের যত সন্নিকটে সেটা ততই উত্তম। আদি সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ থেকে স্বর্গীয়মণ্ডল তাঁর সত্তা প্রাপ্ত। অনুরূপে, এ জগতে যা কিছু সৎ তা সবই তাঁর ইচ্ছার ও পরিকল্পনার সৃষ্টি। অসৎ সম্বন্ধে বলা যায়, জড়ের কারণেই এর অস্তিত্ব। এ জগৎ হচ্ছে সম্ভাব্যরূপে উত্তম জগৎ।

চিরন্তন গতির অধীনে কাল (Time) এক অনন্ত প্রবাহ—কাল এক ও প্রবহমান, কারণ, সত্য অবিচ্ছিন্ন। গতি ও কাল অনন্ত হওয়ার কারণে ইবনে রুশদ জগৎ নিত্য বলে অভিমত পোষণ করেন।

ইচ্ছার দ্বারা সঞ্চালক আদি গতি সঞ্চালন করেন। জগৎ সজীব—এর আত্মা আছে এবং বুদ্ধিও আছে (the world is animated-it has a soul it also has intelligence)। ইন্দ্রিয় ও প্রতিরূপ (senses and representations)-এর দ্বারা স্বর্গীয়মণ্ডল সঞ্চালিত হয়—এটা সঞ্চালিত হয় বুদ্ধির সম্প্রত্যয়ের মাধ্যমে। (স্বর্গীয় মণ্ডলের প্রেক্ষিতে একে বুদ্ধি বলা হয়, মানুষের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বোধশক্তি (intellect)। স্বর্গীয় মণ্ডলের ইন্দ্র বা অঙ্গ নেই। বংশ সংরক্ষণের জন্য জীবের ক্ষেত্রেই এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন। একই লক্ষ্যে জীবের মধ্যে প্রতিরূপও (representation) অস্তিত্বশীল। চিরন্তন হওয়ার কারণে স্বর্গীয় মণ্ডলের বংশ রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। বোধশক্তির মাধ্যমে (through intellection) ইচ্ছার দ্বারা তাদের গতি সৃষ্টি হয়। অতি মর্যাদাসম্পন্ন ইচ্ছা (most dignified desire) পরম কল্যাণ বা শুভ ইচ্ছার (supreme good) দ্বারা নভোমণ্ডলের প্রথম চালক শক্তি (first move of the firmament) সঞ্চালিত হন। বুদ্ধি হচ্ছে (intelligence) স্বর্গীয় মণ্ডলের চালক শক্তি (mover)। বুদ্ধিগুলো নিজে গতিহীন। আটত্রিশটি (thirty eight) চালক শক্তি ও নয়টি মণ্ডল রয়েছে।

দশম বুদ্ধি বা চালক বুদ্ধি (intelligence agens) হচ্ছে শেষ পর্যায়ের। এটা চন্দ্রমণ্ডলের গতিসঞ্চার করে (It moves the sphere of the moon)। এটা চন্দ্রীয় সত্তাসমূহের (sublunary beings) গতির কারণ। এই চালক বুদ্ধিই উপাদনসমূহ ও অন্যান্য অস্তিত্বের আকার দান করে।

www.pathagar.com

স্বর্গীয় মণ্ডলের সন্নিকটতম সত্তা হচ্ছে মানুষ। কারণ, তাঁর বোধশক্তি রয়েছে। মানুষ চিরন্তন ও অবিশুদ্ধতার[৬৭] মধ্যবর্তী (intermediate)। চালক বুদ্ধির সাহায্যে সে তার সৃষ্টির আকার গ্রহণ করে। এভাবে মানুষ চালক বুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং এ যোগাযোগের (communion) মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে তাঁর কল্যাণ ও সুখ (felicity and happiness)।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ইবনে রুশদের জীবন ও রচনাবলির জন্য দ্রষ্টব্য : রেনান, এভারোজ এট লা এভারোইজম, প্যারিস, ১৮৫২; এল-এহ্ওয়ালি, ইসলামিক ফিলসফি, কায়রো, ১৯৫৭; হোয়ারলি, লাইফ অ্যান্ড অব ইবনে রুশদ (চারটি ভাষণ সম্বলিত আমেরিকান ইউনিভার্সিটি), কায়রো, ১৯৪৭; আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাছ ইবনে রুশদ, (আরবি) কায়রো, ১৯৫৩।
২. আল-দাহাবী কর্তৃক রচিত ইবনে রুশদের জীবনী যারিনাল কর্তৃক আরবিতে পুনর্মুদ্রিত পৃ. ৪৫৬।
৩. আল মাকারি নাফহ্ আল তিব্ব ভ্য, ২।
৪. ইবনে খাল্লিখান, জীবনী সংখ্যা, ৬৬০।
৫. আবদ আল-ওয়াহিদ আল মারাকুশ, ed. জমি, পৃ. ১৭৪-৭৫।
৬. বাওয়েজেসের মতামতও তাই।
৭. "ক্যাটাপরিস"ই হচ্ছে একমাত্র আরবি মাধ্যম ভাষ্য।
৮. এল. এখওয়ালি, ইসলামিক ফিলসিফ, কায়রো, ১৯৫৭, পৃ. ৪০-৪২।
৯. আল-আনসারী কর্তৃক উল্লেখিত রেনালের এভারোজ এট লা এভারোইজম, পৃ. ৪৩৯-৪৩।
১০. ফসল, কায়রো, সম্পাদিত, পৃ. ২।
১১. ibid, পৃ. ১৮।
১২. মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, ফিলসফি অ্যান্ড থিওলজি অব এভারোজ রাবেয়দা, ১৯২১।
১৩. এম. সাঈদ শেখ, স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১৭৯।
১৪. cf. জামিল-উর-রহমান, of cit, পৃ. ৫০, ৫১ এবং ১৯১।
১৫. হযরত আলীর বক্তব্যও তাই (মানুষের বোধের স্তর অনুযায়ী কথা বল)।
১৬. রোসানথলের মত অনুসারে 'ইবনে রুশদ প্রথমে মুসলিম ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত : প্লেটো ও এরিস্টোটলের শিষ্য এবং তাঁদের ভাষ্যকার ছিলেন।' cf. তাঁর পলিটিক্যাল থট ইন মেডিথেয়ল ইসলাম, কেম্ভিজ, ১৯৫৮, পৃ. ১৭৭।
১৭. কায়রো : পৃ. ১০।
১৮. ibid পৃ. ১৫।
১৯. আল-কাশফ, 'এন মানাহিজ আল-আদিল্লাহ, কায়রো, পৃ. ৩১।
২০. ibid পৃ. ৩১। আল-সামকেও ঐতিহ্যগত বলে অভিহিত করা হয়।
২১. ibid পৃ. ৩২।
২২. ibid পৃ.৪০।
২৩. ibid পৃ.পৃ. ৪১।
২৪. ibid পৃ. ৪৪।
২৫. ibid পৃ. ৪৬।
২৬. ibid পৃ. ৪৮।
২৭. আল-কাশফস পৃ. ৫৩।

www.pathagar.com

২৮. ibid পৃ. ৬০, সুরা XLiI, ১১।
২৯. ibid পৃ. ৮০।
৩০. ibid পৃ. ৮৬।
৩১. ibid পৃ. ৯৭, সুরা XvII, ৯৩, "Am I aught same a mortal massenger".
৩২. প্রকৃতির গতিকে বাধা দেয়ার অর্থে অতিপ্রাকৃতিক (খারিক)।
৩৩. আল-কাশসাফ, পৃ. ১০৭।
৩৪. গিলসন, হিস্ট্রি অব খ্রিস্টান ফিলসফি ইন দি মিডল এজেস, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪, পৃ. ২১৯।
৩৫. ইবনে রুশদ, কিবাত আল-নাফস, পৃ. ৮।
৩৬. "জড়ীর আকার'কে আরবিতে হায়ুলানিয়াহ বা তা'বিয়াহ বলা হয়। প্রথম শব্দ গ্রিক 'হাইল' থেকে, দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক।
৩৭. কিতাব আল-নাফস, পৃঃ ১২।
৩৮. ibid পৃ. ১৩।
৩৯. ইবনে রুশদ, তাহাফুত, অনুবাদ, ভাল, ডি বার্গ পৃ. ৩০১।
৪০. কিতাব আল-নাকস, পৃ. ৬৯।
৪১. তাহাফুত, পৃ. ২৭৯।
৪২. ibid পৃ. ২৮৫।
৪৩. ibid
৪৪. কিতাব আল-নাফস, পৃ. ৬৭।
৪৫. ibid পৃ. ৭২।
৪৬. ibid পৃ.৭৬।
৪৭. তাহাফুত, পৃ. ২৮১।
৪৮. বার্গর্স, দি টু সোর্সেস অব মরালিটি অ্যান্ড রিলিজিয়ন, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪, পৃ. ১০২।
৪৯. তাহাফুত আল তাহাফুত,.পৃ. ৩১২।
৫০. ibid পৃ. ৩১৩।
৫১. ibid পৃ. ৩১৫।
৫২. ইবনে রুশদ ওয়া ফালসিফা, আলতুন ফারাহ, আলেকজান্দ্রিয়া, ১৯০৩, পৃ. ৯১।
৫৩. তাহাফুত আল তাহাফুত, পৃ. ৩১৮।
৫৪. ibid পৃ. ৩১৮।
৫৫. ibid পৃ. ৩১৯।
৫৬. তলখিস মা'বাদ আল তাবিয়াহ, উসমান তামিন, ১৯৫৮।
৫৭. ibid পৃ. ৩৪।
৫৮. ibid পৃ. ১৭।
৫৯. ibid পৃ. ৩৭, ৬৫।
৬০. ibid পৃ. ৪০-৪১।
৬১. ibid পৃ. ৪৫।
৬২. ibid পৃ. ৯৪।
৬৩. ibid পৃ. ৮৬।
৬৪. ibid পৃ.৯৪।
৬৫. ibid পৃ.৯৫।
৬৬. মানুদস্ প্রবন্ধ, 'হিলাল-এ তুসীর উপর' নভেম্বর, ১৯৫৬, করাচি।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

আল-গাযালি
(১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

ক. ভূমিকা

জ্ঞানের গভীরতায় এবং চিন্তার মৌলিকতায় বিশ্ব ইতিহাসে আল-গাযালির নাম অবিস্মরণীয়। মুসলিম ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাসে আল-গাযালি এক অনন্য স্থান দখল করে আছেন। তিনি ইসলামের প্রমাণ (Proof of Islam, Hujjat al-Islam), বিশ্বাসের শোভা (Ornament of faith, Zain-al-din) এবং ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী[১] (Renewer, Mujaddid) হিসেবে ভূষিত ও অলংকৃত। আল-সুবকি তাঁকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, যদি মোহাম্মদ (সঃ)-এর পর আর কোনো নবির আবির্ভাব ঘটত, তবে সম্ভবত আল-গাযালি হতেন সেই ব্যক্তি।[২] তিনি একদিকে নিজের মধ্যে তাঁর কালের বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় আন্দোলন (movement) অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, অন্যদিকে ইসলামে বিকশিত 'আত্মার' বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তরে আভ্যন্তরীণ 'অন্তর-চিন্তায়' নিমগ্ন ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন আইনবেত্তা, স্কলাসটিক্স, দার্শনিক, সংশয়বাদী, মরমিবাদী, ধর্মবিদ, ঐতিহ্যবাদী ও নীতিবিজ্ঞানী। ধর্মবিদ হিসেবে নিঃসন্দেহে, ইসলামে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তাঁর সৃজনশীল এবং আগ্রহী ব্যক্তিত্বের সজীব সমন্বয় (synthesis)-এর মাধ্যমে তিনি মুসলিম ধর্মতত্ত্বকে নবরূপ দান করেন এবং এর মূল্য ও ভাবধারাকে পুনর্জাগরিত করে তোলেন। ইসলামে মৌলিকতাবাদ (fundamentalizm) এবং আধ্যাত্মিককরণের (spiritualization) সমন্বয়, তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের এত উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখে যে, তাঁর কাল থেকে সমাজ ও বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক এ ভাবধারা অব্যাহতভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিকতার দ্বারা চিহ্নিত। এ মৌলিকতা যত না গঠনমূলক, তার চেয়ে অধিকতর সমালোচনামূলক। দর্শনের উপর তাঁর লিখিত গ্রন্থ পাঠে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। তাঁর দার্শনিক তীক্ষ্ণতা, দার্শনিকদের মতাবলির উপর তাঁর সুস্পষ্ট ও পাঠযোগ্য বিবরণ, যে উপায়ে তিনি দার্শনিকদের সমালোচনা করেন তার সূক্ষ্মতা এবং তাঁর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং সর্বত্র সত্যকে গ্রহণ করার তাঁর উদার মানসকিতা আমাদেরকে আকর্ষণ করে। জগতের কিছুই তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত বা মোহিত করতে পারে নি। মনের অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য শক্তির দ্বারা তিনি অ্যারিস্টোটলের

www.pathagar.com

অনুসরণীয় দার্শনিকবৃন্দের, বিশেষ করে, প্লটিনাসের এবং তাঁদের মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। আল-গাযালির মূল ধর্মীয় ভাবধারা ও দার্শনিক চিন্তাধারা আধুনিক মনের ধ্যান-ধারণার অতি সন্নিকটে চলে আসে। একদিকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাবাদের আধুনিক আন্দোলনের সমর্থকবৃন্দ এবং অন্যদিকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের প্রবক্তাগণ, যদিও কূটাভাসিক বলে প্রতীয়মান হয়, তথাপি আল-গাযালির লেখায় উভয় মতবাদই স্বচ্ছন্দে অবস্থান করছে। ইসলামের এ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের শিক্ষা, সেটা ধর্ম বা দর্শন বিষয়ে হোক অথবা গঠনমূলক বা সমালোচনামূলক যাই হোক না কেন তাঁর জীবন সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা না করলে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। কারণ, তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বে জীবন ও চিন্তা একত্রে মিশে আছে। তিনি যাই ভেবেছেন ও লিখেছেন তা সবই এসেছে তাঁর স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার সজীব বাস্তবতা থেকে।

খ. জীবনী[৩]

খোরাসানের অন্তর্গত তুস নগরে তাবাবান-এ সন ৪৫০/১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে গাউস, আহমদ আল-তুসি আল সাফিই জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণত তিনি তাঁর নিসবাহ (বংশনাম) আল-গাযালি নামে সুপরিচিত।

তাঁর পরিবারের মধ্যে তিনিই একমাত্র বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না। আরেকজন আবু হামিদ আল-গাযালি (৪৩৫/১০৪৩) ছিলেন। তিনি সম্পর্কের দিক দিয়ে আল-গাযালির ঠানচাচা (grand uncle)। তিনি একজন নামকরা প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইন পরামর্শক[৫] ছিলেন। আল-গাযালি সম্ভবত তাঁর যৌবনে এ মহাপুরুষকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রারম্ভেই তাঁর মধ্যে সুফি প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ দরবেশ। আল-সুবকির মতে, তিনি স্বীয় হস্তে যা অর্জন করতেন তা ব্যতীত অন্যকিছু দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন না। অধিকাংশ সময়েই তিনি সুফি পরিবেশ ও সাহচর্যে ব্যয় করতেন। অল্প বয়সেই আল-গাযালি এতিমরূপে পরিত্যক্ত হন। ধর্মপরায়ণ একজন সুফি পিতৃবন্ধু কর্তৃক তাঁর ভ্রাতাসহ তিনি প্রতিপালিত হন ও শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী কালে তাঁর ভাই একজন প্রখ্যাত সুফি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর নিজ শহরে শেখ আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আল-রাদখানি-আল-তুসি এবং পরে জুরজানে ইমাম আবু নসর আল-ইসমাইলীর অধীনে সম্পদ ও খ্যাতিলাভের আশায় তাঁর নিজ স্বীকৃতি[৬] অনুযায়ী তিনি বালক থাকাকালীন সময়েই ধর্মতত্ত্ব এবং আইন-অনুশাসন পাঠ করা শুরু করেন।

জুরাজান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তুসে কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং সম্ভবত এ সময় তিনি ইউসুফ আল-নাসাজের অধীনে সুফিবাদ পাঠ করেন এবং হয়ত কিছু সুফিভাবধারা অনুশীলনও করেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি নিশাপুর নিযামিয়া একাডেমীতে গমন করেন। সেখানে তিনি তৎকালীন ইমাম আল-হারমায়েন নামে পরিচিত বিশিষ্ট আশারীয় ধর্মতত্ত্ববিদ আবু মা'লি আল-জুয়াইনীর অধীনে আসেন এবং

www.pathagar.com

তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। এ-একাডেমীর পাঠ্য-তালিকায় বিস্তর বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল যথা : ধর্মতত্ত্ব, আইন বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, যান্ত্রিকবাদ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সুফিবাদ প্রভৃতি। ইমাম আল-হারমায়েন তাঁর শিষ্যদেরকে চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং স্বাধীন মত প্রকাশের অনুমতি দেন। সকল প্রকার বিতর্ক ও আলোচনার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য শিষ্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। আল-গাযালি শুরু থেকেই মহান পাণ্ডিত্যের প্রমাণ রাখেন এবং দার্শনিক উপায়ে চিন্তা করার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ইমাম আল-হারমায়েন তাঁকে বর্ণনা করেন "একটি পর্যাপ্ত সমুদ্র যাতে নিমজ্জিত হওয়া যায়" অন্য দু'শিষ্যের সাথে তুলনা করে ইমাম আল—হারমায়েন বলেন, "খাওয়াফির মূল বিষয় ছিল সত্যতা প্রতিপাদন (verification), আল-গাযালির ছিল অনুধ্যানপরায়ণ চিন্তা (speculation), আল-কিয়াসের ছিল বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যাকরণনীতি (explanation)[৭]।" অপরের সাথে বিতর্কে আল-গাযালি যুক্তি-কৌশল প্রদর্শন করেন এবং এ গুণ ছিল তার সহজাতধর্মী। অচিরেই তিনি তাঁর সহ-শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিতে থাকেন এবং গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন। কিন্তু, আল-গাযালি ছিলেন সেই কদাচিৎ পণ্ডিতদেরই একজন যাঁর মৌলিকতা শিক্ষার দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার নয়। তিনি একজন জাত-সমালোচক (born critic) এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। নিশাপুরে নিযামিয়া একাডেমীতে শিক্ষারত থাকাকালীন তিনি প্রথাগত শিক্ষার (dogmatic teaching) প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং নিজেকে প্রাধিকার (authority)-এর বন্ধন থেকে বিমুক্ত করেন, এমন কি, সংশয়বাদের ভাবও তাঁর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

নিশাপুরে অবস্থানকালীন তিনি সুফি আবু-আল-ক্বাদল ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী আল-ফারমাদির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আল-ফারমাদির নিকট তিনি সুফিবাদের তত্ত্ব এবং এর অনুশীলন-পদ্ধিতি শিক্ষা লাভ করেন। এমন কি, তাঁর অধীনে এবং তাঁরই নির্দেশনায় তিনি সুফিবাদের কঠোর সাধনা (rigorous ascetic) এবং এর অনুশীলন করতে থাকেন। কিন্তু এতে তিনি তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন তিনি সেই স্তর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেন নি, যেখান থেকে মরমিবাদিগণ 'সুউচ্চ-উর্ধ্ব'(high above) থেকে বিশুদ্ধ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ফলে তিনি মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। একদিকে স্কলাসটিক্স ধর্মবিদদের অনুধ্যানপরায়ণ পদ্ধতিতে তিনি অতৃপ্ত, প্রাধিকারের কিছুই গ্রহণ করতে পারছিলেন না, অন্যদিকে সুফি অনুশীলনও তাঁর মনে সুনির্দিষ্ট কোনো ছাপ ফেলতে পারেন নি। কারণ, এ থেকে তিনি তখনও কোনো নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করতে পারেন নি। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সুফি শিক্ষার প্রতি তাঁর বর্ধিত আকর্ষণ এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে নির্বিচারে গৃহিত ধর্মতত্ত্বের প্রতি আল-গাযালির সমালোচনামূলক অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পায়।

আল-ফারমাদি ৪৭৭/১০৮৪ এবং ইমাম আল-হারমায়েন ৪৭৮/১০৮৫-তে মৃত্যুবরণ করেন। আল-গাযালি তখন ২৮ বৎসর বয়সের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহী যুবক। ইসলামি বিশ্বে তাঁর খ্যাতি ও পাণ্ডিত্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি নিযাম-আল-মুলকের

www.pathagar.com

দরবারে নিজেকে উপস্থাপন করেন। নিযাম-আল-মূলক তখন মালিকশাহের ৪৬৫/১০৭২-৪৮৫/১০৯২ সালযুক সার্বভৌমের মহান উযির। নিযাম আল-মূলক জ্ঞান ও শিল্পের প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং দরবারে উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ ঘটাতেন। তিনি প্রায়শই বিতর্ক ও আলোচনার জন্য সভা ডাকতেন। এসব ক্ষেত্রে আল-গাযালি তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং অচিরেই তাঁর বিতর্ক-কৌশল সবার নিকট সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

মুসলিম আইন, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে আল-গাযালির গভীর জ্ঞান নিযাম-আল মূলককে আকর্ষণ করে। তিনি তাঁকে বাগদাদে (৪৮৪/১০৯১) নিযামিয়া একাডেমীতে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে নিয়োগ দান করেন। আল-গাযালির বয়স তখন ৩৪ বৎসর। মুসলিম বিশ্বে এ পদ তখন ছিল অত্যন্ত গৌরবের ও অত্যন্ত সম্মানের। এ পদ ছিল লোভনীয় ও আকর্ষণীয় এক পদ। আল গযালীর পূর্ব পর্যন্ত এত অল্প বয়সে কেউ এ পদ অলংকৃত করতে পারেন নি।

একাডেমীর অধ্যাপক হিসেবে আল-গাযালি চরম সফলতা অর্জন করেন। তাঁর উৎকৃষ্ট ভাষণ, জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং স্বচ্ছ ব্যাখ্যা তৎকালের প্রধান পণ্ডিতবর্গসহ বহু শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাঁর বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য এবং দ্বান্দ্বিক কৌশল প্রশংসিত হয়। তাঁকে আ'শারীয় ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। ধর্মীয় এবং রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করা হয় এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর তুলনায় তাঁর সুদক্ষ প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে। জাগতিক সফলতার দ্বারা তাঁর সুদক্ষ প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে। জাগতিক সফলতার দ্বারা একজন জ্ঞানী যা অর্জন করে থাকেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে তাই লাভ করেছিলেন। কিন্তু, অন্তর বা আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তিনি বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চরম সংকটের কাল অতিবাহিত করতে থাকেন।[৯]

প্রাচীন সন্দেহ ও সংশয়বাদ তাঁকে পুনরায় পেয়ে বসে এবং তিনি যেসব বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন তাঁর প্রতি কঠোর সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন। আইনজ্ঞদের আইনের[১০] কূটতর্কের ঘোরপ্যাঁচের নিষ্ফলতার বিষয় তিনি তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করেন। স্কলাসটিক্স ধর্মবিদদের (Scholastics theologian, mutakallimin)[১১] পদ্ধতির কোনো যৌক্তিক নিশ্চয়তা নেই। কারণ, তাঁরা তাঁদের প্রাথমিক নির্বিচারে গৃহিত ধারণাসমূহের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রাধিকার গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের মতবাদের উপর অত্যধিক গুরুত্বকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, এটা শুধু গোঁড়ামি ও ধর্মমতের কূট-বিচারে ধর্মকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। স্কলাসটিকদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে তিনি দ্বান্দ্বিক বিতর্ক বলে বিবেচনা করেন। ধর্মীয় জীবনের সাথে এর কোনো বাস্তব সম্পর্ক নেই। আল-গাযালি পুনরায় দর্শন পাঠে প্রত্যাবর্তন করেন। এবারে তিনি অত্যন্ত মনোযোগও ব্যাপকভাবে তা পাঠ করেন।[১২] কিন্তু কান্টের ন্যায় তিনি অনুভব করেন যে, কেবল বুদ্ধির দ্বারা ধর্মতত্ত্ব গঠন করা অসম্ভব। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা উভয়—একে চলতে দেয়া উচিত, কিন্তু এটা খুব বেশিদূর এগুতে পারে না এবং এর মাধ্যমে আদি সত্তা বা পরম সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। বুদ্ধির ধর্মতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা

www.pathagar.com

সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার পর তিনি সংশয়বাদের অবস্থায় পতিত হন এবং মনের স্থিরতা হারান। সনাতন শিক্ষার কপটতায় (hypocrisy) তিনি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং নিজেকে এক বিব্রতকর অবস্থায় দেখতে পান।

কিন্তু সবকিছু তখনো হারিয়ে যায় নি। তাঁর কিছু আস্থা বা নিশ্চয়তা (assurances) ছিল যা সুফিপন্থার মাধ্যমে তিনি কিছু প্রদান করতে পারেন। সুফিবাদের মধ্যে বাস্তব সত্তার সাথে প্রত্যক্ষ মুখোমুখির যে সম্ভাবনা রয়েছে এটা তাঁর নতুন আবিষ্কার নয়—এ বিষয়টি তিনি বহুকাল যাবৎই অনুভব করে আসছিলেন। তিনি সুফিবাদের তত্ত্বগত দিক অনুসরণ করেছিলেন এবং এর অনুশীলনও করেছিলেন, কিন্তু তিনি এর গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি। তিনি যদি আধ্যাত্মিক আত্মত্যাগ, স্থায়ী সাধনা, প্রলম্বিত ও গভীর ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে সুফি জীবনধারায় নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে পারতেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি কাঙ্ক্ষিত জ্যোতি প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়াতো তাঁর সকল শিক্ষাজীবন ও পার্থিব অবস্থানকে অস্বীকার করা। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন: খ্যাতি ও গৌরবের জন্য তাঁর বাসনা ছিল। অন্যদিকে, তিনি সত্যের একজন অতি নিষ্ঠাবান আগ্রহী পূজারী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। প্রায় ছয়মাস যাবৎ তিনি তীব্র নৈতিক সংকট ও আধ্যাত্মিক যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করেন। শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। তার ক্ষুধা ও হজম শক্তি হ্রাস পায় এবং কথা বলার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেন। এ ঘটনা তাঁকে অধ্যাপক পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। সম্ভবত হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করেন; কিন্তু বাস্তবে মনের নিশ্চয়তা এবং আত্মার শান্তির জন্য তিনি সুফির ধর্মীয় নীতি এবং নির্জন সাধনার তন্ময়তা অনুশীলনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। পরিবারের জন্যে কিছু অর্থ ব্যতীত তিনি সমস্ত সম্পদ বর্জন করেন এবং সিরিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হন।

৪৮৮/১১০৫ থেকে ৪৯০/১০৯৭—এ দু'বৎসর দামেশকের উমাইয়াদের মসজিদ-মিনারে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অবসর জীবন যাপন করেন। এ সময় তিনি কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকেন এবং ধর্মীয় রীতিনীতি অনুশীলন করেন। উমরের মসজিদে এবং পাহাড়ের গম্বুজে তিনি ধ্যানাবস্থা কাটানোর জন্য আরেকবার জেরুজালেম গমন করেন। হেবরনে ইব্রাহিমের মিনার পরিদর্শনের পর তিনি মক্কা ও মদিনায় হজ্জব্রত উদ্দেশ্য গমন করেন। তারপর বিভিন্ন পবিত্রস্থান, মসজিদ, মাযার ও মরুভূমিতে নীরবে নিভৃতে ঘুরে বেড়ান। এগার বৎসর পর তাঁর দরবেশি ও পাণ্ডিত্যের জীবনে পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পরিশেষে তিনি তাঁর নিজ শহর তুস-এ ৪৯৯-১১০৫ প্রত্যাবর্তন করেন।[১৪]

বাগদাদ ত্যাগের পর তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরীক্ষামূলক বাস্তবতা সম্বন্ধে তিনি আমাদের কিছুই বলেন না। শুধু এটুকুই বলেন যে, এ নির্জন বাসের সময় তাঁর নিকট অসংখ্য ও দুর্বোধ্য বিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাহ্যত এসব অভিজ্ঞতার মধ্যে রাসুল (সঃ)-এর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তির স্বীকৃতি এবং কোরআনে বর্ণিত সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের পুনরুদ্ধারের প্রতীক 'আল রিসালাহ আল কুদসিয়া' গ্রন্থটি জেরুজালেমে নির্জন অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে

www.pathagar.com

রচিত। এটা কুয়াযেদ আল-আকায়েদ হিসেবে প্রখ্যাত গ্রন্থ ইয়াহহিয়া উলুম আল-দীন (ধর্মবিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)-এর দ্বিতীয় গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি যা কিছু শিখেছেন এর মধ্যে তা সবকিছু বর্ণিত হয়েছে।[১৫] বিভিন্ন স্থানে বিচরণ কালে 'ইয়াহহিয়া' ব্যতীত তিনি শুধু রচনার কাজেই ব্যাপৃত থাকেন নি বরং সময় সময় শিক্ষাদান কার্যও চালিয়ে গেছেন। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন, তাঁর চতুষ্পার্শ্বে পরিবেষ্টিত প্রচলিত ধর্মীয় অবিশ্বাসকে বিদূরীত করা, লোকদেরকে ইসলামের সত্যের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনা এবং ইসলামের নৈতিক বলে বলিয়ান করে তোলা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব। এ কারণে তিনি লেখা ও শিক্ষা উভয় কাজই চালিয়ে গেছেন। বাস্তবে তিনি নৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ভূমিকাই পালন করেছেন। রাসুল (সঃ)-এর ঐতিহ্য ও সনাতন বিশ্বাসে গভীর অধ্যয়নে তিনি নিজেকে অধিক পরিমাণে নিয়োজিত রাখেন এবং আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ব্যাপকভাবে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান।

তুসে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় নিজেকে অবসর ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিয়োজিত রাখেন। কিন্তু, অতি শীঘ্রই নিযাম-আল-মুলকের পুত্র ও সুলতান সঞ্জরের উযির ফখর আল-মুলক তাঁকে নিশাপুরে মায়মুনাই নিযামিয়া কলেজে ধর্মতত্ত্বের পদ অলংকৃত করার জন্য অনুরোধ জানান। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে তিনি তা গ্রহণ করেন, কিন্তু সেখানেও তিনি বেশিদিন অবস্থান করেন নি। পুনরায় তিনি তাঁর নিজবাড়ি 'তুসে' অবসর জীবন কাটান এবং সেখানে তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্মতত্ত্ব ও ভাসাউফ শিক্ষা দিতে থাকেন। বাগদাদের পণ্ডিতবর্গ ও সাধারণ লোকের অনুরোধে প্রধান উযির আল-সাঈদ বাগদাদে পুরাতন নিযামিয়া একাডেমীতে শিক্ষাদানের জন্য তাঁকে আহ্বান জানান। কিন্তু আল-গাযালি তুসে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তুসে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত শিষ্যদের সাহচর্যে শান্তিতে বসাবস করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। ১৪ই জুমাদা ৫০৫/১৯শে ডিসেম্বর ১১১১-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রতিটি মুহূর্তকে পাঠে ও ধ্যানে ব্যয় করেন। আল-গাযালির ছিল একটা সুন্দর সফল পরিপূর্ণ জীবন। তাঁর সুফি তন্ময়তার পরিণতি প্রারম্ভেই সূচিত হয়েছিল।

গ. পদ্ধতি ও জ্ঞানতত্ত্ব

আল-গাযালির চিন্তার গঠন-প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর পদ্ধতি। আল-গাযালির এ পদ্ধতি হচ্ছে সত্যকে জানার ও সন্দেহ করার সাহস। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুনকিদ মিন-আল-দালাল (ভ্রম থেকে পরিত্রাণকারী)-এ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থ তিনি তাঁর মৃত্যুর[১৬] পাঁচ বৎসর পূর্বে রচনা করেছিলেন। আল মুনকিদ গ্রন্থে আল-গাযালি তাঁর সমকালীন চিন্তার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পদ্ধতির সমালোচনামূলক পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। তাঁর এ সমলোচনামূলক পরীক্ষণ আধুনিক দর্শনের জনক রেনে ডেকার্টের (১০৬০/১৬৫০) ডিককোর্স অন মেথড্‌স্‌ (১০৪৭/১৬৩৭)-এর ঘনিষ্ঠ অনুরূপে লিখিত বলে ভ্রম হয়।

আল-গাযালি অভিমত পোষণ করেন, সকল প্রকার জ্ঞানের জন্য অনুসন্ধানকার্য চালানো উচিত। কোনো কিছুকেই বিপজ্জনক বা শত্রুতাপূর্ণ ভাবা উচিত নয়। তাঁর

www.pathagar.com

নিজের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, "যৌবনকাল থেকেই সন্দিগ্ধতাকে দূরে সরিয়ে তিনি জ্ঞানের মুক্ত সমুদ্রে বিচরণ করেছেন; প্রতিটি অন্ধকোটর আমি খুঁচিয়েছি এবং প্রত্যেক সমস্যার উপর প্রবল আক্রমণ চালিয়েছি। আমি প্রতিটি অতল গহ্বরে ডুব দিয়েছি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস আমি নিরীক্ষণ করেছি এবং প্রতিটি মতবাদের রহস্য নির্ণয় করেছি। এসব করেছি আমি এ কারণে যাতে করে আমি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারি। এমন কোনো দার্শনিক নেই যার পদ্ধতির সাথে আমি পরিচিত হইনি। এমন ধর্মবিদ নেই যার মতবাদ আমি পরীক্ষা করিনি। যখনই কোনো সুফির সাক্ষাৎ লাভ করেছি তাঁর গোপন রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছি, যখন কোনো নির্জন সাধকের দেখা পেয়েছি, তাঁর কঠোর নিয়ম-শৃংখলার মূলে প্রবেশ করেছি, যখন কোনো নাস্তিকের (aetheist, zindigs) সন্ধান পেয়েছি তাঁর নির্ভীক নাস্তিকবাদের কারণে হাত দিয়েছি।"[১৭] এ ছিল আল-গাযালির জানা বা অবহিত হওয়ার সাহস। আল-গাযালি তাঁর সমকালীন নির্বিচার ধর্মবিদদের সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। নির্বিচার ধর্মবাদী নাস্তিক ও দার্শনিকদের গ্রন্থ পাঠ করার চাইতে তিনি এগুলো পুড়িয়ে ফেলার কাজেই বেশি নিয়োজিত ছিলেন। প্রতিটি ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদকে জানার জন্য আল-গাযালি প্রস্তুত থাকলেও তিনি কোনো মতবাদকেই গ্রহণ করেন নি। বরং প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই তাঁর ছিল সন্দেহ-সংশয়। একটি বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সত্যকে জানার সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে অন্যের প্রাধিকারের (Authority) উপর বিশ্বাস এবং অতীত উত্তরাধিকারের প্রতি অন্ধ-আনুগত্য। তিনি নবি (সঃ)-এর সনাতন বাণী স্মরণ করেন : প্রতিটি শিশু সুস্থ স্বভাব (fit-rah) নিয়ে জন্মায়, তার মাতাপিতাই তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা ম্যাগিয়ান বানায়[১৮]। এর সুস্থ স্বভাব কি, তা তিনি জানতে চান অর্থাৎ মূল থেকে তিনি সকল জ্ঞানের অবকাঠামো গঠন করতে চান। এটি করতে গিয়ে তিনি অনুধাবন করেন : সত্যানুসন্ধান আমার লক্ষ্য হওয়ার কারণে আমি প্রথমে স্থির করতে চাই নিশ্চিতকরণের (certitude) ভিত্তি কি? দ্বিতীয়ত: আমি স্বীকার করতে চাই যে, সেই নিশ্চিতকরণ হচ্ছে : বস্তু সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ জ্ঞান-এমন নিশ্চিত জ্ঞান যেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই কিংবা ভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি যে, নিশ্চিতকরণের আল-গাযালির প্রস্তাবিত পরীক্ষণ (test) তাঁকে সন্দেহের পর সন্দেহের অনুক্রমে পরিচালিত করে। তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁর কোনো অংশই এ কঠোর পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। তিনি আরো পর্যবেক্ষণ করেন : 'যেসব বস্তু নিজেদের প্রকাশ বা সত্যতা নিজেরা বহন করে না, সেসব বস্তু ব্যতীত অন্যবস্তু সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আমরা আশা করতে পারি না, অর্থাৎ চিন্তার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ (sense perception) ও অনিবার্য সূত্র (necessary principles)—এ দুইকে প্রথমে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' কিন্তু তখন গাযালি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের প্রমাণ সন্দেহ করেছেন। ডেকার্টের ন্যায় তিনিও সাধারণভাবে দেখেছেন যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ জ্ঞান প্রায়শ: আমাদেরকে প্রতারণা করে। কোনো দৃষ্টি ছায়ার গতি নিরীক্ষণ করতে পারে না। তবু গতি হিসেবে ছায়া চলছে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা যে কোনো তারকাকে আবৃত করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে,

www.pathagar.com

জ্যামিতিক হিসেব প্রদর্শন করে যে, একটি তারকা পৃথিবীর চেয়ে অনেক গুণে বড় বৃহৎ।[১৯]

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের প্রতি আল-গাযালির আস্থা নড়বড় হওয়ার পর তিনি অনিবার্য নীতি বা সূত্রের সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ কাজে ফিরে আসেন। তিনি এসব নীতিকেও সন্দেহ করেন। দশ কি তিনের চেয়ে অধিক? একই সময় একটি বস্তু আছে কি নেই, নাকি উভয়ই, কিংবা এটা অনিবার্য ও অসম্ভব উভয়ই হতে পারে? এ বিষয়ে তাঁর বলার কি রয়েছে? ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ প্রজ্ঞার অভ্রান্ততা (infallibility) গ্রহণে তাঁকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। প্রজ্ঞার বিচার বা রায় দ্বারা অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইন্দ্রিয়ের প্রামাণিক সাক্ষ্যে (testimony) বিশ্বাস করতেন। হয়ত প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির ঊর্ধ্বে এক বিচারক রয়েছেন যার আবির্ভাবের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। যদিও এ তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব সুস্পষ্ট নয়, তুবও এর অর্থ এই নয় যে, এর কোনো অস্তিত্ব নেই।

পরবর্তী জগতের তুলনায় এ জগতের জীবন স্বপ্ন হওয়ার সম্ভাব্যতার কথা আল-গাযালি উল্লেখ করেন। বর্তমানে মানুষ যা অবলোকন করে,[২০] মৃত্যুর পর তা ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হতে পারে। বর্তমানে স্থান-কালিক (spatio-temporal) বিন্যাসের চেয়ে সত্তার ভিন্নতর বিন্যাস থাকতে পারে যা স্বাভাবিক জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের ঊর্ধ্বস্তরে লোকদের নিকট প্রকাশিত হয়, যথা : সুফিসাধক এবং নবিগণ। এ ছিল আল-গাযালির চিন্তার গতিধারা যা 'আল-মুনকিদে' কিছুটা কৃত্রিম উপায়ে নির্মিত হয়েছে। এখানে তিনি প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির বোধগম্যতার (rational apprehension) ঊর্ধ্বে উচ্চতরে বোধগম্যতার এক আকারের কথা বলেন, যেমন মরমিবাদের অনুপ্রেরণা এবং নবিদের প্রত্যাদেশ-জাত বোধ।[২১]

নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, আল-গাযালির সংশয় পদ্ধতি বা সংশয়বাদের প্রতি তাঁর ঝোঁকের ঐতিহাসিক পূর্বগামিতা রয়েছে। দ্রব্য (substance) ও গুণ (quality) ব্যতীত সকল ক্যাটেগরি বা প্রকারকে (categories) আত্মগতে পরিণত করে আ'শারীর পরমাণুবাদ পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে সংশয়বাদের অবয়ব গঠন করে।[২২] এর পূর্বেও আল-নাজ্জাম (২৩১/৮৪৫) ও আবু আল-হুদায়েল (২৬৬/৮৪০)-এর মত মুতাযিলাগণ সকল জ্ঞানের[২৩] সূচনা হিসেবে সংশয়ের নীতি বা সূত্র গঠন করেছিলেন। কিন্তু আল-গাযালির নিকট সূত্র বা নীতি হিসেবে এটা অনেকটা তাঁর বৌদ্ধিক মনের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁর সূক্ষ্মও আধ্যাত্মিক আন্দোলনে অভিব্যক্ত তবুও তাঁদের যে কোনো একটি একক আন্দোলনের দ্বারা সেই মন প্রভাবিত হয় নি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও আত্মপ্রত্যয়ী আল-গাযালি বিভিন্ন প্রভাবকে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাদের কোনো একটির দ্বারা আক্রান্ত হননি। যা অর্জিত হয় নি তা লাভ করার জন্য তাঁর চঞ্চল মন সর্বদা প্রয়াস চালিয়েছে। পরম সত্যের জন্য তাঁর উদার ও মুক্ত অন্বেষায় সম্ভবত তিনি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলনায় দীর্ঘকাল যাবৎ দোলায়িত হয়েছেন। আল-গাযালির ন্যায় জটিল মনের আধ্যাত্মিক বিকাশের[২৪] সঠিক কালক্রম নির্ণয় করা সত্যি কঠিন। এমনকি, আল-মুনকিদসহ তাঁর কোনো রচনাই তাঁর আত্মার[২৫] আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য আমাদের কোনো সাহায্য করে না।

www.pathagar.com

যাই হোক না কেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত আল-গাযালির আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য আল-মুনকিদ একটি মূল্যবান উৎস। এ গ্রন্থে বিভিন্ন মতবাদ ও ভাবধারার সাথে সম্যক পরিচিত হয়ে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। নিশ্চিত সত্যের অন্বেষায় তিনি বিভিন্ন মতবাদ ও তাদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছেন। এবারে তাঁর প্রধান কাজ হলো সংক্ষিপ্ত আকারে এদের একটি সমালোচনামূলক ভাষ্য প্রদান করা। তিনি সত্যের অনুসন্ধানকারীদের (seekers) চারটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত করেন :

১. ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়, ২. মরমি বা সুফি সম্প্রদায়, ৩. তালেমীয় সম্প্রদায়, এবং ৪. দার্শনিকবৃন্দ।

১. ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের উপর তাঁর সমালোচনা বেশ নমনীয়। তিনি তাদের ঐতিহ্যে লালিত ও তাদের পদ্ধতির দ্বারা পুরোপুরিভাবে সিক্ত (saturated)। তিনি কখনও সম্পূর্ণভাবে তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন কিনা সন্দেহ হয়। কারণ, সুফি হওয়ার পরও তিনি ধর্মবিদ হওয়া থেকে বিরত থাকেন নি। তিনি মূলত দার্শনিকদের সমালোচনা করেছেন একজন ধর্মবিদের দৃষ্টিকোণ থেকেই। শুধু ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের স্কলাসটিক্স পদ্ধতির প্রতিই তাঁর অসন্তুষ্টি ছিল। কারণ, এটা কোনো বৌদ্ধিক নিশ্চয়তা আনতে পারে না, কিন্তু তাঁদের মতবাদ যথার্থ ছিল বলে মনে করেন। আল্লাহ, নবুওয়াত ও শেষবিচারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস মনের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। এদের মূল উৎপাটন করা সম্ভব নয়। এদের সম্বন্ধে তাঁর সংশয় যদি থেকে থাকে, তবে তা নিতান্তই ক্ষণিক ও অস্থায়ী। দার্শনিক অথবা অন্যকোনো প্রকার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি তাঁর এ মৌলিক বিশ্বাসের অনুমোদনই (confirmaiton) প্রত্যাশা করেছিলেন মাত্র।

২. কোনো কোনো সুফির[২৬] অসংযত সর্বেশ্বরবাদিতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করার মতো আল-গাযালি তেমন কিছু পান না। মরমিবাদিগণ আবেগ বা অনুভূতিপরায়ণ ব্যক্তি (men of feeling)। আল-গাযালি ধর্মমত ও ধর্মমতের সংজ্ঞার চেয়ে সুফিসাধকের অভিজ্ঞতা ও অবস্থাসমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অভিজ্ঞতাবিহীন সুফিসাধকের নিকট মরমিবাদের উচ্চ ভাবধারা অযৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হতে পারে।

৩. তালেমীয় সম্প্রদায় বলে অভিহিত লোকগণ ইসমাঈলীয় ও বাতেনিয়া[২৭] নামেও পরিচিত। এ সম্প্রদায়ের মতামতের প্রতি আল-গাযালি অত্যন্ত হীন ধারণা পোষণ করতেন। তাঁরা প্রজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং একজন অভ্রান্ত ইমামকে স্বীকার করে নেন। তাঁদের মতে, ইমামই হচ্ছেন নির্ভুল ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। ইমামের বাণী ও ঘোষণাকে সবিনয়ে গ্রহণ করার মাধ্যমেই সত্য লাভ করা যেতে পারে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ মতবাদ অবশ্য ফাতেমীয়দের প্রচারের অংশ এবং কায়রো ছিল এর কেন্দ্র। এর উৎসমূলে ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক বিশৃংখলা। তালেমীয়দের বিরুদ্ধে আল-গাযালির বিরোধিতা সত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ।

৪. সত্যের অন্বেষায় নিয়োজিত চতুর্থ শ্রেণীর দার্শনিকগণই আল-গাযালির দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। অন্য যে কোনো মতবাদের চাইতে তাদের মতবাদই তাঁর মনকে সবচেয়ে অধিক পীড়া দেয় এবং তাঁকে অস্থির করে তোলে।

www.pathagar.com

ঘ. দার্শনিকগণের উপর আক্রমণ

১. পূর্বাভাস : আল-গাযালির জ্ঞান অনুসন্ধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে দার্শনিকদের মতবাদ এবং দার্শনিক পদ্ধতির উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আল-গাযালি দার্শনিকদের জ্ঞানানুসন্ধানের ঠিক বিরোধী ছিলেন না। যুক্তিবিদ্যার উপর রচিত তাঁর 'মা' আর আল-ইলম ফিফান্ন আল-মানতিক' যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞানের স্পর্শমণি এবং 'মিহাক্ক-আল-নসর ফি-আল-মানতিক' যুক্তিবিদ্যায় অনুধ্যানের স্পর্শমণি গ্রন্থগুলোকেই প্রমাণ করে দর্শনের প্রতি তাঁর কি পরিমাণ অনুরাগ ছিল। আল-গাযালি অনুধাবন করেন যে, একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করতে গেলে সেই পদ্ধতি বা সেই বিষয়ে একজনকে সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে। তাই বৌদ্ধিক ও জ্ঞানের সততার খাতিরে দার্শনিকদের পদ্ধতির উপর পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।[২৮]

তাঁর সময়কালে বিদ্যমান সমগ্র গ্রিকদর্শন অধ্যয়নে তিনি নিজেকে কঠোর শ্রমে নিয়োজিত রাখেন। ফলে গ্রিকদর্শন তথা দর্শনের সমস্যা ও পদ্ধতিসমূহের[২৯] উপর তাঁর এত জ্ঞান অর্জিত হয় যে, তিনি 'মাকাসিদ আল-ফালাসিফা' (দার্শনিকগণের অভিপ্রায়, The intentions of the philosophers) নামক শিরোনামে আরবিতে উৎকৃষ্ট মানের এর একটি সংক্ষিপ্তসার (compendium) রচনা করেন। এ সংক্ষিপ্তসারে অ্যারিস্টোটলবাদের এত বিশ্বস্ত ও সূক্ষ্ম বর্ণনা করা হয় যে, যখন ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে খ্রিষ্টান স্কলাসটিকসদের নিকট এটা পরিচিতি লাভ করে, তখন এটা প্যারিপেটিকের মূল রচনা বলেই গৃহীত হয়। আলবার্ট দি গ্রেট, টমাস একুইনাস, রোজার বেকন সকলেই 'দার্শনিকগণের অভিপ্রায়'-এর রচয়িতার নাম ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ করতে থাকেন। কারণ, তাঁরাই ছিলেন তখন আরবীয় অ্যারিস্টোটলবাদের[৩১] সত্যিকার প্রতিনিধি। কিন্তু আরবীয় অ্যারিস্টোটলবাদ আল-গাযালির ন্যায় বলিষ্ঠ শত্রুর সাক্ষাৎ আর পায় না। দর্শনে তাঁর সংক্ষিপ্তসার তাঁর 'তাহাফুত-আল-ফালাসিফা'র (দার্শনিকদের অসংগতি)[৩২] কেবলমাত্র ভূমিকা (Propaedentic) ছিল। এতে তিনি সূক্ষ্ম যুক্তিকৌশল প্যারিপেটিকস মতবাদের উপর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালিয়েছেন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিপ্রায়ে আল-গাযালি দার্শনিকদের প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

১. জড়বাদী (materialists) ২. প্রকৃতিবাদী বা অতিবর্তী খোদাবাদী (Naturalists or Deists) ৩. খোদাবাদী (Theists)। জড়বাদীগণ আল্লাহর ধারণা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। তাঁদের ধারণা, স্রষ্টা ব্যতীত জগৎ চিরন্তনভাবেই অস্তিত্বশীল ছিল। জগৎ হচ্ছে একটা আত্ম আশ্রয়ী (self-subsisting) পদ্ধতি। নিজের মধ্যেই নিজে প্রক্রিয়ারত ও বিকশিত। এর রয়েছে নিজস্ব বিধি-বিধানএবং তদানুসারেই বোধযোগ্য।

প্রকৃতিবাদীগণ অথবা অতিবর্তী খোদাবাদীগণ সৃষ্টির চমৎকারিত্বে অভিভূত। বস্তু বা জগৎ পরিকল্পনার মূলে এক অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য রয়েছে বলে তাদের ধারণা। তাঁরা

www.pathagar.com

মনে করেন, সৃষ্টির পশ্চাতে এক উদ্দেশ্য প্রবহমান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বহু গবেষণাকাজে নিয়োজিত থেকে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহান অপূর্ব সৃষ্টির পেছনে মহাবিজ্ঞ স্রষ্টা বা মহান সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে, তাঁরা মানব আত্মার আধ্যাত্মিকতার ও অমরতাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা প্রাকৃতিক উপায়ে আত্মাকে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, আত্মা হচ্ছে দেহের উপবস্তু বা উপঘটনা। দেহের মৃত্যুর পর আত্মারও আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। বেহশত, দোজখ, পুনরুত্থান, বিচারদিবসের প্রতি বিশ্বাসকে তাঁরা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কাহিনী বা ধর্মীয় কল্পনাবিলাস বলে মনে করেন।

খোদাবাদীদের সম্বন্ধে আল-গাযালি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কারণ তুলনামূলকভাবে তাঁরা জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদীদের থেকে উত্তম। খোদাবাদীগণ জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদীদের দোষত্রুটিগুলোকে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছেন। আল-গাযালি সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলকে খোদাবাদী শ্রেণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অ্যারিস্টোটলের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কারণ, অ্যারিস্টোটল তাঁর পূর্ববর্তী সব দার্শনিকের সমালোচনা করেছেন, এমনকি তাঁর শিক্ষাগুরু প্লেটোকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, "প্লেটো আমার নিকট প্রিয়, সত্যও আমার প্রিয়, তবে সত্য প্লেটোর চেয়ে অধিকতর প্রিয়।"[৩৪]

আরবিতে অ্যারিস্টোটলের দর্শন পরিবাহিত[৩৫] হওয়া সম্বন্ধে আল-গাযালি লক্ষ্য করেন যে, এ ব্যাপারে আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার সাফল্যের তুলনায় অন্য কোনো মুসলিম দার্শনিক এত সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। এ দুই প্রখ্যাত ব্যক্তি অ্যারিস্টোটলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুবাদক ও ভাষ্যকার। অন্যদের রচনা অবিন্যস্ত ও অস্পষ্ট। এ কারণে আল-গাযালি এ-দুই খোদাবাদী দার্শনিকের বিশেষ করে ইবনে সিনার দর্শনচিন্তার উপর শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এবং অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে গণিত, যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রাজনীতিবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম দর্শনে বিভক্ত করেন। তিনি এদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন সত্যি এদের মধ্যে মিথ্যা বা অগ্রহণযোগ্য কিছু আছে কিনা? তাঁর আলোচনা ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ। যে কোনো বিষয় বা প্রমাণকে গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। গণিত, যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যার ন্যায় বিজ্ঞানসমূহের দার্শনিক মতবাদ গ্রহণে তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না, এমনকি তাদের রাজনীতিবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের সাথেও তাঁর তেমন কোনো কঠিন মতদ্বৈধতা ছিল না। খোদাবাদী দার্শনিকদের মারাত্মক ভুল হচ্ছে যে, তাদের তাত্ত্বিক মতবাদ প্রজ্ঞা বা যুক্তির উপর নয় বরং অনুমান বা কল্পনাত্মক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাদের তাত্ত্বিক মতবাদ গণিতশাস্ত্রের ন্যায় যুক্তির উপর নির্ভরশীল হতো, তবে গাণিতিক বিদ্যার ন্যায়ই তাত্ত্বিক সমস্যাবলি সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে একতা বা ঐক্যবোধ থাকত। কিন্তু, আল-গাযালি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, কোনো যুক্তি বা বিচার ব্যতিরেকে আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার দর্শন কোনো কোনো বিষয়ে কোরানে বর্ণিত ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ

www.pathagar.com

করেছেন। আল-গাযালির অভিজ্ঞতা ও ধর্মভিত্তিক ভাবধারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ধর্মের সার্থক বিষয়কে তাত্ত্বিক অনুমানের দ্বারা বর্জন করা যায় না কিংবা দর্শন পদ্ধতির পূর্ব-ধারণার দ্বারা একে বাহ্যিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এদের অন্তর্গুণের দ্বারাই এদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এদের নিজস্ব স্বকীয় ভিত্তির দ্বারাই এদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। মুসলিম দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতার এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উৎসাহে প্রণোদিত হয়ে আল-ফারাবি ও ইবনে সিনা ইসলাম ধর্মের ধর্মবিশ্বাসকে অ্যারিস্টোটল ও প্লটিনাসের ছাঁচে এমনভাবে সংকুচিত করেছেন যে, তারা শেষ পর্যন্ত অসঙ্গতির আবর্তে পতিত হন কিংবা প্রচলিত ধর্মবিরোধী অবস্থানে জড়িয়ে পড়েন।৩৬-৩৭

পদ্ধতি এবং তাহাফুতের সমস্যাবলি : আল-গাযালি যখন সংশয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন তখনই 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' রচিত হয়েছিল বলে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, রচনাটি তার্কিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত এবং এটা তাঁর মধ্যে সংশয়বাদ ও ভাবোল্লাসের (ecstasy) নিশ্চয়তার চমৎকার সমন্বয়ের ভাবপ্রদর্শন করে। তৎকালীন জনগণের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের দার্শনিকদের শিক্ষার সাধারণ প্রভাব অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক বলে গাযালির নিকট প্রতীয়মান হয়। ফলে তাঁর মানবতাবাদী মন দার্শনিকদের মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তিনি নিজেকে দার্শনিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত রাখেন। তাহাফুতে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং বিতর্কের ভাবধারা সুস্পষ্ট, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এদের কোনোটির দ্বারাই এ রচনার মহান দার্শনিক মূল্য৩৮ গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন হয় নি। তাহাফুতে কোনো কোনো যুক্তি (argument) এবং এর সাধারণ উদ্দেশ্যের দ্বারা একজন আধুনিক পাঠক, হিউম (১১৯০/১৭৭৬), স্লিয়েরমাকার (১২৫০/১৮৩৪), রিটস্ল (১৩০৭/১৮৮৯) এবং অন্যগণ, এমনকি, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ তাদের চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পূর্বাভাষ লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারবেন না। আল-গাযালির সাধারণ অবস্থান সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি মনে করেন, ধর্মের সার্থক ঘটনাবলিকে প্রমাণ কিংবা অপ্রমাণ কোনোটাই করা যায় না। এর ব্যতিক্রম করতে গিয়ে দার্শনিকগণ প্রায়শই ভুলপথে পরিচালিত হয়েছেন।

আল-গাযালি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে বিশটি অভিযোগ আনেন। (সৃষ্টি দিয়ে এর শুরু এবং শেষ বস্তু দিয়ে এর পরিসমাপ্তি)। তিনি এটা দেখাতে চেষ্টা করেন যে, দার্শনিকদের জগতের চিরন্তনতা ও স্থায়িত্বের ধারণা মিথ্যে, আল্লাহ্ জগতের সৃষ্টিকর্তা—তাঁদের এ উক্তি অসত্য—তাঁরা আল্লাহ্র অস্তিত্ব একত্ব সরলতা এবং আল্লাহ্র অশরীরিত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ। সার্বিক অথবা বিশেষ সম্বন্ধে আল্লাহর জ্ঞান, স্বর্গীয় মণ্ডলে আত্মা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত, বিশেষের মণ্ডলীয় জ্ঞান এবং তাদের গতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে দার্শনিকদের ধারণা ভিত্তিহীন। দার্শনিকদের কারণের মতবাদ মিথ্যে, তাঁরা আত্মার আধ্যাত্মিকতা (spiritualaty) প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না এবং এর অমরতা প্রমাণ করতে পারেন না। মৃত্যুর পর দেহের পুনরুত্থানে দার্শনিকদের অস্বীকৃতি তত্ত্বগতভাবেই (Philosophically) অন্যায়। আল-গাযালি তিনটি বিষয়ে দার্শনিকদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করেন : (১) জগতের নিত্যতা, (২) বিশেষ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অস্বীকৃতি, (৩) দৈহিক পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি। অন্যান্য বিষয়ে দার্শনিকদের মতামত প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী অথবা তাদের ধর্মীয় উদাসীনতা ও অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কিন্তু, প্রত্যেকটি বিষয়েই রয়েছে তাদের স্ববিরোধী উক্তি এবং চিন্তার অস্পষ্টতা।

১. জগতের নিত্যতা : আল-গাযালি যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, তা হচ্ছে জগতের নিত্যতা (qidam) প্রশ্নটি। দর্শন ও ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে অত্যন্ত প্রতিবাদী ও আপোষহীন সমস্যা। প্রচলিত ধর্মমতের সমর্থকগণ দার্শনিকদের জগৎ চিরন্তনবাদীকে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক বলে মনে করেন এবং এর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। আল-আশারী (-৩২৪/৯৩৫) তাঁর 'কিতাব আল-ফুসুল' গ্রন্থে এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪০] ইবনে হাজম (৪৫৭/১০৬৪) এ মতবাদকে প্রচলিত ধর্মমত এবং এর বিরোধী ধর্মমত সম্প্রদায়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের বিভেদরেখা বলে বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাসিগণ দার্শনিকদের জগৎ-চিরন্তন মতবাদকে মেনে নিতে পারেন নি। কারণ, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো কিছুই চিরন্তন নয়, আল্লাহ্ ব্যতীত সবই সৃষ্ট (হাদিস)। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো কিছুকে সহ-নিত্য আল্লাহ্‌র পরমত্ব ও চিরন্তন নীতি ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্‌কে কারিগরে পরিণত করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ হচ্ছেন জগৎ নির্মাতা। প্রকৃতপক্ষে, এ মতবাদ একজনকে জড়বাদী পর্যায়ে নিয়ে আসে। কারণ জড়বাদীগণ মনে করেন, জগৎ হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র বিশ্ব-আত্মআশ্রয়ী প্রকৃতি যা নিজের দ্বারাই নিজে বিকশিত হচ্ছে এবং নিজকর্তৃক বোধগম্য (understood) হয়ে উঠেছে। এসব বিষয় গলধঃকরণ আল-গাযালির ন্যায় ধর্মবিদদের পক্ষে সত্যি কঠিন।

সত্যিকার মুসলিম হিসেবে আল-ফারাবি ও ইবনে সিনা স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্ জগতের চিরন্তন স্রষ্টা। কিন্তু আবার সত্যিকার প্যারিপেটিক হিসেবে এটাও উল্লেখ করেন যে, জগৎ যদিও সৃষ্ট তবুও এর কোনো প্রারম্ভ নেই, অর্থাৎ জগৎ চিরন্তন। তাঁরা অ্যারিস্টোটলীয় আদি জড়ের চিরন্তন মতবাদের সাথে জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁদের সমগ্র দার্শনিক মতবাদ প্রয়োগ করেন। আল্লাহ্ এবং জগৎ উভয়ের চিরন্তনত্ব প্রমাণের জন্য তাঁরা বাহ্যত খুব জোরালো যুক্তি প্রদান করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা কতকগুলো মৌলিক ও সুস্পষ্ট ধারণার (assumptions) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; (১) শূন্য থেকে কিছু উদ্ভব হয় না— অন্যকথায়, প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে। (২) কারণ যখন ক্রিয়াশীল থাকে (operation) তাৎক্ষণিভাবে, কার্য উৎপাদিত হয়। (৩) কারণ হচ্ছে কার্য থেকে অন্যকিছু অর্থাৎ কারণ কার্যের বাইরে থাকে। এসব ধারণাকে স্বীকার করে নিলে জগৎ সৃষ্টির নিত্যকার ব্যাপারে আরো অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। এ জগতের অস্তিত্বের জন্য এর একটা কারণ থাকবে। এ কারণটি প্রাকৃতিক কারণ হতে পারে না, কারণ এর পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এ কারণ যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা (will) হয় (যা ধর্মে বিশ্বাস করা হয়) তবে ঐশী ইচ্ছা পূর্বের কোনো কারণ দ্বারা অবশ্যই চালিত হবে। এই পর্ববর্তী কারণ গৃহীত তৃতীয় ধারণা অনুযায়ী অবশ্যই আল্লাহ্‌র বাইরে

www.pathagar.com

থাকতে হবে, কিন্তু পুনরায় আল্লাহ্র বাইরে কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাই আমরা মাত্র দু'টি বিকল্পে যেতে পারি : হয় আল্লাহ্র সত্তা (being of God) থেকে কোনো কিছুর অস্তিত্ব আসে নি। অথবা নিত্য থেকেই জগৎ অস্তিত্বশীল ছিল। প্রথম বিকল্পটি অসম্ভব, কারণ প্রকৃত ও বাস্তবে জগতের অস্তিত্ব রয়েছে। ফলে প্রমাণিত হয় যে, জগৎ চিরন্তন, নিশ্চিতই চিরন্তন আল্লাহ্র চিরন্তন সৃষ্টি হিসেবে।

আল-গাযালি দার্শনিকদের উপরোক্ত যুক্তি খণ্ডনের জন্য তাঁদের তথাকথিত তিনটি ধারণাকে প্রশ্ন করে বসেন। কারণ, তাঁর মতে এদের কোনোটিরই যৌক্তিক অনিবার্যতা (logical necessity) নেই কিংবা এদের সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণনীতি নেই। যৌক্তিক অনিবার্যতা বলতে এই বুঝায় যে, এটা এমন এক বিষয় যার সম্বন্ধে অন্যকিছু বা বিপরীত কিছু ভাবা অসম্ভব। আল্লাহ্র ইচ্ছার কারণ নেই, এটা ভাবা অসম্ভব নয়, যদি এর কারণ থাকতেই হয়, তবে এই কারণ এর বাইরে নয় ভাবা অসম্ভব নয়। সংক্ষেপে, আল্লাহ্র ইচ্ছা মুক্ত স্বাধীন এবং আত্ম-সূচিত (self initated)। দার্শনিকগণ কি নিজেরা আল্লাহ্কে কারণহীন কারণ বলে ঘোষণা করেন নি? অনুরূপে, এটা অনিবার্য নয় যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় আশুক্ষণিকভাবে কার্য উৎপাদন হবে। এটা ভাবা সম্ভব যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় বিলম্বিত কার্য (delayed effect) উৎপাদন হতে পারে, অর্থাৎ কিছুকাল পর কার্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে। আল-গাযালি সেন্ট অগাস্টিনের মতো উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় চিরন্তনতা (eternity), সম্ভাব্যতা এবং জগতের অস্থায়িত্ব ও সৃষ্টি সেই ইচ্ছারই বিষয়বস্তু। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আল্লাহ্ নিত্যভাবেই ইচ্ছা করেছেন যে, আল-ফারাবি এবং ইবনে সিনা এমন সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং একজন আরেকজনের আগে জন্মগ্রহণ করবে। অনুরূপে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন যে, কোনো বিশেষ সময়ে জগৎ অস্তিত্বশীল হবে। ফলে জগতের উৎপত্তি ছিল, অর্থাৎ জগৎ চিরন্তন নয়, প্রচলিত এ বিশ্বাসের স্বীকৃতিতে যুক্তির কোনো লংঘন নেই। অন্যদিকে দার্শনিকদের মতবাদে জগৎ যদিও সৃষ্ট, তবু এ চিরন্তন—এটা একটা যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা, কারণ চিরন্তন সৃষ্টির ধারণা হচ্ছে একটি স্ববিরোধী ধারণা। যা চিরন্তনভাবেই অস্তিত্বশীল তার সৃষ্টির কথা বলার কি কোনো অর্থ হয়?

অধিকন্তু, দেশ ও কাল সম্বন্ধে দার্শনিকগণ ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। তাঁরা কাল অসীম ও দেশ সসীম বলে মনে করেন এবং কাল দেশ ও গতির সাথে সহ-জড়িত বলে ভাবেন। আল-গাযালি যথার্থভাবে উল্লেখ করেন যে, যিনি দেশের সসমত্বে বিশ্বাস করেন, তিনি অনিবার্যভাবেই সসীম কালের অস্তিত্বের কথা ধারণা করতে পারেন, বিশেষ করে দেশ, কাল ও গতি বিষয়ে অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিকোণ থেকে। দেশ, কাল ও গতি সবই একের সাথে অন্য সম্পর্কযুক্ত। তাঁরা যদি বলেন, শূন্য দেশের চিন্তা অসম্ভব, তাঁদের সমভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, শূন্য কালের চিন্তাও অনুরূপভাবে অসম্ভব। অবশ্য শেষপর্যায়ে আল-গাযালি উল্লেখ করেন যে, অন্যান্য বস্তুর ন্যায় দেশ, কাল আল্লাহ্র সৃষ্টি।

দার্শনিক এবং আল-গাযালির মধ্যে অন্য একটি যুক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ, সম্ভাব্য অসম্ভাব্য ও অনিবার্য বিষয়ে এটা দার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সাথে

www.pathagar.com

সম্পর্কিত। সম্ভাব্য ও অনিবার্য একত্রে চিন্তা ও সত্তার সকল প্রকারের (categories) সমগ্রতা (totality) গঠন করে। জগৎ উৎপত্তির পূর্বে, দার্শনিকগণ মনে করেন, জগৎ হয় সম্ভাব্য, অসম্ভাব্য অথবা অনিবার্য হয়ে থাকতে পারে। এমন যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, জগৎ অসম্ভাব্য ছিল না; কারণ যা অসম্ভাব্য তা কখনো অস্তিত্বশীল হয় না, কিন্তু বাস্তবে জগৎ অস্তিত্বশীল। জগৎ আবার অনিবার্যও নয়, কারণ অনিবার্যের অনস্তিত্ব (non-existence) চিন্তায় অসম্ভব এবং জগৎ উৎপত্তির ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব নয়। এখন একমাত্র বিকল্প রয়ে গেল সম্ভাব্যতা। জগৎ উৎপত্তির পূর্বে এটা সর্বদাই সম্ভাব্য ছিল, অন্যথায় জগৎ কখনও অস্তিত্বশীল হতো না। কিন্তু সম্ভাব্যতা হচ্ছে একটি গুণগত (attributive) ধারণা (notion)। এটা কোনো কিছুকে পূর্বে স্বীকার করে নেয়, অর্থাৎ অ্যারিস্টোটলীয় অর্থে দ্রব্যকে স্বীকার করে নেয় যা বাস্তবে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে (in the process of becoming actual)। নিজের মধ্যে সম্ভাব্যতা অস্তিত্বমান (subsisting) অথবা কোনো কিছুতেই সম্ভাব্যতা অস্তিত্বমান নয়, এমন কথা নিশ্চয়ই আমরা বলতে পারি না, কিংবা আল্লাহর মধ্যে সম্ভাব্যতা অস্তিত্বমান একথা বলারও কোনো অর্থ হয় না। তাই জড় ছাড়া সম্ভাব্যতাকে আশ্রয়দানে আর কিছু নেই। জড়ই সম্ভাব্যতাকে আশ্রয় দান করে এবং জড় সম্ভাব্যতাকে ধারণে সক্ষম। এখন জড়ের উৎপত্তি হয়েছে বলা যায় না, কারণএটা ছিল তার অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা যা অস্তিত্বের পূর্বে বিদ্যমান। এবারের শুধু দু'টো বিকল্প রয়েছে : সম্ভাব্যতার মধ্যে সম্ভাব্যতার অস্তিত্ব অথবা জড়ের উৎপত্তি হয়নি। সম্ভাব্যতার মধ্যে সম্ভাব্যতার অস্তিত্ব বোধগম্য নয়—অপরদিকে, জড়ের উৎপত্তি হয়নি একথা বলার অর্থ হচ্ছে শেষপর্যন্ত জড় চিরন্তন বলে স্বীকার করে নেয়া।

আল-গাযালি দার্শনিকদের কূটতর্ক ও যুক্তিকৌশল দ্বারা বিন্দুমাত্র মোহাচ্ছন্ন হন নি। তিনি কান্টের অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, অসম্ভাব্যতার ন্যায় সম্ভাব্যতাও ধারণাগত ধারণা (conceptual notion) যার বাস্তব অনুরূপতার প্রয়োজন নেই। যদিও সম্ভাব্যতার জন্য তা প্রয়োজন। কিন্তুএটা অসম্ভব যে, অসম্ভাব্যতার অনুরূপে এর মূর্ত অস্তিত্ব থাকবে। সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন ধরনের বলে মনে হতে পারে। কারণ, সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে যুক্তির বিধান লংঘন না করে গুণ আশ্রয়ী দ্রব্যের ধারণা করা যেতে পারে। আল-গাযালি নির্দেশ করেন যে, দ্রব্যের ধারণাগত ধারণা এবং এর বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে এক বিরাট ফারাক রয়েছে যা কোনো দার্শনিকের কঠোর-লক্ষরের দ্বারাও ঘুচানো যায় না। এটা অনেকটা আমাদের আধুনিকদের উপস্থাপনার 'মৎস্য কুমারী সাঁতার কাটে'—এ যুক্তিবাক্য থেকে মৎস্য কুমারীর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ন্যায়। এটা তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তির সুস্পষ্ট অনুপপত্তি।

যদিও সম্পূর্ণ কান্টীয় রচনা শৈলী তিনি ব্যবহার করেন নি, তবু তত্ত্ববিষয়ক অনুপপত্তি বিষয়ে আল-গাযালি সচেতন ছিলেন। দার্শনিকদের আড়ম্বরপূর্ণ নির্গমন মতবাদের সমালোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ মতবাদে যদিও একটি অন্যটি থেকে নির্গত হয়; তবু প্রথম বুদ্ধির অন্তর্গত তিন প্রকারের

www.pathagar.com

জ্ঞান থেকে তিন প্রকার বস্তু একেক প্রকার থেকে একটি করে নির্গত হয়। যেহেতু প্রথম বুদ্ধি আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবহিত, তাই এ থেকে দ্বিতীয় নির্গমন ঘটে, এবং যেহেতু দ্বিতীয় বুদ্ধি তার সারসত্তাকে জানে, তাই এর থেকে নির্গত হয় উচ্চতম স্বর্গীয় মণ্ডলের আত্মা এবং যেহেতু কেবল সম্ভাব্য সত্তা হিসেবে এটা নিজেকে জানে; তাই সেখান থেকে নির্গত হয় সেই মণ্ডলের[৪১] দেহ। অন্যান্য বহু বিষয়ে তিনি যা উল্লেখ করেন, এ মতবাদ সম্বন্ধেও তিনি সঠিক মন্তব্য পেশ করেন। কোন ধরনের প্লেটোনিয়ান ম্যাজিকের মাধ্যমে তিনপ্রকার জ্ঞান থেকে তিন প্রকার বাস্তব অস্তিত্ব বের হয়? সর্বোপরি, একটি বুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞাতা কেমন করে কেবল জ্ঞান (mere knowing) থেকে লক্ষ দেয়? আশ্চর্য, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন; "কেউ যদি বলেন তিনি স্বপ্নে এ প্রকার বস্তু দেখেছেন, তাহলে অনুমান করা যায় যে, তিনি কোনো রোগে ভুগছেন।"[৪৩]

দার্শনিকদের উপরে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম বুদ্ধি এবং অনুরূপে পর্যায়ক্রমে নির্গত বুদ্ধিসমূহের জ্ঞানের তিনপ্রকার গুণ দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হলেও আল্লাহ্র জ্ঞান তাঁর স্বীয় মহান আত্মাকে পরিবেষ্টন করে আছে। দার্শনিকদের এ মতবাদ আল্লাহ্ সম্বন্ধে অ্যারিস্টোটলের বর্ণনার অনুরূপ। অ্যারিস্টোটল আল্লাহ্কে চিন্তন (thought) হিসেবে ভেবেছেন যিনি নিজের সম্বন্ধে নিজেই চিন্তা করেন : এটা স্বয়ং সেই চিন্তনই যা চিন্তা করে এবং এর চিন্তন হচ্ছে চিন্তনের উপর চিন্তা (Its thinking is thinking on thinking)।[৪৪] আল-গাযালি বলেন, এটা অদ্ভুত যে কার্য তার কারণকে জানে, কিন্তু কারণ তার কার্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। এ বিষয়ে আরো অধিকতর ব্যাখ্যা আমাদেরকে আল-গাযালি ও দার্শনিকদের মধ্যকার অন্য একটি সংকটজনক দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়; সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র জ্ঞানের পরিধি ও ধরন সম্পর্কিত। এর গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা যায় যে, কোনো বিশেষ মুহূর্তে শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে বলে যদিও আল-গাযালি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ় সমর্থন করেন, তবু তিনি বলেন, আল্লাহ্র সৃজনমূলক ক্রিয়া উপলব্ধি বা ব্যাখ্যা করা কঠিন। কারণ, আমাদের সকল উপলব্ধি ও ব্যাখ্যাকরণ গভীর অর্থে পরিণামে সেই ক্রিয়ারই আজ্ঞাবাহী বা অধীন। সকল দার্শনিক ব্যাখ্যারই পরম পরিণতি রয়েছে এবং শূন্য থেকে সৃষ্টিও এদেরই একটি।

২. বিশেষ সম্পর্কে আল্লাহ্র জ্ঞান : বিশেষ সম্পর্কে আল্লাহ্র জ্ঞান দার্শনিকগণ অস্বীকার করেন। অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহ্র জ্ঞানকে সার্বিক অথবা সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। দার্শনিকদের বিরুদ্ধে আল-গাযালির এ অভিযোগের কোনো ন্যায্যতা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। সম্ভবত আল-গাযালি আল্লাহ্র জ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিকদের প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইবনে সিনা আল্লাহ্র জ্ঞান সব বিশেষকে পরিবেষ্টন করে আছে বলে কিছুতেই অস্বীকার করেন না। তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আল-শিফা' (মেটাফিজিক্স্-viii৬) মন্তব্য করেন যে, "স্বর্গমর্ত্যে" কোনো কিছুই এমনকি বালুকণিকা পর্যন্ত আল্লাহ্র অগোচরে নেই।" তাঁর এ বর্ণনার সাথে পবিত্র আল-কোরআনের আয়াতের সামঞ্জস্য রয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্র নিকট বিশেষকে জানার উপায় স্বয়ং বিশেষ নয়, বরং

www.pathagar.com

সার্বিক; অর্থাৎ এটা প্রত্যক্ষগত নয়, বরং বুদ্ধিগত (retional) ও ধারণাগত (conceptual)। আমরা সাধারণত বিশেষকে যেভাবে জানি এ জানা ঠিক সেভাবে নয়, এ জানা হচ্ছে সার্বিক উপায়ে জানা, অর্থাৎ সাধারণ বস্তু, তাদের নির্ধারিত আকার, তাদের একরূপতা ও বিধানের মাধ্যমে জানা। একজন জ্যোতির্বিদ, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারকার দিকে তাকিয়ে বাস্তবে তারকার গতি-প্রকৃতি (behaviour) জানেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে, গাণিতিক নিয়মের বিশেষ নীতির পরীক্ষার মাধ্যমে তা অবহিত হন। এখানে যে পার্থক্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, তা হচ্ছে, আল্লাহ্র জ্ঞানের প্রকৃতি বা স্বভাব এবং সেই জ্ঞানের বিষয়সমূহ। প্রথমটি, দার্শনিকদের মতে, বিশুদ্ধ-সার্বিকএবং পরবর্তীটি হয় সার্বিক অথবা বিশেষ হতে পারে। দার্শনিকদের সমালোচনাকালে আল-গাযালি এ পার্থক্য কিছুটা উপেক্ষা করেছেন বলে মনে হয়।

বিশেষ সম্পর্কে আল্লাহ্র জ্ঞান বুদ্ধিগত ও ধারণাগত, প্রত্যক্ষগত নয়, দার্শনিকদের এ বক্তব্যের মূল কারণ হচ্ছে প্রত্যক্ষগত জ্ঞান পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। এ পরিবর্তন শুধু প্রত্যক্ষণের মধ্যে নয়, প্রত্যক্ষকারীর মধ্যেও সূচিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ পরিবর্তনের উর্ধ্বে—তিনি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ (is, was and will) সকল পরিবর্তনের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে কালের প্রকার বা ক্যাটাগরিতে আল্লাহ্কে মিশিয়ে ফেলার অর্থ হচ্ছে তাঁর পূর্ণতা পরমত্ব এমনকি একত্বের প্রশ্নে মুখোমুখি হওয়া। মুসলিম হিসেবে মুসলিম দার্শনিকগণ আল্লাহ্র একত্ব বা একত্বের প্রশ্নে আপোষহীন। অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইসলামের এক খোদাবাদের এই মানসিকতাই তাঁদেরকে স্বয়ং চিন্তনের চিন্তন হিসেবে অ্যারিস্টোটলের আল্লাহ্র ধারণায় সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু তাঁরা দৃঢ়তার সাথে এটাও সংযোজন করেন যে, আল্লাহ্র চিন্তন বা তাঁর জ্ঞান, বায়ুতে বিদ্যমান বালুকণায়, বৃক্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাতায় পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, আল্লাহ্ হচ্ছেন সকল অস্তিত্বের ভিত্তি ও প্রধান উৎস। বিশেষ সম্পর্কে আল্লাহ্র জ্ঞানের ব্যাপারে এই হচ্ছে দার্শনিকগণের অভিমত এবং এটা আল-কোরআনের শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই যদি হয়,তবে এটা আশ্চর্যের বিষয়, কেন আল-গাযালি তাদেরকে ধর্মদ্রোহীবলে চিহ্নিত করলেন? সম্ভবত তিনি তাদের ভুল বুঝেছিলেন। সামান্য ভুল বুঝাবুঝি হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু তাদের উপর তাঁর সমালোচনার ভুল প্রয়োগ হয়নি।

অতি উৎসাহের সাথে উল্লেখ করা যায় যে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপর এর প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে আল-গাযালির সমালোচনার প্রধান অংশ কাল বা সময়ের আবর্তে ঘূর্ণিত হয়। দার্শনিকদের মতে, বিশেষ ঘটনা ঘটার সময় আল্লাহ্এই বিশেষ ঘটনাকে জানেন না, তিনি চিরন্তন বা নিত্যকাল থেকেই পূর্বাহ্নে এ সম্বন্ধে অবহিত। তিনি মানব সত্তাকে তাদের বিশেষ এ-ক্ষণ (heres) এবং, সে-ক্ষণ (nows) দ্বারা জানেন না, তিনি তাদের সার্বিক এবং নিত্যভাবেই জানেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জন যখন তার বিশেষত্বের অবস্থান করছে, তখন তিনি জনকে জানেন না, তিনি জনকে জানেন তাঁর নিত্য সর্বজ্ঞতার মাধ্যমে—বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, 'জন-জাতীয়' স্বভাবকে সেটা ধার্মিক বিশ্বাসী অথবা পাপী ধর্মদ্রোহী যাই হোক না কেন। আল্লাহ্ নবিগণকেও অনুরূপভাবে

www.pathagar.com

জানেন। বিশেষ মুহূর্তে নবির আবির্ভাবকাল থেকে নয়, আল্লাহ্ নিত্যকাল থেকেই মোহাম্মদ (সঃ)কে জানতেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অবহিত।

এ বিষয়টি আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং এ ব্যবধান সংযোগহীন অবস্থায়ই থেকে যায়। সংক্ষেপে, এ ব্যবধান হচ্ছে আল্লাহ্র নিত্যতা (eternality) এবং মানুষের অনিত্য বা অস্থায়িত্ব বিষয় সম্পর্কিত। আল্লাহ্ অতিবর্তীরূপে অপরিবর্তনীয় অনন্তরাজ্যে বাস করছেন, অন্যদিকে, মানুষ নিত্য-পরিবর্তন, নিত্য-ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে ভাসমান। আমাদের সকল অভিজ্ঞতা কালে সঞ্চরণশীল, যদিও একাল সজীব প্রবহমান কাল। কিন্তু দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ্র সত্তায় এমন কালের অনুরূপতা নেই। যদি তা-ই হয় তবে ঐশী আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে, যে সম্পর্ক ধর্মের প্রাণ ও আত্মা। আল্লাহ্ যদি অতিবর্তীরূপে নিত্যভাবে মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন তবে তাঁর নিকট ধর্মীয় প্রার্থনা ও যাচঞ্চার কি কোনো অর্থ থাকে? এ ব্যাপারটি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন একটি বিবর্ণ (bleak) ও শীতল চিত্র দান করে যে, হতাশায় আমাদের বলতে ইচ্ছে করে আমাদের নিকট তাঁর অস্তিত্বের তাৎপর্য কি? আল্লাহ্র সাথে সংযোগ ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে পড়ে। আল্লাহ্র জ্ঞান সম্পর্কে এ হচ্ছে দার্শনিকদের করুণ পরিণতি। এ মতবাদ ধর্মের স্নায়ুকেন্দ্র কেটে ফেলে—নিয়ে যায় জীবনের উষ্ণতা এবং সরিয়ে ফেলে স্বয়ং জীবনকে। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এ সুনির্দিষ্ট কারণেই আল-গাযালি দার্শনিকদের ধর্মদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করেন।

অধিকন্তু, একক বিকাশে সকল বিশেষ ঘটনা (বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ) সম্বন্ধে আল্লাহ্র চিরন্তন জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে এসব ঘটনাকে জপমালার গুটিকার ন্যায় কালের সুতা দিয়ে বাঁধা। আল্লাহ্র জ্ঞানের দর্পণে ভবিষ্যৎ ঘটনাসহ সকল ঘটনা অনুক্রমের আকারে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত—এগুলো অনড় ও অপরিবর্তনীয়। এ যেন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ অতীত ঘটনাবলিকে অনুক্রমিক সাজে সজ্জিত করার ন্যায়। স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় যে, এটা আমাদেরকে কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ইচ্ছার স্বাতন্ত্রতা এবং সৃজনমূলক কর্ম করার কোনো অবকাশ নেই, এমনকি, স্বয়ং আল্লাহ্রও নয়। এ গঠন পদ্ধতিতে অলৌকিক কিছু ঘটারও অবকাশ নেই। আপাতত এ হচ্ছে মুসলিম ধর্মতত্ত্বের সনাতন বা প্রচলিত ঐচ্ছিক উপলক্ষবাদী (Voluntaristic occasionalistic) জগৎ মতবাদের বিরুদ্ধে দার্শনিকদের মুক্ত বৌদ্ধিক নিয়ন্ত্রণবাদী (intellectualistic deterministic) জগৎ মতবাদ। মুসলিম ধর্মতত্ত্বের প্রচলিত ঐচ্ছিক প্রয়োজনবাদী জগৎ মতবাদে আল্লাহ্র অসীম শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটার অনুমোদন লাভ করে। দার্শনিকগণ এ ব্যাপারটি উপেক্ষা করেছেন, কারণ আল-গাযালির মতে, তাঁরা তাদের মধ্যে গ্রিক দর্শনের উপর তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মৃত্যুর পর দৈহিক পুনরুত্থানকেও অস্বীকার করার মতো সাহসী হয়েছিলেন।

৩. দৈহিক পুনরুত্থান : দৈহিক পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার বিষয়টি ধর্মতত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে ডি ব্যুওর এটি আলোচনা করেন নি। দৈহিক পুনরুত্থানের

www.pathagar.com

সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আল-গাযালি ও দার্শনিকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এত সহজে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ, এ দ্বন্দ্ব মূলত দু' দার্শনিক মতবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব : অর্থাৎ, জগৎ সম্বন্ধে দার্শনিকদের বৌদ্ধিক নিয়ন্ত্রণবাদী মতবাদ এবং আল-গাযালির ঐচ্ছিক উপলক্ষবাদী মতবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব।

দার্শনিকগণ অবশ্য মানবাত্মার আধ্যাত্মিকতা, ঐক্য ও অমরতার দৃঢ় সমর্থক এবং এ সমর্থনের পেছনে তাঁরা বেশ কিছুসংখ্যক যুক্তি প্রদর্শন করেন যার দশটি আল-গাযালি তার 'তাহাফুতে' উল্লেখ করেছেন। তিনি শেপর্যন্ত কান্টের ন্যায় এটা দেখাতে চেয়েছেন যে, দার্শনিকদের এসব যুক্তি অনিশ্চিত (non-conclusive)।[৪৫] মৃত্যুর পর দৈহিক পুনরুত্থানের ব্যাপারে দার্শনিকগণ স্বীকৃতভাবেই সন্দেহবাদী। এর প্রধান তাৎপর্য হচ্ছে : (১) দেহের পুনরুজ্জীবনের অস্বীকৃতি, (২) দৈহিক সুখ-দুঃখের অস্বীকৃতি। (৩) দৈহিক অর্থে স্বর্গ-নরকের অস্তিত্বে অস্বীকৃতি। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, মৃত্যুর পর জীবন, বিশুদ্ধভাবেই আধ্যাত্মিক এবং স্বর্গ-নরক বা বেহেশত-দোযখ আত্মারই অবস্থামাত্র—এদের স্থানিক অস্তিত্ব নেই। তাঁরা দৈহিক অর্থে মৃত্যুর পর জীবন সংক্রান্ত কোরআনের বহু উদ্ধৃতির স্বীকৃতিদান করেন, কিন্তু এসব ব্যাপারে প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেন এবং মহাগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তাঁদের মতে, এসব উদ্ধৃতির ভাষা প্রতীকী ও রূপক; এদের উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ লোকের বোধগম্যতার জন্য যারা সবকিছু বুঝতে পারেন না। দার্শনিকদের কাজ হচ্ছে ধর্মগ্রন্থের গভীর ও বিশুদ্ধতার অর্থ ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করা।

এসবই হচ্ছে আল-গাযালির মতে, দার্শনিকদের প্রতারণা ও ছলনা। প্রকৃতপক্ষে, দার্শনিকগণ কোরআনের যে সব আয়াত নির্বাচন করেন যা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন করে এবং এসবের উপরই তাঁরা তাঁদের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁদের দৈহিক পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির বিষয়টি প্রধানত দেহ এবং আত্মার প্লটিনিয়ান (Plotinian) দ্বিভাজন (dichotomy) থেকে উদ্ভূত। প্লটিনিয়ান দর্শনে দেহ হচ্ছে আত্মার পূর্ণতা লাভের প্রতিবন্ধক ও বাধা। চিরন্তন সত্য ও প্রজ্ঞার রাজ্যই হচ্ছে আত্মার বাস ও গন্তব্যস্থান। এ রাজ্যে গমন করার জন্য আত্মা সর্বদা উন্মুখ। দর্শনের সার্বিকতায় এবং অমূর্তে আত্মা তার একঝলক সাক্ষাৎ পায় এবং সে তার অতীত স্মৃতি স্মরণ করতে পারে। দেহ হচ্ছে আত্মার মন্দির, এর কবরগাহ ও জেলগৃহ। মৃত্যুর পর দেহ থেকে মুক্তিই হচ্ছে এর প্রথম পুনরুত্থান। তাই পরকালে দেহের সাথে পুনরায় সংযুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা না করে এ জীবনে দেহ দূষণ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার বিশুদ্ধতা অর্জন করা উচিত। দার্শনিকগণ তাঁদের এ মতের সমর্থনে এবং তাদের অবস্থান ব্যাখ্যার জন্য কোরআন ও হাদিস থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেন। কোরআন কি পুনরুত্থানের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধারণা বর্ণনা করেছে না '....মাত্রার দিক থেকে পরকাল অধিক শ্রেষ্ঠতর এবং উৎকর্ষতার দিক থেকেও অধিক শ্রেষ্ঠতর।' (xvii-[২১])? বেহেশতে বস্তু সম্পর্কে নবি (সঃ) কি বলেন নি '... কোনো দৃষ্টি অবলোকন করে নাই, কোনো শ্রবণ শুনে নাই এবং কোনো অন্তর ধারণা করতে পারে না' (বুখারি ৫৯ : ৮)? পুনরায়, কোরআনের আয়াত কি অধিকতর সমর্থন জানায় না কোনো আত্মাই জানে না তাঁর জন্য কি লুক্কায়িত রয়েছে

www.pathagar.com

(অর্থাৎ, বেহেশতবাসীদের জন্য) (xxxii ১৭) এসবই হচ্ছে ধর্মতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সার্থক যুক্তিসমূহ। কিন্তু বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে দেহের পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে আরো শক্তিশালী নঞর্থক যুক্তি রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ : 'কবরে মানুষের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়, অথবা কীট-পতঙ্গ ও পাখির দ্বারা ভক্ষিত হয় এবং পরে রক্তে বা বাষ্পে রূপান্তরিত হয় এবং তারপর শেষে জগতের সকল বস্তুর সাথে একাত্ম হয়ে মিশে যায়। এ দেহের পক্ষে কি পুনরুত্থিত হওয়া সম্ভব? এই অর্থে যে এর সমস্ত মৌলিক অংশ পুনরায় এর মধ্যে একত্রিত হতে পারে না। যা শেষ হয়ে যায় তা কখনই এর অভিন্ন আকারে (Identity) পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে না। দার্শনিকদের এ ধরনের বহু নিরঙ্কুশ কৃত্রিম যুক্তি রয়েছে। আল-গাযালির মতে, এসব যুক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন এগুলো খুব বেশি হলে পরোক্ষভাবে এর অসম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করতে পারে, কিন্তু সেটা হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার।

দার্শনিকদের প্রকৃত সমস্যা নির্ণয় করতে গিয়ে আল-গাযালি উল্লেখ করেন যে, দার্শনিকগণ নিয়ন্ত্রণবাদী জগৎ মতবাদের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং সকল বস্তুর প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা দান করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তারা কার্যকারণ নীতির দ্বারা সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে চান এবং অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতার কথা স্বীকার করেন না। এ বিষয়টি আল-গাযালিকে দার্শনিকদের কার্যকারণ ধারণার সূক্ষ্ম ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করার দিকে ধাবিত করে। আমরা অচিরেই দেখব যে, তাঁর এ বিশ্লেষণের সাথে হিউম এবং মিলের মতবাদের আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য রয়েছে।

ঙ. কার্যকারণ তত্ত্ব

নির্গমন মতবাদে দার্শনিকদের কার্যকারণ তত্ত্ব সম্যকভাবে উল্লেখ করার পর আল-গাযালি এর দু'টো গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশেষভাবে উল্লেখ করেন :

১. কার্যকারণ সম্পর্ক হচ্ছে অনিবার্য সম্পর্ক ; যেখানে কারণ আছে, সেখানে কার্য রয়েছে এবং বিপরীতক্রমে।
২. কার্যকারণ সম্পর্ক হচ্ছে এক থেকে একে ; অনুরূপ কারণ অনুরূপ কার্য উৎপাদন করবে এবং বিপরীতক্রমে।

উপরোল্লিখিত উভয় মতবাদকে আল-গাযালি প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথমটি সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন যে, কার্যকারণের মধ্যে কোনো বাধ্যতামূলক (compelling) অনিবার্য সম্পর্ক নেই।[৪৬] দৃষ্টান্তস্বরূপ, অগ্নি এবং প্রজ্জ্বলন অথবা পানি পান ও তৃষ্ণা নিবারণ এবং আহার ও পরিতৃপ্ততার অনুভূতি। অভিন্নতা (identity) সংশ্লেষে (implication) বৈকল্পিক অথবা ব্যতিহার্য (receprocity) প্রভৃতির মধ্যে আমরা যে যৌক্তিক ধারণা (logical notion) পাই, উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একের সাথে অন্যের সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা তা লক্ষ্য করি না। এখানে একের স্বীকৃতিতে অন্যের স্বীকৃতি বা একের অস্বীকৃতিতে অন্যের অস্বীকৃতি মন নির্দেশমূলক অনিবার্যতার

www.pathagar.com

(imperative necessity) দ্বারা মেনে নিতে বাধ্য (coerced) নয়। একের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে অন্যের অস্তিত্বকে পূর্বানুমান করে না। এ ধরনের ধারণা করা সম্ভব যে, অগ্নি আছে, কিন্তু এটা জ্বলে না, পানি আছে, কিন্তু এটা তৃষ্ণা নিবারণ করে না—এসব ধারণা কোনো বিরুদ্ধ বিরোধিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

এ ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করা দূরের কথা নয়। অগ্নি এবং প্রজ্জ্বলন অথবা পানি পান ও তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে প্রকৃতির ঘটনাবলি এবং প্রকৃতির স্বরূপ, দার্শনিকদের স্বীয় স্বীকৃতি অনুযায়ী অনিবার্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সম্ভাব্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—এর অস্তিত্ব থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। প্রকৃতির দুটো ঘটনা বা কার্যকারণ নামে পরিচিত তা' শুধু সম্ভাব্য (possible) অস্তিত্ব এবং নিজ বৈশিষ্ট্যে (per se) তাদের মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। তাই কারণিক সম্বন্ধ হচ্ছে প্রাকৃতিক অর্থাৎ সম্ভাব্য সম্বন্ধ যৌক্তিকভাবে অনিবার্য সম্বন্ধবিশিষ্ট নয়। যৌক্তিক সম্বন্ধ ভাবের রাজ্যের (sphere of thought) অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কার্যকারণের মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই অনিবার্য সম্বন্ধ দেখতে পাই। কারণ, এটা আমাদের মনে কার্যকারণ ধারণার পুনঃপুনঃ সংযোগ ও অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি থেকে ভাবরাজ্যে স্থানান্তরিত হয়। প্রকৃতির দু'টো পরম্পরাগত ঘটনা যা স্বভাবসিদ্ধভাবে পারস্পরিক বাইরের (external), তাদেরকে পুনঃপুনঃ পর্যবেক্ষণ করার ফলে, আমাদের মনে তারা অভ্যন্তরীণভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। তাই কার্যকারণ সম্বন্ধে যে অনিবার্যতা রয়েছে তা ছদ্ম অনিবার্যতা (pseu-necessity), কারণ এটা মনস্তাত্ত্বিক অনিবার্যতা, যৌক্তিক অনিবার্যতা নয়।

কার্যকারণ বিষয়টি আমাদের স্বীয় মনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত, সুনিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, কার্যকারণের মধ্যকার কোনো আত্মগত সম্পর্ক নেই। কারণ, কার্যকে আমরা সর্বদাই কারণের সাথে ঘটতে দেখি, হয় কারণের সাথে সংযুক্ত হয়ে নতুবা সাক্ষাৎ পরম্পরাগতভাবে, কিন্তু কখনও একে কারণের মধ্য দিয়ে ঘটতে দেখা যায় না। কারণ হয় কার্যের সাথে সহ-অস্তিত্বশীল অথবা এর পূর্বের ঘটনা; কিন্তু এ কখনও কার্যের উৎপাদক নয়। কারণে কোনো ইচ্ছা (will) এবং কর্তা (Agency) আরোপিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, প্রাকৃতিক অস্তিত্বের কোনো কিছুর উপরই এটা আরোপ করা চলে না, এমনকি স্বর্গীয় ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিষয়গুলোও কারণ, তারা সবই প্রাণহীন নির্জীব সত্তা। স্বর্গ-মর্ত্যের সমগ্র ঐকতানে একমাত্র ইচ্ছে হচ্ছে : সর্ববিদ্যমান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। একমাত্র তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর ইচ্ছা করার মনস্থতার মধ্য দিয়েই স্বর্গীয় বস্তু তাদের নিজস্ব কক্ষপথে নড়ে ওঠে এবং ঘটনার প্রাকৃতিক প্রবাহ কারণিক আকারে (causal pattern) নিয়মানুগভাবে একরূপতা (uniform) গ্রহণ করে : অগ্নি জ্বলে ; সূর্যকিরণ দেয়, পানি তৃষ্ণা নিবারণ করে প্রভৃতি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত বায়ুর ধূলি, বৃক্ষের পাতা, গভীর সমুদ্রে মাছের কান্‌খা পর্যন্ত নড়ে না। দার্শনিকগণ কি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন?

অধিকন্তু, কার্যকারণের সম্বন্ধে এক থেকে একে (one to one) নয় যা দার্শনিকগণ ধারণা করে রেখেছেন। তাদের এ ধারণা প্রধানত প্লটোনিয়ান নির্গমনবাদের পূর্ব-ধারণা

www.pathagar.com

থেকে গৃহীত, তাও আবার দ্বৈত অর্থে। কারণ, নিশ্চিতরূপেই একক ঘটনা নয়। এটা একটা যৌগিক বিষয়।এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য উপাদান (factors)—এদের কানো কোনোটি সদর্থক এবং কোনো কোনোটি নঞর্থক। কিন্তু কারণের কার্যকরী প্রক্রিয়া জানতে হলে উভয়ের জ্ঞানই আবশ্যক। একটি সাধারণ ঘটনা, যেমন একটি বস্তুকে দেখা—এটিও একটি জটিল ব্যাপার, কারণএ দেখার কাজটি নির্ভর করে আছে দৃষ্টিশক্তি, আলোর উপর ধূলিকণা ও ধূম্রের অনুপস্থিতির উপর এবং আমাদের নিকট থেকে বস্তুর দূরত্ব ও ব্যবধান এবং পরিমাণ এবং আকার প্রভৃতির উপর। আরো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, কার্য একক কারণের ফলশ্রুতি নয়, এটা বহু কারণের ফলশ্রুতি। একই কার্য অসংখ্য বিভিন্ন কারণদ্বারা সংঘটিত হতে পারে—এ সংখ্যাগুলোও আবার আমরা যা পর্যবেক্ষণ করছি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ আমাদের পর্যবেক্ষণও সীমিত ও সীমাবদ্ধ। যাঁরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম তাঁদের মতে, আল-গাযালির উপরোক্ত বিশ্লেষণ মানবচিন্তার ইতিহাসে এক অতি মৌলিক অবদান। তিনি এটা গ্রহণ করেছেন অসাধারণ ও অলৌকিক সম্ভাব্যতার প্রমাণের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ অন্যবস্তুর সঙ্গে পরকালে দৈহিক পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা নিয়ে। এ কারণে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এটা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কার্যকারণ প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সম্ভাব্যতার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, এটা অনিবার্য কিংবা অসম্ভাব্যতার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় (not that of necessity nor the cause of impossibility)। কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্ক যৌক্তিক সৃষ্টিকরণ (logical implication) বা তার নিজস্ব ক্রিয়া (agency) বা ইচ্ছার মাধ্যমে কার্য উৎপাদন করতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছার মাধ্যমেই কার্য উৎপাদিত হয় যা বিশ্বব্যাপী ক্রিয়াশীল। কারণ, অত্যন্ত জটিল ঘটনা, শুধু তাদের যৌগিক স্বভাবের জন্য নয় বরং অধিকতররূপে এবং বিশেষ করে কারণ বহুত্ব হওয়ার জন্য। কারণ বহুত্ব হওয়ার ফলে শুধু একটি বিশেষ কারণকে অস্বীকার করে একটি কার্যকে অস্বীকার করা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। যে পর্যন্ত না আমরা বিভিন্ন কারণ, প্রকৃতপক্ষে সকল সম্ভাব্যকারণ, অস্বীকার করছি, সে পর্যন্ত একটি কার্যকে অস্বীকার করা যৌক্তিকভাবে সম্ভব নয়। শেষে সম্ভাব্যতার ব্যাপারটি বাস্তবেই অসম্ভব। কার্যজগতের একটি কার্যের সকল কারণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়—সে যতই মেধাসম্পন্ন হোক না কেন। বিশ্ব-কৌষিক (Encyclopaedic) প্রতিভাসম্পন্ন ইবনে সিনা এবং অ্যারিস্টোটলের পক্ষেও একটা কার্যের পূর্ণ ও সমগ্র কারণসমূহ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আত্ম-আরোপিত বিরুদ্ধ-বিরোধিতার নিয়ম ব্যতীত আল্লাহ্র ইচ্ছাই সকল প্রকার যৌক্তিক সম্ভাবনা ঘটাতে পারে—এমনকি, পরকালে দৈহিক পুনরুত্থানের চেয়ে আরো আশ্চর্যজনক ও রহস্যমূলক ঘটনা ঘটাতে পারে। যেমন 'মানব সংবেদনশীলতা বোধ পরিহার' (Elude the descernment of human sensibility)। আল্লাহ্র শক্তি সকল প্রকার যৌক্তিক সম্ভাব্যতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যেমন দণ্ডকে সর্পে পরিণত করা অথবা মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা। একই কারণে পরকালে দৈহিক পুনুরুত্থান ঘটানো এবং কোরআনে[৪৭] বর্ণিত বেহেশত-দোযখের সকল বিষয় ঘটানোও আল্লাহ্র পক্ষে

www.pathagar.com

অসম্ভব নয়। এদেরকে অস্বীকার করার অর্থ অযৌক্তিক ও অধর্মীয় (Irreligious) উভয়ই। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন আল-গাযালির মতে শুধু অলৌকিক ঘটনাবলিই প্রাকৃতিক নয় বরং সমস্ত প্রকৃতিই অলৌকিক (miraculous)[৪৮]। যাই হোক, প্রকৃতি কারণের নিয়ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ্ অলৌকিক ঘটনার দ্বারা প্রবহমান ঘটনার মধ্যে সাধারণত বাধা সৃষ্টি করেন না—এটা সম্ভব যে প্রয়োজনবোধে তিনি যে কোনো মুহূর্তে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির ঘটনাবলি সম্বন্ধে একজনকে সন্দেহবাদী করে তুলতে পারে এবং সমভাবে সকল বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ বিরাজমান এই অর্থে একজনকে সূক্ষ্ম রহস্য বা মরমিবাদী করে তুলতে পারে। এ প্রকার সংশয়বাদ এবং মরমিবাদ সর্বদাই বিরোধাভাসমূলক (antithetical) নয়—প্রথমটি পরবর্তীটিতে পরিচালিত করতে পারে এবং আল-গাযালির ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা ঘটেছে।

চ. সুফিবাদ

১. সূচনা : দর্শনের মোহমুক্তি ঘটার পর এবং স্কলাসটিকস ধর্মতত্ত্বের প্রতি অতৃপ্তিবোধের কারণে আল-গাযালি শেষপর্যন্ত সুফি রহস্যবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন একথা বলা সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। এটা সত্যের একটা অংশ বটে। এ ব্যাপারে 'মুনকিদে' তাঁর স্বকীয় স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য প্রকৃত ঘটনার চেয়ে বরং অতিরঞ্জিত বলে প্রতীয়মান হয়। শিশু অবস্থা থেকেই তাঁর মনে সর্বদা সুফি প্রভাব কাজ করে আসছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, তাঁর পিতা একজন ধর্মপরায়ণ দরবেশ ছিলেন এবং তাঁর অভিভাবক ছিলেন একজন সুফি সাধক এবং যৌবনে তিনি তুসে প্রথমে ইউসুফ আল-নাসাজ এবং পরে নিশাপুরে আল-ফারমাদি-এর অধীনে শিক্ষা লাভ করেন।[৪৯]। এমনকি তিনি সুফিবাদে প্রায়োগিক অনুশীলনও করেন। তাঁর স্বীয় ভ্রাতা আহমেদ আল-গাযালি (৫২০/১১২৬) একজন প্রসিদ্ধ সুফি হিসেবে পরিচিত লাভ করেছিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি ইমাম আল-হারামাইন এবং প্রখ্যাত সুফি আবু নায়েম আল-ইসফাইহানি (৪৩০/১০৩৮)-এর শিষ্য ছিলেন। তাই আল-গাযালির সুফি-জীবন গ্রহণ বাস্তবে এসব আদি প্রভাবেরই ধারাবাহিকতা। এটা ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যাবলির দার্শনিক সমাধানের ব্যর্থতারই পরিণাম নয়। গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা যায় যে, দর্শনে তাঁর প্রকাশ্য আনুষ্ঠানিক প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও দর্শনকে তিনি কখনও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। ধর্মতত্ত্বের ন্যায় দর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের দ্বারা তাঁর সুফি রহস্যবাদ প্রভাবিত হয়েছিল। সুফি গূঢ়বাদের শেষ বিকাশে তাঁর মধ্যে ছিল দার্শনিকদের ও ধর্মবিদদের মরমিবাদ-এর পূর্ণ প্রভাব।

তাঁর মরমি মতবাদে হেলেনীয় ভাবধারা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়, এমন কি নব্য প্লেটোবাদের আভাসও পরিলক্ষিত। যদিও কূটাভাসিক তবু প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের আওতায় উভয়ই এর মধ্যে অবস্থান করে। নিশ্চিতরূপেই তাঁর ছিল উদারধর্মী মরমিবাদ। তিনি সতর্কভাবে সর্বখোদাবাদীর সকল প্রকার অতিরঞ্জন পরিহার এবং উন্মত্ত সুফিদের নীতিবিরোধী প্রবণতার কঠোর সমালোচনা করেন। একদিকে তিনি

www.pathagar.com

মরমিবাদকে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং অন্যদিকে, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে গূঢ়াত্মক করার প্রয়াস চালিয়েছেন। দার্শনিক এবং স্কলাসটিকস্ ধর্মবিদদের নিকট তিনি এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, সকল প্রকার ধর্মীয় নিশ্চয়তার মূল হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আল্লাহ্ অভিজ্ঞতা। তিনি অবশ্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপের মধ্যদিয়ে ইসলামের আইন ও মতবাদকে প্রাণশক্তি দান করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর প্রখ্যাত ইহয়্যা উলুম আল-দীন[৫০] (ধর্মবিজ্ঞানের পুনর্জীবন) গ্রন্থে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। উক্ত গ্রন্থ আল-গাযালির রহস্যমূলক শিক্ষা সকল শ্রেণীর লোকের পাঠের উদ্দেশ্যে রচিত। তবে একে অধ্যয়ন করতে হলে তাঁর অন্যগ্রন্থ যেখানে তাঁর সুফি মতবাদ বিশেষ আলোচিত হয়েছে, তা পাঠ করা উচিত। অন্যগ্রন্থ হচ্ছে 'মিশকাত আল' আনওয়ার' 'আল-মারিফ আল-আকালিয়া' এবং 'মুকাশাফাত আল কুলুব' এবং অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে যে মতবাদ পরিব্যক্ত হয়েছে তাকে দিব্যজ্ঞানমূলক মরমিবাদ (theo-sophical mysticism) বলে আখ্যায়িত করা যায়। আল্লাহ্ এবং মানবাত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে আল-গাযালির সুনির্দিষ্ট অভিমত না জানলে এসব গ্রন্থের আলোচনা যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ এবং আত্মা সম্বন্ধে আল-গাযালির রহস্যাত্মক মতবাদ যা বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় তা সম্যকভাবে জানতে গেলে অন্য দার্শনিকগণের অর্থাৎ আল-ফারাবি, ইবনে সিনা এবং তাঁদের অনুসারীদের আল্লাহ্ এবং আত্মা সম্বন্ধে তাদের কিরূপ ধারণা ছিল তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

২. আল্লাহ্ : দার্শনিকগণ বিশেষভাবে আল্লাহ্র একত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আল্লাহ্র উপর সদর্থক কিছু আরোপ করা যায় না। কারণ, তাহলে এটা আমাদেরকে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের দ্বৈতবাদে পরিচালিত করবে। এমনকি শুধু অস্তিত্ব প্রশ্নটি তাঁর প্রসঙ্গে টানা যাবে। তিনি সকল পার্থক্য ও চিন্তার সকল ক্যাটিগরী (all the categories) উর্ধ্বে। সকল গুণ বিবর্জিত একত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আল্লাহকে কেবল আধেয়হীন (contentless) শূন্যগর্ভে পরিণত করে। তিনি হয়ে ওঠেন অনির্বচনীয়, অবর্ণনীয় ও অবিধেয়ক কোনো কিছু। এ হচ্ছে দার্শনিকদের এক খোদাবাদী রূপান্তরবাদের (reductionism) দ্বান্দ্বিকতা বা যুক্তিকৌশলের (dialectic) ফলশ্রুতি। অ্যারিস্টৌটলের অনুসরণে কোনো কোনো দার্শনিক আল্লাহ্কে চিন্তনের চিন্তন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি যা জানেন তা তাঁর সত্তার অত্যুজ্জ্বল (over effulgence) থেকে নির্গত হয়, কিন্তু সার্থকভাবে তিনি কিছু ইচ্ছা করেন না, কারণ ইচ্ছা করার অর্থ হচ্ছে অভাববোধ—একটা অসম্পূর্ণতা। তিনি কেবল স্বয়ং তাঁকে জানেন, খুব বেশি হলে তাঁর প্রথম নির্গমন—প্রথম বুদ্ধিকে জানেন এবং এভাবে তিনি পরিবর্তনশীল ও বহুতা জগতের সম্পূর্ণ অতিবর্তী হয়ে যান।

দার্শনিকদের ন্যায় আল-গাযালিও আল্লাহ্র একত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আল্লাহ্ হচ্ছেন একমাত্র অস্তিত্বশীল, সকল সত্তার আদিকারণ ও ভিত্তি—একমাত্র আত্ম-আশ্রয়ী সত্তা। তিনি সত্তার পূর্ণতার অধিকারী, কোরআনে উল্লেখিত সকল গুণাবলি তাঁর মধ্যে সহজাত (inherent)। এ সহজাতের নমুনা (modality) প্রাজ্ঞিকভাবে

www.pathagar.com

অজ্ঞেয়। আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তাঁর সকল গুণাবলি হচ্ছে আধ্যাত্মিক (spiritual), তিনি পূর্ণ শুভ, পূর্ণ সৌন্দর্য; তিনি প্রেমের প্রধান বিষয়, তিনি আলোর আলো, তিনি নিত্য বিজ্ঞতা, সৃজনমূলক সত্য এবং সর্বোপরি তিনি চিরন্তন শাশ্বত ইচ্ছা।

দার্শনিকদের নিকট আল্লাহ্ প্রধানত চিন্তন বা বুদ্ধি, কিন্তু আল-গাযালির নিকট আল্লাহ্ মূলত একটি ইচ্ছা যা সৃষ্টির কারণ। প্রথম বা আদিসত্তা (First Principle) হচ্ছে, তিনি বলেন, এক সর্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময় কর্তা, তিনি যা ইচ্ছে করেন তা-ই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা-ই নির্দেশ দেন এবং তিনি যেরূপ ইচ্ছা সে-ই মোতবেক সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু একইভাবে সৃষ্টি করেন" ।[৫১] তাই দেখা যায়, আদিসত্তা হচ্ছে ইচ্ছে। স্বর্গের সমগ্র সূত্র এবং মর্তের সমগ্র সামগ্রী সবই হচ্ছে তাঁর প্রত্যক্ষ বা সরাসরি কাজ যা কেবল "হও" শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ শূন্য থেকে সৃষ্ট। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মাধ্যমেই এ বিশ্বজগৎ সৃষ্ট, রক্ষিত এবং এ ইচ্ছার মাধ্যমেই এর বিনাশ বা বিলয় ঘটবে। দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ্ জগৎ হওয়া ইচ্ছে করেছেন, কারণ তিনি এর চিন্তা করেছেন। আল-গাযালির মতে, জগতের অবগতি বা জ্ঞান (cognigence) আল্লাহ্‌র কাছে, কারণ তিনি একে ইচ্ছে করেন এবং তাঁর ইচ্ছার মধ্যে এটা অন্তর্নিহিত ।[৫২]

দার্শনিকদের ন্যায় আল-গাযালি আল্লাহ্‌র অতিবর্তীতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দেশ-কালের সীমাবদ্ধতার অতীত ও ঊর্ধ্বে। কারণ, তিনি দেশ-কালের সৃষ্টিকর্তা। তিনি দেশ ও কালের অস্তিত্বের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি আবার দেশ-কালের বিন্যাসের মধ্যেও অন্তর্ব্যাপী হয়ে আছেন। তাঁর শাশ্বত বিজ্ঞতা ও পরম সৌন্দর্য তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়ে ও মহত্ত্বে নিজেদেরকে প্রকাশ করছে। তাঁর চিরন্তন ইচ্ছা বিশ্বজগতের প্রকাশের মধ্য দিয়ে ক্রিয়ারত, এ ইচ্ছা চন্দ্র-সূর্যের সঞ্চালনের, দিবারাত্রির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। চতুর্দিকে রয়েছে তাঁরই স্পর্শ, তাঁরই ছোঁয়া তাঁরই সৃষ্টিকর্ম ।[৫৩] আল-গাযালির আল্লাহ্ দার্শনিকদের পরম সত্তা নন যিনি বিবর্ন (bleak) এবং শীতল, তাঁর আল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সজীব—প্রাণবন্ত আল্লাহ্। তিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসা সম্ভব করে তুলেন, বিশেষ করে, রহস্যাত্মক জ্ঞানের আশীর্বাদে পুষ্ট সাধকগণ তাঁর আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করে থাকেন।

৩. আল-গাযালির আত্মা-সম্পর্কীয় মতবাদ : আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে আল-গাযালি ও দার্শনিকদের মধ্যকার পার্থক্য এত বেশি সুস্পষ্ট নয়। তিনি কান্টের ন্যায় দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন যে, দার্শনিকগণ তাঁদের প্রাজ্ঞিক যুক্তির দ্বারা মানব আত্মার আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃত অস্তিত্ব, ঐক্য ও অমরতাকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারেন না। এ বিষয়ে দার্শনিকদের উপর তাঁর আক্রমণ কান্টের ন্যায় [৫৪] তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক কিন্তু, সম্ভবত অধিকতর উগ্র। তিনি বাস্তবে এক এক করে দশটি যুক্তি খণ্ডন (smash) করেন সেই সমশক্তিতেই যার দ্বারা দার্শনিকগণ তাঁদের মতবাদের পক্ষে যুক্তিগুলো দাঁড় করিয়েছেন। আবার কান্টের ন্যায়ই তিনি তাঁদের মূল অবস্থানের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন নি, ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন 'তাঁদের পদ্ধতির' (method)-এর ব্যাপারে। কোনো কোনো স্কলাসটিক্স ধর্মবিদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে তিনি দার্শনিকদের সাথে

www.pathagar.com

সংযুক্তও হয়েছিলেন, বিশেষ করে, তাঁদের আত্মা সম্পর্কীয় যুক্তি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে। স্কলাসটিক্স ধর্মবিদগণ উল্লেখ করেন যে, আত্মা হচ্ছে একটা সূক্ষ্মদেহ অথবা একটি আকস্মিক ঘটনা এবং এটা দ্রব্য নয়[৫৬] (not a substance)। দার্শনিকগণ স্কলাসটিক্স ধর্মবিদদের এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং আল-গাযালিও তা' সমর্থন করেন। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, সত্তার রাজ্যে আত্মার স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে আল-গাযালি নব্য প্লেটোনিকদের ভাষায় কথা বলেন। তাঁর বিশ্বতত্ত্ব ত্রয়ী : (১) ঐশী জগৎ (আলম-আল-মালাকুত), (২) স্বর্গীয় বা মধ্যবর্তী জগৎ (আলম আল-জাবারুত) এবং (৩) জড়ীয় বা অবভাসিক জগতে (আলম-আল-মূলক-ওয়া-আল সাহাদা) এ প্লটিনাসের সার্বিক মন, সার্বিক আত্মা ও সার্বিক জড়ের [৫৭] অনুরূপ ও সমান্তরাল। প্লটিনাসের মতো তিনিও উল্লেখ করেন যে, মানবাত্মা আল-আল-জাবারুতে অন্তর্ভুক্ত। মানবাত্মা উভয় জগতে অংশগ্রহণ করে।

মানবাত্মা সম্পর্কে আল-গাযালির ধারণা কোরআন ও হাদিস শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। কৌতূহলের বিষয় এই যে, আল-গাযালির এই ধারণা তাঁর আল্লাহ্ সম্পর্কীয় ধারণার সমান্তরাল। আত্মা, আল্লাহ্র ন্যায়ই একটা ঐক্য এবং তাঁর ন্যায়ই প্রধানত ও মূলত একটি ইচ্ছাশক্তি। অধিকন্তু, আল্লাহ্ জগতের অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী উভয়ই। "মানুষ আল্লাহ্র প্রতিবিম্বে সৃষ্ট"[৫৮] এ হচ্ছে নবি (সঃ)-এর হাদিস এবং কোরআনে দু'বার উক্ত হয়েছে যে "আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় আত্মা মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়েছেন'।[৫৯] আত্মা হচ্ছে একটি দর্পণ যা ঐশী আলোকচ্ছটা দ্বারা উদ্ভাসিত এবং যার মধ্যে আল্লাহ্র গুণাবলি এমনকি, সারসত্তা প্রতিফলিত। "মানব গুণাবলিই শুধু" আল-গাযালি বলেন, "আল্লাহ্র গুণাবলি প্রতিফলন নয়, মানবাত্মার অস্তিত্বের ধরনও (mode) আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধরনের (mode) গভীরে প্রবেশ করার প্রয়াস চালায় ..." আত্ম-জ্ঞানই আল্লাহ্র জ্ঞানের চাবিকাঠি। হাদিসে প্রায়শ উদ্ধৃতি "যে নিজেকে জানে সে তার প্রভুকে জানে।" আল্লাহ্ এবং আত্মা উভয়ই, আল-গাযালি বলেন, "অদৃশ্য অবিভাজ্য এবং দেশ ও কালের সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়"; তারা গুণ ও পরিমাণের ক্যাটিগরীর (categories) বাইরে; আকার, রং বা আকৃতির ধারণা তাদের মধ্যে সেঁটে[৬০] দেওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয়-জগতের সবকিছু থেকে মানবাত্মা স্বতন্ত্র। জগৎ দু'প্রকার—নির্দেশের (আমর) জগৎ এবং সৃষ্ট (খালক) জগৎ।[৬১] পরিমাণ ও দিক বঞ্চিত সবকিছুই নির্দেশের জগতের অন্তর্ভুক্ত। আত্মা নির্দেশের জগতের অন্তর্ভুক্ত কারণ, এটা আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে আগত। "বলুন আত্মা হচ্ছে আমার প্রভুর নির্দেশ"—[৬২] এ ছিল নবি (সঃ) এর প্রতি আল্লাহ্র শিক্ষা। এ নির্দেশের জগৎই সৃষ্ট-জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। নির্দেশ হচ্ছে ঐশীশক্তি যা জগৎকে নিয়ন্ত্রণ ও দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। আত্মা হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্তা, এর স্বকীয় জীবন আছে। এটা দেহকে প্রাণশক্তি দান করে, দেহকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। দেহ হচ্ছে আত্মার হাতিয়ার, আত্মার বাহন। আল্লাহ্ হচ্ছে প্রধানত ইচ্ছাশক্তি, মানুষ বিশেষ করে এ ইচ্ছাশক্তির অর্থে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত। আমি ইচ্ছা করি, তাই আমি অস্তিত্বশীল (volo ergo sum)। এ নীতির উপর আল-গাযালি তাঁর রহস্যাত্মক

www.pathagar.com

মনোবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা গড়ে তোলেন। আত্মার মৌলিক উপাদান চিন্তন নয়, যা শেষ বিশ্লেষণে দৈহিক প্রত্যক্ষণ ও চিন্তনের আকারের (categories) উপর নির্ভরশীল। আত্মার মূল উপাদান হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, আল্লাহ্র ইচ্ছাশক্তি দৈহিক প্রত্যক্ষণ ও চিন্তনের প্রকার উভয়কেই নিজ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন। স্বয়ং মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা এবং মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং নিজেকে মনের এবং আল্লাহ্র ইচ্ছার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে আসতে পারে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ বলেছেন : "হে প্রশান্তিময় আত্মা, তোমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তোমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব, তোমরা প্রবেশ কর, আমার ইবাদতকারীদের সাথে আমার বাগানে, আমার বেহেশতে।"[৬৩] একজন শেখের (Sheikh) নির্দেশনায় সুফিপথ অবলম্বনে আত্মা তার স্বকীয় সম্ভাবনার বিকাশে এবং এর অন্তঃস্থ আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তির মাধ্যমে শেষপর্যন্ত আল্লাহ্র সাক্ষাৎ মুখোমুখি হয় এবং এটাই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত সারসত্তা গঠন করে।

ছ. গুরুত্ব ও প্রভাব

ভুবনবিখ্যাত আল-গাযালির নাম বিশ্ব ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায়। মুসলিম বিশ্বে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম, প্রভাব গভীর ও ব্যাপক উভয়ই। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ওসেনিয়া পর্যন্ত বহু মুসলিম লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। কালের আবর্তে এসব লেখা আজ প্রায় সবই বিলুপ্ত কিন্তু আল-গাযালির রচনাবলি মুসলিম সমাজে আজো সাদরে পাঠ করা হচ্ছে। ধর্মবিদ হিসেবে তাঁর শিক্ষা তাঁর প্রণীত বিধিমালা, সমাজজীবন তথা সমগ্রজীবনের জন্য রচিত তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক 'ইহয়্যা-উল-উলুম' প্রতিটি মুসলিম গৃহে শোভা পাচ্ছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা হয় "মুসলিম সমাজে এককভাবে আল-গাযালির প্রভাব, সম্ভবত অন্য যে কোনো মুসলিম স্কলাসটিক্স ধর্মবিদের চেয়ে অনেক বেশি।"

স্কলাসটিক্স ধর্মতত্ত্ব ও মরমিবাদের যেগসূত্র হিসেবে এবং মুসলিম চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য আল-গাযালি মুসলিম দর্শনে এক অনন্য স্থান দখল করে আছেন। আল-গাযালির শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, ডেকার্ট থেকে শুরু করে বার্গসঁ পর্যন্ত সমগ্র পাশ্চাত্যের দর্শনের প্রধান প্রধান বিষয় তিনি পূর্বাহ্নেই আলোচনা করে গেছেন। জর্জ হেনরি লিউস তাঁর দর্শনের ইতিহাসে উল্লেখ করেন, "এ গ্রন্থ (ইহয়্যা) ডেকার্টের (Discourse our la Methode)-এর সাথে এতই সাদৃশ্যপূর্ণ যে, যদি ডেকার্টকালীন সময়ে এর কোনো অনুবাদ থাকত তবে একে রচনার চৌর্যাপরাধ বলে অভিহিত করা যেত।" এখানে উল্লেখ্য যে, ডেকার্টের বহুপূর্বেই আরব দর্শন পাশ্চাত্যে প্রবেশ করে এবং আল-গাযালির রচনা অংশত মধ্য দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে ল্যাটিনে অনূদিত হয়ে ইহুদি ও ক্রিশ্চান স্কলাসটিসিজমে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। ডেকার্টের বহুপূর্বে তাঁর সংশয়বাদ জেহুদা জাল লেভী (মৃঃ ১১৪৫) কর্তৃক গৃহীত হয়। তিনি তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'চৌসারী' এ সংশয়বাদ ব্যক্ত করেন এবং এটা ক্রেসকাসের (মৃ. ১৪১০) উপর প্রভাব

www.pathagar.com

বিস্তার করে। চিন্তার এ স্রোতধারা ইহুদি ও ক্রিশ্চান স্কলাসটিসিজমে ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে।

যাই হোক, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক রেনে ডেকার্টের দর্শন ও পদ্ধতির সাথে আল-গাযালির দর্শন ও পদ্ধতির অপূর্ব, বলতে গেলে সমান্তরাল সাদৃশ্য বিদ্যমান। আল-গাযালি ও ডেকার্ট উভয়েই প্রাধিকার (authority) ঐতিহ্য ও প্রথাগত বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করেন। এসব বিশ্বাসের প্রভাবমুক্ত হয়ে মানুষের মৌলিক স্বভাব (original disposition) আবিষ্কার করা উভয়েরই লক্ষ্য। গোড়া থেকে সমগ্র জ্ঞানের সৌধ নির্মাণ উভয়েরই প্রত্যাশা। নিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধানে উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ অস্বীকার করেন। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার ত্রুটির দৃষ্টান্ত ও ভাষার ব্যবহার উভয়েরই অভিন্ন। উভয়েই উপলব্ধি করেন যে, জাগ্রত অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নদেখা অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য কোনো চূড়ান্ত পদ্ধতি নেই। তাই উভয়ের চিন্তা এই যে, মনে যা প্রবেশ করে তা স্বপ্ন বৈ কিছু নয়। এ হচ্ছে "কোনো বস্তুর অবভাস (appearances), স্বগত বস্তু নয়"। উভয়েই সত্য আবিষ্কারের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। উভয়েরই পদ্ধতি অনুরূপ, এমনকি, ভাষা পর্যন্তও। আল-গাযালির 'মুনকিদ' এবং ডেকার্টের 'ডিসকোর্স' এতই সাদৃশ্যপূর্ণ যে, একে আকস্মিক সামঞ্জস্য বলে অভিহিত করা যায় না। এ দু'গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রামাণিক তথ্য এত সমৃদ্ধ যে, ডেকার্টের উপর আল-গাযালির প্রভাবকে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ থাকে না। বাহ্যিক প্রমাণেরও অভাব নেই। ডেকার্ট স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের সাধারণ পরিকল্পনার জন্য বহু উজ্জ্বল প্রতিভাবান (fine intellect)-এর ঋণ স্বীকার করেন যাঁরা পূর্বেই এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উজ্জ্বল প্রতিভাবানের নাম উল্লেখ না করলেও এটা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, আল-গাযালি তাঁর 'মুনকিদ' পরিকল্পনার পূর্বে এ ধরনের হুবহু পরিকল্পনা তাঁর পূর্ববর্তী অন্য কারোর দ্বারা রচিত হয় নি।

জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট-এর উপর আল-গাযালির প্রভাবও এখন সুস্পষ্ট। জগতের এ দু'বিখ্যাত দার্শনিকের মধ্যে চিন্তা ও ভাবধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। কান্ট যেখানে হিউমের সংশয়বাদ দ্বারা জাগ্রত, আল-গাযালি সেখানে নিজের সংশয়বাদ দ্বারা জাগ্রত। আল-গাযালির 'দার্শনিকদের বিনাশ' গ্রন্থটি কান্টের 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার'-এর সাথে তুলনীয়, বিশেষ করে, এর ভাবের দিক থেকে। উভয় গ্রন্থই মানব প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধ মতবাদের জন্য ইকবাল কান্ট এবং আল-গাযালি উভয়কে অভিযুক্ত করেন। কান্ট এবং আল-গাযালি উভয়েই অনুধ্যানপরায়ণ চিন্তা বা তাত্ত্বিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে দার্শনিকদের আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আত্মা ও আত্মার অমরতা প্রমাণ অসম্ভব বলে মনে করেন। আল-গাযালি কান্টের ন্যায়ই ঐশী-এলাকার প্রজ্ঞার অসমর্থতার কথা নির্দেশ করেন। কান্ট তাঁর ব্যবহারিক প্রজ্ঞার বিচার এবং প্রজ্ঞার সীমানার মধ্যে ধর্মগ্রন্থে দার্শনিক আচ্ছাদনে বহু ধর্মীয়বিষয় পুনর্ব্যক্ত করেন। আল-গাযালিও মরমি-আবরণে অনুরূপভাবে তাঁর গঠনমূলক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। উভয়ের চিন্তা গঠনের ভিত্তি ছিল গভীর ধর্মবোধ, কান্টের ক্ষেত্রে এ ছিল প্রচ্ছন্ন, আল-গাযালির ক্ষেত্রে প্রকাশিত। একজনের ক্ষেত্রে এটা ছিল ক্রিশ্চান ধর্মের অনুরূপ, অন্যজনের ক্ষেত্রে এটা ছিল ইসলাম ধর্মের অনুরূপ।

www.pathagar.com

উভয়ের মধ্যে যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সংমিশ্রণ ছিল। কান্টের অভিজ্ঞতাবাদ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও নৈতিক চৈতন্যের স্তরে ছিল। আল-গাযালির অভিজ্ঞতাবাদ মূলত মরমীয় অভিজ্ঞতার স্তরে ছিল। পরম সত্তাকে জানার জন্য উভয়েই জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে মানুষের নৈতিক স্বভাব এবং নৈতিক ইচ্ছার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। "আমি চিন্তা করি তাই আমি অস্তিত্বশীল"—এ নীতির পরিবর্তে "আমি ইচ্ছা করি তাই আমি অস্তিত্বশীল" এ নীতিতে কান্ট ও আল-গাযালি উভয়েই বিশ্বাসী। কান্টীয় পদ্ধতি ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য মতবাদ প্রচ্ছন্ন থাকলেও সোপেনাহাওয়ার, হার্টম্যান ও নীটশের ভাবধারার দ্বারা এটা যে বিকশিত হয়েছিল তা' অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে আল-গাযালির ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য মতবাদ প্রকাশ্যেই আলোচিত হয়েছে।

কান্টের ন্যায় আল-গাযালি ধর্ম এবং দর্শনকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন। কান্ট এবং আল-গাযালি উভয়ের মতে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের সত্যেই আমরা নৈতিক নিশ্চয়তা (moral certainity) লাভ করি। বার্গসঁ, জেকোবি, স্লিয়ের মেকারের ন্যায় আল-গাযালি স্বজ্ঞা বা সাক্ষাৎ চৈতন্যকে (immediate consciousness) জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন।

এককথায়, "ডেকার্টের সংশয় পদ্ধতি, হিউমের কার্যকারণ তত্ত্ব, কান্টের দেশ-কাল-অস্তিত্ব এবং ব্রেডলীর বিরোধ নিয়মের ব্যবহার আল-গাযালির দর্শনে এক অতুলনীয় মহিমায় ভাস্বর। জগতের যে কোনো মৌলিক চিন্তাবিদের ন্যায় আল-গাযালিও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে রহস্যাত্মক এবং রহস্যময়তাকে ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করার তাঁর অভূতপূর্ব প্রয়াস দার্শনিক এবং স্বাভাবিকভাবে সকল চিন্তাগোষ্ঠীর মনে সন্দেহ ও সমালোচনার সৃষ্টি করে। মৃত্যুর আগে ও পরে তিনি বহুল সমালোচিত হন। উদারপন্থীগণ তাঁর রক্ষণশীলতার জন্য এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসীগণ তাঁর দর্শনের জন্য তাঁকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন।

আল-গাযালির সদা দার্শনিক ভাষার প্রয়োগ, তাঁর যুক্তির ধরন এবং সুফিবাদে তাঁর পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ধারণা সনাতন ধর্মবিশ্বাসের প্রখ্যাত ধর্মবিদ তারতুসি (৫২০/১১২৬), আল-মাসারি (৫৩৬/১১৪১), ইবনে জাওযি (৫৯৭/১২০০), ইবনে আল-সালাহ (৬৪৩/১২৪৫), ইবনে তায়েমিয়া (৭২৮/১৩২৮), ইবনে কায়্যুম (৭৫১/১৩৬০) এবং অন্যেরা প্রকাশ্যে আল-গাযালিকে "বিপথগামী একজন" (one of the misguided) বলে আখ্যায়িত করেন। ইবনে জাওযি বিস্ময়ে উক্তি করেন, "সুফিবাদের পক্ষে আল-গাযালি ধর্মতত্ত্বের জন্য কি সস্তাই না বাণিজ্য করেন (how cheaply traded) অর্থাৎ সুফিবাদের জন্য আল-গাযালি ধর্মতত্ত্বকে কি যথেচ্ছাই না ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, ইবনে তায়েমিয়া দর্শনের জন্য ধর্মতত্ত্বকে ব্যবহার করায় আল-গাযালিকে অভিযুক্ত করেন। করডোভার কাজি আবু-আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে হাসছিন এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন যে, তিনি একটি আইন জারি করতে চেয়েছিলেন যে, ইহ্‌য়াসহ আল-গাযালির সমগ্র রচনাবলি যেন পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং কারো নিকট তাঁর কোনো গ্রন্থ পাওয়া গেলে অধিকারীর সম্পত্তি যেন বাজেয়াপ্ত করা হয়, এমনকি মৃত্যুদণ্ড ভীতিও যেন প্রদর্শন করা হয়। ধর্মীয় মতবাদের গোঁড়া অনুরাগী মারাকুল সুলতান ইবনে ইউসুফ

www.pathagar.com

ইবনে তা' সিফিন (৪৭৭/১০৮৪-৪৩৭/১১৪২)-এর রাজত্বকালে উত্তর আফ্রিকাতে আল-গাযালির দার্শনিক, এমনকি ধর্মীয় গ্রন্থাবলিও ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। এ দু'টো ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়, আল-গাযালির লেখা মুসলিম পাশ্চাত্যে কত ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। দার্শনিকদের মধ্যে আল-গাযালির প্রখ্যাত ও কঠোর সমালোচক ছিলেন ইবনে রুশদ (৫২০/১১২৬-৫৯৫/১১৯৮)। তিনি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে আল-গাযালির 'তাহাফুতে' বর্ণিত যুক্তিগুলো এক এক করে খণ্ডন করেন এবং তাঁর নিজ রচনার নামকরণ করেন 'তাহাফুত আল তাহাফুত' অর্থাৎ 'ধ্বংসের ধ্বংস।' দার্শনিকেদের বিরুদ্ধে আল-গাযালির আক্রমণ যেমন তীব্র, দার্শনিকদের পক্ষে ইবনে রুশদের সমর্থনও তেমনি তীক্ষ্ণ ও জোরালো। যদিও ইবনে রুশদ তাঁর যুক্তিগুলো সহজবোধ্য ও উদ্ভাবনী কৌশলে উপস্থাপন করেন, তথাপি শেষ বিচারে আল-গাযালির যুক্তিগুলোই সমৃদ্ধ বলে পরিগণিত হয় এবং সর্বত্র সমর্থন লাভ করে। ইবনে রুশদ আল-গাযালিকে কপটতার দায়ে অভিযুক্ত করেন এবং উল্লেখ করেন যে, দার্শনিকদের বিরুদ্ধে আল-গাযালির অভিযোগগুলো প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসীদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য শুরু করা হয়েছে। ইবনে রুশদের এ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। তিনি অবশ্য আল-গাযালিকে চিন্তার অসঙ্গতির জন্যও পুনরায় দায়ী করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, 'মিশকাত আল-আনওয়ারে' আল-গাযালি নির্গমনবাদকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। অথচ তিনি তাঁর তাহাফুতে তীব্রভাবে এর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে আল-গাযালির শিক্ষা কোনো কোনো সময় ধর্মের, কোনো কোনো সময় দর্শনের এবং কোনো কোনো সময়ে উভয়েরই ক্ষতিসাধক। ইবনে তায়েমিয়ার উক্তি অনুযায়ী ইবনে রুশদ আল-গাযালির কাপট্যে এতই আশ্চর্য হন যে, তিনি তাঁর প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লেখ করেন, "ইয়ামেন থেকে যখন একজন লোকের সাক্ষাৎ ঘটে তখন তিনি একজন ইয়ামেনীয়। আবার যখন মাআদনান থেকে একজনকে দেখেন তখন তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি একজন আদনানবাসী।"

অন্য একজন মুসলিম দার্শনিক ইবনে তোফায়েলও (৫০১/১১৮৫) আল-গাযালির বিরুদ্ধে অসঙ্গতির অভিযোগ আনয়ন করেন। তিনি বলেন, সাধারণ পাঠকের জন্য আল-গাযালির রচনায় আল-গাযালি হচ্ছেন একস্থানে সংযত, বিন্যস্ত, অবার অন্যস্থানে অবিন্যস্ত ও অসঙ্গত এবং কোনো সময় কিছু বস্তুর অস্বীকৃতি, আবার পরক্ষণে তা' সত্য বলে ঘোষণাকারী এক ব্যক্তি। আল-গাযালির রচনার কোনো কোনো অংশের বিরোধিতা করলেও ইবনে তোফায়েল আল-গাযালির শিক্ষার উচ্চপ্রশংসা করেন এবং এ প্রশংসার প্রভাব তাঁর স্বীয় দার্শনিক রম্যোপন্যাস গ্রন্থ 'হ্যায় বিন ইয়াকযানে' পরিলক্ষিত হয়।

আল-গাযালির বিরুদ্ধে বিপুল সমালোচনার পরিমাণই প্রমাণ করে তাঁর ব্যাপক প্রভাবের কথা। আল-গাযালির অনুসারী ও প্রশংসাকারী যারা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা তাঁর সমালোচকদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিল, তাঁদের দীর্ঘ তালিকা দেয়া এখানে সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। যাই হোক, একটি বিষয় এখানে সুস্পষ্ট যে, দুধরনের লোক এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যথা—প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ধর্মবিদগণ এবং সুফিগণ অথবা তাঁরা যাঁরা সমভাবে ধর্ম ও সুফিতত্ত্ব উভয়েই

www.pathagar.com

যোগ্যতাসম্পন্ন। এটা পরিষ্কার যে, ইসলামের মধ্যে আল-গাযালির প্রভাব দুই ভিন্ন ঐতিহ্যে যুগপৎভাবে নিজেকে বিকশিত করেছিল, অর্থাৎ সুফিবাদ ও সনাতন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে যাচ্ছিল। এভাবে ইতিহাসের অন্যান্য শক্তির সাথে মিশ্রিত হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এ প্রভাব ইসলাম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চৈতন্যের স্থায়ী ভাবধারা নির্ণয় করে। যথা : আধ্যাত্মিকবাদ ও মৌলবাদের ভাবধারা (attitude of spiritualism and fundamentalism)। আল-গাযালির সমগ্র রচনার মধ্যে 'ইহয়্যাই' আজ পর্যন্ত সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। সকল সম্প্রদায়ের লোকই এ গ্রন্থ পাঠ করে যাচ্ছেন, সামগ্রিকভাবে না হলেও, আংশিকভাবে বা সংক্ষিপ্ত আকারে। 'ইহয়্যা' গ্রন্থ বা এর সংক্ষিপ্তসার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ এর এত প্রশংসা করেন যে, তাঁরা একে দ্বিতীয় কোরআন বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। ধর্মবিদ এবং সনাতনপন্থীগণ এর উপর ভাষ্যের পর ভাষ্য রচনাতে পরিশ্রান্ত হচ্ছেন না।

কেবলমাত্র ইসলামি পরিমণ্ডলেই আল-গাযালির প্রভাব নিজেকে বিকশিত করে নি, পাশ্চাত্য, বিশেষ করে, ইহুদি ও ক্রিশ্চান ভাবধারায়ও এর প্রভাব পড়ে। আমাদের আধুনিক দর্শনের চিন্তাপ্রবাহেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে আল-গাযালির প্রভাব এখন একটা আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ব্যাপার।

আল-গাযালি দার্শনিক মতবাদের যে বিশটি সমস্যা পরস্পর বিরোধপূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যান করেন তা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপ :

১. জগৎ-নিত্যতা দার্শনিক মতাবাদের বিশ্বাসের প্রত্যাখ্যান।
২. জগৎ-প্রকৃতির চিরঞ্জীবতার (ever lasting) দার্শনিকদের বিশ্বাসের খণ্ডন।
৩. আল্লাহ্ জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং জগৎ তাঁর উৎপন্ন—দার্শনিকদের এই অসাধু উক্তির প্রতিবাদ।
৪. সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণে দার্শনিকদের ব্যর্থতা।
৫. বৌদ্ধিক যুক্তির দ্বারা দ্বি-ঈশ্বরের সম্ভাব্যতা প্রমাণে দার্শনিকদের অক্ষমতা।
৬. ঐশী গুণাবলি অস্বীকারে দার্শনিক মতবাদের খণ্ডন।
৭. আদি সত্তা (principle) জাতি বা বিভেদক লক্ষণে (differentia) বিভাজ্য নয়—এই মতবাদ খণ্ডন।
৮. আদিসত্তা (principle) এক অযৌগিক নির্গুণ (unqualified) সত্তা—দার্শনিকদের এই মতবাদ খণ্ডন।
৯. আদি সত্তা (principle) শরীরী নয় প্রদর্শনে দার্শনিকদের অক্ষমতা।
১০. জগৎ নিত্যিতা স্বীকার এবং স্রষ্টার অস্বীকারে দার্শনিকদের বাধ্যবাধকতা বিষয় প্রসঙ্গে।
১১. আদি সত্তা (principle) নিজেকে ব্যতীত অন্যকে জানেন—দার্শনিকদের এইমত পোষণ প্রমাণে ব্যর্থতা।
১২. স্রষ্টা নিজেকেও জানেন—এই মত পোষণে দার্শনিকদের ব্যর্থতা।
১৩. আদি সত্তা (principle) বিশেষকে (particulars) জানেন—এই মতবাদের খণ্ডন।

www.pathagar.com

১৪. স্বর্গ একটি সজীব সত্তা যার গতি বা সঞ্চালন ঐচ্ছিক (voluntary)—দার্শনিকদের এই মতবাদের খণ্ডন।
১৫. স্বর্গের গতি উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদের প্রত্যাখ্যান।
১৬. স্বর্গের আত্মাসমূহ সব বিশেষকে জানে (know all particulars)—দার্শনিকদের এই মতবাদের খণ্ডন।
১৭. ঘটনার স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক (natural) গতি পরিত্যাগের অসম্ভাব্যতা বিষয়ে দার্শনিক মতবাদের খণ্ডন।
১৮. মানবআত্মা বস্তু (substance) যা নিজের মধ্যে অস্তিত্বশীল এবং এটা দেহ কিংবা অবাস্তর লক্ষণও নয়।
১৯. মানবআত্মাসমূহের বিনাশের অসম্ভাব্যতা বিশ্বাসে দার্শনিক মতবাদের খণ্ডন।
২০. দৈহিক পুনরুত্থানে দার্শনিকদের অস্বীকৃতির মতবাদের প্রত্যাখ্যান—যা প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা উৎপাদিত হয়ে স্বর্গ-নরকে সুখ-দুঃখ আকারে অনুভূত হবে।

www.pathagar.com

বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে আল-গাযালির ২০টি সমস্যার মধ্যে নিম্নে মাত্র ৮টি সমস্যা আলোচনা করা হলো :

চতুর্থ সমস্যা

জগতের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণে দার্শনিকদের অক্ষমতা প্রদর্শন

আমরা বলি :

সব মানুষকে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা চলে :

১. সত্য অনুসন্ধানকারী দল (The class of the people of turth)। তাঁরা অভিমত পোষণ করেন যে, কালে (in time) জগৎ শুরু হয়েছিল। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার প্রয়োজন নেই। তাঁরা অবহিত হন, কালে যা কিছু উদ্ভব ঘটে তা নিজে উদ্ভূত নয়। সুতরাং এর একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাঁদের এই বিশ্বাস অবশ্যই বোধগম্য।

২. জড়বাদী গোষ্ঠী (Materialists)। তাদের বিশ্বাস জগৎ যা, তা' সর্বদাই অনুরূপ ছিল। তাই জগৎ সৃষ্টির জন্য তাঁরা সৃষ্টিকর্তার কথা বলেন না। তাঁদের বিশ্বাসও বোধযোগ্য—যদিও প্রত্যাখ্যানের জন্য যুক্তির অবতারণা করা যায়।

কিন্তু দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, জগৎ নিত্য বা চিরন্তন (eternal)। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা জগৎ-সৃষ্টির জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার কথা উল্লেখ করেন। তাঁদের এই মতবাদ মৌলিক গঠন-রীতিতেই স্ববিরোধী। এ মতবাদ প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন নেই।

যদি বলা হয় : আমরা যখন বলি জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন তখন এর দ্বারা আমরা একজন কর্তাকে (agent) অর্থ করি না যিনি ঐচ্ছিকভাবে ক্রিয়া করেন—যেমন নাকি আমরা দরজি, তাঁতি বা নির্মাতাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি। বিপরীতে, এর দ্বারা আমরা জগতের কারণকেই অর্থ করি—এই কারণকে আমরা আদিসত্তা (first principle) বলেও অভিহিত করি। আদিসত্তা স্বয়ং কারণহীন, কিন্তু অন্যসব সত্তার কারণ। কেবলমাত্র এই অর্থেই আদিসত্তাকে আমরা সৃষ্টিকর্তা বলে আখ্যায়িত করি। এমন একটি অস্তিত্বের কারণহীন সত্তার বিষয়টি বর্তমানে সিদ্ধান্তমূলক যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। আমাদের কথা হচ্ছে, জগৎ এবং এর মধ্যে সব সত্তা হয় কারণহীন অথবা কারণযুক্ত। যদি তাদের কারণ থাকে, তবে স্বয়ং এই কারণের হয় কারণ থাকবে অথবা কারণহীন হবে। পরবর্তীতে কারণ—এর ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটবে। ফলে, (ক) হয় কারণের অনুক্রম অনন্তভাবে চলতে থাকবে (go on ad infinitum,যা অসম্ভব); অথবা পরিশেষে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই চূড়ান্ত পর্যায়টিই হবে আদি কারণ। আদি কারণ স্বয়ং কারণহীন। এই কারণকেই আদিসত্তা বলে অভিহিত করা যাক। (Let us call this cause the first principle)।

যাই হোক, জাগৎ স্বয়ং যদি কারণহীন হয়, তবে আমরা আদিসত্তা পেয়ে গেছি বলতে হবে। কারণ, কারণহীন সত্তা ব্যতীত অন্যকোনো অর্থে আমরা এই সত্তাকে অর্থ

www.pathagar.com

করছি না। আমাদের প্রকল্প (hypothesis) অনুযায়ী এমন সত্তা অনিবার্যভাবেই (necessarily) পরিচিত ঘটনা (recognisable fact)।

সন্দেহাতীতভাবেই স্বর্গসমূহকে (heavens) আদিসত্তা হিসেবে বিবেচনায় আনা সম্ভব নয়। কারণ, তারা অসংখ্য দল (mumerous group) গঠন করে। ঐশী ঐক্যের প্রমাণ সংখ্যাকে আদিসত্তাতে গুণ আরোপে বাধা সৃষ্টি করে। আদিসত্তার গুণাবলির অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই স্বর্গমণ্ডলসমূহ আদিসত্তা হতে পারে—এ মতবাদের মিথ্যাত্ব পরিলক্ষিত হয়।

কোনো এক স্বর্গ, কোনো এক দেহ বা কোনো এক সূর্য বা এ ধরনের কোনো বস্তুকে আদিসত্তা বলা সম্ভব নয়। কারণ, এসব বস্তু হচ্ছে শরীরী বা দেহী; এবং দেহ আকার ও উপাদানে গঠিত। আদিসত্তা এরূপে গঠিত এমন ভাবা সম্ভব নয়। অন্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় (আদিসত্তার গুণাবলির অনুসন্ধান ব্যতীত)।

অতএব, আমরা যা দেখাতে চাই তা' হচ্ছে কারণহীন সত্তার অস্তিত্ব একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য—বুদ্ধিগত অনিবার্যতা (rational necessity)এবং সাধারণের গ্রহণযোগ্যতার দ্বারাই এ সত্য প্রতিষ্ঠিত। এমন সত্তার গুণাবলি বিষয়েই কেবলমাত্র মতপার্থক্য সূচিত হয়।

আদিসত্তা বলতে আমরা উল্লিখিত অর্থই করি। দু'দিক থেকে উত্তর :

প্রথমত, চিন্তার সাধারণ তাড়না থেকে অনিবার্য পরিণাম হিসেবে এটা অনুসরণ (follow) করে যে, জগতের বস্তুগুলো নিত্য বা চিরন্তন এবং কারণহীন (uncaused)। দ্বিতীয় অনুসন্ধানের (second enquiry) মাধ্যমে এইপরিণাম (consequence) যে পরিহার করা যেতে পারে তা ঐশী সত্তার একত্ব ও গুণাবলি সমস্যা আলোচনাকালে খণ্ডন করা হবে।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে এই সমস্যার ব্যাপারে এটা বলা যেতে পারে : অনুমান (hypothesis) দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, জগতের সমুদয় বস্তুরই কারণ রয়েছে। এখন কারণের কারণ এবং সেই কারণেরও অন্যকারণ থাকার এবং এরূপে কারণের অনন্ত প্রবাহ চলবে (ad infinitum)। এর দ্বারা এটা এই অর্থ করে না যে, কারণের অনন্ত পশ্চাদ্‌গতি (linfinite regress) অসম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে : কারণ দ্বারা উদ্বোধ্য হয়ে সাক্ষাৎ-অনুমানে (immediate inference) আমরা একে জানি নাকি অবরোহ যুক্তির মাধ্যমে একে জানা যায়? এক্ষেত্রে বুদ্ধিগত অনিবার্যতা থেকে যুক্তি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং প্রারম্ভহীন কালিক ঘটনার সম্ভাব্যতার স্বীকার্যে (admitted the possibility of temporal phenomena) তাত্ত্বিক অন্বেষার পদ্ধতিও (method of theoretical enquiry) প্রতারাণা (betray) করে। অস্তিত্বের জন্য যদি অনন্ত কিছু আসা সম্ভব হয়, তবে সমভাবে এর কারণের অংশকে অন্যের কারণ হিসেবে আসা সম্ভব হবে না কেন? এতে করে নিম্নদিক থেকে ক্রম (series) পরিণামহীন পরিণামে পরিসমাপ্তি ঘটে—উপর দিক থেকে কারণহীন কারণে পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে—এটা অনেকটা অতীতের ন্যায় (past) যা প্রবহমান 'বর্তমানে' (Now) উপনীত হয় এবং এর কোনো প্রারম্ভ থাকে না। যদি স্বীকার করা যায় যে অতীত

www.pathagar.com

ঘটনাবলীর অস্তিত্ব বর্তমানে অথবা অন্যকোনো অবস্থায় নেই এবং অন-অস্তিত্বকে সসীম বা অসীম বলে বর্ণনা করা যায় না, তবে, মানব আত্মাসমূহ (human soul) যা দেহ পরিত্যাগ করে তার সম্বন্ধেও অনুরূপ মতবাদ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এ মতবাদ অনুযায়ী তারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বশীল আত্মার সংখ্যা অনন্ত। মানুষ থেকে বীর্য অবিরামভাবে এবং বীর্য থেকে মানুষ অনির্দিষ্টভাবে বংশপরম্পরা চলে আসছে। তাহলে প্রতিটি মানুষের আত্মা যা মৃত তা বেঁচে আছে। এই আত্মা সংখ্যা পৃথক সে সব আত্মা থেকে যা এই মানুষের পূর্বে, পরে বা তার সাথে একত্রে মৃত। প্রজাতি হিসেবে সব আত্মা যদি এক হয়, তবে তোমার মতে আত্মার অস্তিত্ব যে কোনো মুহূর্তে অসীম সংখ্যা হয়ে থাকবে।

যদি বলা হয় : আত্মাদের এক অংশের সাথে অন্য অংশের সংযোগ নেই, কিংবা স্বভাবে বা অবস্থানে তারা বিন্যস্ত (order) নয়। আমরা সত্তার একটি অসীম সংখ্যার অসম্ভাব্যতা বিশ্বাস করি যার বিন্যাস রয়েছে, হয় অবস্থানের দিক থেকে, যেমন, দেহ, তাদের কোনো কোনোটি অন্যের উর্ধ্বে বিন্যস্ত অথবা স্বভাবের দিক থেকে, যেমন, কার্য ও পরিণাম। কিন্তু আত্মাসমূহের ক্ষেত্রে এইরূপ নয়।

আমাদের উত্তর হবে : অবস্থান সম্বন্ধে এই বিচার (Judgemend about position) (বিন্যাসের দ্বারা, by order) এর বিপরীত সত্যতা থেকে অধিক বিস্তৃত করা যায় না। সত্তার অনন্ত সংখ্যার এক প্রকারের সম্ভাব্যতার বিষয়ে তুমি বিশ্বাস করছ কেন, অন্যের ব্যাপারে নয় কেন? এই পার্থক্য প্রমাণের যুক্তি কি? তুমি একজনকে অপ্রমাণিত করবে কিভাবে যদি সে বলে :

"এসব আত্মা যা সংখ্যায় অসংখ্য তাদেরও বিন্যাস রয়েছে, কারণ, তাদের কোনো কোনোটির অস্তিত্ব অন্যদের পূর্বে। কারণ, অতীত দিন এবং রাত্রির সংখ্যা অসংখ্য। আমরা যদি অতীতের প্রতিটি দিন ও রাত্রির মধ্যে একটা করে আত্মার অস্তিত্বের ধারণা করি, তবে ইতিমধ্যে তাদের সমষ্টি সমস্ত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং এদেরকেও অস্তিত্বের ক্রমবিন্যাসে সাজানো যায়—অর্থাৎ, এক আত্মার অস্তিত্বের পর অন্য আত্মা...?

কারণ সম্বন্ধে বলা যায় যে প্রকৃতগতভাবেইএটা পরিণামের (consequence) পূর্বে। যেমন বলা হয় সারবত্তা হিসেবে এটা পরিণামের উর্ধ্বে—স্থান হিসেবে নয়। 'পূর্বতা' (before) যদি বাস্তব কালিক ক্ষেত্রে (in the cause of real temporal) অসম্ভব না হয়, তবে 'পূর্বতা' আবশ্যিক প্রকৃতির (essential natural) ক্ষেত্রেও অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। এসব দার্শনিক কি হয়েছে যে তাঁরা একদিকে, দেশে (space) অনন্তভাবে দেহ একের উপর অন্যের বিন্যস্তের সম্ভব্যতার কথা অস্বীকার করেন, অন্যদিকে কালে (time) অনন্তভাবে একের উপর অন্যের অস্তিত্বশীল সত্তা সম্ভাব্যতার কথা স্বীকার করেন? এটা কি যথেচ্ছাকৃত, ভিত্তিহীন ও অসমর্থন পুষ্ট নয়?

যদি বলা হয় : কারণের এক অনন্ত অনুগমনের (Infinite regress) অসম্ভাব্যতার সিদ্ধান্তমূলক প্রদর্শন হচ্ছে এই : প্রতিটি ব্যক্তি কারণ হয় নিজে সম্ভাব্য অথবা অনিবার্যে (eithers possible itself in necessary)। যদি অনিবার্য হয়, তবে এর কারণের প্রয়োজন নেই। যদি সম্ভাব্য হয়, তবে, সমগ্রকে (whole) (এটা যার অংশ, of

www.pathagar.com

which it is a part) সম্ভাব্যতার দ্বারা বর্ণনা করতে হবে। এখন যা সম্ভাব্য তা নিজ ব্যতীত অন্যকারণের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, সমগ্রকেও নিজ ব্যতীত অন্য বহিঃকারণের ওপর নির্ভরশীর হতে হবে (যা অসম্ভব)।

আমাদের উত্তর হবে : 'সম্ভাব্য' ও 'অনিবার্য' শব্দগুলো হচ্ছে অস্পষ্ট শব্দ। অবশ্য কারণহীন সত্তার জন্য 'অনিবার্য' এবং কারণের জন্য 'সম্ভাব্য' শব্দগুলো ব্যবহৃত হলে ভিন্ন কথা। যদি এই অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, তবে আমরা সঠিক জায়গায় প্রত্যাবর্তন করছি। আমরা বলব প্রতিটি ব্যক্তি কারণই সম্ভব এই অর্থে যে এর অন্য একটি কারণ রয়েছে যা এর নিজ অতিরিক্ত। সমগ্র (whole) সম্ভব নয়, অর্থাৎ, নিজ ব্যতীত এর অতিরিক্ত বা বহিঃকারণ নেই। আমাদের প্রদত্ত অর্থ ব্যতীত যদি অন্যকোনো অর্থ থাকে তবে সেটার কোনো স্বীকৃতি থাকতে পারে না (that meaning cannot be recognised)।

যদি বলা হয় :

এটা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পরিচালিত করে যে, সম্ভাব্য বিষয়ের অনিবার্য সত্তা হতে পারে না। কিন্তু সিদ্ধান্তটি উদ্ভট।

আমাদের উত্তার হবে : 'সম্ভাব্য' ও 'অনিবার্য' বলতে আমরা যা অর্থ করেছি তা' যদি বোধগম্য হয় তবে এই সঠিক সিদ্ধান্তটিই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। একে উদ্ভট বলে আমরা স্বীকার করি না। একে উদ্ভট বলা অনেকটা এরকম যে একজন বলছেন কালিক ঘটনার (temporal events) দ্বারা সৃষ্ট কোনো নিত্য বা চিরন্তন অসম্ভব। দার্শনিকদের নিকট কাল (time) নিত্য; অথচ ব্যক্তিক মণ্ডলীয় বিবর্তনগুলো কালিক। এবং প্রতিটি স্বাতন্ত্র্য বিবর্তনের প্রারম্ভ রয়েছে, অথচ এ বিবর্তনগুলোর সমষ্টির কোনো প্রারম্ভ নেই। সুতরাং, যার প্রারম্ভ নেই তা' যার প্রারম্ভ রয়েছে তা' দ্বারা সৃষ্ট। কালে প্রারম্ভ আছে বিধেয়টি সত্যিকার অর্থে ব্যক্তি বিবর্তনগুলোর ওপর প্রয়োগযোগ্য, কিন্তু তাদের সমষ্টিগুলোর ওপর নয়। অনুরূপে, (কারণসমূহ এবং তাদের সমষ্টির ক্ষেত্রে) বলা যায় যে, প্রতিটি কারণেরই কারণ আছে—কিন্তু এসব কারণের সমষ্টির কারণ নেই। কারণ, ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে যা বলা যায়, সমষ্টির ক্ষেত্রে তা' বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা বলা যায় যে, এটা হচ্ছে বহুর, (of many) একক (one), একটা ভগ্নাংশ অথবা অংশ সমগ্রের, (of whole)। কিন্তু, সমষ্টির ক্ষেত্রে এমন কিছু বলা যায় না। পৃথিবীর ওপর যে-কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে আমরা নির্দেশ করি না কেন, তা' দিনের বেলার সূর্যের আলোর দ্বারা উজ্জ্বলিত হয়, রাতের আঁধার দ্বারা অন্ধকার হয়ে ওঠে। প্রতিটি কালিক (temporal) ঘটনার উৎপত্তি হয় না থাকা থেকে (not having been),অর্থাৎ, কালে এর প্রারম্ভ রয়েছে। কিন্তু দার্শনিকগণ কালিক ঘটনাবলীর সমষ্টির প্রারম্ভ রয়েছে বলে স্বীকার করেন না।

এ থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, যদি কেউ উৎপত্তি বিষয়সমূহের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন, যথা : চার উপাদানের আকার এবং পরিবর্তনীয় বিষয়সমূহ যার কোনো প্রারম্ভ নেই, তবে এ থেকে কেউ এটা বলতে পারে না যে কারণে অনন্ত-ক্রম অসম্ভব (infinite series of causes is impossible)। আরো লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, এই

www.pathagar.com

জটিলতার (this difficulty) কারণেই দার্শনিকগণ আদিসত্তা স্বীকারের পথ খুঁজে পান না। ফলে আদিসত্তা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা (notion) স্বেচ্ছাচারী হতে বাধ্য।

যদি বলা হয় : মণ্ডলের বিবর্তনগুলোর অস্তিত্ব বর্তমানে নেই অথবা উপাদানের আকারেরও এরূপ অস্তিত্ব নেই—এবং যার অস্তিত্ব নেই তাকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট বলা যায় না যে পর্যন্ত না এর অস্তিত্ব কল্পনায় (imagination) ধারণা করা হয়। এবং যা কল্পনায় ধারণা করা হয় তা অসম্ভব নয়, যদিও ধারণাকৃত কোনো কোনো বস্তু একে অপরের কারণ হয়। কারণ, মানুষ প্রায়শই এসব বস্তু তার কল্পনায় ধারণা করে থাকে। কিন্তু এখানে আমরা বাস্তবে অস্তিত্বশীল বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করছি—মনের বিষয়কে নিয়ে নয়।

অবশিষ্ট জটিলতা যা আমাদেরকে বর্তমানে সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাহলো মৃতের আত্মাসমূহ (souls of the dead)। কোনো কোনো দার্শনিক অভিমত পোষণ করেন যে, দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে সকল আত্মা নিত্যকাল থেকে এক ছিল। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের ঐক্য পুনরায় পুনঃস্থাপিত হবে। সংখ্যা নেই : তাদেরকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট বলে অভিহিত করার সম্ভাবনা ত দূরের কথা কোনো কোনো দার্শনিক বিশ্বাস করেন যে, আত্মা দেহের গঠনকে অনুসরণ করে : মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে আত্মার অস্তিত্বহীন হওয়া, আত্মার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। এ মত অনুসারে আত্মার ওপর অস্তিত্ব আরোপ করা যায় না যে পর্যন্ত না তারা জীবিত ব্যক্তির আত্মা হয়। জীবিত ব্যক্তিসমূহ (living persons) হচ্ছে বাস্তব সত্তা (actual being) যার সংখ্যা সীমিত এবং যার ওপর সসীমত্ব (finitude) প্রয়োগ হয়। যারা অনস্তিত্বশীল তাদেরকে সসীমে বা বিপরীতে বর্ণনা করা যায় না—ব্যতিক্রম হচ্ছে কল্পনা, অবশ্য, যদি তাদের অস্তিত্ব (তথায়) আছে বলে ধারণা করা হয়।

উত্তর :

আমরা ইবনে সিনা, ফারাবি এবং অন্যান্য চিন্তাবিদদের নিকট এই জটিলতা উপস্থাপন-করি যারা মনে করেন যে, আত্মা হচ্ছে একটি দ্রব্য (substance) যা নিজে অস্তিত্বশীল। এই ধারণা অ্যারিস্টোটল এবং প্রাচীন জগতের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। যাই হোক, এই ধারণা যারা স্বীকার করেন না, তাঁদেরকে আমরা বলব : যা অবিনাশী (imperishable) তা' কি অস্তিত্বে আসতে পারে বলে ধারণা করা যায়? তাঁরা যদি বলেন না, তবে, উত্তরটি হবে উদ্ভট। যদি তাঁরা হ্যাঁ বলেন, তবে আমরা বলব : যদি প্রতিদিন একটি করে অবিনাশী বস্তু চিরস্থায়ী হয়ে অস্তিত্বে এসেছিল, তবে সুস্পষ্টভাবেই বলা চলে ইতোমধ্যে এসব সত্তার সংখ্যা অনন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বর্তুলাকার গতি যদি অস্থায়ী হয়, তবে এরমধ্যে চিরস্থায়ী সত্তার আবির্ভাব অসম্ভব নয়। ফলে, এই ধারণার দ্বারা জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চিরস্থায়ী বস্তু, মানুষের আত্মা, জিন, শয়তান অথবা ফেরেশতা অথবা যে কোনো সত্তাই আমরা মনে করি না কেন, এ প্রশ্নটি অবাস্তব। কারণ, যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রহণ করা যাক না কেন জটিলতার উদ্ভব ঘটবেই, কারণ তাঁরা মণ্ডলীয় বিবর্তনকে ধরে নিয়েছে যার সংখ্যা অনন্ত।

www.pathagar.com

পঞ্চম সমস্যা

বৌদ্ধিক যুক্তির দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব প্রমাণে দার্শনিকদের অক্ষমতা এবং কারণহীন দু'টি অনিবার্য সত্তার ধারণা অসম্ভব বলে তাদের ব্যর্থতা।

এ বিষয়ে তারা দু'ভাবে যুক্তির অবতারণা করেন :

প্রথমে তারা বলেন : যদি দুজন সত্তা থাকেন, তবে প্রত্যেকেই অনিবার্য বলে অভিহিত হবেন। নিম্নে উল্লেখিত কোন অর্থে একটি সত্তাকে অনিবার্য বলে আখ্যায়িত করা যায়। হয় এর অস্তিত্বের অনিবার্যতার (necessity of existence) জন্য এটা আবশ্যিক (essential)। কিন্তু এ ধরনের অনিবার্যতা অন্যকিছুর মালিকানাধীন (belong) হতে পারে না। অথবা এর অস্তিত্বের অনিবার্যতার জন্য একটা কারণ থাকতে পারে। অনিবার্য সত্তার সারবত্তা একটা কারণের পরিণাম (the essence of necessary being would be the effect of a cause) যা এর অস্তিত্বের অনিবার্যতা দাবি করে। কিন্তু অনিবার্য সত্তা বলতে আমরা এমন কিছু অর্থ করি না যার অস্তিত্ব কোনো না কোনোভাবে কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট (connected' with a cause in any meaning) এবং তারা আরো বলেন, জাতি 'মানুষ' জায়েদ ও আমর বিধেয়িত (predicated) জায়েদ স্বয়ং (per se) মানুষ নয়। যদি সে তাই হতো, তবে' আমর মানুষ হতে পারত না। বিপরীতে, জায়েদ একটা কারণের মাধ্যমে একজন মানুষ এবং আমরও তাই। এভাবে মানুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায়, এর বহনকারী জড়ের গুণনের সাথে (humanity multiplies with the multiplication of matter bearing it) এবং জড়ের সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে একটা কারণের পরিণাম। কারণ এই সম্পর্ক মনুষ্যত্বে আবশ্যিক নয় (is not essential to humanity)। অস্তিত্বের অনিবার্যতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ সত্য প্রযোজ্য যা অনিবার্য সত্তার অন্তর্ভুক্ত। কারণ অনিবার্য সত্তার জন্য এটা আবশ্যিক (essential), অন্য কেউ এটা পেতে পারে না। কিন্তু এটা যদি একটি কারণের পরিণাম (effect) হয়, তবে অনিবার্য সত্তা স্বয়ং কারণজনিত (caused) বস্তু হবে ফলে অনিবার্য হতে পারবে না। এ থেকে সত্য প্রকটিত হয়েছে যে, অনিবার্য সত্তা অবশ্যই এক হবে।

আমরা বলব : তোমাদের বক্তব্য যে জাতি 'অস্তিত্বের অনিবার্যতা' হয় আবশ্যিক অথবা একটা কারণ থেকে উদ্ভূত, মূলতই একটি ভুল বিভাগীকরণ (division)। আমরা দেখিয়েছি যে, 'অনিবার্য' (necessity) শব্দটি দুর্বোধ্য যে পর্যন্ত না কারণের অনুপস্থিতি দেখাতে এটা ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে এটা ব্যবহার করে আমরা বলব : দু'সত্তা অসম্ভব হবে কেন যা কারণহীন এবং পারস্পরিক কারণ নয়? তোমাদের বক্তব্য

www.pathagar.com

যা কারণহীন তা স্বয়ং কারণহীন (uncaused perse) অথবা কারণগত (percausum) এটা একটা ভুল শ্রেণীকরণ। একটি কারণ থেকে একটি সত্তার স্বাধীনতা বা অনুপস্থিতি কেউ অনুসন্ধান করে না। কারণহীন বস্তু স্বয়ং কারণহীন বা কারণগত এ শব্দমালার দ্বারা কি অর্থ পরিবাহিত হয়? আমরা যখন বলি কোনো কিছুর কারণ নেই—এর অর্থ হচ্ছে বিশুদ্ধ না-বাচক (pure negation) এবং বিশুদ্ধ না-বাচকের কারণ থাকে না। তাই এটা কি স্বয়ং না কারণগত এ প্রশ্ন উঠতে পারে না।

যাই হোক, যদি অস্তিত্বে অনিবার্যতা বলতে অনিবার্য সত্তার নিশ্চিত এবং সদর্থক বুঝে থাক; উপরন্তু, সেই সত্তার কারণহীন সত্তা অর্থ করে থাক, তবে এই অর্থ স্বয়ং বোধগম্য নয় (intelligible itself)। সত্তার কারণের অস্বীকার করে যে অর্থ উদ্ভূত হয়, যা বিশুদ্ধ না-বাচক তাকে স্বয়ং কারণ অথবা কারণহীন বলে অভিহিত করা যায় না। এই ভিত্তিতে অনিবার্য সত্তার শ্রেণীকরণ দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। এখন আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এতে করে এ ধরনের শ্রেণীকরণ যুক্তিতর্কের নির্বোধ ও ভিত্তিহীন উপায় বলে প্রতীয়মান হয়। অনিবার্য সত্তা বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে যে, এর অস্তিত্বের জন্য কোনো কারণ নেই এবং এর কারণহীন বৈশিষ্ট্যেরও কারণ নেই। কারণহীন হওয়ার জন্য এটা কোনো কারণের পরিণাম (effect) নয়। কেবলমাত্র বলা যায় যে, এর অস্তিত্ব হচ্ছে কারণহীন এবং এই কারণহীনতাও কারণহীন। কোনো কারণ থেকে আগত গুণাবলি এবং যা আবিশ্যক (essential) তা সদর্থক (positive) গুণাবলিতে আরোপ করা যায় না, নঞর্থক তো দূরের কথা, কেউ বলতে পারেন না : কালত্ব (blackness) কি স্বয়ং (perse), না কারণগত (per causum) রং? যদি স্বয়ং হয়, তবে লালত্ব (redness)-কে যথার্থভাবে রং বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ এই উপজাতি (Species), অর্থাৎ বর্ণত্ব (colouredness) একান্তভাবেই কালত্বের সারবত্তার অন্তর্ভুক্ত। যদি কালত্ব কারণের মাধ্যমে রং (colour) হয়ে থাকে, তবে এটা অনুসরণ করে বা যুক্তিসংগতভাবেই কালত্ব (blackness) আছে যা বর্ণ নয়, অর্থাৎ বর্ণত্বে কারণ একে বর্ণ করে নি কারণ সারবত্তার সাথে একত্রে যা অস্তিত্বশীল তা বহিঃকারণ দ্বারা সংযোজিত (added)। এমন সংযোজিত বস্তুর (additional thing) অনস্তিত্ব কল্পনা ধারণা করা সম্ভব, যদিও ধারণাকৃত অনস্তিত্ব অভিজ্ঞতায় পরিলক্ষিত হয় না।

এর উত্তর হবে : এই বিভাজন (devision) মূলতই ভ্রান্তিমূলক। যখন বলা হয়, কালত্ব স্বয়ং রং, এই বক্তব্য এ অর্থ করে না যে অন্য কারোর এ গুণ থাকবে না। অনুরূপ যখন বলা হয়, কোনো সত্তা অনিবার্য, অর্থাৎ, স্বয়ং কারণহীন তবে এ বক্তব্য এটা অর্থ করে যে কেউ সম্ভাব্যরূপে অনিবার্যতার গুণ লাভ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত তারা বলেন : আমরা যদি দু'টি অনিবার্য সত্তার ধারণা করি, তবে হয় তারা সর্বদিক থেকে একরূপী হবে, অথবা পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হবে। যদি সর্বদিকে একরূপী হয়, তবে সংখ্যাগত বৈসাদৃশ্য বা দ্বৈততা বোধযোগ্য (intelligible) হবে না। কারণ, দু'টি কালোবস্তু কালো তখনই হয় যখন তারা দু'টি স্থানে থাকে অথবা একই স্থানে দুই সময়ে থাকে। অথবা কালত্ব ও গতি একই স্থানে একই সময়ে দুই

বস্তু—কারণ তারা ভিন্ন স্বভাবের। কিন্তু স্বভাবের যদি পার্থক্য না হয়, যেমন, দু'টি কালো বস্তুর ক্ষেত্রে যদি কাল এবং স্থান এক হয় তবে সংখ্যাগত বৈসাদৃশ্য বোধযোগ্য নয়। একই স্থানে একই সময়ে যদি দু'টি কালো বস্তুর কথা বলা সম্ভব হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দুই ব্যক্তি বলা যেতে পারে, কারণ দু'য়ের পার্থক্য সাধারণত উপেক্ষা করা হয়—কারণ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য থাকে না।

এখন সর্বদিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ (দু'টি অনিবার্য সত্তা) অসম্ভব হওয়ায় এটা অনুসরণ করে যে কোনো পার্থক্যকে অবশ্যই গ্রহণ করে নিতে হবে। এটা স্থান ও কালের পার্থক্য নয়, বর্তমানে যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে স্বভাবের পার্থক্য।

পুনরায়, যদি দু'টি অনিবার্য সত্তার কোনো কিছুতে পার্থক্য থাকে, তবে এই পার্থক্য দুই আকারের হতে পারে : হয় দু'টির মধ্যে কোনো কিছুই সাধারণ (common) নেই অথবা আছে। কিন্তু এটা অসম্ভব যে তাদের মধ্যে কোনো কিছু সাধারণ নেই। কারণ, সেক্ষেত্রে কোনো অস্তিত্ব, অস্তিত্বের অনিবার্যতা, কর্তা, নিরপেক্ষ আত্মআশ্রয়ী সত্তা (self-subsisting entity) তাদের সাথে সাধারণ হবে না। যদি কোনো কিছু তাদের সাথে সাধারণ (common) থাকে এবং অন্যকিছুর সাথে পার্থক্য থাকে, তবে তাদের সাথে যা সাধারণ তা অভিন্ন হবে না তাদের সাথে যার পার্থক্য রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে অনিবার্য সত্তা হবে যৌগিক (composition) এবং তাদের সংজ্ঞায়িত গঠন অংশে বিভক্ত করা যাবে (analysable into parts) কিন্তু অনিবার্য সত্তায় কোনো যৌগিকতা থাকবে না। পরিমাণে একে বিভক্ত করা যাবে না, এর সংজ্ঞায়িত গঠনরূপও অংশে বিভাজ্য নয়। অনিবার্য সত্তার সারবত্তা সেসব বস্তু দিয়ে গঠিত যার বহুত্ব সংজ্ঞায়িত গঠনরূপ দ্বারা নির্দেশিত (অংশের বিভাজন)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'জীব' (animal) এবং 'বুদ্ধি' (rational) মানুষের সারাংশ গঠন (quiddity of man) কি তা প্রকাশ করছে। কারণ মানুষ জীব এবং বুদ্ধিসম্পন্ন বটে। মানুষের মধ্যে 'জীব' শব্দ যা নির্দেশ করে 'বুদ্ধি' শব্দ তা থেকে তাকে পৃথক করে প্রকাশ করে। তাই সংজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হয়ে মানুষ অংশে গঠিত যা শব্দের দ্বারা সেই অংশগুলোকে অর্থ করে। 'মানুষ' নাম 'সমগ্রে' (whole) প্রয়োগ করা হয় [যেসব অংশে (of those parts) কিন্তু অনিবার্য সত্তার ক্ষেত্রে তা অকল্পনীয়, কিন্তু এ ব্যতীত দ্বৈততা (duality) অকল্পনীয়।

উত্তর : যে পর্যন্ত না কোনো বিষয়ে দু'টি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং সকল বিষয়ে সদৃশ দু'টি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য না থাকে সেই পর্যন্ত এ দ্বৈততাকে অকল্পনীয় বলে স্বীকার করা যায়। কিন্তু আদি সত্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের যৌগিকতা (composition) অসম্ভব বলে তোমাদের উক্তি একটি স্বেচ্ছাচারী ধারণা।

একে প্রমাণে যুক্তি কি? এ বিষয়টিকে বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। কারণ, এটা দার্শনিকদের সুপরিচিত উক্তি যে, আদি সত্তাকে সংজ্ঞায়িত গঠনরূপের (definitory) মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায় না। এমন কি পরিমাণগত বিভাজনও (quantitative division) তার উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই উক্তির উপর ভিত্তি করেই তারা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

তাদের আরো বক্তব্য : ঐশী ঐক্যের বিশ্বাস অপূর্ণ যে পর্যন্ত না ঐশী সত্তা সর্বদিক থেকে এক বলে স্বীকার করা হয়। সর্বদিক থেকে বহুত্বকে অস্বীকার করেই সর্বদিক থেকে একত্বকে স্বীকার করা হয়। বস্তুর সারবত্তায় (essence) বহুত্ব পাঁচ উপায়ে প্রবেশ করে।

প্রথমত, প্রকৃত বিভাজন (division in fact) অথবা কল্পনার (imagination) দ্বারা। এ কারণেই বস্তু (body) চূড়ান্তভাবে (absolutely) এক (one) নয়। বস্তু এক হয় এর ধারাবাহিকতার দ্বারা যা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান এবং যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাই পরিমাণের দিক থেকে বস্তুকে কল্পনায় বিভক্ত করা যায়। কিন্তু আদিসত্তার ক্ষেত্রে এক বিভাজন অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিতে কোনো কিছুর অ-পরিমাণগত (non-quantitative) বিভাজন দুই ভিন্ন ধারণার দ্বারা যথা—আকার ও জড় বস্তুর বিভাজন। কারণ, যদিও আকার কিংবা জড় একে অপরকে ছেড়ে অস্তিত্বশীল বলে ভাবা যায় না, তবুও সংজ্ঞায় (definition) এবং বাস্তবে (reality) তারা দুই ভিন্ন বস্তু। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এটাকেও অস্বীকার করতে হবে। কারণএটা যথার্থ নয় যে, স্রষ্টা বস্তুতে আকার, বস্তুতে জড় অথবা এ দু'য়ের সমন্বয় হবেন (from in a body or matter in a body or combination of the two)। তিনি আকার ও জড়ের সমন্বয় যে হতে পারেন না তার দু'টি কারণ। প্রথমত, এমন সমন্বয় বিভাজনীয়—বাস্তবে এবং কল্পনায় যেহেতু একে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষিত করা চলে। দ্বিতীয়ত, এই সমন্বয় আকার ও জড় ধারণাগতভাবেও বিভাজনীয়। তারপর আল্লাহ্ জড় হতে পারেন না। কারণ জড় ও আকারের উপর নির্ভরশীল। অনিবার্য সত্তা সর্বদিক থেকে নিরপেক্ষ (independent); নিজ ব্যতীত একে অন্যকারণের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব নয়। পরিশেষে আল্লাহ্ আকার নন, কারণ আকার জড়ের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, গুণের রূপ ধরে বহুত্ব আসে। যেমন, যখন আমরা জ্ঞান, শক্তি এবং ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র গুণ বলে ধারণা করি, যদি এসব গুণ অনিবার্য বলে ধরা হয়, অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা (necessity of existence) সবার জন্য সাধারণ হবে (common to all) এবং ঐশী (divine) সারবত্তায়ও। এভাবে অনিবার্য সত্তায় বহুত্বের উদ্ভব ঘটবে এবং পরিণামে ঐক্য (unity) অদৃশ্য হবে।

চতুর্থত, জাতি (genus) ও উপজাতির (species) গঠন (composition) থেকে বহুত্ব আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক কালো বস্তু 'কালো' (black) এবং বর্ণ (colour), বুদ্ধির নিকট বর্ণত্বের সাথে কালত্ব অভিন্ন নয়। বিপরীতে, বর্ণত্ব হচ্ছে জাতি এবং কালত্ব হচ্ছে বিভেদক (differentia)। সুতরাং কাল বস্তু জাতি ও বিভেদকের দ্বারা গঠিত। অনুরূপে, মনুষ্যত্ব (humanity) জীবত্বের (animality) সাথে অভিন্ন নয়—বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই মানুষ হচ্ছে জীব এবং বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা (being) এখানে 'জীব' হচ্ছে জাতি এবং প্রজ্ঞা বা 'বুদ্ধি' (rational) হচ্ছে বিভেদক। অতএব, মানুষ জাতি ও বিভেদকের দ্বারা গঠিত এবং এ হচ্ছে অন্য ধরনের বহুত্ব। একেও (তারা স্বীকার করেন) আদি সত্তার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা উচিত। প্রথমত, সারাংশের (quiddity) ধারণা থেকে বহুত্ব অনুসরণ করে এবং পরে সারাংশের অস্তিত্বের ধারণা থেকে তা অনুসৃত হয়।

www.pathagar.com

যেমন, অস্তিত্বের পূর্বে মানুষের সারাংশ রয়েছে। তার অস্তিত্ব সারাংশের সাথে সম্পর্কিত এবং সারাংশের দ্বারা ব্যাখ্যায়িত। অনুরূপে, ত্রিভুজের সারাংশ রয়েছে—যেমন, এর আকৃতি তিন বাহুর দ্বারা বেষ্টিত এবং ত্রিভুজের অস্তিত্ব সারাংশের সারবত্তার (essence) অংশ নয়। এ কারণে বাস্তবে এর অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক এ জানা ব্যতীত মানুষের ও ত্রিভুজের সারাংশকে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব। যদি ত্রিভুজের সারাংশ অস্তিত্ব গঠন করতো তবে, বাস্তবায়নের (actualisation) পূর্বে বুদ্ধিতে সারাংশের অস্তিত্ব অকল্পনীয় হতো।

তাই অস্তিত্ব সারাংশের সাথে সম্পর্কিত—সে সারাংশ সর্বদা অস্তিত্বশীল থাকুক বা না থাকুক, যেমন স্বর্ণের ক্ষেত্রে—'অথবা না থাকা অস্তিত্বে আসা—যেমন, সারাংশ অর্থাৎ জায়েদ এবং আমরের মনুষ্যত্ব অথবা আকস্মিক বা অস্থায়ী (accident and temporat forms) আকারের সারাংশ। (এবং তারা স্বীকার করেন) যদি সত্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের বহুত্বকে আবার অস্বীকার করতে হবে। এখানে বলা দরকার যে, তার ক্ষেত্রে সারাংশ নেই যার সাথে অস্তিত্ব সম্পর্কিত। কারণ, তার অনিবার্য অস্তিত্ব তার নিকটই; যেমন অন্যসত্তার জন্য তার সারাংশ হয়। অতএব, তাঁর অনিবার্য অস্তিত্ব হচ্ছে সারাংশ : সার্বিক বাস্তবতা (universal reality) অথবা যথার্থ প্রকৃতি (real nature) যেমন নাটক, মনুষ্যত্ব, বৃক্ষত্ব বা স্বর্গত্ব হচ্ছে একটা সারাংশ। তার অস্তিত্ব থেকে পৃথক করে তার সারাংশকে যদি আমরা স্বীকার করতাম, তবে, অনিবার্য সত্তাকে পরিণাম হিসেবে as consequence) বিবেচনা করতে হতো, সেই সারাংশের গঠনমূলক সত্তা হিসেবে নয় (not as constitutive principle of that quiddity)। পরিণাম হচ্ছে একটি কাজের ফল। এই যুক্তিতে অনিবার্য অস্তিত্ব একটি কাজের ফল হয়ে দাঁড়ায় যা অনিবার্যতার স্বভাববিরুদ্ধ (contradictory) [এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও দার্শনিকগণ বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন : (ক) সত্তা (principle) : সুনির্দিষ্ট (the) আদি (first) : (ক) সত্তা (being) : (ক) দ্রব্য (substance) : সুনির্দিষ্ট (the) এক (one) ; সুনির্দিষ্ট (the) নিত্য (eternal) : সুনির্দিষ্ট (the) চিরঞ্জীব (everlasting) : (ক) জ্ঞাতা (knower) : এক (an) বুদ্ধি (intelligence) : এক (an) বুদ্ধিমান বা প্রজ্ঞাবান (Intelligent) : এক (an) বোধগম্য (intelligible) : এক (an) কর্তা (agent) : (ক) সৃষ্টি কর্তা (creator) : (ক) সংকল্পকারী : ক্ষমতাবান : সজীব (willer, powerful, living) : (ক) প্রেমিক (lover) (ক) প্রেমাস্পদ (beloved) এক (an) : সুখময় (pleasant) : পরিতুষ্টি (pleased) : মহৎ (generous) : এবং বিশুদ্ধ কল্যাণ বা মঙ্গল (pure good) তাঁরা স্বীকার করেন যে, এসব শব্দ এক বা অনুরূপ বিষয়কে (thing) অর্থ করে যার মধ্যে বহুত্ব নেই। এটা এক অদ্ভুত ধারণা (notion)। প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে এ মতবাদের আরো বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন যাতে করে এটা আরো বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে। পরিপূর্ণ বোধ প্রাপ্তির পূর্বে এ মতবাদের প্রত্যাখ্যান হবে অন্ধকারে তীর ছোঁড়ার ন্যায়]।

আদি সত্তার সারবত্তা এক। এ এক সারবত্তার নামসমূহের বহুত্বের উদ্ভব ঘটে : হয় এর সাথে বস্তুর সম্পর্ক থেকে বা বস্তুর সাথে এর স্বীয় সম্বন্ধ থেকে অথবা এর বিধেয়

www.pathagar.com

হিসেবে বস্তুর নিষেধক (nagation) থেকে। বিধেয় হিসেবে কোনো কিছুর অস্বীকার নির্দেশ করে না। সম্পর্কের বহুত্বকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু এ সমস্যায় তাঁরা যা অবদান রাখেন তা হচ্ছে : সকল গুণাবলিকে (attirbutes) নিষেধক (negation) ও সম্পর্কের দ্বারা তাদের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস।

তাঁরা বলেন : তাকে প্রথম বা আদি বলার অর্থ, তার পরবর্তী সকল সত্তার সাথে তার সম্পর্ক প্রদর্শন (to show his relation)।

তাকে সত্তা (principle) বলার অর্থ এই নির্দেশ করে যে সকল সত্তা তার থেকে আগত বা উদ্ভূত (derived) এবং তিনি অস্তিত্বের কারণ। এই হচ্ছে তার পরিণামের (His effects) সাথে সম্পর্ক।

তাকে এক সত্তা বলে অভিহিত করার (to call him a being) অর্থ সুস্পষ্ট। তাকে দ্রব্য (subtance) বলা এক অস্তিত্বকে অর্থ করে যার অস্তিমানকে (subsistence) বিষয়ে (subject) অস্বীকার করা হয়। এই হচ্ছে নিষেধক (negation)। তাঁকে চিরন্তন (eternal) বলার অর্থ তার পূর্ববর্তী অন্য অস্তিত্বকে না করা। তাকে চিরঞ্জীব বলার অর্থ একটি অন্য অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যা অন্যসত্তার ক্ষেত্রে শেষে অস্তিত্ব অনুসরণ করে।

'চিরন্তন' ও 'চিরঞ্জীব' একত্রে গ্রহণ করার অর্থ এক অস্তিত্বকে স্বীকার করা যা অন্য অস্তিত্বের দ্বারা পূর্বগামী নয় কিংবা এর দ্বারা অনুসৃতও হবে না (not followel by it)। তাকে অনিবার্য সত্তা বলে অভিহিত করার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি ও তার অস্তিত্ব কারণহীন এবং তিনি অন্যসকল অস্তিত্বের কারণ। এখানে আমরা নিষেধক ও সম্বন্ধের সমন্বয় পাই (have a combination of negation and relation)। প্রথমটি কারণহীনত্বের (uncausedness) দ্বারা প্রতীকায়িত, পরবর্তীটি সত্তার বৈশিষ্ট্য অন্যের কারণ দ্বারা নির্দেশিত। (the characters of being the cause of others)

তাকে জ্ঞান (intelligence) বলার অর্থ তিনি হচ্ছেন বিচারহীন সত্তা (irrational being)। এ ধরনের প্রতিটি সত্তাই হচ্ছে জ্ঞান, অর্থাৎ, এর আত্ম জ্ঞান (self knowlege) ও আত্ম চৈতন্য (self consiousness) রয়েছে এবং এটা জানে নিজ ব্যতীত অন্যসত্তা কী? অতএব এটি হচ্ছে, জড় থেকে মুক্ত হওয়া ঐশী সত্তার (Divine being) একটা গুণ। কাজেই তিনি মানসম্পন্ন। জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া এবং জড় মুক্ত হওয়া উভয়েই অনুরূপ বস্তুকে নির্দেশ করে। তাকে জ্ঞানী (intelligent) বলার অর্থ জ্ঞান হওয়ার কারণে তিনি বোধের বিষয় (obsect of intelligence) অথবা বোধগম্য বা জ্ঞানগম্য (intelligible) যা তার স্বীয় সারবত্তা (essence)। কারণ, তিনি নিজ সম্বন্ধে সচেতন এবং তিনি নিজেকে জানেন। তাই তার সারবত্তা জ্ঞানগম্য, বুদ্ধিমান বোধশক্তি (intelligble, Intelligent and Intelligence) এ তিনটি আসলে এক। কারণ, তাকে জ্ঞানগম্য বলেও অভিহিত করা হয়, যেহেতু তার সারাংশ (quiddity) জড়-বিবর্জিত। এটা তার সারবত্তা থেকে অস্পষ্ট নয় বা গোপনীয় নয় কারণ তার সারবত্তা হচ্ছে জ্ঞান এই অর্থে যে, এটা হচ্ছে একটা অজড়ীয় সারাংশ (non-material quiddily) যা থেকে কিছুই গোপন নেই এবং যার মধ্যে অস্পষ্টতাও

www.pathagar.com

নেই। নিজেকে নিজের জানার জন্যই তিনি জ্ঞানগম্য (Himself being known to himself, he is the Intelligible) তার আত্মজ্ঞান তার সারবত্তার অতিরিক্ত না হওয়ার জন্যই তিনি বোধশক্তিসম্পন্ন ((His self-knowledge not being additional to his essence, he is the Intelligence), এবং এটা অসম্ভব নয় যে বুদ্ধিমান, বোধশক্তি ও জ্ঞানগম্য এক হবে। কারণ, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন নিজেকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলে জানেন তখন তা তিনি জানেন জ্ঞানী ব্যক্তি হওয়ার কারণেই এবং এভাবে জ্ঞানী ও জ্ঞানগম্য এক হয়ে ওঠে—সেই একত্ব (union) যে কোনোভাবেই হোক না কেন। সন্দেহতীতভাবেই আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এই একত্ব ভিন্ন হবে। কারণ, ঐশী জ্ঞানের বিষয় (object of Divine Intelligence) অনন্ত বাস্তব (perpetually actual) যেখানে আমাদেরটি কোনো কোনো সময় সম্ভাব্য (potential), কোনো কোনো সময় বাস্তব।

তাকে সৃষ্টিকারী, কর্তা বা সৃষ্টিকর্তা অথবা অন্যকোনো বস্তু বা কার্যের গুণ বহন করে সেই অর্থে অভিহিত করার অর্থ হচ্ছে তার অস্তিত্ব, এক মহান অস্তিত্ব, স্বীকার যা থেকে সার্বিক সত্তা অপরিহার্যভাবে নিঃসৃত হয়। অন্যসব সত্তার অস্তিত্ব তার অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত এবং তার অস্তিত্বের অধীন, অনেকটা সূর্যের সাথে আলো অথবা অগ্নির সাথে তাপের সম্পর্কের ন্যায়। তার সাথে জগতের সম্পর্ক এবং সূর্যের সাথে আলোর সম্পর্ক বিষয়টি তখনই তুলনীয় যখন জগৎ ও আলোকে একটি পরিণাম হিসেবে ভাবা হয়। এই দৃষ্টিকোণ ও এই সত্য ব্যতীত কোনো তুলনা নেই। সূর্য তার নিজ থেকে আলোর নির্গমনের ব্যাপারে সচেতন নয় কিংবা অগ্নি তাপের নির্গমন সম্বন্ধে সচেতন নয়। কারণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্গমন এখানে বিশুদ্ধ প্রকৃতি বা স্বভাব (pure nature), কিন্তু বিপরীতে, আল্লাহ নিজেকে জানেন এবং জানেন যে, তার সত্তা হচ্ছে অন্য সকল অস্তিত্বের মূল (principle)। তাই তার থেকে যা নির্গত হয় সেই সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত এবং তা থেকে যা নির্গত হয়,এ সম্বন্ধেও তিনি অনবহিত নন (unaware) । উপরন্তু, তিনি আমাদের কারোর মতো নন যিনি পীড়িত মানুষ ও সূর্যের মধ্যে অবস্থান করেন যাতে করে সূর্যের তাপ পীড়িত ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—তার মনের বিরুদ্ধে। বিপরীতে, আল্লাহ্ তার পরিণামকে জানেন এবং তিনি তাদেরকে অপছন্দ করেন না। মানুষের ছায়ার (shadow) ব্যাপারে বলা যায় : ছায়ার কর্তা হচ্ছে দেহ, কিন্তু ছায়ার পতন সম্বন্ধে অবহিত হয়, তার দেহ নয়, তার আত্মা এবং সে এটাকে পছন্দ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে তা হতে পারে না। কারণ, তার মধ্যে কর্তা (doer) জ্ঞাতাও (knower) বটে এবং পছন্দকারীও অর্থাৎ অপছন্দকারী নন (not disliker)। অন্যসত্তা তার থেকে আগত এবং এর মধ্যে যে তার পূর্ণতা নিহিত এ সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত। যদি এমন মনে করা সম্ভব হতো যে, যে দেহ ছায়ায় প্রতিফলন ঘটায় সেই দেহই ছায়া প্রতিফলনের জ্ঞাতা এবং এর পছন্দকারী, তবুও এই ঘটনা এবং ঐশী কাজের মধ্যে কোনো সমান্তরাল ঘটতো না। কারণ, আল্লাহ্ কেবল জ্ঞাতা ও কর্তা নন, তার জ্ঞান তার কার্যের মূল। তাঁর আত্মা-জ্ঞান, অর্থাৎ তিনি যে বিশ্বের আদি সত্তা তার এই জ্ঞানই হচ্ছে জগৎ নির্গমনের কারণ। এভাবে অস্তিত্বশীল পদ্ধতি জ্ঞানগম্য পদ্ধতিকে অনুসরণ করে,

www.pathagar.com

এই অর্থে যে পরবর্তীটার কারণেই এর আবির্ভাব ঘটে। তাই আল্লাহ্ কর্তা (Agent) বিষয়টি তার জগৎ-জ্ঞাতার (knower of the universe) অতিরিক্ত নয়। তাঁর জগৎ বা বিশ্ব-জ্ঞান হচ্ছে তার থেকে জগৎ নির্গমনের (emanation) কারণ এবং তার জগৎ-জ্ঞাতা হওয়া বিষয়টি তার আত্মজ্ঞানের অতিরিক্ত (additional) নয়। কারণ, তিনি জগতের সত্তা এ জানা ব্যতীত তিনি নিজেকে জানেন না। তার প্রথম ইচ্ছেয় (intention) তার স্বীয় সারসত্তা হচ্ছে তার জ্ঞানের বিষয় (His own essence in the object of his knowledge)। দ্বিতীয় ইচ্ছের দ্বারা জগৎ তার নিকট জ্ঞাত হয় (the universe is known to Him)।এটাই হচ্ছে তার কর্তা হওয়ার অর্থ।

তাকে সর্বশক্তিমান বলার অর্থ হচ্ছে তার কর্তা হওয়া—যে অর্থে আমরা এটা নিরূপণ করেছি। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সেই সত্তা যার থেকে সে সব বস্তু নির্গত হয় যাতে সর্বশক্তিমান বিস্তৃতি লাভ করেন এবং যার নির্গমনের দ্বারা জগতের বিন্যাস এমনভাবে রূপ লাভ করে (shaped) যে পূর্ণতার সম্ভবনাসমূহ এবং সৌন্দর্য উচ্চতম মাত্রায় পরিপূর্ণতা লাভ করে।

তাকে সংকল্পকারী বা ইচ্ছাকারী (willer) বলার অর্থ তার থেকে যা কিছু নির্গত হয় (proceeds) যে সম্বন্ধে তিনি অনবহিত নন অথবা অখুশি নন (displeased)। তিনি জানেন যে, তার পূর্ণতা তার থেকে উদ্ভূত জগৎ নির্গমনের মধ্যেই নিহিত (consists in the emanation of the universe from him) এই অর্থে এটা বলার অধিকার রয়েছে যে, তার থেকে যা নির্গত হয় (emanate) হয় তা তিনি ইচ্ছে করেন। এবং তিনি যিনি তার পরিণাম ইচ্ছা করেন তাকেও ইচ্ছাকারী বা সংকল্পকারী বলে অভিহিত করা যায়। এভাবে ঐশী ইচ্ছা (divine will) সর্বশক্তিমানতার সাথে অভিন্ন হয়। সর্বশক্তিমান ঐশী জ্ঞানের (Divine) সাথে অভিন্ন এবং ঐশী জ্ঞান হচ্ছে ঐশী সারবত্তা (Divine knowledge is Divine essence) । এ কারণে সকল ঐশী গুণাবলি শেষ পরিণামে (ultimately) ঐশী সারবত্তার সাথে অভিন্নরূপে চিহ্নিত হয় (To be identified with the Divine essence) এবং এটা এ জন্য হয় বা বস্তু সম্বন্ধে তার জ্ঞান বস্তু থেকে উদ্ভূত নয় (not derived)। যদি তা-ই হতো তবে আল্লাহ্কে অন্যসত্তা থেকে সুবিধাজনক গুণ অথবা পূর্ণতা গ্রহীতারূপে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু অনিবার্য সত্তার ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব।

আমাদের জ্ঞান দু'প্রকারের। প্রথমত, বস্তুর জ্ঞান বস্তুর আকার (form) থেকে উদ্ভূত। যথা, স্বর্গ বা মর্ত্যের আকার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান। দ্বিতীয়ত, এমন জ্ঞান যা আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জন করি। যেমন বস্তুর আকারের জ্ঞান যা আমরা কখনও দেখি নি, কিন্তু একে আমরা আমাদের আত্মার মধ্যে এক আকার দিয়েছি এমনিভাবে যে এটা আমাদের দ্বারা উদ্ভূত। এক্ষেত্রে, আকারের অস্তিত্ব জ্ঞান থেকে আগত, জ্ঞান আকারের অস্তিত্ব থেকে নয়। ঐশী জ্ঞান হচ্ছে এ ধরনেরই। কারণ, তার সারবত্তা গঠনের আদর্শ প্রতীকী (for the ideal representation of the system)। গঠন-রীতির নির্গমনের কারণ তার সারবত্তা থেকে উদ্ভূত (is the cause of the emanation of the system from his essence)।

www.pathagar.com

আমাদের আত্মার মধ্যে যদি একটা রেখা (line) বা পত্রের (letter) আকারের সামান্য প্রতিভাস (apperance) সেই আকার (from) উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত হতো, তবে নিঃসন্দেহে আমাদের জ্ঞান শক্তি এবং ইচ্ছার (power and will) সাথে অভিন্ন হতো। কিন্তু আমাদের অপূর্ণতার দরুন আমাদের আত্মার মধ্যে দেয় (giving) আকার সেই বস্তুর আকার উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। এই কারণে জ্ঞানের সাথে ইচ্ছার একটা কার্যের প্রয়োজন (an act of will) যা নূতন উপাদান হিসেবে আবির্ভাব ঘটে। ইচ্ছাশক্তি (faculty of desire) থেকে এর উদ্ভব ঘটে। এর ফলে শক্তির একটি প্রক্রিয়া শুরু হয় যা মাংসপেশীর গতি এবং বহিরাঙ্গের সঞ্চালনের কারণ। তাই মাংসপেশী ও হাড় সঞ্চালনের সাথে হাত বা অন্য কোনো অঙ্গ নড়তে শুরু করে। হাতের গতির সাথে কলম বা অন্যকোন বহিঃ হাতিয়ারের গতির উদ্ভব ঘটে। কলমের গতির সাথে জড়ের (matter) গতির উদ্ভব ঘটে—এ ক্ষেত্রে কালি বা অন্য কোনো বস্তু, এরপর বস্তুর আকারের আবির্ভাব ঘটে থাকে। আমরা আমাদের আত্মার একটা আকার দিয়েছিলাম (had given) । এই কারণেই আমাদের আত্মাসমূহে আকারের কেবলমাত্র অস্তিত্ব শক্তিও নয়, ইচ্ছাও নয়। বিপরীতে, আমাদের শক্তি ইচ্ছে সত্তার সাথে যা মাংসপেশীকে নাড়ায়। সুতরাং আকার সঞ্চালন করে অন্য সঞ্চালকের (so, the form moves another mover) অর্থাৎ, আমাদের শক্তির সত্তাকে (in the principle of our power) কিন্তু অনিবার্য সত্তার ক্ষেত্রে এটা সত্য হতে পারে না। কারণ, তিনি দেহ দ্বারা গঠিত নন যার সীমানার মধ্যে শক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার সারবত্তার ন্যায়ই তার শক্তি, ইচ্ছা ও জ্ঞান এক এবং অনুরূপ।

তাকে সজীব সত্তা বলার অর্থ হচ্ছে যে তিনি একজন জ্ঞাতা। তার জ্ঞান থেকে সত্তা উদ্ভূত হয় তাকে তার কার্য (His action) বলে অভিহিত করা হয়। সজীব সত্তা হচ্ছেন একজন কর্তা এবং চরম মাত্রার (highest degree) একজন জ্ঞাতা; ফলে, সজীব সত্তা বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে তার সত্তা, তার কার্যের সম্পর্কের দিক থেকে (আমাদের বর্ণিত আকারের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে হবে)। তার জীবন আমাদের মতো নয় যার পরিপূর্ণতার জন্য দুই ভিন্নশক্তির প্রয়োজন যা আমাদের জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

তাকে উদার বা মহান বলার অর্থ এই যে, জগৎ তার থেকে উদ্ভূত—তার দিক থেকে এক উদ্দেশ্যের (a purpose) কারণে নয়। বদান্য দু'টো বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথমত, দান গ্রহণকারী এর দ্বারা উপকার পেতে সক্ষম (able to profit by it)। যার প্রয়োজন নেই এমন কাউকে কিছু দেয়াকে দান বলা যায় না। দ্বিতীয়ত: মহানুভব ব্যক্তির বাহ্য কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয় যা তার দান দ্বারা সাধিত হয়। দানের কার্য তিনি এমনভাবে পালন করবেন যাতে এর নিজ প্রয়োজন মিটে। যিনি প্রশংসা বা খ্যাতি অথবা নিন্দে এড়াবার জন্য দান করেন, তিনি চুক্তি পালনকারী (bargainer) দাতা নন। আল্লাহর দান হচ্ছে সত্যিকার দান, কারণ এর মাধ্যমে তিনি নিন্দে এড়াতে চান বা অথবা পূর্ণতা লাভ করতে চান না যা প্রশংসার পরিণাম। তাই উদার (generous) শব্দটি তার সত্তার প্রকাশক—কার্যের সম্পর্কের দিক থেকে, অর্থাৎ

www.pathagar.com

দানশীলতা এর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটার দ্বারা তার সারবত্তার কোনো বহুত্ব বুঝায় না।

তাকে বিশুদ্ধ কল্যাণ বা মঙ্গল বলার অর্থ এই যে, তার সত্তা অপূর্ণতা থেকে মুক্ত এবং অন্য অস্তিত্বের সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত। মন্দ বা অকল্যাণ (evil) যার কোনো সত্তা নেই—এর অর্থ হয় (ক) একটা দ্রব্যের অন-অস্তিত্ব (non-existence of a substance) অথবা (খ) একটি দ্রব্যের অবস্থার উপযুক্তার অস্তিত্বহীনতা (non-existence of the fitness of a substance)। অস্তিত্ব অস্তিত্ব হিসেবেই মঙ্গল বা কল্যাণ। এ কারণেই মঙ্গল (good) শব্দটি যখন ব্যবহার করা হয়, তখন এটা অমঙ্গল এবং অপূর্ণতার সম্ভাব্যতার অভাবকেই অর্থ করে।

বিকল্পরূপে, কোনো কিছুর নাম হিসেবে মঙ্গল শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে যা বস্তুর পদ্ধতির কারণ। আদি সত্তা হচ্ছে সবকিছুর পদ্ধতির সত্তা। অতএব, তিনি মঙ্গল (He is good) নামটি ঐশী সত্তাকে বুঝায় যা এই বিশেষ সম্পর্ককে বহন করে। তাকে অনিবার্য সত্তা বলতে ঐশী সত্তা বুঝায় যা এর কারণ অস্বীকার করে এবং যা এর পূর্বে বা পরে অন-অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে।

তাঁকে এক প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ, সুখময় ও পরিতুষ্টিত বলা এই অর্থ করে যে সকল সৌন্দর্য, জাঁকমজক ও পূর্ণতা তার নিকট প্রিয় (সৌন্দর্যও মহান) একের ভালবাসার পাত্র। সুখ বা আনন্দ পূর্ণতার অনুকূল (agreeable) সচেতনতা বৈ আর কিছু নয়। তিনি সে-ই যিনি তার পূর্ণতাকে জানেন—যে পূর্ণতা সকল জ্ঞেয় বস্তু (knowledge things) থেকে উদ্ভূত (মনে করা যাক সে এদেরকে উপলব্ধি করে না) : যে পূর্ণতা তার আকারের বা রূপের (from) সৌন্দর্য থেকে আগত : যে পূর্ণতা তার শক্তি থেকে আসে : যে পূর্ণতা তার দৈহিক শক্তি থেকে উদ্ভূত হয় : সংক্ষেপে, যে পূর্ণতা মহত্ত্বের (greatness) সকল সম্ভাব্য কারণের অধিকারী (possessor) হওয়ার সচেতনতা থেকে উদ্ভূত (মনে করা যাক সববস্তুর অধিকারী এক ব্যক্তিই) তবে, সুনিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে তিনি তার এই পূর্ণতাকে ভালবাসেন এবং এ থেকে আনন্দ লাভ করবেন। কিন্তু মানুষের আনন্দ অপূর্ণ কারণ, তার পূর্ণতা অস্তিত্বহীন (non-existence) হয়ে পড়া বা হারিয়ে যাওয়া একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। সুখ বা আনন্দের কারণসমূহ সেসব বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে না যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং যার হারানোকে সর্বদা পূর্ব থেকে অনুমান করা যায়। কিন্তু আদিসত্তার রয়েছে পূর্ণ মহনীয়তা, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, কারণ প্রতিটি পূর্ণতাই যা তার জন্য সম্ভব তা বাস্তবে উপস্থিত (actually present)। তার এই পূর্ণতার চৈতন্য (consciousness) হ্রাস (decrease) এবং হারানোর সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। যে পূর্ণতা তিনি সর্বদা বাস্তবে আনন্দে উপভোগ করেন তা অন্য যে-কোনো পূর্ণতার চেয়ে উৎকৃষ্ট (superior)। তার প্রেমের জন্য মঙ্গল বা কল্যাণের জন্যই এই পূর্ণতা, এটা অন্য সকল পূর্ণতার চেয়ে অতি উৎকৃষ্ট মানের। অন্য পূর্ণতার ক্ষেত্রে প্রেম ভোগ করা হয়। মঙ্গল গ্রহণ করা হয়। তার পূর্ণতা থেকে তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন তা যে কোনো আনন্দের চেয়ে ব্যাপকতর বলা চলে যে, আমাদের আনন্দ এবং তার আনন্দের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। 'পুলক'

www.pathagar.com

(delight), আনন্দ (joy) ও সুখ (bliss) শব্দগুলো তার আনন্দ বর্ণনার জন্য অতি সাধারণ (too coarse)। ঐশী অর্থে (Divine meaning) ব্যবহার করা যায় এমন কোনো পর্যাপ্ত শব্দ আমাদের নেই। এ জন্য রূপক এবং দূরবর্তী রূপক ব্যবহার করাও আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যেমন আমরা তার জন্য ইচ্ছাকারী (willer) অথবা মুক্ত স্বাধীন কর্তা (free agent) শব্দগুলোও রূপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। এভাবে তার ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানের সাথে আমাদের ইচ্ছা, শক্তি ও জ্ঞানের দূরত্ব অনভিপ্রেতভাবে কমিয়ে আনি। এ জন্যই সম্ভবত : (likely) 'আনন্দ' (pleasure) শব্দটির ব্যবহার অনুমোদন করা যায় না। এর পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। যাই হোক, এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দেখানো যে তার অবস্থা (state) মহত্তর (nobler)—তাই অধিকতর উপভোগ্য—ফেরেশতাদের চেয়ে। এবং ফেরেশতাদের অবস্থা আমাদের চেয়ে মহত্তর যদি দৈহিক যৌনক্ষুধা আনন্দের একমাত্র কারণ হতো, তবে গাধা বা শূকরের অবস্থা ফেরেশতাদের চেয়ে মহত্তর হতো। কারণ ফেরেশতাদের অর্থাৎ জড় বিবর্জিত আদি (principle) অথবা জড় বিবর্জিত সত্তার (being) পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের আনন্দদায়ক(joyful pleasure) চৈতন্য ব্যতীত অন্যকোনো আনন্দ থাকত না। এই বিশিষ্টতা শুধু ফেরেশতাদেরই—এদের আনন্দদায়ক চৈতন্য হ্রাসের অধীন নয়।

যা আদি সত্তার অধিকারভুক্ত (that which belongs to the first principle) তা ফেরেশতাদের অধিকারভুক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ফেরেশতাদের অস্তিত্ব স্বয়ং সম্ভব (for the existence of angels, who are pure intelligences, is possible in itself) এবং নিজ ব্যতীত অন্যের দ্বারা অনিবার্য (and necessary by viture of something other than itself) । অন্য অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা এক ধরনের মন্দ বা অপূর্ণতা। আদি সত্তা ব্যতীত অন্যসত্তা চূড়ান্তভাবে সকল অমঙ্গল থেকে মুক্ত নয়। আদি সত্তাই হচ্ছে একমাত্র বিশুদ্ধ কল্যাণ বা মঙ্গল। তারই একমাত্র রয়েছে পূর্ণ সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব। অধিকন্তু তিনি একজন অতিপ্রিয় পাত্র। (beloved one)—কেউ তাকে ভাল বাসুক বা না বাসুক তাতে তার কিছু যায় আসে না—তিনি জ্ঞান ও জ্ঞানগম্য, কেউ তাকে জানুক বা না জানুক তাতেও তার কিছু যায় আসে না। এসব অর্থ তার সারবত্তা, তার আত্মা-চৈতন্য ও আত্মজ্ঞানের স্থিরকৃত (resolved)। কারণ, তার আত্মজ্ঞান তার সারবত্তার সাথে অভিন্ন (His self knowledge is identical with His essence)। তিনি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাময় হওয়ায় সকল নামসমূহ (যা আমরা তার প্রতি আরোপ করেছি, এক এবং অনুরূপ বস্তুকে অর্থ করে (He being a pure intelligent, all the names [We have givien to Him] mean one and the same thing]।

[সুতরাং তাদের দার্শনিকদের মতবাদ ব্যাখ্যা করার এই হচ্ছে পদ্ধতি। এগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

www.pathagar.com

(ক) সেই সমস্ত যা বিশ্বাস করা হয়। এমনবস্তু সম্বন্ধে আমরা দেখব যে, তারা দার্শনিকদের মূল নীতির (fundamental principles) সাথে সংগতিপূর্ণ নয় (not compatible)।

(খ) সেইসব যা বিশ্বাস করা যায় না। এসব বিষয় সম্বন্ধে আমরা দার্শনিকদের সমালোচনা করব :

এরপর আমরা বহুত্বের (plurality) পাঁচ প্রকার (categories) নিয়ে আলোচনা করব। প্রতিটি প্রকার বা ক্যাটাগরির প্রত্যাখ্যানের সমালোচনা করে (আল্লাহর উপর আরোপিত) আমরা দেখাব তারা কি করে তাদের মতবাদ প্রমাণে যৌক্তিক প্রমাণ দানে ব্যর্থ হয়েছেন। এবারের প্রতিটি ক্যাটাগরির বিস্তৃত আলোচনায় আসা যাক।]

www.pathagar.com

ষষ্ঠ সমস্যা

ঐশী গুণাবলি অস্বীকারে দার্শনিকদের মতবাদের প্রত্যাখ্যান।

আদি সত্তার জ্ঞান, শক্তি এবং ইচ্ছার স্বীকার অসম্ভব বলে মুতাযিলাদের প্রত্যাখ্যানের সাথে দার্শনিকগণ একমত। তাঁরা বলেন : এ সমস্ত নাম পবিত্র বিধান দ্বারা ব্যবহৃত এবং তাদের প্রয়োগ ভাষাগতভাবে সমর্থনযোগ্য। যাই হোক, তারা সকলে, যা পূর্বে দেখানো হয়েছে এক বস্তুকে অর্থ করে, অর্থাৎ এক সারবত্তাকে অর্থ করে (one essensce)। আমাদের জ্ঞান বা শক্তি যেমন আমাদের সারবত্তার অতিরিক্ত একটা গুণ, তদ্রূপ ঐশী সারবত্তার গুণাবলিকে অতিরিক্ত বলে স্বীকার করা ঠিক হবে না। কারণ, (তারা বলেন), এসব বিষয় বহুত্বকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে।

আমাদের নিকট যদি আমাদের গুণাবলির আবির্ভাব ঘটত (occur), তবে, আমরা জানতাম যে এগুলো আমাদের সারবত্তার অতিরিক্ত—যেভাবে এগুলো পরবর্তীতে উদ্ভূত হয় (emerge)। তাদেরকে যদি আমাদের সত্তার সাথে সহ-অস্তিত্বশীল বলে ধারণা করা হয়, পরবর্তীতে নয়, তবুও তাদের সহ-অস্তিত্ব (co-existence) সারবত্তার অতিরিক্ত হওয়ার স্বভাব (character) পরিবর্তন হতো না। কারণ, যে কোনো দুটি বস্তু যদি একটা আরেকটা ঘটায় (one occurs of the other) এবং যদি একে জানা যেত যে এই (this) সেই (That) নয় কিংবা সেই (That) এই (This) নয়, তবে তাদের সহ-অস্তিত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদের দুই ভিন্ন বস্তু হওয়া বোধযোগ্য ঘটনা হতো (not with standing their co-existence—their being two different things will remain an intelligible fact)। তাই, ঐশী গুণাবলিকে যদিও ঐশী সারবত্তার সাথে সহ-অস্তিত্বশীল হয় তবুও সারবত্তার অতিরিক্ত হওয়ার থেকে বিরত (cease) হবে না। এবং এটা অনিবার্য সত্তার ক্ষেত্রে বহুত্বকে আবশ্যকীয় করে তুলবে। এ কারণেই গুণাবলি অস্বীকারে দার্শনিকগণ একমত পোষণ করেন।

তাদেরকে বলা উচিত : তোমরা কিভাবে জান যে এ ধরনের বহুত্ব অসম্ভব। তোমরা মুতাযিলাদের ব্যতীত সকল মুসলিমের বিরোধী। এই বিরোধিতা যে সঠিক তা প্রমাণে কি যুক্তি আছে কেউ যদি বলে সারবত্তা (যা গুণাবলি বহন করে) এক হওয়ায় অনিবার্য সত্তার বহুত্ব অসম্ভব, তবে সে এই অর্থ করে যে, গুণাবলির বহুত্বও অসম্ভব (plurality of attribtes is impossible)। এটাই এখন আলোচ্য বিষয়। বৌদ্ধিক অনিবার্যতার (rational necessity) দ্বারা এমন অসম্ভাব্যতাকে জানা যায় না। একে প্রমাণের জন্য যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন।

তারা দু'উপায়ে যুক্তি প্রদর্শন করে।

www.pathagar.com

প্রথমত : তারা বলেন—

বিষয়টি প্রমাণের জন্য এই হচ্ছে একটি যুক্তি : দু'টি বিষয়ের মধ্যে, অর্থাৎ একটি গুণ এবংএর কর্তা (an attribute and its subject)—এটা সেটা নয় এবং সেটা এটা নয়। এখন (ক) হয় দু'টির প্রত্যেকটির অস্তিত্ব একে অপরের স্বতন্ত্র হবে, বা (খ) একে অপরের প্রয়োজনে হবে, অথবা (গ) একটি স্বতন্ত্র হবে, অন্যটি নয়। যদি প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয়, তবে উভয়ই অপরিহার্য হবে। এতে করে চূড়ান্ত দ্বৈততা সৃষ্টি হবে না, যা অসম্ভব। যদি দু'টির প্রত্যেকটিই একে অপরের জন্য প্রয়োজন হয়,তবে কোনোটিই অপরিহার্য সত্তা হবে না। কারণ, অপরিহার্য সত্তা বলতে অন্যসত্তা নিরপেক্ষ স্বয়ম্ভূ সত্তাকে নির্দেশ করে। যাতে করে যার অন্যসত্তার প্রয়োজন তার কারণ সেই সত্তাতেই : কারণ পরবর্তীটা যদি অদৃশ্য হয়, তবে এর স্বীয় অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে উঠবে। (so that which needs another being has its cause in that being, for if the latter use to disappear, its own existence would be impossible)। অর্থাৎ, এর অস্তিত্ব নিজ থেকে আগত নয়, অন্য সত্তা থেকে আগত। পরিশেষে, যদি দু'টির একটি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়,তবে যেটি নির্ভরশীল তা' কারণজনিত সত্তা হবে (will be a caused being) এবং অন্যটি হবে অপরিহার্য সত্তা। কারণজনিত সত্তা হওয়ার জন্য নির্ভরশীল সত্তার একটি বহিঃর্কারণ থাকবে।এটা আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে বহিঃর্কারণ দ্বারা নির্ভরশীল সত্তা অনিবার্য সত্তার সাথে সম্পর্কিত হয় (connected)।

নিম্নরূপে এর প্রতিবাদ গ্রহণ করা যায় :

এ তিন বিকল্পের শেষেরটিকে গ্রহণ করা যায়। প্রথমটি, দ্বৈততা সম্বন্ধে আমরা দেখেছি (পূর্ববর্তী সমস্যায়) তোমাদেরএই প্রত্যাখ্যান যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয়। কারণ, দ্বৈততার প্রত্যাখ্যান বহুত্বের স্বীকারের উপর নির্ভর করে আছে। অর্থাৎ, এই সমস্যার বিষয় এবং পরবর্তীটি। সুতরাং যা এই সমস্যার সহগামী (corollary) তা' কখনও এই সমস্যার ভিত্তি হতে পারেনা। যাই হোক, যে বিকল্প গ্রহণ করতে হবে তা' এই যে, এর গঠনে (in its caustitution) সারবত্তা (essence) গুণাবলির উপর নির্ভরশীল নয় যেখানে ঐশী গুণাবলি এবং আমাদেরগুলো তাদের কর্তার (subject) উপর নির্ভরশীল।

তাদের যা বলার থাকে :

যা অন্যকিছুর পর নির্ভরশীল তা অনিবার্য সত্তা হতে পারে না।

এর উত্তর হবে :

তোমরা এমন বল কেন যে, অনিবার্য সত্তা বলতে সেই সত্তাকে অর্থ করে যার কার্যকরী কারণ নেই (has no efficient cause)। এটা বলা অসম্ভব কেন যে অনিবার্য সত্তার সারবত্তা যেমন চিরন্তন এবং একটি কার্যকরী কারণ নিরপেক্ষ (independent of an efficient cause) তদ্রূপ তাঁর গুণাবলিও চিরন্তন এবং একটি কার্যকরী কারণ নিরপেক্ষ? যদি অনিবার্য সত্তা বলতে তুমি গ্রহণকারী কারণ ছাড়া (without receptive cause) এক সত্তাকে অর্থ করে, তবে গুণাবলিগুলো সেই অর্থে অনিবার্য নয়। যাই হোক, না কেন, তারা চিরন্তন এবং তাদের কার্যকরী কারণ নেই। এই মতবাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা কিভাবে অন্তর্ভুক্ত?

www.pathagar.com

যদি বলা হয় :

একান্তভাবে (absolutely) অনিবার্য সত্তার কোনো কার্যকরী কারণ কিংবা গ্রহণকারী কারণ নেই। যদি তোমরা স্বীকার কর যে, গুণাবলির গ্রহণকারী কারণ রয়েছে, তবে তোমরা স্বীকার করছ যে, তারা কারণজনিত বস্তু (they are caused things)।

আমাদের উত্তর হবে :

সারবত্তা যা গুণাবলিকে গ্রহণ করে, তাকে গ্রহণকারী কারণ বলে অভিহিত করা তোমাদের ব্যবহৃত পরিভাষা (terminology)। অনিবার্য অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বৌদ্ধিক বা প্রজ্ঞাসম্মত যুক্তি নেই যার মধ্যে তোমাদের পরিভাষা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তারা একমাত্র যা প্রমাণ করতে পারে তা হচ্ছে যে, কার্যকারণের অনুক্রম সীমিত—এক নির্দিষ্ট সীমানায় এসে তাদের অনুক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে (what they prove is that there must be limit of which series of causes and effects come to an end)। এর চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণ করতে পারে না। এবং কার্যকারণের অনুক্রমের পরিসমাপ্তি আনা যায় একের (one) দ্বারা যাঁর চিরন্তন গুণাবলি রয়েছে এবং যাঁর গুণাবলি ও সারবত্তা উভয়ই কার্যকরী কারণ নিরপেক্ষ। যদিও চিরন্তন, তাঁর গুণাবলি তাঁর সারবত্তায় অবস্থান করে (reside in his essence)। অনিবার্য সত্তা শব্দটাকে পরিহার করা যাক, কারণ, এটা হয়ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। বৌদ্ধিক যুক্তি শুধু এটা প্রমাণ করে যে অনুক্রম বন্ধ হতেই হবে। এর চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণ করা যায় না। এর চেয়ে বেশি কিছু এই দাবিটি একটি স্বেচ্ছাচারী দাবি।

যদি বলা হয় :

কার্যকরী কারণের অনুক্রমকে যদি কোথাও থামতে হয়, তবে তদ্রূপে গ্রহণকারী কারণকেও কোথাও না কোথায় থামতে হবে। যদি প্রতিটি সত্তারই একটা আশ্রয়ের (substratum) প্রয়োজন হয় যার মধ্যে এর অস্তিত্ব এবং স্বয়ং আশ্রয়ের যদি অন্য একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, তবে অনন্ত ধারা অনুসরণ করবে—যেহেতু প্রতিটি সত্তারই কার্যকরী কারণের প্রয়োজন হয় এবং স্বয়ং কারণেরও অন্য কারণের প্রয়োজন হয়।

আমরা বলব :

এটা সত্য। আমরা অনুক্রমের পরিসমাপ্তি এনেছি এই বলে যে ঐশী গুণাবলি ঐশী সারবত্তার মধ্যে এবং ঐশী সারবত্তা কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। এটা অনেকটা আমাদের স্বীয় গুণাবলির অবস্থানের ন্যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের আশ্রয় (substratum) হচ্ছে আমাদের সারবত্তা, কিন্তু আমাদের সারবত্তা স্বয়ং অন্যের আশ্রয়ের মধ্যে নয়। সুতরাং গুণাবলির কার্যকরী কারণের অনুক্রম ঐশী সত্তায় পৌঁছে পরিসমাপ্তি ঘটায়, কারণ সারবত্তা কিংবা গুণাবলি কারোর কার্যকরী কারণ নেই। এবং কারণহীন সারবত্তা এবং এর কারণহীন গুণাবলি কখনও অস্তিত্ব থেকে নিবৃত্ত নয়। (and the un-caused essence as well as its uncaused attributes never ceased to exist) গ্রহণকারী কারণ সম্বন্ধে বলা যায়, সারবত্তার মধ্যে এর সমাপ্তি

www.pathagar.com

(end) পৌছে। তাহলে এটা কোথা থেকে আসে যে, একটি কারণকে অস্বীকার করার জন্য একটি আশ্রয় বা আধারকে অস্বীকার করতে হবে। বৌদ্ধিক যুক্তি অনুক্রম বন্ধ হতেই হবে ব্যতীত অন্যকোনো কিছু বিশ্বাস করতে একজনকে বাধ্য করে না। প্রতিটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটা অনুক্রম cut short তা' judgement-এ বিশ্বস্ত যার উপর অনিবার্য সত্তার বৌদ্ধিক প্রদর্শন (rational demonstration) ভিত্তি করে আছে। যাই হোক, যদি বৌদ্ধিক সত্তা বলতে অন্যসত্তাকে অর্থ কর যা কার্যকরী কারণ নিরপেক্ষ এবং যার মধ্যে কার্যকরী কারণের অনুক্রম এর লক্ষ্যে বা পরিণতিতে পৌছোয়, তা হলে আমরা স্বীকার করব না এমন সত্তার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে। পরিশেষে, যদি বুদ্ধি কারণহীন এক চিরন্তন সত্তার ধারণা স্বীকার করে, তবে একে গুণবালীর এক চিরন্তন অধিকারীকেও স্বীকার করতে হবে যার গুণাবলি এবং সারবত্তা উভয়ই কারণহীন।

দ্বিতীয়ত তারা বলেন :

আমাদের জ্ঞান অথবা শক্তি আমাদের সারবত্তার সারাংশে প্রবেশ করে না। কারণ, এটা কেবল একটি উপলক্ষণ (an accident)। যদি আদি সত্তার ক্ষেত্রে এসব গুণাবলি স্বীকার করা হয়,তবুও এগুলো তাঁর সারবত্তার সারাংশে (quiddity of his essence) প্রবেশ করবে না, কিন্তু তাঁর সারবত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কেবল উপলক্ষণ হিসেবে থাকতে পারে—হয়ত চিরস্থায়ী হয়ে। অনেক উপলক্ষণ অবিচ্ছেদ্য (many an accident is inseparable), অর্থাৎ এটা অবশ্যম্ভাবী সারাংশের অন্তর্গত হয় (it belongs to the quiddity inevitably)। কিন্তু তাই বলে এটা সারবত্তার উপাদান গঠন করে না। উপলক্ষণ হওয়ার কারণে এটা সর্বদাই সারবত্তার অধীন (subordinate to the essence) যা এর কারণ (which is a cause of it) এভাবে এক উপলক্ষণকে এক কারণজনিত বিষয় করে তুলে (makes an accident a caused thing) । তবে, কেমন করে একটি উপলক্ষণকে—অর্থাৎ একটি গুণকে—একটি অনিবার্য সত্তা বলে অভিহিত করতে পার?

(ভাষার পরিবর্তনে এটা প্রথম যুক্তিরই অনুরূপ)

আমাদের উত্তর হবে :

যদি সারবত্তার অধীন হওয়া এবং পরবর্তীটি এর কারণ বলতে তোমরা বুঝে থাক যে সারবত্তা হচ্ছে এর পরিণাম কারণ এবং এটা সারবত্তার পরিণাম তবে এই অর্থ সঠিক নয়। আমাদের সারবত্তার সাথে সম্পর্কের দিক থেকেও আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিষয়ের আবশ্যকতা নেই (such a thing is not necessary even in the case of our knowledge as related to our essence)। কিন্তু তোমরা যদি অর্থ কর যে সারবত্তা হচ্ছে একটা আশ্রয় বা আধার (substratum) এবং গুণাবলির নিজস্ব অস্তিত্ব থাকতে পারে না (যদি এই আধারে তাদের অস্তিত্ব না থাকে), তবে এই অর্থটি পূর্বেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছেএবং একে কেন অসম্ভব বলা হবে এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। গুণাবলিকে অধীন, উপলক্ষণ বা পরিণাম অথবা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, অর্থের পরিবর্তন হতে পারে না। যদি আমরা একে ঐশী

www.pathagar.com

গুণাবলি ঐশী সারবত্তার মধ্যে অস্তিত্বশীল—যেমন সকল গুণাবলি তাদের কর্তার মধ্যে অবস্থান করে এই অর্থে চিহ্নিত না করি, তবে এসবের কোনোই অর্থ থাকবে না। একে অসম্ভব বলার কোনো কারণ নেই। সারবত্তার মধ্যে গুণাবলি অবস্থান করেও চিরন্তন এবং কার্যকরী কারণ নিরপেক্ষ (attributes exist in the essence and still be eternal and independent of an efficient cause) থাকতে পারে।

দার্শনিকদের সকল যুক্তির লক্ষ্য আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তাঁরা (ঐশী গুণাবলির ক্ষেত্রে) এসব শব্দ যেমন, 'সম্ভাব্য' 'অনিশ্চিত' 'অধীন' 'অবিচ্ছেদ্য' 'উপলক্ষণ' 'পরিণাম' প্রভৃতি ব্যবহার করেন এবং ইংগিত দেন যে এসব শব্দ অবাঞ্ছিত (undesirable)। তাদেরকে বলা উচিত : যদিএর অর্থ এই হয় যে, গুণাবলির একটি কার্যকরী কারণ আছে, তবে সেই অর্থ গ্রহণীয় নয়। কিন্তু যদি অর্থ এই হয় যে, গুণাবলির কার্যকরী কারণ নেই, কিন্তু আধার বা আশ্রয় রয়েছে যার মধ্যে তারা থাকে (exist) তবে এই অর্থ প্রকাশার্থে যে শব্দই ব্যবহার করা যাক না কেন—এর মধ্যে অসম্ভাব্যতার কিছু নেই।

কোনো কোনো সময় দার্শনিকগণ অন্য বিকর্ষী শব্দ ব্যবহারে আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের প্রয়াস চালান। তারা বলেন :

এটা আমাদেরকে এ-সিদ্ধান্তে পরিচালিত করে যে আদি সত্তার গুণাবলির প্রয়োজন, পরিণতিতে, তিনি চূড়ান্তভাবে (absolutely) অভাবহীন (unneedy) থাকবেন না। কারণ, চূড়ান্তভাবে অভাবহীনের কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই যা তাঁর নিজ-বহির্ভূত (which is external to him)।

এই হচ্ছে অত্যন্ত অপ্রত্যয়িত (unconvincing) অক্ষরধর্মী মন-মানসিকতা (literal mindedness)। পূর্ণতার গুণাবলি পূর্ণতার সারবত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না যাতে করে একজনের বলার সুযোগ ঘটে যে পূর্ণতার কিছুর অভাব রয়েছে যা তার বহির্ভূত। আল্লাহ্ যদি কখনও বিরত না হন কিংবা কখনও বিরত হবে না এবং স্বীয় জ্ঞান, শক্তিএবং জীবনের বলে পূর্ণ হন, তবে কিভাবে বলা চলে যে এদেরকে তাঁর প্রয়োজন আছে (If God had never cease to be nor will never cease to be, perfect by virture of his own knowledge, power and life, how can it be said that he has a need for them)। পূর্ণতার কিভাবে অভাব থাকতে পারে যা একটি অবিচ্ছেদ্য সহগামী (inseparable accompaniment)।

দার্শনিকদের বক্তব্য অনেকটা এরূপ :

পূর্ণ হলেন তিনি যার পূর্ণতার প্রয়োজন রয়েছে এবং যার প্রয়োজন বা অভাব রয়েছে—এমন কি পূর্ণতার গুণাবলি পর্যন্ত মূলত অপূর্ণ (essentially imperfect)।

এর উত্তর হবে :

পূর্ণ হওয়ার অর্থ সারবত্তার সম্পর্কের দিক থেকে (In relation to his essence) পূর্ণতার বাস্তব অস্তিত্ব বৈ কিছু নয় (nothing but the actual existence of perfection)। অনুরূপে, আল্লাহ্র অভাবহীন হওয়ার অর্থ তাঁর সারবত্তার দিক থেকে তাঁর গুণাবলির বাস্তব অস্তিত্ব যা তাঁর সকল অভাব, চাহিদা পূর্বাহ্নেই বন্ধ করে দেয়। তবে কেমনে, তোমরা অস্বীকার করতে পার—এ ধরনের আক্ষরিক সূক্ষ্মতার মাধ্যমে—পূর্ণতার সে সব গুণাবলিকে যার দ্বারা ঐশী সত্তা নিজেকে বাস্তবায়ন করছেন।

www.pathagar.com

যদি বলা হয় :

যদি তোমরা স্বীকার কর (ক) এক সারবত্তা (খ) এক গুণ এবং (গ) সারবত্তায় গুণাবলির অস্তিত্বে (subsistence), তবে তোমরা এতে মিশ্রণ বা গঠন প্রবেশ করিয়েছ (introduce composition)। যেখানে মিশ্রণ রয়েছে, সেখানে একজন মিশ্রণকারী রয়েছেন যিনি মিশ্রণকার্য সম্পাদান করেন (produces composition)। এজন্যই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না আদি সত্তাকে বস্তু (body) অভিহিত করা যা গঠন বা মিশ্রণের কর্তা।

আমাদের উত্তর হবে :

সকল গঠনের জন্যই একজন কর্তার প্রয়োজন যিনি গঠনকার্য সম্পাদন করেন। এটা অনেকটা এরূপ বলার ন্যায় যে, প্রত্যেকটি সত্তার জন্যও একজন কর্তা রয়েছেন যিনি সত্তা হওয়ার কার্য সম্পাদন করেন (who causes being)। এ উক্তির জবাব হবে : আদি সত্তা হচ্ছেন এক সত্তা যা চিরন্তন (eternal), কারণহীন এবং 'যিনি সত্তা ঘটান' (causes being) তা নিরপেক্ষ (independent)। অনুরূপে, এটা বলা উচিত : আদি সত্তা হচ্ছেন গুণাবলির অধিকারী (possessor of attributes) যিনি নিত্য ও কারণহীন এবং যাঁর (ক) সারবত্তা (খ) গুণাবলি এবং (গ) সারবত্তার মধ্যে গুণাবলির অস্তিত্ব সবই কারণহীন (uncaused) নিত্য থেকে নিত্যে প্রতিটির অস্তিত্ব।

বস্তু (body) সম্বন্ধে বলা যায় যে, এটা আদি সত্তা হতে পারে না। কারণএর স্বভাব বা প্রকৃতি অস্থায়ী (temporal character)। অস্থায়ী স্বভাব কখনও পরিবর্তন মুক্ত নয়। যিনি বস্তুর অস্থায়িত্বে বিশ্বাস করেন না, তিনি—যা আমার পরে দেখাব—আদি কারণ যে বস্তু হবে এই সম্ভাব্যতা স্বীকারে বাধ্য।

এখন হয়ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দার্শনিকদের কর্তৃক গৃহীত প্রমাণের সকল পদ্ধতি (methods of demonstration) উদ্ভট।

অধিকন্তু, তারা এটা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে সকল সদর্থক উক্তি (positive statement) কিভাবে তাঁর সারবত্তায় রূপান্তরিত হতে পারে (can be reduced to his essence)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা স্বীকার করেন যে, তিনি জ্ঞাতা (knower)। এখন তাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, জ্ঞাতা হওয়ার বিষয়টি অস্তিত্বের অতিরিক্ত (addition to existence)। প্রশ্ন করা উচিত : আদি সত্তা কি নিজকে ব্যতীত অন্যকিছু জানেন (knows anything other than himself)? এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন উত্তর। কেউ এটা স্বীকার করেন, অপরপক্ষে অন্যরা বলেন, তিনি কেবল নিজেকেই জানেন (He knows himself only)।

আল্লাহ্ নিজকে ব্যতীত অন্য কি (what is other) তা জানেন—এ মত ইবনে সিনা কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ সার্বিক উপায়ে সকল বস্তুকে জানেন (God knows all things in a universal manner) যা কালের (Time)-এর আওতায় পড়ে না। তিনি যুক্তি দেখান যে, বিশেষগুলো (particulars) আল্লাহ্র নিকট জ্ঞাত নয় (are not known to him)। কারণ বিশেষের জ্ঞান সারবত্তার পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে।

www.pathagar.com

এ মতবাদের প্রতিবাদ গ্রহণে আমরা বলব :

সকল উপজাতি ও জাতি সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র জ্ঞান যার সংখ্যা অনন্ত তা' কি তাঁর আত্মজ্ঞানের সাথে অভিন্ন, নাকি, অভিন্ন নয়? যদি তোমরা বল যে, অভিন্ন নয়, তবে বহুত্ব স্বীকারে তোমরা নিয়ম ভঙ্গ করবে। যদি অভিন্ন বল তবে, কেন তোমরা নিজেদেরকে সেই শ্রেণীভুক্ত কর না যারা দাবি করেন যে নিজ ব্যতীত অন্য কি এর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান তার আত্ম-জ্ঞান এবং তার সারবত্তার সাথে অভিন্ন? এবং যিনি এই উক্তি (statement) করেন তিনি অবশ্যই একজন নির্বোধ।

তাকে বলা হবে : 'এক' (one) বস্তুর সংজ্ঞা এই যে, এটা অসম্ভব—এমন কি কল্পনায়ও—এর মধ্যে স্বীকার এবং অস্বীকারের সমন্বয়ের ধারণাও (To suppose the combination of affirmation and denial in it) অসম্ভব। 'এক' বস্তুর জ্ঞান এক হওয়ার কারণে এটা কল্পনা করাও অসম্ভব যে একই সময়ে এটা অস্তিত্বে আছে এবং অস্তিত্বে নেই। তার নিজকে ব্যতীত অন্যবস্তু সম্বন্ধে তার জ্ঞান ব্যতিরেকে যেহেতু মানুষের জ্ঞান ধারণা করা অসম্ভব নয়—এমনকি কল্পনায়ও নয়, তাই তার আত্মজ্ঞান নিজকে ব্যতীত অন্য বস্তুর জ্ঞানের সাথে অভিন্ন নয় (since it is not impossible to suppose–in the imagination—a man's self knowledge is not identical with his knowledge of things other than himself) যদি দু'টি জ্ঞান অভিন্ন হয়, তবে একটির অস্বীকার অন্যটির অস্বীকার হবে; একটির স্বীকার অন্যটির স্বীকার হবে। এটা অসম্ভব যে জায়েদ একই সময়ে আছে এবং নেই। কিন্তু এ বিষয়টি জ্ঞানের (cognition) ক্ষেত্রে সত্য নয় (not true)—যেমন আত্মজ্ঞান এবং অপরের জ্ঞান (self knowledge and the knowledge of other) অনুরূপে, আল্লাহ্‌র আত্মজ্ঞান এবং অপরের জ্ঞান অভিন্ন হতে পারে না। কারণ, তাদের একটির অস্তিত্ব অপরটির অস্তিত্ব ব্যতীত কল্পনা করা সম্ভব। তারা দু'টি ভিন্ন বস্তু। কিন্তু তাঁর সারবত্তার অস্তিত্বের কল্পনা, ব্যতীত সম্ভব নয় (It is not possible to imagine the existence of his essence without imagining the existence of his essence)। যদি তাঁর সারবত্তার আত্মা-অনুরূপতা (self-sameness) দু'জ্ঞানের ন্যায় (two cognitions) হতো, তবে এই কল্পনা অসম্ভব হতো। অতএব, যে দার্শনিক আল্লাহ্ নিজকে ব্যতীত অন্যকিছু জানেন বলে দাবি করেন, তিনি বস্তুত বহুত্বকেই স্বীকার করেন (affirms plurality)।

যদি বলা হয় :

তিনি প্রাথমিক ইচ্ছার দ্বারা (by primary intention) অপরকে (other) জানেন না। কিন্তু জগতের সত্তা হিসেবে নিজেকে জানেন। এই জ্ঞান থেকে এটা অনুসরণ করে—দ্বিতীয় ইচ্ছা (second intention)—জগতের জ্ঞান (knowledge of the universe)। তিনিই জগতের সত্তা, এ জানা ব্যতীত তিনি নিজেকে জানেন এটা অসম্ভব। জগতের সত্তা হওয়ার অর্থ তাঁর সারবত্তার বাস্তবতা। নিহিতার্থ (implication) বা অনিবার্যের পরিণামের উপায় দ্বারা অপর (other) তাঁর জ্ঞানে প্রবেশ করা ছাড়া তিনি নিজকে ব্যতীত সেই অন্যের সত্তা হিসেবে নিজকে জানেন এটা

www.pathagar.com

সম্ভব নয় (it is not possible that he should know himself of the principle of that which is other that himself, without the other entercing into his knowledge —by way of implication or necessary consequence)। তাঁর সারবত্তার অনিবার্য না হওয়ার কোনো কারণ নেই। অনিবার্য পরিণাম সারবত্তার সারাংশে (quiddity in the essence) বহুত্বকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে না। যা অসম্ভব তা' হচ্ছে যে, স্বয়ং সারবত্তার মধ্যে কেবল বহুত্ব থাকবে।

বিভিন্ন দিক থেকে উত্তর :

প্রথমত, তোমাদের উক্তি জগতের সত্তা হিসেবে তিনি নিজেকে জানেন এটি একটা স্বেচ্ছাচারী ধারণা। যথার্থ হতো যদি বলা হতো যে, তাঁর সারবত্তার অস্তিত্বের জন্যই তিনি জানতেন (He knew)। সত্তা হওয়ার জ্ঞান অস্তিত্বের জ্ঞানের অতিরিক্ত। সত্তা হওয়ার বিষয়টি সারবত্তার সাথে সম্পর্কিত। সম্পর্ককে না জেনেও একজনের পক্ষে তার সারবত্তাকে জানা সম্ভব। সত্তা হওয়ার বিষয়টি যদি সম্পর্ক সম্পর্কিত না হতো,তবে, সারবত্তা হতো বহু (multiple), অর্থাৎ, অস্তিত্ব থাকত এবং সত্তা হওয়ার অবস্থাও থাকত (there would be existence and the state of being a principle)। কারণ, অস্তিত্ব এবং সত্তা হওয়ার বিষয় দু'টি ভিন্ন জিনিস। সেএকটি পরিণাম নয় জানা ব্যতীতও মানুষের পক্ষে নিজকে জানা সম্ভব (কারণ, সেই জ্ঞান পরিণাম হওয়ার সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত, তার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল যার কারণ সে বহন করে)। তদ্রূপ, আল্লাহ্‌র কারণ হওয়া হচ্ছে একটা সম্পর্ক (God's being the cause is a relation)যা তিনি তাঁর পরিণামে বহন করেন (He bears to his effects)। পরিণামগুলোকে যদি ত্যাগও করা হয় তবু তাদের উক্তির প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ সত্তা হিসেবে তিনি নিজেকে জানেন বলবৎ থাকে। কারণ, উক্তিটি সারবত্তার জ্ঞান এবং সত্তা হওয়ার জ্ঞানকে অর্থ করে। সত্তা হওয়া বিষয়টি হচ্ছে সারবত্তার একটি সম্পর্ক বিশেষ। একটি সারবত্তার সম্পর্ক বিষয়টি সারবত্তার সাথে অভিন্ন নয় (A relation of essence is not indentical with the essence)। অতএব, সম্পর্কের জ্ঞান সারবত্তার জ্ঞানের সাথে অভিন্ন হতে পারে না। এই সিদ্ধান্তে আমাদের যুক্তি পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে, যথা : একদিকে সত্তা হওয়ার জ্ঞান কল্পনা ব্যতীত সারবত্তার জ্ঞান কল্পনা সম্ভব এবং অন্যদিকে, সারবত্তার জ্ঞান কল্পনা ব্যতীত (কারণ সারবত্তা এক) সারবত্তার জ্ঞান কল্পনা সম্ভব নয় বা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় ইচ্ছার দ্বারা জগৎ তাঁর নিকট পরিচিত (known), তাদের এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত। কারণ তাঁর জ্ঞান যদি অপরকে (other) পরিবেষ্টন করে থাকে, যেমন নাকি তাঁর সারবত্তাকে পরিবেষ্টন করে আছে, তবে তাঁর জ্ঞানের দুটি ভিন্ন বিষয় (object) থাকবে। পরিচিত বস্তুর সংখ্যা এবং পৃথককরণ জ্ঞানের সংখ্যাগত বৃদ্ধিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে। যেহেতু কল্পনায় জ্ঞানের বিষয়কে এক থেকে অন্যকে পৃথক করা সম্ভব, তাই একের জ্ঞান অন্যের সাথে অভিন্ন হতে পারে না। এটা যদি না হয়, তবে অন্য ব্যতীত একের অস্তিত্ব ধারণা করাও সম্ভব হবে না। যদি সকল জ্ঞান এক হয় তবে, 'অন্য' (other) থাকবে না : শব্দের ব্যবহারে ভাষার পরিবর্তন 'দ্বিতীয় ইচ্ছাও'— কোনো পার্থক্যও সৃষ্টি করবে না।

www.pathagar.com

আমি কিভাবে অনুধাবন করতে পারি যখন একজন বলেন :

স্বর্গ অথবা মর্ত্যের উপর এমন কিছু নেই—এমন কি বালুকণা পর্যন্ত যা তাঁর জ্ঞান থেকে লুক্কায়িত। কিন্তু তিনি বস্তুকে জানেন সার্বিক উপায়ে (universal manner)। সার্বিকগুলো যা জানা যেতে পারে তার সংখ্যা অনন্ত। কিন্তু জ্ঞানের বস্তুসমূহের মধ্যে বহুত্ব ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এসব বস্তুসমূহের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সবদিক থেকে এক।

বহুত্ব অস্বীকার করবে কিভাবে? ইবনে সিনা এই বিষয়ে অন্য দার্শনিকদের বিরোধী। তিনি বহুত্বকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে এই মতবাদ গ্রহণ করেন যে, আল্লাহ্ নিজকে ব্যতীত অন্যকিছু জানেন না। বহুত্ব অস্বীকারে ইবনে সিনা কিভাবে এসব দার্শনিকদের সাথে একমত হন এবং অপর সম্বন্ধে আল্লাহ্র জ্ঞানের স্বীকারে আবার দ্বিমত পোষণ করেন। এ বলাতে তার লজ্জিত হওয়া উচিত যে—

আল্লাহ্ এ-জগতে অথবা পরজগতে কোনো কিছু জানেন না। তিনি কেবল নিজেকেই জানেন। কিন্তু, অন্য প্রতিটি সত্তা জানে (ক) আল্লাহ্কে (খ) নিজকে এবং (গ) নিজকে ব্যতীত অন্যকে। সুতরাং জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সত্তা আল্লাহ্র চেয়ে মহত্তর।

তাই তিনি এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তিনি এতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সর্বদিক থেকে বহুত্ব অস্বীকারে তিনি লজ্জাবোধ করেন নি। তিনি ব্যক্ত করেন যে, আল্লাহ্র আত্মজ্ঞান এবং নিজ ব্যতীত অন্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাঁর সারবত্তারই নামান্তর। এই হচ্ছে বিরোধিতা—যা প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—যাতে সব দার্শনিকেরই লজ্জিত হওয়া উচিৎ। এভাবে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ইবনে সিনা এবং যাদের সাথে তিনি একমত পোষণ করেন না, উভয়েই এমন সব কথা বলে পরিসমাপ্তি টানেন যা লজ্জাজনক। এভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাভূত করেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত। তারা ভাবেন যে তাদের প্রজ্ঞা অথবা কল্পনা ঐশী সত্তাকে আঁকড়িয়ে ধরার জন্য সাহায্য করতে পারে।

যদি বলা হয় : যদি এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সম্পর্কের দ্বারা সত্তা হিসেবে তিনি নিজেকে জানেন,তবে বিষয়ের জ্ঞান যাতে (to which) সম্পর্ক জন্মে তা' এক (one) হবে। কারণ যিনি 'পুত্র' (son)-কে জানেন, তিনি তাকে 'এক' জ্ঞানের দ্বারাই জানেন যা নিহিতার্থে (by implication) 'পিতা', 'পিতৃত্ব' এবং 'পুত্রত্বের' জ্ঞানও বটে (knowledge of father, fatherhood and sonhood)।

এভাবে জ্ঞানের বস্তুর বহুত্বতা সত্ত্বেও জ্ঞান এক থাকে। অনুরূপে, আল্লাহ্ অপরের সত্তা হিসেবে নিজেকে জানেন, জ্ঞানের বস্তুর বহুত্বতা সত্ত্বেও এখানেও জ্ঞান এক থাকে। আল্লাহ্র সাথে এ পরিণাম এবং এর সম্পর্ক হিসেবে যেহেতু এ ধরনের বিষয় বোধগম্য এবং যেহেতু এটা বহুত্বকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে না, তাইএটা অনুসরণ করে যে, সেই সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে অর্থাৎ যা বহুত্বের কারণ তাও বহুত্বকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে না।

একজন যখন একটি বস্তুকে জানেন এবং সেই বস্তুর জ্ঞানকেও জানেন তখন একই ঘটনা ঘটে। বস্তুকে জেনেই তিনি তার বস্তুর জ্ঞানকে জানেন। কারণ, প্রতিটি বস্তুই হচ্ছে নিজের জ্ঞান (knowledge of itself), এর বিষয় হিসেবে এভাবে, জ্ঞানের বিষয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জ্ঞান এক থাকে।

www.pathagar.com

আমাদের মতবাদের অন্য একটি প্রমাণ এই যে, তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্র জ্ঞানের বিষয় সংখ্যায় অনন্ত, কিন্তু তাঁর জ্ঞান এক। তোমরা বল না যে, তাঁর জ্ঞানের অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে। যদি জ্ঞানের বিষয়ের বহুত্ব, স্বয়ং জ্ঞানের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাত, তবে ঐশী সত্তার জ্ঞানের অসীম সংখ্যাও থাকত যা অসম্ভব।

আমাদের উত্তর হবে : সর্বদিক থেকে জ্ঞান যখন এক তখন দুই বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক অকল্পনীয়। এক বস্তুর অধিক জ্ঞানের সম্পর্ক বহুত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, অবশ্য যদি দার্শনিকদের বহুত্ব মতবাদের নীতি অনুসরণ করা হয়। কারণ, তারা অতিরঞ্জিত করেছে (বহুত্বের অর্থের) এই বলে যে, অস্তিত্বের গুণাবলির অধিকারী হিসেবে আল্লাহ্র যদি সারাংশ থাকত তবে বহুত্বের উদ্ভব ঘটত। তারা দাবি করেন যে একটি বস্তু যার বাস্তবতা আছে এবং তারপর (then) যাতো অস্তিত্ব আরোপিত হয় তা' বোধগম্য নয়। তারা বলছেন যে, যদি অস্তিত্ব বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে দু'টি ভিন্ন বস্তু হবে যেখানে বহুত্বের উদ্ভব ঘটবে। সুতরাংএই ভিত্তিতে (on this ground) বহু বস্তুর সাথে এক জ্ঞানের ধারণা করা অসম্ভব—কেননা তা'হলে এক ধরনের বহুত্বের উদ্ভব ঘটবে যা অধিকতর স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট তার চাইতে যা সারাংশের সাথে সম্পর্কিত অস্তিত্বের ধারণা থেকে আসে।

'পুত্রে'র অথবা যে কোনো আত্মীয়তার জ্ঞান সম্বন্ধে বলা যায় যে এর মধ্যে বহুত্ব রয়েছে। কারণ, 'পুত্রে'র জ্ঞান এবং 'পিতা'র জ্ঞান দু'টি ভিন্ন জ্ঞান। আবার, তৃতীয় জ্ঞান রয়েছে, যেমন :এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কের জ্ঞান। দু'টি জ্ঞানের মধ্যে তৃতীয় জ্ঞান অন্তর্নিহিত, কারণ তারা হচ্ছে এর শর্ত, এর আবশ্যকতার প্রস্তুতি। সম্পর্কিত বিষয়কে না জেনে সম্বন্ধকে জানা যায় না। এসব জ্ঞান সংখ্যাগতভাবেই স্পষ্ট এবং তাদের কোনো কোনোটি অন্যের দ্বারা শর্তাবদ্ধ (conditioned)।

তাদের সত্তা হওয়ার কারণে জাতি ও উপজাতির সম্বন্ধ হিসেবে আল্লাহ্ যদি নিজেকে জানেন,তবে এই জ্ঞান দাবি করে যে তিনি জানবেন (ক) নিজেকে (Himself) (খ) একে একে জাতি ও উপজাতিকে (genera and species one by one), (গ) জাতি ও উপজাতির সাথে তাঁর সম্পর্ককে—জাতি ও উপজাতির সত্তা হওয়ার কারণে (His relation to the genera and species—by virtue of his being the principle of genera and species) এটা না হলে এমন বলা বোধগম্য হবে না যে সম্পর্ক (relation) হচ্ছে তাঁর জ্ঞানের বিষয় (The relation is the object of His knowledge)।

তাদের বক্তব্য যে, তিনি যিনি কোনো কিছু জানেন, তিনি তার জ্ঞানকে জানেন এই জ্ঞানেরই দ্বারা (যা প্রদর্শন করে যে জ্ঞানের বিষয়ের বহুত্বতা সত্ত্বেও জ্ঞান এক থাকে) এ কথাটি সত্য নয়। যিনি কোনো বিষয়ে তার জ্ঞানকে জানেন, তিনি তা'জানেন অন্যের জ্ঞান দ্বারা (দ্বিতীয় জ্ঞানকে জানেন তৃতীয় জ্ঞান দ্বারা) এভাবে চলতে থাকে যে পর্যন্ত না এ অনুক্রম সেই জ্ঞানে পৌঁছায় যা সম্বন্ধে সে অমনোযোগী এবং যা তার জ্ঞাত নয়। তাই (পরিশেষে) সে হয় জ্ঞানে অমনোযোগী, কিন্তু জ্ঞানের বিষয়ে অমনোযোগী নয়।

www.pathagar.com

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন একজন কালোবস্তুকে জানেন, জানার সময় তার আত্মা এই বস্তুতে নিমগ্ন থাকে এবং এ কারণেই এ বিষয়ে তার জ্ঞানের সম্বন্ধে তিনি অমনোযোগী বা অনবহিত থাকেন। কারণ, যদি তিনি তার জ্ঞানে সচেতন থাকতেন, এটার জন্য অন্য জ্ঞানের প্রয়োজন হতো—যার দ্বারা তার সচেতনতা নিবৃত্ত হতো।

ঐশী জ্ঞানের বিষয়ের ক্ষেত্রে (objects of Divine knowledge) আমাদের প্রতিবাদ আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে বলে তাদের উক্তি সম্বন্ধে আমরা বলব : এই গ্রন্থে আমাদের উদ্দেশ্য (পদ্ধতি, system) গঠনমূলক নয়, বরং সেসব বিষয়ের আলোচনা এতে অন্তর্ভুক্ত যা ধ্বংসমূলক বা সমালোচকমূলক। এই কারণেই গ্রন্থটিকে আমরা 'দার্শনিকদের ধ্বংস' বলে (Destruction of philosophers) অভিহিত করেছি—'সত্যের ভূমিকা' (Introduction to truth) নয়। ফলে তোমাদের অভিযোগের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য নই।

যদি বলা হয় :

কোনো একটা নির্দিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করতে হবে আমরা এমন বলছি না, অর্থাৎ কোনো বিশেষ দলের (sect) মতকে। কিন্তু একটি জটিলতা যা মানবজাতির নিকট নিজেকে উপস্থাপন করে এবং যা সবার নিকট সমভাবে ব্যর্থ (baffling) তাঁকে তোমার পরিত্যাগ (dismissed) করা উচিত হবে না। আমরা যে জটিলতা উত্থাপন করেছি তা' এ ধরনেরই। তাই তোমরা বা কোনো দল একে অবহেলা করতে পার না।

আমরা বলব :

না, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু সিদ্ধান্তমূলক যুক্তির দ্বারা বস্তুর সত্তার জ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের দাবির ন্যায্যতাকে ব্যর্থ প্রমাণ করা। আমরা তোমাদের স্বীয় দাবির বিশ্বাসকে নাড়া দিতে চাই। যেহেতু, তোমাদের অক্ষমতা এখানে প্রদর্শিত হয়েছে, এখন তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কিছুসংখ্যক লোক আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে, ঐশী বস্তুর সত্তাকে বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায় না। বিপরীতে, তাদেরকে আবিষ্কার করা মানুষের ক্ষমতার অতীত। এ কারণেই বিধানদাতা (Law-giver) বলেন : "আল্লাহ্‌র সৃজনমূলক ক্রিয়ার সৃষ্টির উপর চিন্তা কর এবং ভাব; তাঁর সারবত্তার উপর নয়।" তুমি লোকদের কিভাবে অ-প্রমাণ করবে?

যারা রাসূলদের সত্যতায় বিশ্বাস করেন, রাসূল কর্তৃক অলৌকিকতা প্রদর্শনকে তারা তাদের যুক্তি হিসেবে দেখেন।

যারা তাঁর সম্বন্ধে বুদ্ধিগত বিচার প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন যিনি রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন।

যারা ঐশী গুণাবলির বুদ্ধিগত অনুসন্ধানের প্রয়াস থেকে বিরত থাকেন। ঐশী গুণাবলি সম্বন্ধে বিধানদাতা তাদের যা বলেছেন তা যারা বিশ্বাস করেন।

যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিধান প্রদাতা যেসব শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন; যেমন, 'এক জ্ঞাতা' : 'এক ইচ্ছাময়' : 'সর্বশক্তিমান'কে অনুসরণ করেন। তাঁর উপর আরোপিত সে সকল শব্দ যারা প্রত্যাখ্যান করেন যা তাদের জন্য অনুমোদিত নয়।

এবং যারা স্বীকার করেন যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দ্বারা এসব বিষয়কে তারা বুঝতে অক্ষম।

www.pathagar.com

তুমি এসব লোকদের সাথে অনৈক্য প্রকাশ কর, কারণ তোমরা মনে কর যে তারা বুদ্ধিগত প্রমাণের পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং সহানুমানের আকারে তারা তাদের বাক্যকে বিন্যস্ত করতে পারে না। এবং তোমরা দাবি কর যে, তোমাদের বুদ্ধিগত পদ্ধতির দ্বারা ঐশী বস্তুর সত্তা আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু তোমাদের অসহায়ত্ব প্রদর্শিত হয়েছে, তোমাদের পদ্ধতির অসংগতি প্রকাশ করে ফেলা হয়েছে এবং তোমাদের সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের দাবিকে উল্টে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই আলোচনায় এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। তারা কোথায় যারা বলেন যে গাণিতিক যুক্তি, তাত্ত্বিক যুক্তির ন্যায়ই সিদ্ধান্তমূলক।

যদি বলা হয় :

এই জটিলতাকে ইবনে সিনার নিকট উপস্থাপন করা উচিত যিনি স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্ নিজকে ব্যতীত অন্যকে জানেন। দার্শনিকদের মধ্যে 'পণ্ডিতগণ' (masters) একমত পোষণ করেন যে তিনি নিজকে ব্যতীত অন্যকিছু জানেন না। তাই তোমাদের উত্থাপিত জটিলতা বিদূরিত হয়েছে।

আমাদের উত্তর হবে :

এই অখ্যাত মতবাদ সম্বন্ধে সাবধান হও। যদি এটা চরমভাবে আপত্তিকর না হতো, তবে পরবর্তী দার্শনিকগণ একে সমর্থনে প্রত্যাখ্যান করত না। একে এই আপত্তিকর ভাবার কারণ ব্যাখ্যা করা যাক। এটা এই অর্থ করে যে, আল্লাহ্র পরিণাম (effects of God) আল্লাহ্র চেয়ে মূল্যবান (worthier)। কারণ, একজন ফেরেশতা, একজন মানুষ অথবা যে কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা জানেন (ক) নিজেকে, (খ) এর সত্তাকে এবং (গ) অন্যসত্তাকে। যদি আল্লাহ্ নিজকে ব্যতীত অন্যকিছু না জানেন, তবে, মানুষ (ফেরেশতাদের প্রশ্নও উঠে না) কিংবা পশুর (যারা-আত্ম-সচেতনতা ব্যতীতও অন্য অনেক বস্তু জানে) তুলনায়—তিনি অপূর্ণ (imperfect) হবেন। স্পষ্টতই, জ্ঞান মূল্যের কারণ; এবং এর অনুপস্থিতি হচ্ছে অপূর্ণতা।

দার্শনিকদের উক্তিগুলো এখন কোথায় যারা বলেন তিনি প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ, কারণ, পূর্ণ জাঁকজমক ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য তাঁরই অধিকারে? একটি সাধারণ সত্তা কি সৌন্দর্য থাকতে পারে যার সারাংশ বা সত্তা নেই এবং যিনি জানেন না জগতে কি ঘটছে অথবা অনিবার্যভাবে এ থেকে কি অনুসরণ করছে বা অগ্রসরমানতা হচ্ছে। আল্লাহ্র অপূর্ণ জগতে এরচেয়ে অধিকতর অপূর্ণতা আর কি হতে পারে? সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করবে যে, দার্শনিকগণ যারা বুদ্ধির গভীর পাণ্ডিত্যের দাবি করেন, পরিশেষে, তারা এই বলে পরিসমাপ্তি টানেন যে পরম সত্তা যিনি কারণের কারণ তিনি জানেন না জগতে কি ঘটছে। তাঁর আত্মজ্ঞান ভিন্ন একজন মৃত ব্যক্তির সাথে তাঁর কি পার্থক্য থাকতে পারে? তাঁর আত্মজ্ঞানকে পূর্ণ বলার কি যুক্তি থাকতে পারে যদি তিনি নিজকে ব্যতীত অন্যের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন। মতবাদটি এত সুস্পষ্টভাবেই আমর্যাদাকর একে প্রমাণ করার জন্য বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নেই। পরিশেষে, দার্শনিকদের এটা বলা উচিত : এসব অমর্যাদাকর বিষয়ে নিজেদের জড়িত করেও তোমরা বহুত্ব থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হও নি। আমাদের জিজ্ঞাস্য : তাঁর আত্মজ্ঞান কি

www.pathagar.com

তাঁর নিজ ব্যতীত অভিন্ন অথবা অন্যকিছু? যদি বল এটা নিজ ব্যতীত অন্যকিছু, তবে বহুত্বের আবির্ভাব ঘটছে। কিন্তু, যদি বল অভিন্ন, তবে তোমার এবং তার মধ্যে পার্থক্য কি যিনি বলেন যে, মানুষের আত্মজ্ঞান তার নিজ সাথে অভিন্ন। এমন উক্তিতে আমাদের উত্তর হবে : এই হচ্ছে মূর্খতা। মানুষের সারবত্তার অস্তিত্ব বোধগম্য—সেই সময়েও যখন সে নিজের প্রতি অমনোযোগী থাকে। যখন তার অমনোযোগ নিবৃত্ত হয়, তিনি নিজকে জাগ্রত করেন (awakens to himself)। এটা আবার এই প্রদর্শন করে যে তার আত্ম-চৈতন্য হচ্ছে নিজ ব্যতীত অন্যকিছু।

যদি তোমরা বল :

মানুষ কোনো কোনো সময় আত্ম-জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকে, যা পরে তার নিকট আবির্ভাব ঘটে। এটা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, আত্মজ্ঞান নিজ ব্যতীত অন্যকিছু।

আমাদের উত্তর হবে :

অন্যতা (otherness) ঘটনা বা সহ-অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয় না একটি বস্তুর পরিচিতি এতে ঘটে না। যা কিছুর চেয়ে অন্য, তা' সেই বস্তু হয় না—অর্থাৎ এর সাথে সহঅবস্থিতি হওয়ার কারণে এটা সেই বস্তু থেকে অন্যবস্তু হওয়া থেকে বিরত হয় না। অতএব আল্লাহ্ যদি কখনও নিজেকে একজন জ্ঞাতা হওয়ার থেকে বিরত না রাখেন, তবে এটা অনুসরণ করে না যে তাঁর আত্ম-জ্ঞান হচ্ছে তাঁর সারবত্তা। কল্পনা একটি সারবত্তার ধারণা স্বীকার করে এবং তারপর (then) চৈতন্যের আবির্ভাব। সারবত্তার সাথে যদি চৈতন্য অভিন্ন হতো, তা'হলে এই কল্পনার কাজ সম্ভব হতো না।

যদি বলা হয় : তাঁর সারবত্তা হচ্ছে বুদ্ধি ও জ্ঞান (Intelligence and knowledge)। এমন কিছু নেই : "সারবত্তা : তারপর সত্তার মধ্যে জ্ঞান অস্তিত্ব থাকে।"

আমরা বলব—

সুস্পষ্টভাবেই এটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। জ্ঞান হচ্ছে একটা গুণ অথবা উপলক্ষণ যার জন্য কর্তার প্রয়োজন। তাঁর নিজের মধ্যে তিনি বুদ্ধি অথবা জ্ঞান বলা অনেকটা তিনি শক্তি বা ইচ্ছা বলার ন্যায়। পরবর্তী বক্তব্য এই পর্যায়ে নিয়ে আসে যে শক্তি বা ইচ্ছা যেন স্বয়ং অস্তিত্বশীল। এ মত যদি যথার্থভাবেই পোষণ করা হয়, তবে এটা অনেকটা এই বলার ন্যায় যে, কালত্ব, শ্বেতত্ব, পরিমাণ, অথবা ক্রিত্ব, চারুত্ব অথবা অন্য যে কোনো উপলক্ষণ (any other accident) স্বয়ং অস্তিত্বশীল। যে যুক্তি অস্তিত্বশীল গুণাবলির অসম্ভাব্যতা বস্তুতে নয়, তাদের নিজেদের মধ্যে বলে প্রমাণ করে, একই যুক্তি সজীব সত্তার গুণাবলি প্রমাণেও প্রযোজ্য, অর্থাৎ, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা প্রভৃতির অস্তিত্ব, তাদের নিজেদের মধ্যে নয়, তার সারবত্তায় অস্তিত্ব থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জীবন সারবত্তায় অস্তিত্বশীল। অন্যসকল গুণাবলির সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র গুণাবলির অস্বীকারে কিংবা তাঁর সত্তা ও সারাংশকে অস্বীকারেই পরিতুষ্ট নয়, তারা আরো অগ্রসর হন—তারা তাঁকে উপলক্ষণের প্রকৃতি ও গুণাবলিতে রূপান্তর করে তাঁর আত্মবিদ্যমানতা (self-subsistence)-কেও অস্বীকার করেন যা নিজেরা থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা এটা দেখাতে চাই যে, (এই গ্রন্থের অন্য সমস্যাতে) তিনি জানেন—নিজেকে, অথবা তাঁকে ব্যতীত অন্যকে।

www.pathagar.com

নবম সমস্যা

আল্লাহ্ বস্তু নয়, বৌদ্ধিক যুক্তির দ্বারা এটা প্রমাণে দার্শনিকদের অক্ষমতা।

আমরা বলব :

যিনি বিশ্বাস করেন যে, বস্তু বা দেহ কালে (time) সৃষ্টি বা উদ্ভূত হয়েছে (কারণ, এটা কখনও পরিবর্তন মুক্ত নয় এবং সকল পরিবর্তনের জন্যই একজনের দরকার যিনি কালে এদেরকে সৃষ্টি করেন)। তিনি সংগতভাবেই এই মত পোষণ করতে পারেন যে, আল্লাহ্ বস্তু নয়। কিন্তু তোমরা চিরন্তন বস্তুর ধারণাতে বৌদ্ধিক সম্মতি প্রদান কর যার কখনও শুরু হয় নি এবং যা সর্বদা পরিবর্তনের অধীন। যদি তাই হয়, তবে তোমার জন্য এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব হবে কেন যে আদি সত্তা হচ্ছে বস্তু—সূর্য অথবা উচ্চতম মণ্ডল প্রভৃতি?

যদি বলা হয় :

কারণ এই যে, বস্তু গঠিত (composed) হতে বাধ্য। একে বিভক্ত করা যেতে পারে : (ক) পরিমাণগতভাবে, দুই অংশে (খ) ধারণাগতভাবে, আকার এবং জড়ে এবং (গ) সে সব গুণে যা বিশেষ করে বস্তুর সাথে জড়িত যাতে করে বস্তু থেকে বস্তুকে পৃথক করা যায়, কিন্তু এটা ভিন্ন নয়। কিন্তু, অনিবার্য সত্তা এক এবং অভিভাজ্য—এসব বস্তুর প্রেক্ষাপটে।

আমাদের উত্তর :

আমরা তোমাদের এই যুক্তি খণ্ডন করেছি এবং দেখিয়েছি যে তোমরা একমাত্র যা প্রমাণ করতে পার তা হচ্ছে সমগ্রের (aggregate) যদি কিছু অংশের অন্যকে প্রয়োজন হয়, তবে সমগ্র বা সমষ্টি কারণিত বস্তু হবে। আমরা এই বিষয়টি বিবেচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে, একটি সত্তাকে ধারণা করা যদি অসমর্থনীয় (untenable) হয় যা 'যিনি এর সত্তা ঘটান' (causes its being) তার নিরপেক্ষ, তবে এটাও অসমর্থনীয় হবে না এই ধারণা করা (ক) একটা মিশ্রণ (compound) যা 'যিনি মিশ্রণ ঘটান' তার নিরপেক্ষ, অথবা (খ) অনেক সত্তা যা 'যিনি সত্তা ঘটায়' তার নিরপেক্ষ। মিশ্রণের অস্বীকারের উপর তোমরা সংখ্যা ও দ্বৈততা অস্বীকারের ভিত্তি করেছ এবং মিশ্রণ বা গঠনের (composition) অস্বীকার নির্ভর করে আছে সারাংশের অস্বীকারে—যেন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে। আমরা তোমাদের সারাংশের অস্বীকারকে প্রত্যাখ্যান করেছি যা তোমাদের মতবাদের আদি ভিত্তি এবং প্রদর্শন করেছি কেমন স্বেচ্ছাচারী (arbitrary) তোমাদের ধারণা।

www.pathagar.com

যদি বলা হয় :

বস্তু যদি আত্মার সাথে সংযুক্ত না হয়, তবে এটা কার্যকরী কারণ হবে না। কিন্তু যদি আত্মার সাথে সংযুক্ত হয়, তবে আত্মা হবে এর কারণ। তাই বস্তু আদি বা প্রথম কারণ হতে পারে না।

আমাদের উত্তর হবে :

আমাদের আত্মা আমাদের দেহের কারণ নয়। কিংবা (তোমাদের মতানুসারে) স্বয়ং মন্ডলের আত্মা মন্ডলের দৈহিক কারণ নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বহির্কারণ দ্বারা দেহ উৎপাদিত হয়। এবং এটা চিরন্তন হতে পারে, তবে এর আদৌ কারণ থাকবে না।

যদি বলা হয় :

তা'হলে দেহ ও আত্মার সমন্বয় (combination) কিভাবে ঘটে?

আমাদের উত্তর হবে :

এ প্রশ্নটি অনেকটা এমন জিজ্ঞাসার ন্যায় : আদি সত্তার আবির্ভাব কেমনে ঘটেছে? এ প্রশ্নের জবাব হবে : এ প্রশ্নটি একটি বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্ধে করা যেতে পারে। 'কিভাবে বস্তুর উৎপত্তি ঘটে? একটা সত্তা সম্বন্ধে এ জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে না যা কখনও অস্তিত্ব থেকে নিবৃত থাকে না। অনুরূপে, যদি দেহ কিংবা আত্মা কোনটাই অস্তিত্ব থেকে বিরত না হয়, এটা অসম্ভব হবে কেন যে দেহ সৃষ্টিকর্তা হবে?

যদি বলা হয় :

কারণ বস্তু হিসেবে বস্তু অন্যসত্তা সৃষ্টি করতে পারে না। এবং আত্মা যা দেহের সাথে সংযুক্ত তা' কেবল দেহের মাধ্যমে কাজ করে। এই উদ্দেশ্যে দেহ আত্মার মাধ্যমে হতে পারে না (ক) অন্যদেহের সৃষ্টি (খ) আত্মার উৎপাদন (গ) দেহের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন বস্তুর উৎপাদন।

আমাদের উত্তর হবে :

এটা সম্ভব হবে না কেন যে আত্মাসমূহের মধ্যে এক আত্মা যা বিশেষ গুণ দ্বারা গুণান্বিত তা' থেকে দেহ বা অন্যবস্তুর উৎপাদনের উৎস হতে পারে না। এ ধরনের অসম্ভাব্যতা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা নয় (not self evident fact)। কিংবা তাত্ত্বিক যুক্তির দ্বারাও এটা প্রমাণ করা যায় না। অভিজ্ঞতাভিত্তিক বস্তুর ক্ষেত্রে এ ধরনের বস্তু পর্যবেক্ষণ করি নি। কিন্তু, অপর্যবেক্ষণ অসম্ভাব্যতাকে প্রমাণ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দার্শনিক আদি সত্তাতে বহু বিষয় আরোপ করেন যে (বিষয়গুলো, thing) একটি সত্তাতে আদৌ আরোপ করা যায় না এবং অন্যকোনো সত্তার ক্ষেত্রে এগুলো পর্যবেক্ষিতও হয় নি। আত্মা ও দেহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সত্য প্রযোজ্য।

যদি বলা হয় :

উচ্চতম মণ্ডলের বস্তু বা সূর্য অথবা যে কোনো বস্তু মনে করা হোক তার একটা পরিমাণ রয়েছে যার বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্ভব। ফলে, বস্তুর অনিশ্চিত পরিমাণের জন্য (contingent quantity for the body) বিশেষ নির্বাচন (special choice) প্রয়োজন এবং সেই বিশেষ নির্বাচনের একটা কারণ থাকবে। অতএব, বস্তু বা দেহ আদি বা প্রথম কারণ হবে না।

www.pathagar.com

আমরা জবাব দেব :

একজনকে তুমি অ-প্রমাণ করবে কিভাবে যিনি বলেন :

"এটা অনিবার্য—সার্বিক পদ্ধতির কারণেই—এই বস্তু যে পরিমাণ বহন করছে সেই পরিমাণই তার বহন করা উচিত। বর্তমান পরিমাণের চেয়ে এর বৃহত্তর অথবা ক্ষুদ্রতম পরিমাণ থাকতে পারে না। এটা তোমাদের ব্যাখ্যার ন্যায়। তোমরা বলেছ : উচ্চতম মণ্ডলের বস্তু প্রথম পরিণাম (first effect) থেকে উদ্ভূত (emanated) হয়েছে। এই বস্তু কিছু পরিমাণ বহন করে। প্রথম পরিণামের সম্পর্কের দিক থেকে সকল পরিমাণ সমান। কিন্তু এদের একটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে-সার্বিক পদ্ধতির সাথে এর সম্পর্কের কারণে—প্রথম মণ্ডলের বস্তুর পরিমাণ হওয়ার জন্য। তাই পরিমাণ যা বাস্তবে অস্তিত্বশীল তা অনিবার্য এবং এ থেকে যা বিভিন্ন তা' প্রত্যাখ্যাত।" সুতরাং, যা পরিণাম নয় তার ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দেযা যেতে পারে।

প্রথম পরিণামের (যা তাদের মতে প্রথম মণ্ডলের বস্তুর কারণ) মধ্যে বিশেষ নির্বাচনের (special choice in first effect) সত্তার স্বীকারেও প্রশ্নটির সমাধান হচ্ছে না—অর্থাৎ, ইচ্ছাশক্তির স্বীকৃতিতেও। তারা যেভাবে মুসলমানদের নিকট (যারা চিরন্তন ইচ্ছাতে সকল বস্তুকে বর্ণনা করেন) প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয়েছে, এতে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে : কেন প্রথম পরিণামের এই (this) পরিমাণ থাকবে—অন্যদেরকে বাদ দিয়ে। (প্রকৃতপক্ষে, স্বর্গের মণ্ডলের গতির সুনির্দিষ্ট দিকের আলোচনা আমরা তাদের প্রতিবাদ তাদের বিরুদ্ধে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং ফিরিয়ে দিয়েছি দু'ই সুনির্দিষ্ট মেরুবিন্দুর আলোচনাতেও)।

যেহেতু এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, এর ন্যায় অন্য থেকে কোনো কিছুর কারণজনিত পার্থক্যের (a caused ditinction of someting) সম্ভাব্যতা স্বীকারে তারা বাধ্য। এটা স্বীকার করলেএ অনুসরণ করে যে, এ ধরনের কারণজনিত পার্থক্যের স্বীকার একটি অ-কারণজনিত (uncaused one) স্বীকারের ন্যায়ই। কারণ,এটা কোনো পার্থক্য সূচিত করে না যে এ প্রশ্নটি কোনো কিছু বিশেষ পরিমাণ সম্বন্ধে কি না, যেমন, কেন এটার হবে? অথবা কারণ সম্বন্ধে বলা যায়, যেমন, এটা কেন কোনা কিছুকে বিশেষ পরিমাণ দিয়েছে? যদি পরবর্তী প্রশ্ন, অর্থাৎ, কারণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যায় এই বলে যে, এই পরিমাণ অন্য কোনো পরিমাণের ন্যায় নয় (কারণ, এর সংযোগ রয়েছে পদ্ধতির সাথে যা অন্য পরিমাণে নেই)। তবে প্রথমোক্ত প্রশ্ন, অর্থাৎ স্বয়ং বস্তু সম্বন্ধে যার বিশেষ পরিমাণ রয়েছে তার উত্তর একইভাবে দেয়া যায়—এর কোনো বহির্কারণের দরকার পড়ে না। এই অবস্থা এড়ানো যায় না। যদি একটি বিশেষ পরিমাণ যা বাস্তবে ঘটেছে তা' যদি যা বাস্তবে ঘটে নি তার ন্যায় হয়, তবে প্রশ্ন হবে, এর ন্যায় অন্য থেকে কোনো কিছুর পার্থক্য সূচিত হবে কেমন করে? (প্রশ্নটি বিশেষ করে তাদের নীতির সাথে প্রাসঙ্গিক; কারণ তারা পার্থক্যের কারণ হিসেবে ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে)। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ যা ঘটেছে এবং যা ঘটে নি তা যদি অনুরূপ না হয়, তবে অনস্তিত্বের পরিমাণের সম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাদেরকে বলা হবে, তারা যেমন চিরন্তন কারণকে 'ঘটেছে' (to have happened) বলে মনে করে, তবে দেহ

www.pathagar.com

বা বস্তুও (যাকে তাদেরকে প্রত্যাখ্যানের জন্য আমরা প্রথম কারণ বলে ধরে নিয়েছি। 'ঘটেছে' (happened) নিত্যভাবে (eternal)।

(এই আলোচনায়, যারা দার্শনিকদের সাথে বির্তক করেন, তারা তাদের কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির ব্যবহার করবেন চিরন্তন ইচ্ছাশক্তির এবং তাদের মণ্ডলীয় গতির দিক ও মেরু মতবাদের আমাদের উত্থাপিত প্রতিপক্ষীয়- আপত্তিও)।

এবং এটা এই প্রদর্শন করে যে, যিনি দেহের উৎপত্তিতে বিশ্বাস করেন না, তিনি বৌদ্ধিক যুক্তির দ্বারা আদি বা প্রথম সত্তা যে চূড়ান্তভাবে দেহহীন তা প্রমাণ করতে পারে না।

www.pathagar.com

দশম সমস্যা

কারণ অথবা জগতের সৃষ্টিকর্তা আছে বলে যে মত তা যুক্তিসঙ্গত উপায়ে প্রমাণে দার্শনিকদের অক্ষমতা।

আমরা বলব :

যিনি বিশ্বাস করেন যে, সকল দেহ বা বস্তু উদ্ভূত (কারণ, এটা কখনও পরিবর্তন মুক্ত নয়) তার একটা বোধগম্য অবস্থান আছে, যদি তিনি দাবি করেন যে দেহ বা বস্তুর কারণ বা সৃষ্টিকর্তার দরকার। কিন্তু দার্শনিকদের জড়বাদীদের ন্যায় এই বলা থেকে কি সে বাধা দিচ্ছে যে—

"নিত্যকাল থেকেই জগৎ যেমনি আছে তেমনি রয়েছে। এর কোনো কারণ বা সৃষ্টিকর্তা নেই। তার জন্যই কারণের প্রয়োজন যা সময়ে উদ্ভূত হয়। জগতের কোনো বস্তুই সময়ে উদ্ভূত নয়—এবং এর ধ্বংসও নেই। কেবল আকার ও উপলক্ষণই (forms and accidents) কালে উদ্ভূত হয়। দেহ বা বস্তু, অর্থাৎ মণ্ডলসমূহ—নিত্য, চিরন্তন। এবং চার উপাদান যা চন্দ্রমণ্ডলের পদার্থ এবং তাদের বস্তুসমূহ এবং জড় চিরন্তন। এসব থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে মিশ্রণ ও পরিবর্তন থেকে আকার আসে (on these pass in succession the forms resulting from combination and transformation)। অধিকন্তু, মানব আত্মা এবং উদ্ভিদ আত্মা কালে উদ্ভূত। কালে সৃষ্ট সেসব বস্তুর কারণসমূহের অনুক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে ঘূর্ণন আবর্তে। এবং ঘূর্ণন গতি (rotary motion) চিরন্তন, এর উৎস হচ্ছে মণ্ডলের চিরন্তন আত্মা। এসবই এটা প্রদর্শন করে যে, জগতের কারণ নেই এবং জগতের বস্তসমূহের সৃষ্টিকর্তা নেই। অনুরূপে, জগতে বস্তসমূহ চিরন্তনভাবেই কারণহীন আছে এবং থাকবে।

জগতের চিরন্তন বস্তুর কারণ আছে বলতে দার্শনিকগণ কি অর্থ করেন?

যদি বলা হয় :

যা কারণহীন তা অনিবার্য সত্তা। অনিবার্য সত্তার গুণাবলি প্রসঙ্গে আমরা যুক্তি দেখিয়েছি কেন বস্তু অনিবার্য সত্তা হতে পারে না।

আমরা উত্তর দেব :

অনিবার্য সত্তার গুণাবলি সম্বন্ধে তোমাদের দাবির অক্ষমতা আমরা প্রকাশ করে দিয়েছি। এটা প্রদর্শিত হয়েছে যে, বৌদ্ধিক যুক্তি অনন্ত ধারার অসম্ভাব্যতা ব্যতীত অন্যকোনো কিছু প্রমাণ করতে পারে না এবং জড়বাদীগণ সংক্ষিপ্ত করেন (cuts short)—প্রারম্ভেবই অনন্ত ধারাকে এই বলে :

www.pathagar.com

বস্তুর কোনো কারণ নেই। আকার এবং উপলক্ষণ সম্বন্ধে বলা চলে তাদের কোনো কোনোটি অন্যের কারণ যে পর্যন্ত না শেষ অনুক্রম ঘূর্ণন গতিতে পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং দার্শনিকগণ নিজেরা বিশ্বাস করে (জড়বাদীগণ স্বীকার করেন) কোনো কোনো ঘূর্ণন গতি অন্যের কারণ, কিন্তু কারণের অনুক্রম ঘূর্ণন গতিতে পৌঁছে এর পরিসমাপ্তি ঘটায়।

অতএব, আমাদের উল্লেখিত আলোচনার উপর চিন্তা করলে দেখা যাবে যারা তাদের কারণ আছে বলে দাবি করে বস্তুর নিত্যতায় বিশ্বাস করে তাদের ব্যর্থতা কোথায়? এসব লোক সঙ্গতভাবেই জড়বাদ নাস্তিকবাদকে গ্রহণ করতে বাধ্য—কোনো কোনো চিন্তাবিদ দার্শনিক মতবাদের ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে—কেউ কেউ বাস্তবে স্বীকার করেছেন।

যদি বলা হয় :

আমাদের যুক্তি এই : যদি এসব বস্তুকে অনিবার্য বলে মনে করা হয়, তবে এটা হবে উদ্ভট। যদি তাদেরকে সম্ভাব্য বলে ধারণা করা হয়, তবে, যা সম্ভাব্য তার কারণ আছে।

আমাদের উত্তর হবে :

'অনিবার্য, এবং 'সম্ভাব্য' শব্দগুলো অর্থহীন। দার্শনিকদের কর্তৃক সৃষ্ট সকল গোলযোগের উৎস হচ্ছে এ দু'শব্দ। তাদের পরিবর্তে তাদেরই অর্থে আমরা পছন্দ করি এই বলা—অর্থাৎ আত্মাকে একটা কারণে অস্বীকার। এতে দার্শনিকদের বক্তব্য হবে এসব বস্তুর কারণ থাকতে পারে, বা নাও থাকতে পারে। জড়বাদীগণ বলেন, তাদের কারণ নেই। দার্শনিকগণ এতে দোষের কি দেখেন? এবং সম্ভাব্যতা যদি কি করে (what it does) এই অর্থ করে, তবে আমরা বলব বস্তু অনিবার্য, সম্ভব নয়। তারা যদি বলে বস্তু অনিবার্য হওয়া সম্ভব নয়, তবে তারা ভিত্তিহীন ও স্বেচ্ছাচারী ধারণা পোষণ করেন।

যদি বলা হয় :

বস্তুর অংশ রয়েছে বলে কেউ অস্বীকার করতে পারে না : এ অংশগুলো সমগ্র (whole) গঠন করে। এবং মূলত তারা সমগ্রের উপর পূর্বগামিতা গ্রহণ করে।

আমাদের উত্তর হবে :

তাই হোক। অংশ এবং তাদের সমন্বয়ের দ্বারা সমগ্র স্থায়ী থাকুক। অংশ এবং তাদের সমন্বয় কারণহীন, চিরন্তন এবং কার্যকরী কারণ-নিরপেক্ষ হোক। দার্শনিকগণ এসব ধারণার অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করতে পারেন না যে পর্যন্ত না তারা আদি সত্তার ক্ষেত্রে বহুত্বে অসম্ভাব্যতার যুক্তি উপস্থাপন করছে। আমরা সেই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছি। নিজেদের সমর্থনে দার্শনিকদের আর বলার কিছু নেই।

এটা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে যিনি বস্তুর উৎপত্তিতে বিশ্বাস করেন না, সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই।

www.pathagar.com

একাদশ সমস্যা

যে সব দার্শনিক অভিমত পোষণ করেন যে আল্লাহ্ অপরকে জানেন এবং তিনি সার্বিক আকারে উপজাতি ও জাতিকে জানেন এ-মতবাদের প্রত্যাখ্যান

আমরা বলি :

মুসলিমদের নিকট অস্থায়ী ও চিরন্তন সত্তার বিভক্তিকরণ একটা ব্যাপক বিভক্তিকরণ। তাদের মতে, আল্লাহ্ এবং তাঁর গুণাবলি ব্যতীত কিছুই চিরন্তন নয়। কারণ, প্রতিটি বস্তুর কালে প্রারম্ভ রয়েছে—আল্লাহ্র প্রভাবে এবং তাঁর ইচ্ছার কারণে। এসব মতাবলী থেকে আল্লাহ্র জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস অনুসরণ করে। একে তারা অনিবার্য সিদ্ধান্ত বলে মনে করে। কারণ, ইচ্ছার বিষয়বস্তুর আবশ্যকতা ইচ্ছাকারীর নিকট পরিজ্ঞাত। এ থেকে তারা আরো সিদ্ধান্ত টানেন যে, জগৎ তাঁর নিকট পরিজ্ঞাত, কারণ, এটা তাঁর কর্তৃক ইচ্ছায়িত (willed) এবং তাঁর ইচ্ছাতে এর উৎস (owes its origin to his will)। যা কিছু আছে তা' সবকিছুই তাঁর ইচ্ছা থেকে উদ্ভব। যখন এটা প্রমাণিত যে, তিনি যা ইচ্ছা করেন (what he wills) তিনি তারই ইচ্ছাকারী এবং জ্ঞাতা, তাই এটা সুস্পষ্ট যে তাঁকে অবশ্যই সজীব (Living) বলতে হবে। এবং প্রতিটি সজীব সত্তা যিনি অপরকে (who knows the other) জানেন তার সর্বাগ্রগণ্য (fortiori) আত্ম-জ্ঞান (self-knowledge) রয়েছে। এভাবে, মুসলিম মতাবাদের জগৎ আল্লাহ্র জ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে। এবং এ মতবাদ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কারণ, তারা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন কালে জগৎ উৎপত্তির ইচ্ছাকারী বা সংকল্পকারী।

কিন্তু তোমরা স্বীকার করেছ যে, জগৎ চিরন্তন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছার কারণে এটার কখনও উৎপত্তি ঘটে নি। তা'হলে তোমরা কিভাবে জান যে, নিজ ব্যতীত তাঁর অন্যের জ্ঞান রয়েছে? এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য তোমাদের যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে।

ইবনে সিনা কর্তৃক এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা 'যা তার দর্শনের বিভিন্ন অংশে উপস্থাপিত হয়েছে তা' দু'ভাবে নিম্নে সংক্ষিপ্ত রূপান্তরিত করা যেতে পারে :

(১)

প্রথমে তিনি বলেন :

আল্লাহ্ হচ্ছেন বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা (God is a being not-in-Matter)। বস্তুনিরপেক্ষ (not-in-Matter) প্রতিটি সত্তা হচ্ছে বিশুদ্ধ বুদ্ধি (Pure intelligence), প্রতিটি বিশুদ্ধ বুদ্ধির সকল বোধ-গ্রহণীয়তা (intelligible) তার

www.pathagar.com

নিকট উন্মুক্ত (laid bare unto it) থাকে, কারণ জড়ের সাথে এর সম্পর্ক (relation to matter) এবং এতে এর দখলীকরণ (occupation) বস্তুর বোধগম্যতার পথে বাধাস্বরূপ। মানুষের আত্মা জড়—অর্থাৎ, দেহের নির্দেশনার (direction) দ্বারা অধিকৃত (occupied)। মৃত্যু যখন এই অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং এটা যদি ইন্দ্রিয়গত ক্ষুধা ও অসৎ গুণাবলির দ্বারা যা সংক্রমণরূপে দৈহিক বস্তু থেকে এর নিকট আসতে পারে তা যদি সংক্রমিত না হয়, তবে সকল বোধগম্য সত্যগুলো এর নিকট উন্মুক্ত থাকে। একই কারণে, এটা বিধান রয়েছে যে সমস্ত ফেরেশতাগণ সকল বোধগম্যতাকে জানেন, ব্যতিক্রম একটিও নয়, কারণ, তারাও জড় নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ বুদ্ধি।

আমরা বলব :

আল্লাহ্ বস্তুনিরপেক্ষ বলতে যদি তোমরা এই বুঝে থাক যে তিনি বস্তু নন এবং বস্তুর উপর ছাপও (impressed) নন, কিন্তু নিজের মধ্যেই নিজে অস্তিত্বশীল (subsists by himslf) যাঁর কোনো স্থান (location) নেই বা দিক (dimension) নেই, তবে এসবই হচ্ছে তর্কাতীত, অকাট্য (indisputable) সত্য। কিন্তু তোমাদের কথা অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে : তোমরা বলছ যার এই গুণ আছে, তিনি হচ্ছেন বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা জ্ঞান (pure intelligence)। এখন বুদ্ধি বলতে তোমরা কি বুঝ? তোমরা যদি এরদ্বারা এমন কিছুকে অর্থ কর যা সব বস্তুকে জানে, তবে তোমাদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এটিই কি পাওয়া যেতে পারে? কিন্তু তুমি যদি অন্যকিছু অর্থ করে থাক। (যেমন, জ্ঞান হিসেবে তিনি নিজেকে জানেন), তা'হলে সেটা হবে এমন এক অবস্থা যা তোমার দার্শনিক ভ্রাতাগণ তোমাকে স্বীকার করে নিতে পারে। কিন্তু যে সিদ্ধান্তে তোমার লক্ষ্য তা হচ্ছে : যিনি নিজেকে জানেন, তিনি অপরকেও জানেন। অতএব তোমাকে বলা হবে : "তুমি কেন এই উক্তি করছ? এটা তো স্বতঃপ্রতীত সত্য নয়। সকল দার্শনিকের মধ্যে কেবল ইবনে সিনাই এই অভিমত পোষণ করেন।" সুতরাং তোমরা কেমন করে দাবি কর যে এটা স্বতঃপ্রতীত সত্য? যাই হোক, এটা যদি তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয় হয়, তবে এটাকে প্রমাণের যুক্তি কি?

যদি বলা হয় :

বিশুদ্ধ বুদ্ধির বস্তুর জ্ঞান রয়েছে, কারণ জড় বস্তুর বোধগম্যতার পথে বাধাস্বরূপ। অতএব যেখানে জড় নেই সেখানে বাধা নেই।

আমাদের উত্তর :

আমরা স্বীকার করি যে জড় বাধা বা প্রতিবন্ধকতা, কিন্তু এটাই একমাত্র প্রতিবন্ধকতা নয়। তাদের সহানুমান যুক্তি যা প্রাকল্পিক তা' নিম্নে বিবৃত করা যায় :

যদি এটা জড়ে থাকে, তবে এটা বস্তুকে জানতে পারে না, এটা জড়ে নেই, সুতরাং, এটা বস্তুকে জানে।

এটা পূর্বগামিতার (antecedent) বিপরীতের প্রতিবন্ধকতা যা থেকে (এটা সর্বদিক থেকে সম্মত) সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে না। এটা অনেকটা এই বলার ন্যায়' :

www.pathagar.com

যদি এটা মানুষ হয়, তবে এটা জীব হবে,

কিন্তু, এটা মানুষ নয়, অতএব, সে জীব নয়।

এখানে সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে না। কারণ, মানুষ না হলে, সে ঘোড়াও হতে পারে—এবং ফলে সে একটি জীব। নিঃসন্দেহে, পূর্বগামিতার বিপরীতের প্রতিবন্ধকতা থেকে অনুগামীর বিপরীত অনিবার্য সিদ্ধান্ত হিসেবে আসে, যখন যুক্তিবিদ্যা, উল্লেখিত কিছু শর্ত পূরণ করা হয়—অর্থাৎ অনুগামী ও পূর্বগামী পারস্পারিক পরিবর্তনীয় বলে প্রমাণিত হয়। এবং এটা সম্ভব হবে তখন যখন তাদের মধ্যকার সকল বিকল্প তাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দার্শনিকগণ বলেন—

যদি সূর্য উদিত হয়, এটা হবে দিন,

কিন্তু সূর্য উদিত হয় নি,

তাই, এটা দিন নয়।

এখানে সিদ্ধান্তটি বৈধ। কারণ সূর্য উদয় হওয়াটা দিনের একমাত্র কারণ। অনুগামী ও পূর্বগামী এইস্থানে পারস্পরিক পরিবর্তনীয়। (এই টেকনিকেল শব্দের ব্যাখ্যা 'স্ট্যান্ডার্ড অব নলেজ' গ্রন্থে পাওয়া যাবে যা আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দিয়েছি।

(২)

ইবনে সিনার দ্বিতীয় বক্তব্য নিম্নরূপ :

যদিও আমরা বলি না যে, আল্লাহ্ জগৎ উৎপত্তির ইচ্ছাকারী অথবা কালে জগৎ উদ্ভূত, তবু আমরা বলি যে, জগৎ তাঁর কার্য (His action), তাঁর দ্বারা উৎপন্ন (produced)। যে বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব দিতে চাই, তা'হচ্ছে তিনি গুণ অধিকারে কখনও নিবৃত্ত নন যা কর্তাকে চিহ্নিত করে (characterises)। তিনি কখনও কর্তা হওয়া থেকে বিরত নন (ceased to be an agent)। এ ব্যতীত আমরা অন্যদের সাথে অমত পোষণ করি না। মৌলিক প্রশ্নে (জগৎ আল্লাহ্ কার্য কি না) চূড়ান্তভাবে কোনো ভিন্ন মত নেই। যেহেতু সর্বদিক থেকে এমত পোষণ করা হয়েছে যে কর্তাকে তার কার্যের জ্ঞান থাকতে হবে, (আমরা আল্লাহ্র জগতের জ্ঞানে বিশ্বাস করি) তাই, আমরা জগতকে তাঁর কার্য বলেই মনে করি।

দু'দিক থেকে উত্তর :

প্রথমত, কার্য দু প্রকার ১. ঐচ্ছিক কার্য অর্থাৎ সজীব সত্তার কার্য এবং ২. স্বাভাবিক কার্য যেমন, সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরণের কার্য, অগ্নির তাপ বিকিরণের কার্য এবং পানি শীতলকরণের কার্য। কেবল ঐচ্ছিক কার্যের ক্ষেত্রে কার্যের অনিবার্য জ্ঞান (দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন, মানুষের কৌশলের জন্য এটা প্রয়োজন কিন্তু স্বাভাবিক কার্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাদের মতে :

জগৎ আল্লাহ্র কার্য—তাঁর সারসত্তা থেকে অনিবার্য পরিণাম হিসেবে—স্বভাবে অথবা বাধ্যবাধ্যকতার (constraint) মাধ্যমে : তাঁর ইচ্ছা বা নির্বাচনের দ্বারা নয়। সুতরাং জগৎ অনিবার্যভাবেই তাঁর সারবত্তা থেকে আসে (proceeds) স্থগিত (withhold) করার শক্তি নেই, বা অগ্নির তাপ স্থগিত করার শক্তি নেই, অনুরূপে, আল্লাহ্রও তাঁর কার্যের স্থগিতকরণের শক্তি নেই।

www.pathagar.com

(দার্শনিকগণ তাঁর সম্বন্ধে যা বলেন, তিনি তার চেয়ে বহু উর্ধ্বে-অনেক মহীয়ান)। এ ধরনের বিষয়কে একটি কার্য বলে অভিহিত করার অনুমতি দেয়া হলেও, এ 'কর্তা' সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। যদি বলা হয় :

দু'টি বস্তুর মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। তাঁর সারবত্তা থেকে জগৎ উদ্ভব, কারণ জগৎ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের জন্যই। জগৎ পদ্ধতির আদর্শিক প্রতিনিধিই জগৎ নির্গমণের কারণ। জগৎ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানই হচ্ছে জগৎ সত্তা (The Principle of the Universe)। এবং জগৎ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান তাঁর নিজ সাথে (with Himself) অভিন্ন। জগৎ সম্বন্ধে যদি তাঁর জ্ঞান না থাকত; জগৎ উৎপন্ন হতো না—যা সূর্য থেকে আলোর বিকিরণের ক্ষেত্রে সত্য নয়।

আমাদের উত্তর হবে :

এ বিষয়ে তোমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের সাথে অমত পোষণ করে। তারা বলে জগতের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে তাঁর সারবত্তা থেকে অনুসরণ করে যা স্বভাব ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যাতে তাঁর জ্ঞাতা হওয়ার দরকার পড়ে না। এই অবস্থার মধ্যে কোনো উদ্ভটতা কি তোমরা দেখতে পাও? ইচ্ছার অস্বীকারে তোমরা যদি অন্য দার্শনিকদের সাথে একমত পোষণ কর এবং তোমরা যদি এটা না বল যে আলো সম্বন্ধে সূর্যের জ্ঞান, সূর্য থেকে আলো বিকিরণের শর্ত (বিপরীতে এই উক্তি কর যে, সূর্য থেকে আলো অনিবার্যভাবে আসে), তবে অনুরূপ ব্যাখ্যা আল্লাহ্র জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা যায়। এ করা থেকে কেউ তোমাকে বারণ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, যদি এটি স্বীকারও করা হয় যে, কর্তা থেকে যা কিছু আসে সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকার প্রয়োজন, তবুও আল্লাহ্র কার্য দার্শনিকদের মতে এক অর্থাৎ প্রথম পরিণাম হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধি বা জ্ঞান। এ থেকে এটা অনুসরণ করে যে, এ-ব্যতীত তিনি অন্যকিছু জানবেন না। অনুরূপে, প্রথম পরিণামও এর থেকে যা উদ্ভূত শুধু তাকেই জানবে। জগৎ তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক উৎপন্ন হয় নি। বিপরীতে, এটা মাধ্যমে, ক্রমবিকাশের পরোক্ষ সংযোগে এবং পরিণাম হিসেবে এসেছে। তাই, যা কোনো কিছু থেকে উদ্ভূত যেটা আল্লাহ্ থেকে আগত তা' অনিবার্যভাবে তাঁর নিকট পরিজ্ঞাত নাও হতে পারে। এবং তাঁর থেকে কেবল একের উদ্ভব ঘটে।

ঐচ্ছিক কার্যের পরোক্ষ পরিণামের ক্ষেত্রে জ্ঞান অপরিহার্য নয়। যদি তা-ই হয়, তবে, স্বাভাবিক কার্যের পরোক্ষ পরিণাম হিসেবে এটা কেমন করে হবে? উদাহরণস্বরূপ, পর্বতের শীর্ষ থেকে গতিশক্তি যার ঐচ্ছিক কারণ রয়েছে তা' মূল গতির জ্ঞানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে; কিন্তু এটা সেই গতির পতন-পর জ্ঞানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারে না, অর্থাৎ, যার প্রকাশে গতি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেমন অন্যবস্তুর উপর পাথরের পতন এবং তাদেরকে ভেঙ্গে ফেলা।

এ-প্রশ্নে দার্শনিকদের কোনো উত্তর নেই।

যদি বলা হয় :

তিনি নিজেকে ব্যতীত কিছু জানেন না, এটাকেই যদি বিচার করতে হয়, তবে এটা হবে দুর্ভাগজনক। কারণ, অন্য নিজেকে, আল্লাহকে এবং অপরকেও জানে।

www.pathagar.com

আমাদের উত্তর হবে :

এই দুর্ভাগ্যজনক উপাদান দর্শন-প্রবণতারই অনিবার্য পরিণাম-অর্থাৎ ঐশী ইচ্ছার অস্বীকারের প্রবণতাএবং জগতের প্রারম্ভ অস্বীকারের প্রবণতা। অতএব, তোমাকে এটা স্বীকার করতেই হবে। সকল দার্শনিক এটা স্বীকার করেছেন। অন্যথায়, তোমাকে ঐশী ইচ্ছা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এটা স্বীকারে খোদ দর্শনকেই পরিত্যাগ করতে হবে।

অধিকন্তু, ইবনে সিনাকে বলতে হবে : তুমি কিভাবে সেসব দার্শনিকদের অপ্রমাণিত করতে পার, যারা বলেন যে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর মহত্ত্বকে (nobility) নির্দেশ করে না। যেহেতু, মানুষ স্বভাবেই অপূর্ণ, তাই পূর্ণতা লাভের জন্যই তার জ্ঞানের প্রয়োজন। মানুষ তার বোধগম্য জ্ঞানের দ্বারা এ জগতে বা পরজগতে তার মধ্যে সম্মানজনক যা কিছু আছে তা' আবিষ্কারে নিজেকে মহৎ করে তুলে। সকল জীবনের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। কিন্তু পূর্ণতার জন্য ঐশী সত্তার এ প্রয়াসের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা যদি মনে করি জ্ঞান থেকে তিনি পূর্ণতা লাভ করেন, তবে আমরা তাঁর সারবত্তাকে অপূর্ণ করে ফেলব। এটা অনেকটা ঠিক তারই ন্যায় যা তুমি শ্রবণ, দর্শন এবং বিশেষের জ্ঞান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছ যা কালের আওতায় পড়ে। অপর সকল দার্শনিকের সাথে তুমি একমত পোষণ কর যে, আল্লাহ্ এসব বস্তু থেকে মুক্ত, স্বাধীন : পরিবর্তনীয় বস্তু (যা কালের আওতাভুক্ত এবং যা' ছিল [was] হবে [will be] হিসেবে বিভক্ত তা' তাঁর নিকট পরিজ্ঞাত নয় এবং যদি পরিবর্তনীয় বস্তুর জ্ঞান তার ক্ষেত্রে সম্ভব হতো—তবে, তাঁর মধ্যে বহুত্ব ও গ্রহণীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত। কিন্তু তার ক্ষেত্রে এটার অস্বীকার তাঁর অপূর্ণতাকে প্রমাণ করে না, প্রমাণ করে পূর্ণতাকে কেবল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অপূর্ণতা বিদ্যমান এবং তাদের প্রয়োজনের জন্যই। মানুষ যদি অপূর্ণ না হতো, তবে তার ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হতো না যাতে করে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে তার বিরুদ্ধে যা তাকে পরিবর্তনেযোগ্য (amenable) করে তুলে। অনুরূপে, তুমি বলছ যে, বিশেষ অস্থায়ীর ঘটনার জ্ঞান অপূর্ণতাকে নির্দেশ করে। যদি আমরা সকল অস্থায়ী ঘটনাবলীকে জানি এবং সকল ইন্দ্রিয় বস্তুকে অনুভব করি, যেখানে আল্লাহ্ বিশেষকে জানেন না এবং ইন্দ্রিয় বস্তুকে অনুভব করেন না এবং যদি তার বিশেষকে না জানার জ্ঞান অপূর্ণতাকে প্রমাণ করে না, তবে এটা থেকে এ অনুসরণ করে যে, ঐশী সত্তা ব্যতীত অন্যসত্তার ক্ষেত্রেও বোধযোগ্য সার্বিকের জ্ঞানকেও স্বীকার করতে হবে। বোধযোগ্য সার্বিকের জ্ঞান থেকে তার অবমুক্ত হওয়া অপূর্ণতাকে বেশি প্রমাণ করে না তার চেয়ে যা বিশেষের জ্ঞানের অভাবে হয়। এবং জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

www.pathagar.com

উনবিংশ সমস্যা

অস্তিত্বে আসার পর মানব আত্মা ধ্বংস হতে পারে না এবং তাদের চিরস্থায়ী স্বভাব তাদের ধ্বংসের ধারণাকে অসম্ভব করে তোলে দার্শনিকদের এই মতবাদের প্রতিবাদ।

এই মতবাদের জন্য দার্শনিকদের নিকট যুক্তি দাবি করা যাক। তাঁদের দু'টি যুক্তি রয়েছে।

প্রথম যুক্তিতে তাঁরা বলেন :

আত্ম ধ্বংস (যদি আদৌ ধ্বংস হয়) হতে পারে নিম্নলিখিত কারণে :

১. দেহের মৃত্যুর কারণে, অথবা
২. আত্মার বিপরীত ঘটনা যা আত্মাকে স্থলাভিষিক্ত করতে পারে তার কারণে, এবং
৩. ক্ষমতাশীল কর্তার ক্ষমতার কারণে।

এখন দেহের মৃত্যুর কারণে আত্মা ধ্বংস হতে পারে এটা বলা সঠিক নয়। কারণ, আত্মা দেহের আধার (substratum) নয়, এটা আত্মা কর্তৃক ব্যবহৃত হাতিয়ার মাত্র। দেহের মধ্যে অবস্থিত বৃত্তির মাধ্যমে আত্মা একে ব্যবহার করে। যন্ত্রের বিকৃতি যন্ত্রের ব্যবহারকারীর বিকৃতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে না, যে পর্যন্ত না পরবর্তীটি এরমধ্যে অবস্থান করে অথবা এর ওপর ছাপ ফেলে (impressed), যেমন নাকি জীবের আত্মা অথবা দৈহিক বৃত্তির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, আত্মার দু'টি ক্রিয়া (actions) : একটি হাতিয়ার ব্যবহারে, অন্যটি হাতিয়ার ব্যবহার ব্যতীত ক্রিয়া। (যথা : কল্পনা, সংবেদন, আকাঙ্ক্ষা, রাগ বা দ্বেষ)। হাতিয়ার ছাড়া ক্রিয়া নিঃসন্দেহে বিনাশ বা ধ্বংসের অধীন, কারণ দেহ বিনাশী বা ধ্বংসশীল। আত্মার অন্য ক্রিয়া (যেমন জড় থেকে বিচ্যুত হয়ে বুদ্ধির জ্ঞান) লালিত হয় দেহের সাহায্য ছাড়া। আত্মা যখন বোধে জ্ঞাত (cognised), তখন এর দেহের প্রয়োজন নেই। বিপরীতে, দেহের সাথে এর পূর্ব-দখলীকরণের (pre-occupation) কারণে জ্ঞান থেকে এর মনোযোগ সরে যায়। এখন যেহেতু এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, আত্মার অস্তিত্ব এবং এর দু'টি ক্রিয়া দেহ-নিরপেক্ষ, তাই এটা অনুসরণ করে যে, এর গঠন (constitution) দেহের ওপর নির্ভরশীল নয়।

এমন বলা মিথ্যে যে, এর বিপরীত ঘটনা (occurance) হওয়ার কারণে আত্মা ধ্বংস হতে পারে। কারণ, বস্তুর কোনো বিপরীত নেই (substances have no contraries)। জগতে কেবল ধ্বংসশীল বস্তু হচ্ছে আপাতন ও আকার (accidents and forms) যা পর্যায়ক্রমিকভাবে আসে। পানির আকার ধ্বংস হয় এর বিপরীত ঘটনার কারণে, যেমন বায়ুর আকারের কারণে। কিন্তু, জড় যা এসব আকারের আধার

www.pathagar.com

বা আশ্রয় (substratum) তা' অবিনাশী। বস্তুর ক্ষেত্রে যা কোনো আধারে অস্তিত্বশীল নয় এবং যা বিপরীত ঘটনার কারণে বিনাশী, তাও, অকল্পনীয় (inconceivable) কারণ যা আধারে নেই, তার বিপরীত নেই, যেহেতু বিপরীত পর্যায়ক্রমিকভাবে একই আধারে আসে।

পরিশেষে একথা বলা মিথ্যে প্রতিপন্ন হবে যে ক্ষমতাশীল কর্তার ক্ষমতা আত্মাকে বিনষ্ট করে। কারণ, অন-অস্তিত্ব (non-existence) কিছুই নয়। সুতরাং, এটা অকল্পনীয় যে কোনো কর্তার শক্তির এর ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

(ঠিক অনুরূপ যুক্তি তাঁরা উল্লেখ করেন জগতের চিরস্থায়ী অস্তিত্বের সমস্যা বিষয়েও যা বিস্তৃত আলোচনার পর আমরা এই সমস্যার সমাধান করেছি)।

বিভিন্ন দিক থেকে উপরে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতিবাদ :

প্রথমত, এটা এই মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, দেহের মৃত্যু আত্মার মৃত্যুর কারণ নয়। কারণ, আত্মা দেহে অবস্থান করে না। এই মতবাদটি পূর্ববর্তী সমস্যাতে দার্শনিকদের কর্তৃক গৃহীত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, যদিও তারা আত্মাকে দেহের মধ্যে অবস্থান করে বলে মনে করে না, তবুও আত্মা ও দেহের মধ্যকার সংযোগ অতি সুস্পষ্ট। আত্মা অস্তিত্বে আসে না যে পর্যন্ত না দেহ অস্তিত্বশীল হয়। এই মতবাদ ইবনে সিনা এবং অন্যান্য দার্শনিক কর্তৃক গৃহীত হয় যারা নিরপেক্ষ তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য আবিষ্কারে ব্রতী হন। আত্মা চিরন্তন এবং দেহের সাথে এর সংযোগ আকস্মিক—প্লেটোর এই মতবাদ তারা প্রত্যাখ্যান করেন। এইসব চিন্তাবিদের নিরপেক্ষ অনুসন্ধান নিম্নরূপ :

"দেহের অস্তিত্বের পূর্বে আত্মা যদি এক হয়ে থাকে, তবে এটা বিভক্ত হলো কিভাবে? যে বিভক্তি করণের পরিমাণ (magnitude, quantity) নেই, তা বোধগম্য নয়। যদি এটা স্বীকার করা হয় যে, বিভক্তিকরণ ঘটে নি, তবে উক্তিটি হবে উদ্ভট। কারণ, সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, জায়েদের আত্মা আমরের আত্মার চেয়ে ভিন্ন। যদি দু'টি একই হতো, তবে জায়েদের পরিচিতি বা জ্ঞান আমরের পরিচিতি ও জ্ঞান হতো। কারণ, জ্ঞান হচ্ছে আত্মার এক অপরিহার্য গুণ এবং অপরিহার্য গুণ সারবত্তার সকল সম্পর্কে প্রবেশ করে। আত্মা যদি বহুত্ব গঠন করে, তবে বহুত্বের কারণ কি? এই কারণ জড়ে, স্থানে, কালে বা গুণে পাওয়া যায় না। কারণ, এইসবের মধ্যে এমন কিছু নেই যা আমাদের মধ্যকার গুণের পার্থক্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। দেহের মৃত্যুর পর আত্মার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অনুরূপ সত্য নয়। কারণ, যারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন তাদের মতে, পরিত্যক্ত আত্মা (departed) গুণে পার্থক্য হয়, যেহেতু প্রত্যেক আত্মা তার দেহ থেকে বিভিন্ন স্বভাব অর্জন করে। কোনো দু'টি আত্মার অনুরূপ স্বভাব হয় না। কারণ, স্বভাব নৈতিক চরিত্র থেকে আসে। বাহ্যিক চেহারার ন্যায় নৈতিক চরিত্র কোনো দু'টির ক্ষেত্রে কখনও এক বা অনুরূপ হয় না। যদি নৈতিক চরিত্র বা জায়েদের বাহ্যিক চেহারা আমরের অনুরূপ হতো, তবে আমরা এককে অন্যের সাথে গুলিয়ে ফেলতাম।

যেহেতু এই যুক্তির দ্বারা এটা প্রমাণিত : শুক্রাণু যখন গর্ভে প্রবেশ করে তখনই আত্মা অস্তিত্বে আসে, দৈহিক গঠনের কারণে বীর্য (sperm) আত্মা গ্রহণে প্রস্তুত (যা এর

www.pathagar.com

পরিচালক হবে)। কেবল আত্মা হওয়ার কারণেই এটা আত্মাকে গ্রহণ করে না। কারণ, দু'টি বীর্যফোটা (two sperm drops) যা যমজের জন্ম দেয় তা একই গর্ভে থাকতে পারে এবং একই সময়ে সমভাবে আত্মা গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে পারে। তখন দু'টি আত্মা নির্গত হয় (emanate)—প্রত্যক্ষ বা মাধ্যমে—আদি সত্তা থেকে (from the first principle) যা ভ্রূণদেহের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। ফলে এ দেহের আত্মা অন্যদেহের পরিচালক বা নির্দেশক (director) হতে পারে না। বিশেষ আত্মাও বিশেষ দেহের মধ্যকার একটা বিশিষ্ট জ্ঞাতিত্ব (special affinity) এই সম্বন্ধের উদ্ভব ঘটাতে পারে। তা না হলে যমজের একটি দেহ অন্যটির চেয়ে অধিকতর যোগ্য হবে না এই বিশেষ আত্মা গ্রহণের। কারণ, দু'টি আত্মার অস্তিত্ব একই সঙ্গে এবং দু'টি বীর্যফোটাই সমভাবে আত্মার দ্বারা পরিচালিত বা নির্দেশিত হতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন ওঠে : বিশেষ আত্মা এবং বিশেষ দেহের মধ্যকার বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতার কারণ কি? এটা যদি দেহের উপর আত্মার ছাপ হয়, তবে দেহের বর্জন আত্মাকেও পরিবর্জন (elimination) করে ফেলবে। যদি এই বিশেষ দেহ এই বিশেষ আত্মার মধ্যকার সংযোগ ব্যাখ্যার অন্য কোনো কারণ থাকে (যাতে করে সংযোগ আত্মার অস্তিত্বে আসার শর্ত হয়)। তবে এটা অসম্ভব হবে কেমন করে যে এই সংযোগ আত্মা বেঁচে থাকার জন্যও শর্ত হবে। ফলে, এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আত্মাও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র (মহান ও পবিত্র তাঁর নাম) পুনঃসংযোগ বা পুনরায়ণ দ্বারা একে পুনরাবির্ভাব না ঘটান যেমনটি ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় পুনরুত্থান মতবাদ সম্বন্ধে।

যদি বলা হয় :

আত্মা ও দেহের মধ্যকার সংযোগ এই (this) বিশেষ দেহের পক্ষে আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট স্বাভাবিক প্রবণতা (natural inclination) অথবা সহজাত অনুরাগেরই (instinctive affection) ফলশ্রুতি—এই অনুরাগই আত্মাকে এটার (This) পানে আকর্ষণ করে, এবং অন্য সকল দেহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে—কোনো সময়েই এটা আত্মাকে পরিত্যাগ করে না। একটা বিশেষ দেহে এটা একে পিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখে যাতে করে অন্যকোনো দেহ এর মনোযোগ গ্রহণ করতে না পারে। কিন্তু, এতে করে দেহের বিশিষ্টিকরণ আত্মার বিশিষ্টিকরণকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে না—পরিচালনার পানে আত্মার এক সহজাত অনুরাগ রয়েছে। কোনো কোনো সময় এই অনুরাগ দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও থেকে যায়। যদি জীবনকালে দেহের সাথে আত্মার এই অধিকার খুব শক্তিশালী হয় যাতে করে এর মনোযোগ আকাঙ্ক্ষার বঞ্চনা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়, তবে থেকে যাওয়া অনুরাগ (affection) আত্মার যন্ত্রণার (pain) কারণ হয়। কারণ আত্মা হাতিয়ার বঞ্চিত হয়েছে যার দ্বারা এর অনুরাগের বিষয় লাভ করা যেত।

জায়েদের দেহ এবং আত্মার সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের ব্যাপারে বলা যায় যে, অস্তিত্বের প্রাথমিক অবস্থা সুস্পষ্টভাবেই এর কারণ পরিলক্ষিত হয় যার দ্বারা আত্মা ও দেহ একে অন্যের উপযুক্ত হয় (suited to each other)। তাই, এই বিশিষ্ট দেহ অন্যদেহের চেয়ে উপযুক্ত হয়—এই বিশিষ্ট আত্মার জন্য—কারণ, এর অত্যধিক পরিমাণের

www.pathagar.com

উপযুক্ততার স্বভাব। এইভাবে, আত্মা ও দেহে সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়। কিন্তু, পারস্পরিক উপযুক্ততার এমন দৃষ্টান্তের স্বভাব জানা মানুষের শক্তির বাইরে। যাই হোক, বিস্তৃত বিষয়ে আবিষ্কারে আমরা ব্যর্থ হলেও তা আমাদের সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধের মৌলিক বিশ্বাসকে প্রকম্পিত করে না। কিংবা দেহের মৃত্যুর কারণে আত্মা ধ্বংস হয় না—এই উক্তি ক্ষতিকরও নয়।

আমাদের উত্তর হবে :

যেহেতু দেহ ও আত্মার পারস্পরিক উপযুক্ততা আমাদের নিকট অদৃশ্য এবং যেহেতু এই পারস্পরিক উপযুক্ততা একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের দাবি রাখে, তাই, এটা অসম্ভব নয় যে, এই অনিশ্চিত পারস্পারিক উপযুক্ততা এই ধরনের হবে যে, এটা আত্মার অমরতাকে দেহের ধারাবাহিকতার (continuence) ওপর নির্ভরশীল করে তুলবে যদ্দরূণ দেহের বিনষ্টতা আত্মা-বিনষ্টের কারণ হয়। যা অনিশ্চিত তা আত্মা ও দেহের মধ্যকার অনিবার্য আন্তসম্পর্ক কি না—এই বিচারের ভিত্তি হতে পারে না। হতে পারে আত্মার অস্তিত্বের জন্য আত্মা ও দেহের মধ্যকার সম্পর্ক অনিবার্য এবং এই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে পর আত্মা ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন এটা স্পষ্ট উঠেছে যে, দার্শনিকগণ কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তির ওপর নির্ভর করা যায় না।

আল্লাহর ক্ষমতা (মহীয়ান তিনি, Exalted be He) আত্মার ধ্বংসের কারণ—দার্শনিকদের এই তৃতীয় যুক্তি অযৌক্তিক নয়—জগতের অবিনশ্বরতার সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্তমূলকভাবে এটা দেখিয়েছি।

চতুর্থ আপত্তি ধ্বংসের তিনটি উপায় যা তোমা কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে তা আমরা স্বীকার করি না। এগুলো সকল সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে না। তুমি কি প্রমাণ করতে পার যে, এ তিন উপায় ব্যতীত অন্য উপায় অসম্ভব বা অকল্পনীয়। যেহেতু তোমা কর্তৃক বিভক্তিকরণ স্বীকার ও অস্বীকারের মধ্যে আবর্তিত হয় না (does not revolve between affirmation and negation) তাই, তিন সম্ভাবনার সাথে চতুর্থ সম্ভাবনাকে সংযোগ করা যেতে পারে। ফলে, ধ্বংসের তিন উপায়ের পরিবর্তে চার, এমনকি, পাঁচ উপায়ে হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে। সংখ্যাকে তিনে সীমাবদ্ধ করে রাখা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয়।

২

তাদের দ্বিতীয় যুক্তি, যা তাদের প্রধান যুক্তি, এতে তারা বলেন : বস্তু, যা কর্তার মধ্যে অস্তিত্বশীল নয়, তার ধ্বংস অসম্ভব। অন্যকথায়, সরল বা অযৌগিক (simple) সম্পূর্ণভাবে বা চূড়ান্তভাবে অবিনশ্বর।

এই যুক্তিতে প্রথম যা প্রমাণ করতে হবে, তা হচ্ছে দেহের মৃত্যু আত্মার মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে না—এর কারণ উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এখন এটা বলা যায় যে, দেহের মৃত্যু ব্যতীত অন্যকিছুর দ্বারা আত্মা ধ্বংস হওয়া অসম্ভব। কারণ,কোনো বিন্দু যখন কোনো কারণ দ্বারা ধ্বংস হয়, তখন এ থেকে এটা অনুসরণ করে যে, বাস্তবে ধ্বংস হওয়ার পূর্বে এরমধ্যে ধ্বংসের সম্ভাব্যতা বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, ধ্বংসের সম্ভাব্যতা,

www.pathagar.com

বাস্তব ধ্বংসের পূর্ববর্তী। যেমন, অস্থায়ী ঘটনা সম্বন্ধে বলা যায় যে, অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা অস্তিত্বের পূর্ববর্তী। অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাকে (possibility of existence) অস্তিত্বের সুপ্ত সম্ভাব্যতা বলা হয় (is called the potentiality of existence) এবং ধ্বংসের সম্ভাব্যতাকে ধ্বংসের সুপ্ত সম্ভাব্যতা বলা হয়। অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা যেমন একটি আপেক্ষিক গুণ যার কোনো কিছুর দরকার পড়ে যাতে এর অস্তিত্ব থাকে (যার সম্পর্কের দরুন এটা একটা সম্ভাব্যতা হয়), তদ্রূপ, ধ্বংসের সম্ভাব্যতারও কোনো কিছুর দরকার যার সম্পর্কের খাতিরে এটা সম্ভাব্য হতে পারে। এইজন্যই বলা হয় (জগতের চিরন্তনতার সমস্যাতে যা প্রদর্শিত হয়েছে) প্রতিটি অস্থায়ী অস্তিত্বের পূর্ববর্তী জড়ের প্রয়োজন যার মধ্যে সেই অস্থায়ীর অস্তিত্বের অস্তিত্ব সম্ভাব্যতা অথবা এর সুপ্ত সম্ভাব্যতা থাকতে পারে।

আর জড় যার মধ্যে সুপ্ত সম্ভাব্যতা থাকে তা হচ্ছে সেই অস্তিত্বের গ্রহীতা যা তার মধ্যে আবির্ভাব ঘটে এবং যা গ্রহণ করে (that which receives) তা গৃহীত (received) থেকে আলাদা। গ্রহীতা এবং যা গ্রহণ করা হয় (যা গ্রহীতা থেকে ভিন্ন) তা একত্রে অস্তিত্বে থাকে সেই সময় যখন যা গ্রহণ করা হয় (which is received) তার আবির্ভাব ঘটে। অনুরূপে, অন-অস্তিত্বে গ্রহীতারও একই সময়ে থাকা উচিত যখন অন-অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাতে করে এ থেকে অন-অস্তিত্বের কিছু বের হয়—অর্থাৎ এরমধ্যে যা ছিল তা অস্তিত্বে আসে।

এখন, যা এ থেকে অন-অস্তিত্বে বের হয়ে আসে, তা যা অবশিষ্ট থেকে যায় সেই থেকে ভিন্ন এবং যা অবশিষ্ট থাকে তাতে সুপ্ত সম্ভাব্যতা বা গ্রহণের সম্ভাব্যতা অথবা অন-অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকে—যেমন অস্তিত্ব ঘটার সময় যা অবশিষ্ট থাকে, তা যা ঘটে সেই নয়—এই হচ্ছে সেই যার মধ্যে ঘটনা গ্রহণের জন্য সুপ্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাহলে, একটা বলা চলে যে, যা কিছু অন-অস্তিত্বে ঘটে তা গঠনরূপে তারই যার অন-অস্তিত্বে সে প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে, যার অন-অস্তিত্বকে সে গ্রহণ করে এবং যা অন-অস্তিত্ব ঘটার সময় অবশিষ্ট থেকে যায় (কারণ অন-অস্তিত্বের আবির্ভাবের পূর্বে এটা অন-অস্তিত্বের সুপ্ত সম্ভাব্যতার বাহন)। এই সুপ্ত সম্ভাব্যতার বাহনই হচ্ছে জড় (matter) এবং এ থেকে অন-অস্তিত্বে যা বের হয়ে আসে তা হচ্ছে আকার (form)।

কিন্তু, আত্মা হলো সরল বা অযৌগিক (simple)। এটা জড় বিবর্জিত অযৌগিক আকার। এরমধ্যে যদি আকার ও জড়ের মিশ্রণ (composition) ধারণা করা হয়,তবে, আমরা জড়ের আলোচনার পুনঃ প্রবেশ ঘটাবো যা আদিমূল বা জড়। কারণ, আরম্ভ হওয়ার অনুক্রমের সমাপ্তির জন্য মৌলিক সত্তার প্রয়োজন হবে। এইভাবে, আমরা আদি সত্তার ধ্বংসের ক্ষেত্রে দেখেছি। কারণ, যে কোনো ক্ষেত্রেই জড় চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এতে আকার অস্তিত্বে আসে (forms comes into existence in it) এবং এ থেকে অন-অস্তিত্বে প্রবেশ করে। এতে আকার ঘটার জন্য সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে এবং আকার ধ্বংসের জন্যও সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে। কারণ, এটা সমভাবে দুই বিপরীতেরই গ্রহীতা। এটা থেকে এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, প্রতিটি সত্তা যার একক সারবস্তা রয়েছে তা ধ্বংসহীন।

www.pathagar.com

এই বিষয়টিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করা যায় : একটি বস্তুর অস্তিত্বের সুপ্ত সম্ভাবনা বস্তুটির পূর্বে থাকে। কাজেই এটা সেই বস্তু থেকে অন্যকিছু যা (বস্তু, thing) স্বয়ং অস্তিত্বের সুপ্ত সম্ভাবনা হতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বুঝা যেতে পারে যে, যার সুস্থ দৃষ্টিশক্তি রয়েছে তাকে সুপ্ত সম্ভাব্য দ্রষ্টা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, দর্শনের জন্য তার সুপ্ত সম্ভাব্যতা রয়েছে। আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, সুস্থ দৃষ্টিশক্তি পালনের জন্য, চোখের জন্য যে গুণ অত্যাবশ্যকীয় তা তার মধ্যে বিদ্যমান। যাই হোক, যদি দেখা বা দর্শন বিলম্বিত হয়, তবে, এই বিষয় অন্যকোনো শর্তের ওপর আরোপ করা যায়। তাই সুপ্ত সম্ভাবনা; বলা যাক, কালত্বের দৃষ্টিশক্তি চোখে থাকে, কালত্বের বাস্তব দৃষ্টির পূর্বে। যখন কালত্বের দৃষ্টি বাস্তবে লাভ করা হয়, তখন কালত্বের দৃষ্টির সুপ্ত সম্ভাবনা কালত্বের বাস্তব দৃষ্টির সাথে সহ-অবস্থান করবে না। কারণ, দৃষ্টি যখন লাভ করা হয়, তখন এটা বলা সম্ভব হবে না যে এটা বাস্তবে এবং সুপ্ত সম্ভাব্যরূপে বিদ্যমান।

এই পূর্বানুমান প্রমাণিত হওয়ায় এখন আমরা এই বলতে অগ্রসর হব যে, যদি একটা সরল বস্তুকে ধ্বংস হতে হয়, তবে, তা বাস্তবে ধ্বংস হওয়ার পূর্বে এরমধ্যে ধ্বংসের সম্ভাব্যতা থাকতে হবে; অন্তঃপক্ষে, সুপ্ত-সম্ভাব্যতা বলতে তাই বুঝায়। অধিকন্তু, এটা অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাও অধিকার করে থাকবে। কারণ, যার অন-অস্তিত্ব সম্ভব তা অনিবার্য হতে পারে না। সুতরাং, একে অস্তিত্বে সম্ভব হতে হবে এবং অস্তিত্বের সুপ্ত-সম্ভাব্যতার দ্বারা আমরা কেবল অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাকে অর্থ করি।

সুতরাং, এ থেকে যে সিদ্ধান্ত টানা যায় তা হচ্ছে : একই বস্তুর মধ্যে স্বীয় অস্তিত্বের জন্য সুপ্ত-সম্ভাবনা এবং অস্তিত্বের বাস্তব প্রাপ্তি সমন্বিত (combined) হতে পারে। অথবা এর বাস্তব অস্তিত্ব অভিন্ন হতে পারে এর অস্তিত্বের সুপ্ত-সম্ভাব্যতার সাথে। কিন্তু, আমরা দেখিয়েছি যে, দৃষ্টিশক্তির সুপ্ত-সম্ভাব্যতা যা চোখে থাকে তা বাস্তব দৃষ্টি থেকে ভিন্ন। এটা বাস্তব দৃষ্টির সাথে অভিন্ন হতে পারে না। কারণ, এর অর্থ হবে বাস্তবে এবং সুপ্ত-সম্ভাব্যে একই বস্তুর অস্তিত্ব—যা পারস্পরিক বহিষ্কারক শব্দ (mutually exclusive terms)। যখন কোনো কিছু সুপ্ত-সম্ভাব্য তখন এটা বাস্তব হতে পারে না এবং যখন এটা বাস্তব তখন এটা সুপ্ত সম্ভাব্য হতে পারে না। সুতরাং, মূল বস্তুর জন্য ধ্বংসের পূর্বে ধ্বংস প্রমাণ করতে যাওয়ায়, অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অস্তিত্বের অবস্থা বলে প্রমাণ করতে যাওয়ার অনুরূপ এবং এটা অসম্ভব।

www.pathagar.com

বিংশতম সমস্যা

দৈহিক পুনরুত্থান অস্বীকারে দার্শনিক মতবাদের খণ্ডন।

দার্শনিকগণ দেহে আত্মার প্রত্যাবর্তন, বাস্তব বেহেশত ও দোজখের অস্তিত্ব, আয়তনয়না 'হুর' এবং প্রতিটি বস্তু যা আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষের নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছে তা' সবই অস্বীকার করেন। তাঁরা অভিমত পোষণ করেন যে, এসব বিষয় হচ্ছে প্রতীকী যা সাধারণ মানুষের নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে তারা আধ্যাত্মিক পুরস্কার ও শাস্তির কথা অনুধাবন করতে পারে। আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বাস্তব স্বভাবের চেয়ে অনেক মহৎ ও উন্নত। এ ধরনের ধারণা সকল মুসলিম বিশ্বাসের বিপরীত। প্রথমত : এসব বিষয় সম্বন্ধে দার্শনিকগণ কি বিশ্বাস করেন, তা' আমরা ব্যাখ্যা করব। এরপর ইসলামবিরোধী সেসব বিষয়ের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তিগুলো বর্ণনা করব।

তারা বলেন :

দেহের মৃত্যুর পর আত্মা অনন্তকাল থাকবে। হয় : অবর্ণনীয় পরম সুখাবস্থায় অথবা অবর্ণনীয় পরম দুঃখাবস্থায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুঃখ অথবা সুখ চিরস্থায়ী হবে। অন্য ক্ষেত্রে, কালের গতিতে এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে। মাত্রা (degrees) সম্বন্ধে বলা যায়, মানুষের বিভিন্ন মর্যাদা রয়েছে। মানুষের পার্থিব মর্যাদার ন্যায়ই এর বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন :

১. বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ আত্মাগুলোর (pure and perfect souls) জন্য চিরসুখ।
২. অপূর্ণাঙ্গ ও অপবিত্র আত্মাগুলোর (imperfect and impure souls) জন্য চিরদুঃখ, এবং
৩. অপবিত্র কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আত্মাগুলোর জন্য ক্ষণস্থায়ী দুঃখ (Transient pain for the impure but perfect souls)।
৪. একমাত্র পূর্ণতা, বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতার দ্বারা আত্মা পরম শান্তি (bliss) লাভ করতে পারে। জ্ঞান থেকে পূর্ণতার এবং সৎকার্য থেকে বিশুদ্ধতার উদ্ভব ঘটে (derived)।

জ্ঞানশক্তি একান্ত প্রয়োজন। কারণ, বোধগ্রাহ্য (intelligible) জ্ঞান থেকে বুদ্ধিশক্তি (rational faculty) পুষ্টি ও সুখ লাভ করে। যেমন, আকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তি (faculty of desire) আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের দ্বারা সুখ পায় অথবা দৃষ্টিশক্তি সুন্দর আকার অবলোকনের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে এবং এভাবে অন্যান্য সকল বৃত্তির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। জ্ঞানগ্রাহ্য বিষয় আবিষ্কারে (from discovering intelligible)

www.pathagar.com

দেহ, দৈহিক অধিকার এবং দৈহিক ইন্দ্রিয় বুদ্ধিশক্তিকে বাধা দান করেন। অজ্ঞ (ignorant) আত্মার উচিত হবে দুঃখিত হওয়া, এমন কি এ-জগতও (অজ্ঞতার কারণ)। কারণ সে আত্মার সুখ হারিয়েছে। কিন্তু দেহের সাথে এর পূর্ব অধিকার একে নিজ সম্বন্ধে বিস্মৃত করে তুলে এবং এর দৃষ্টিকে এর নিজস্ব দুঃখ থেকে সরিয়ে রাখে। যেমন, যে ভয়ে আক্রান্ত তার দুঃখের অনুভূতি থাকে না। অথবা তুষার স্পর্শে যার দেহ অসাড় তারও অগ্নির অনুভূতি থাকে না। যদি অজ্ঞ আত্মার অপূর্ণতা থাকে যে পর্যন্ত না দেহের সাথে এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, সেই পর্যন্ত আত্মার অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তুষার স্পর্শে অসাড় হয়ে গেছে। যখন তাকে অগ্নিতে আনয়ন করা হয়, তখন তার দুঃখের অনুভূতি থাকে না। কিন্তু যখন তুষার স্পর্শের অসাড়তা দূরীভূত হয়ে যায়, তখন সে আকস্মিকভাবে চরম বেদনার চৈতন্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

কোনো কোনো সময় যদিও আত্মা বোধগ্রাহ্যকে জানে, তথাপি জ্ঞান থেকে সে যে সুখ পায় তা পরিমাণে অল্প এবং স্বভাবতই যা পাওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে কম। এর কারণ, দৈহিক অধিকার এবং কামজ বস্তুর প্রতি আত্মার আগ্রহ। এটা অনেকটা সেই পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যার মুখে রয়েছে তিক্ততা—স্বাদযুক্ত মিষ্টিও তার নিকট বিস্বাদ লাগে এবং যে খাবার সত্যিকার অর্থে তার সুখের পর্যাপ্ত কারণ, তা সে বর্তমানে পরিহার করে, ফলে পীড়িত হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যকর বস্তুর সুখ পেতেও সে ব্যর্থ হয়।

জ্ঞান দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত (perfected) আত্মাগুলোর কথা ভিন্ন। মৃত্যু যখন দৈহিক পূর্বাধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটায়, তখন তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির ন্যায় যে রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করেছে। পীড়া সুখ অনুভব করতে মানুষকে বাধা দেয়। কিন্তু যখন আকস্মিক যন্ত্রণার অবসান ঘটে, তখন তার সুখের অনুভূতি হয় অত্যধিক। অথবা বিমুক্ত আত্মার অবস্থাকে প্রেমিকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মনে করা যাক, প্রেমিক ঘুমন্ত অবস্থায় নিমজ্জিত অথবা অচৈতন্য বা মতাল অবস্থায় নিমগ্ন। এই সময় প্রেমিকা তার নিকট আগমন করে। প্রথমে সে যখন জাগ্রত হয় বা চেতনা লাভ করে অথবা তার মত্ত অবস্থা দূরীভূত হয়, তখন সে মিলন সুখের (যা দীর্ঘ বিরহের পর) অদম্য (overwhelming) চেতনা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞানগত (intellectual) এবং আধ্যাত্মিক (spiritual) সুখের তুলনায় এসব সুখ অতি নগণ্য। কিন্তু মানুষ তা' অনুভব করতে সক্ষম নয় যে পর্যন্ত না তাদেরকে এই জীবনে পরিলক্ষিত বস্তুর উপমা দ্বারা বোঝানো হয়। যেমন, যদি আমরা একটি শিশু বা খোজাকে যৌনসুখ বোঝাতে চাই, তবে শিশুর ক্ষেত্রে সে যে খেলা সবচেয়ে ভাল এবং তার নিকট বেশি আনন্দদায়ক তার প্রসঙ্গ টেনে, এবং খোজাকে তীব্র ক্ষুধার সময় উপভোগ্য স্বাস্থ্যকর খাবারের তুলনা টেনে বোঝাতে হবে। এইভাবে শিশু বা খোজা সুখের মূল স্বভাব সম্বন্ধে অবহিত হবে। সে জানবে যে স্বয়ং উপমা বা প্রতীকী আসল যৌনসুখ সৃষ্টি করতে পারে না (খোজার ক্ষেত্রে), কারণ প্রতীকী কেবল স্বাদের (taste) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়েছে।

জ্ঞানগত সুখ দৈহিক সুখের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান। এ প্রমাণে দু'টি যুক্তি :

প্রথমে, ফেরেশতাদের অবস্থা পশু এবং শূকরের চেয়ে মহত্তর। কিন্তু ফেরেশতাগণ ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করে না : যেমন সম্ভোগ এবং আহার। পূর্ণতার এবং সৌন্দর্যের

www.pathagar.com

চেতনায় তাদের সুখ বিরাজ করে। বস্তুর সত্যতা ও যথার্থতার প্রতি তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। তাঁরা বিশ্বপ্রতিপালকের (স্থানে নয়, সত্তার অনুক্রমে) সান্নিধ্যে রয়েছেন। যেহেতু সকল সত্তা আল্লাহ্ থেকে ক্রমবিন্যাসে এবং মাধ্যম সত্তা এসেছে, তাই এটা সুস্পষ্ট যে, যে-মাধ্যমে তাঁর যত সন্নিকটে তাঁর মর্যাদাও তত উচ্চে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ স্বয়ং ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা জ্ঞানগত সুখ পছন্দ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে শত্রুর উপর বিজয় কামনা করে সে এরজন্য বাড়িঘর পরিত্যাগ করে। এমন কি, দাবা খেলায় বিজয় অর্জনের জন্য সে সারাদিনের আহারও পরিত্যাগ করে। যদিও এই বিজয় সামান্য ব্যাপার মাত্র। তবুও ক্ষুধার যাতনাকে সে কষ্ট বলে মনে করে না। অনুরূপে, যে তার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আগ্রহী সে এটা রক্ষার্থে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। পরিশেষে সে মর্যাদা রক্ষার সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রবৃত্তিকে দমন করে, এ জন্য যে, সেটা তার জন্য অপমান বা মর্যাদাহানিকর হয়ে দাঁড়ায়। সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয় যে, মর্যাদা রক্ষা তাঁর নিকট অধিকতর সুখদায়ক। আবার অনেক সময় সাহসী ব্যক্তি অগণিত যোদ্ধারা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ, মৃত্যুর বিপদকে সে তুচ্ছ জ্ঞানে ঘৃণা করে এই ভেবে যে তার নির্ভীকতার জন্য সে মৃত্যুর পর প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করবে। এটাই তার একান্ত কাম্য এবং আনন্দদায়কও বটে।

সুতরাং, পরলোকের জ্ঞানগত সুখ এই জগতের ইন্দ্রিয়সুখের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এটা না হলে, নবি (দঃ) আল্লাহ্কে এই উক্তি বলতে উল্লেখ করতেন না : "আমি আমার সৎ প্রার্থনাকারীদের জন্য এমন কিছু সংরক্ষিত করে রেখেছি যা কোনো দৃষ্টি অবলোকন করে নি, কোনো শ্রবণ শোনে নি এবং মানুষের অন্তঃকরণে কখনও প্রবেশ করে নি।" এবং আল্লাহ্ বলেন, "কোনো আত্মাই জানে না তার জন্য কি নয়ন তৃপ্তিকর ভাণ্ডার লুক্কায়িত রয়েছে।" এসব বিষয়ই হচ্ছে জ্ঞানের প্রয়োজনের কারণসমূহ। সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী জ্ঞান হচ্ছে বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত জ্ঞান। অর্থাৎ, আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞান, তাঁর গুণাবলি সম্পর্কীয় জ্ঞান, তাঁর ফেরেশতা সম্পর্কীয় জ্ঞান, তাঁর পবিত্র গ্রন্থসমূহ এবং সেসব বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান যা তাঁর নিকট থেকে আগত হয় এবং তাদের সত্তা লাভ করে। অন্য জ্ঞান সম্বন্ধে বলা যায় যে, কেবল সেসব জ্ঞান যা বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত জ্ঞানের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা তাদের স্বভাবের কারণেই উপকারী। কিন্তু যা বিশুদ্ধ জ্ঞানগত জ্ঞানের উপায় হিসেবেও আসে না, যেমন ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, কাব্য এবং বিভিন্ন প্রকার বিশেষিত বিজ্ঞানসমূহ তা' অন্যান্য কলা বা শিল্পের ন্যায়ই কলা বা শিল্প।

তারপর আত্মার বিশুদ্ধিকরণের জন্য প্রয়োজন সৎ-স্বভাব (virtuous conduct) এবং প্রার্থনা। দেহের সাথে আত্মার সংযোগকালীন সময়ে আত্মা বস্তুর সত্তার (realities of things) জ্ঞান থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়, দেহের উপর এর ছাপের জন্য নয় বরং দেহের সাথে এর পূর্বাধিকারবশত (preoccupied)। কামজ বাসনার প্রতি এর আসক্তি এবং দৈহিক চাহিদা মেটানোর প্রতি এর লক্ষ্য। এই আসক্তি একটা মানসিক প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে যা অব্যাহত ইন্দ্রিয়সুখ এবং দীর্ঘ কামজ বাসনার দ্বারা গভীরতর ও সুদৃঢ় হয়। ফলে দেহের মৃত্যুর পরও এই ঝোঁক বা প্রবণতা থেকে মুক্তি পাওয়া আত্মার জন্য অসম্ভব হয়ে ওঠে যা দু'টি কারণে যন্ত্রণাদায়ক ও পীড়াদায়ক।

www.pathagar.com

প্রথমত, এটা আত্মাকে তার সঠিক (proper) সুখ লাভ করতে বাধা দেয়, যেমন ফেরেশতাদের সাথে মিলন (the union with the angels) এবং সুন্দর ঐশী বস্তুর প্রতি অন্তর্দৃষ্টি (insight into be beautiful divine things) এবং দেহ যার সাথে আত্মা মৃত্যুর পূর্বে পূর্বাধিকারী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল, তা' তার দুঃখ থেকে তার দৃষ্টিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, জাগতিক সুখের কারণসমূহের প্রতি আত্মার আগ্রহ থেকেই যায়। কিন্তু এর হাতিয়ার অর্থাৎ দেহ যার মাধ্যমে সে তার সুখ লাভের কৌশল অবলম্বন করত তা বঞ্চিত হওয়ার কারণে এর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। মনে করা যাক, একজন লোক তার স্ত্রীকে ভালবাসে। সে তার সম্পত্তিকে ভোগ করে। সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ-প্রীতি রয়েছে। সে তার সম্পদে আনন্দাপ্লুত এবং তার মর্যাদায় সে আত্মম্ভরী। এবারে মনে করা যাক, তার স্ত্রীকে হত্যা করা হলো। তার মর্যাদা থেকে তাকে পদচ্যুত করা হলো। তার সন্তান ও মহিলাদেরকে বন্দি করা হলো। শত্রুদের কর্তৃক তার সম্পদ ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়া হলো এবং তার মান-মর্যাদা শোচনীয়ভাবে অধঃপতিত হলো। নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তির দুঃখের কারণ সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান। যাই হোক, যতদিন সে বেঁচে থাকে, ততদিন সে তার লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে প্রত্যাশা করে, কারণ জগৎ সর্বদাই আজ থেকে কাল (from today to the tomorrow)-এ গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আত্মার কি হবে যখন তার প্রত্যাশা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু তাকে দেহ থেকে বঞ্চিত করেছে।

এমন মানসিক প্রবণতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় যে পর্যন্ত না আত্মা তার কামজ বাসনা থেকে বিরত হয়, জগৎ থেকে তার মুখ ফিরায় এবং নিজেকে জ্ঞান ও ধর্ম লাভের সংগ্রামে নিয়োজিত রাখে। যদি এসব শর্ত পূরণ করা হয়, এই পার্থিব জগতে থাকলেও পার্থিব জগতের বস্তুসমূহের প্রতি এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অপরপক্ষে, পরকালের বস্তুর প্রতি এর সংযোগ বৃদ্ধি পাবে। তাই যখন মৃত্যু আসে আত্মা তখন সেইরূপ মুক্তি অনুভব করবে, যেমন একজন কারাবন্দি তার মুক্ত হওয়ার অনুভূতি অনুভব করে। সে মুহূর্তে সেসবকিছুই পাবে, যা সে বাঞ্ছা করেছিল—অর্থাৎ বেহেশত।

কিন্তু সকল দৈহিক গুণকে অতিক্রম করা অথবা মুছে ফেলা আত্মার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, দেহের চাহিদা তাকে তাদের দিকে আকর্ষণ করে। যাই হোক, আত্মা দেহের সাথে তার সংযোগকে দুর্বল করতে পারে। এই কারণেই আল্লাহ্ বলেন : "তোমাদের প্রত্যেককেই এর সমীপবর্তী হতে হবে, এটা মহান প্রভুর অলঙ্ঘনীয় বিধান (irrevocable decree of the lord)।" যখন দেহের সাথে এর সংযোগ দুর্বল হয়, তখন দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে যে যাতনা (agony) সৃষ্টি হয়, তা' অনেকাংশে লাঘব হয়ে যায়। বিপরীতে, দেহের মৃত্যুর পর আত্মা আবিষ্কার করতে পারবে যে কিভাবে ঐশী বস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায়। সত্বরই আত্মা জগৎ পরিত্যাগের বিষয়গুলো ভুলে যাবে এবং জাগতিক বিষয়ের প্রতি তার আকর্ষণ হ্রাস পাবে। আত্মার এই অবস্থার কথা সেই ব্যক্তির সদৃশ যে তার নিজ দেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে এবং সেখানে গিয়ে উচ্চমর্যাদা এবং মহান কর্তৃত্ব লাভ করেছে। পরিবার ও দেশ

www.pathagar.com

ত্যাগ করার ফলে তার আত্মা দুঃখ পেতে পারে এবং সে অসুখী অনুভব করতে পারে। কিন্তু তার এসব অনুভূতি অচিরেই দূরীভূত হয়ে যাবে, যখন সে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের মর্যাদা থেকে উদ্ভূত আনন্দ ও সুখের সাথে অভ্যস্ত ও একাত্ম হয়ে যাবে।

দৈহিক গুণাবলির সম্পূর্ণ বর্জন (negation) সম্ভব নয় বিধায় ধর্ম আমাদেরকে চরিত্রের সকল চরম বিপরীতের মধ্যে মধ্যপন্থা বেছে নেয়ার নির্দেশ দেয়। ঈষদুষ্ণ পানি যা গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয় তা' সমভাবে দুই বিপরীতধর্মী গুণ থেকে মুক্ত। কারোর সম্পদ সঞ্চয় করা উচিত নয় কিংবা অপচয় করাও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, সঞ্চয় তাকে লোভ-লালসাকারী হিসেবে এবং অপচয় তাকে অপব্যয়কারী হিসেবে চিহ্নিত করবে। অনুরূপে, কেউ কোনো কিছু থেকে নিজেকে খুব দূরে সরিয়ে রাখবে না, আবার, এতে খুব বেশি জড়িতও হবে না। কারণ, দূরে সরে থাকা ভীরুতার লক্ষণ এবং খুব জড়িত হয়ে থাকা দুঃসাহসিকতার লক্ষণ। প্রথম ক্ষেত্রে, তার লক্ষ্য হবে বদান্যতা (generosity) যা কৃপণতা ও অপব্যয়ের মধ্যপন্থা। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হবে, সাহস (courage) যা ভীরুতা ও দুঃসাহসিকতার মধ্যপন্থা (mean)। অন্যান্য নৈতিক গুণের ক্ষেত্রেও এ নীতি প্রযোজ্য নৈতিক বিজ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক। পবিত্র বিধান (sacred Law) এর পুংখানুপুংখ আলোচনা করে। নৈতিক চরিত্রের সংস্কার সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত না পবিত্র বিধানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ (regard) থাকে। যদি আত্মসুখবাদকে নৈতিক চরিত্র বা স্বভাবের নীতি করা হয়, তবে মানুষ তার ন্যায় হবে যে, "স্বীয় প্রবৃত্তিকে তার প্রভু" মনে করে। বিপরীতে, নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা নয়, একজনকে পবিত্র বিধান অনুসারে কাজ করা বা কাজ না করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা নির্দেশিত হয়েছে।

যার জ্ঞান ও পুণ্য নেই সে অভিশপ্ত। আল্লাহ্ বলেন, "যে জ্ঞান ও পুণ্য সাধন করেছে, সে অবশ্যই সফলকামী, যে একে ব্যাহত করেছে, সে অবশ্যই ব্যর্থ।" যে নৈতিক ও বুদ্ধিগত মহত্ত্ব সমন্বয় করেছে, সে একজন ধর্মপরায়ণ জ্ঞানী (devout sage)। তার পুরস্কার হবে পরম সুখ (absolute bliss)। যার নৈতিক নয়, বুদ্ধিগত দিক রয়েছে সে অধার্মিক জ্ঞানী। তাকে যে শাস্তি দেয়া হবে তা' দীর্ঘকালব্যাপী হবে, তবে অনন্ত বা স্থায়ীভাবে নয়। কারণ, মোটের উপর, তার আত্মা জ্ঞান দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছে। যদিও তার আত্মার বিপরীতে তার দৈহিক স্বভাব অপবিত্রতার (impurity) দ্বারা তাকে কলুষিত করেছে, তবুও কালের গতিতে এই অপবিত্রতা মুছে যেতে পারে। কারণ, এরমধ্যে আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে। অপবিত্র স্বভাবের কারণসমূহ নতুনভাবে সৃষ্টি হবে না। যার জ্ঞান নেই, অথচ পুণ্য আছে, সে পরিত্রাণ পাবে এবং সে কোনো দুঃখ অনুভব করবে না। কিন্তু সে পরম সুখ পাবে না।

অধিকন্তু, (দার্শনিকগণ বলেন) যে মুহূর্তে এজন মৃত্যুবরণ করেন, তখনই তার কেয়ামত আরম্ভ হয়। পবিত্র বিধি-বিধানে যা বর্ণিত হয়েছে তা' রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, মানুষের বোধশক্তি এসব আধ্যত্মিক সুখ-দুঃখ বুঝতে অক্ষম। এ কারণেই এসব বিষয় প্রতীকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এবং একই সঙ্গে তারা উল্লেখ করেন যে, প্রকৃত ও আসল আধ্যাত্মিক সুখ, বর্ণিত আলোচনার বিষয় থেকে অনেক উর্ধ্বে। (এই হচ্ছে দার্শনিকদের মতবাদ)

www.pathagar.com

আমাদের উত্তর হবে :

এদের অধিকাংশ বিষয়ই ধর্মের বিরোধী নয়। পরকালের সুখ ইন্দ্রিয়জাত সুখ থেকে শ্রেষ্ঠতর, এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিংবা আমরা অস্বীকার করি না দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মার অমরত্বকে। কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো জানি ধর্মের প্রাধিকার (authority) বলে যা পুনরুত্থান মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যদি অমরত্বকে স্বীকার করা না হয়, তবে পুনরুত্থানের বিষয়টি বোধগম্য হবে না। কিন্তু পূর্বের ন্যায় আমাদের আপত্তি তাদের সেই উক্তির প্রতি যেখানে তাঁরা উল্লেখ করেন যে এসব বস্তুর চূড়ান্ত জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা (reason) দিতে পারে। অধিকন্তু, এই মতবাদে এমন সব উপাদান রয়েছে যা ধর্মের সাথে বিরোধে আসে। এইগুলো হচ্ছে দেহের পুনরুজ্জীবনের অস্বীকার, বেহেশত-দোজখে দৈহিক ও আত্মিক সুখ-দুঃখের অস্বীকার এবং কোরআনে বর্ণিত বেহেশত-দোজখের অস্তিত্বের অস্বীকার। দৈহিক ও আত্মিক সুখ-দুঃখের সমন্বয়ের সম্ভাব্যতা স্বীকৃতিতে কিসে বাধা দিচ্ছে? আয়াত : "কোনো আত্মাই জানে না তাদের জন্য ভাণ্ডারে কি লুক্কায়িত আছে।" এর অর্থ হচ্ছে কোনো আত্মাই ঐসব বিষয়কে জানে না। অনুরূপে উল্লেখিত হয়েছে : "আমার সৎ এবাদতকারীদের জন্য এমন কিছু সংরক্ষিত করে রেখেছি যা কোনো দৃষ্টি অবলোকন করে নি।" পরম মূল্যের বস্তুর অস্তিত্ব অনুমিত হতে পারে, কিন্তু তাদের ব্যতীত অন্যকোন বস্তুর অস্বীকার এ থেকে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে না। বরং এ দু'য়ের সমন্বয় বৃহত্তর পূর্ণতার জন্য সহায়ক (conducive) হবে। অতি পূর্ণ বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদেরকে এইরূপই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কাজেই এই দু'য়ের সমন্বয় সম্ভব। ধর্মের সাথে সংগতি রেখে এতে স্বীকৃতি দেয়া অপরিহার্য।

যদি বলা হয় :

পবিত্র গ্রন্থে আমরা যা পাই তা হচ্ছে রূপক যা সাধারণ বোধের সীমাবদ্ধতার মাত্রানুসারে বর্ণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বোধগম্য করে তুলার জন্য পবিত্র আয়াত ও হাদিসের রূপকগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। (কারণ, ঐশী গুণাবলি অনুধাবন করার জন্য সাধারণের বোধশক্তিগুলো অত্যন্ত স্থূল)।

উত্তর :

পরবর্তী দৃষ্টান্তটি পূর্ববর্তীর সাথে সমীকরণ করে দেখা স্বেচ্ছাচারিতামূলক। দু'টো দৃষ্টান্তকে আলাদা করে রাখার দু'টি কারণ রয়েছে :

প্রথমত, আয়াত ও হাদিসের শব্দাবলী যার মধ্যে নরত্বারোপমূলক আভাস রয়েছে তার ব্যাখ্যা একই নীতিতে হবে যার দ্বারা আরবি ঐতিহ্যগত রূপক নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু স্বর্গ-নরকের বর্ণনা এবং এসব বিষয়ের বিবরণ এত সহজ যে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো অবকাশ নেই। এখন অবশিষ্ট যা বলার থাকে, তা হচ্ছে কেউ এই মূল পাঠকে প্রতারণামূলক ভাবতে পারে—মানুষের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু অসত্যের ধারণা করতে পারে। কিন্তু এটা মর্যাদা ও পবিত্রতার হানি যা নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিগত যুক্তি আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে দেশ (space), দিক (demension), দৈহিক আকার (physical form), অঙ্গগত হস্ত, অঙ্গগত চক্ষু, গতি ও বিরাম শক্তির

www.pathagar.com

অসম্ভাব্যতার কথা প্রমাণ করে। ফলে, যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা ব্যাখ্যার (মূল পাঠে যেখানে এগুলোর প্রসঙ্গ আসে) প্রয়োজন। কিন্তু পরকালের বস্তুসমূহ যা আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছে তা ঐশী সর্বক্ষমতার দ্বারা পালন করা অসম্ভব নয়। সুতরাং মূলপাঠ প্রাথমিকভাবে যা অর্থ করে তাতে স্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং একে প্রসঙ্গের বাইরে আনা ঠিক নয়। যা থেকে এটি উদ্ভূত যেই তাৎপর্যেই একে বোঝা উচিত।

যদি বলা হয় :

জ্ঞানগত যুক্তি প্রকৃতপক্ষেই দেহের পুনরুত্থানের অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করেছে, যেমনটি তাঁরা আল্লাহতে (মহান তিনি) নরত্বারোপমূলক গুণাবলির অসম্ভাব্যতার কথা প্রমাণ করেছেন। তা'হলে, আমাদের দাবি সেসব যুক্তি কি। তাঁদের মতবাদের পক্ষে তাঁরা বিভিন্ন দিকে থেকে বিষয়টি আলোচনা করেন।

(১)

প্রথমে তাঁরা বলেন :

দেহে আত্মার প্রত্যাবর্তনের ধারণা তিনটি বিকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথমে বলা যায় (যেমন কোনো কোনো মুতাকাল্লিমিন অভিমত পোষণ করেন) মানুষ হচ্ছে দেহী বা শরীরী এবং জীবন হচ্ছে একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র যা দেহের উপর নির্ভরশীল। আত্মা যা আত্ম-আশ্রয়ী বলে ধারণা করা হয় এবং যাকে দেহের পরিচালক বলে অভিহিত করা হয়, তার অস্তিত্ব নেই। মৃত্যু বলতে বোঝায় জীবনের পরিসমাপ্তি অথবা এটা জীবন সৃষ্টির কার্য থেকে স্রষ্টার বিরতিকে অর্থ করে। এই কারণে পুনরুত্থানের অর্থ হবে (ক) আল্লাহ্ কর্তৃক দেহের পুনরুদ্ধার যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (খ) দেহের অস্তিত্বের পুনরায়ন, (গ) জীবনের পুনরুদ্ধার যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল অথবা বলা যেতে পারে যে দেহের উপাদান মৃত্তিকারূপে থেকে যাবে এবং পুনরুত্থান বলতে বোঝায় এই মৃত্তিকা সংগৃহীত হবে এবং মানব অবয়বে গঠিত হবে যার মধ্যে জীবন প্রথমবারের মতো সৃষ্টি হবে। এই হচ্ছে একটি বিকল্প।

দ্বিতীয়ত, এটা বলা যেতে পারে যে, দেহের মৃত্যুর পরও আত্মা অস্তিত্বে থাকবে। পুনরুত্থানকালে দেহের সকল অংশ সংগৃহীত হলে মূল দেহের সাথে একে ফিরিয়ে আনা হবে। এই হচ্ছে আরেকটি বিকল্প।

তৃতীয়ত, এটা বলা যেতে পারে যে, আত্মা দেহে ফিরে আসবে। সেটা আদি দেহের অনুরূপ বা অন্য যে কোনো অংশেই গঠিত হোক না কেন। ফলে, প্রত্যাবর্তন সেই মানুষই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা সেই আত্মাই থাকে (returning one would be that man, in so far as the soul is that soul)। উপাদানের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কারণ, উপাদানের জন্যই মানুষ মানুষ হয় না, বরং আত্মার কারণেই মানুষ মানুষ হয়।

এখন এ তিন বিকল্পই মিথ্যে।

প্রথমটি, সুস্পষ্টভাবেই মিথ্যে। কারণ, যখন জীবন ও দেহ ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন এর পুনঃসৃষ্টির (recreation) অর্থ হবে এটা যা ছিল অনুরূপ কোনো কিছুর উৎপাদন,

www.pathagar.com

কিন্তু হুবহু এক নয় (production of something similar to but not identical with what had been)। কিন্তু প্রত্যাবর্তন বলতে আমরা যা বুঝি, তা' হচ্ছে একটি বস্তুর ধারাবাহিকতার ধারণা এবং অন্যবস্তুর উদ্ভব (supposition of the continuity of one thing as well as emergence of another)। যেমন, যখন একজন দানকার্য পুনরায় গ্রহণ করেছেন বলে বলা হয়, তখন এর অর্থ হচ্ছে বদান্য ব্যক্তি স্থায়ী আছেন (generous person continues) এবং বদান্য কার্য পরিত্যক্ত হওয়ার পর তিনি পুনরায় দানকার্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অর্থাৎ তিনি কোনো কিছুতে প্রত্যাবর্তন করেন যা তার মূলের অনুরূপ ছিল, কিন্তু সংখ্যার দিকে থেকে এটা ভিন্ন। সুতরাং, প্রত্যাবর্তনটি স্বয়ং মূল বস্তুতে প্রত্যাবর্তন নয়, মূল বস্তুর অনুরূপে প্রত্যাবর্তন।

পুনরায়, যখন বলা হয় কোনো একজন শহরে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন এর অর্থ হচ্ছে যে তিনি কোথাও অস্তিত্বে বিদ্যমান রয়েছেন (continued to exist elsewhere) : পূর্বে তিনি শহরে ছিলেন এবং এখন তিনি শহরে থাকার অবস্থা পুনরায় গ্রহণ করেছেন যা তাঁর আদি (original) থাকার অবস্থার (state) অনুরূপ। যদি কোনো কিছু না থাকে যা স্থির এবং বিপরীতে, যদি দু'টি সাদৃশ্যপূর্ণ অথচ সংখ্যাগতভাবে ভিন্ন বস্তু থাকে, যাদের মধ্যে সময় বা কাল বাধা (intervenes) দান করে, তবে প্রত্যাবর্তন শব্দটি প্রয়োগ করার জন্য যে পূর্বশর্তের প্রয়োজন তা' পূরণ হবে না। মুতাযিলাদের ন্যায় কেউ এই পরিণামকে এড়িয়ে যেতে পারেন এই বলে—যথা, অন-অস্তিত্ব হচ্ছে একটা সদর্থক বস্তু এবং অস্তিত্ব হচ্ছে একটি অবস্থা যা আকস্মিক হিসেবে অন-অস্তিত্বে ঘটে, শেষ হয়ে যায় এবং পরে ফিরে আসে। এইভাবে 'প্রত্যাবর্তন' শব্দটি সত্তার (entity) ধারাবাহিকতার অর্থে নির্ধারিত হবে। এটা স্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকার করে, সত্তা যার মধ্যে অস্তিত্ব ফিরে আসতে পারে। কিন্তু পরম অন-অস্তিত্বের ধারণাকে বর্জন করে যা বিশুদ্ধ নঞর্থক। কাজেই এর অসম্ভাব্যতা।

এই বিকল্পের পক্ষে যদি একজন কৌশলে একে এই বলে সমর্থনের চেষ্টা করেন যে দেহের মৃত্তিকা অবিনাশী (imperishable) অতএব, এই মৃত্তিকা হবে ধারাবাহিক সত্তা। জীবন এতে পুনরধিষ্ঠিত মাত্র (to which life is restored)।

আমাদের উত্তর হবে :

এটাই যদি ব্যাপার হয়, তবে একথা বলা সত্য হবে যে, জীবন এ-থেকে কিছুকাল বিলুপ্ত হওয়ার পর, মৃত্তিকা পুনরায় জীবন লাভ করে। কিন্তু এতে করে একজন মানুষের প্রত্যাবর্তন হবে না অথবা তার পূর্ব আত্মারও পুনরাবির্ভাব হবে না। কারণ, মানুষ জড় ও মৃত্তিকার জন্য মানুষ নয় যার সে গঠিত। তার সকল দৈহিক অংশ অথবা ন্যূনপক্ষে অধিকাংশ অংশই খাদ্য বা আহারের দ্বারা প্রতিস্থাপিত (replaced)। কিন্তু আত্মার শক্তিতে (by virtue of spirit or soul) সে প্রথমবারের ন্যায় একই থেকে যায়। তাই জীবন বা আত্মা যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে যা ধ্বংস হয়েছে তার প্রত্যাবর্তন বোধগম্য নয়। খুব বেশি হলে এর অনুরূপ কোনো একটা অস্তিত্বে আনা যেতে পারে। আল্লাহ্ যদি মৃত্তিকায় মানব জীবন সৃষ্টি করেন যা বৃক্ষ, ঘোড়া বা উদ্ভিদের দেহ গঠন করে, তবে এটা হবে মানুষের প্রথম সৃষ্টি। যা অস্তিত্বে নেই তার প্রত্যাবর্তন জ্ঞানগত

www.pathagar.com

নয়। প্রত্যাবর্তিত সত্তাকে অবশ্যই অস্তিত্বশীল হতে হবে। এটা যে অবস্থায় ফিরে আসে যা এটা পূর্বে ছিল—পূর্বের অবস্থার সদৃশে নয়। ফলে, প্রত্যাবর্তিত সত্তা হচ্ছে মৃত্তিকা—জীবনের গুণে প্রত্যাবর্তন (returning to the attribute of life)। কিন্তু মানুষের দেহ সে যা তা-ই সৃষ্টি করে না। কারণ, ঘোড়ার দেহ প্রায়শ মানুষের খাবার হয়ে ওঠে যা বীর্য-বিন্দু তৈরি করে এবং এ থেকে অন্য মানুষের সৃষ্টি ঘটে। কিন্তু সেই বলে এটা বলা যায় না যে, ঘোড়া মানুষ হয়ে গেছে। কারণ, ঘোড়ার আকারই ঘোড়াকে ঘোড়া তৈরি করে—এর জড় বা উপাদান নয়। এবং (বর্তমান দৃষ্টান্তে) ঘোড়ার আকার ধ্বংস হয়েছে—শুধু জড় বা উপাদান থেকে যাচ্ছে।

এখান দ্বিতীয় বিকল্পটি বিবেচনা করা যাক—অর্থাৎ আত্মার ধারাবাহিকতার ধারণা এবং আদি মূল দেহে এর প্রত্যাবর্তন বিষয়টি। যদি এমন বিষয় ধারণা করা যায়, তবে যথার্থ প্রত্যাবর্তন বলতে যা বোঝায় এটা তাকেই অর্থ করবে। অর্থাৎ, এ হবে মৃত্যুর দ্বারা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর দেহের নির্দেশনার কার্যে আত্মার পুনরারম্ভকরণ (resumption)।

কিন্তু এটা অসম্ভব। কারণ, মানুষের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। পাখি এবং কীট-পতঙ্গের দ্বারা এ দেহ ভক্ষিত হয়। তারপর রক্তে বা বাষ্পে পরিবর্তিত হয়ে সমগ্র জগতের পানি, বাষ্প ও বাতাসে মিশ্রিত হয়ে পড়ে।

ঐশী সার্বভৌমের বিশ্বাসের ক্ষমতাবলে যদি একে ধারণা করা হয়, তবে এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে—

১. হয় মৃত্যুর সময় যেসব অংশ বিদ্যমান ছিল, শুধু সেসব অংশের পুনঃসংযোগ হবে। যদি তাই হয়, তবে মানুষ জীবিতকালে জগতে যেরূপ ছিল ঠিক তদ্রূপই তার পুনরুত্থান ঘটবে অর্থাৎ যার অঙ্গ বাদ দেয়া হয়েছে অথবা যার নাক ও কান কর্তিত হয়েছে অথবা যার অঙ্গ বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে ঠিক তদ্রূপই সে পুনরুত্থিত হবে। কিন্তু এটা আপত্তিকর (disgusting), বিশেষ করে স্বর্গের অধিবাসীদের জন্যে যদিও তাদেরকে আদি জীবনে ত্রুটিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে মৃত্যুকালীন সময়ে তাদের যে খুঁত ও ত্রুটি ছিল, সেই খুঁত বা ত্রুটি নিয়েই তাদেরকে আবার পুনরাবির্ভাব হতে হবে। মৃত্যুকালীন সময়ে বিদ্যমান অংশগুলোর পুনঃসংযোগকরণের ধারণার মধ্যে এই অর্থকে সীমাবদ্ধ করে রাখা এই হচ্ছে গুরুতর জটিলতা।

২. অথবা একজনের জীবনকালে যা অস্তিত্বশীল ছিল সেসব অংশের সংযোগকরণ হবে। কিন্তু দু'টি কারণে এটা অসম্ভব।

প্রথমত, মানুষ যখন মানুষকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে (কোনো কোনো স্থানে এ রীতি প্রচলিত আছে এবং দুর্ভিক্ষের সময় প্রায়শ এইরূপ ঘটে) তখন এই দু'য়ের পুনরুত্থান বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হবে। কারণ, উপাদান বা জড় একই থাকবে। খাদ্য গ্রহণকারীর দেহে খাদ্য হিসেবে ভক্ষিত (eaten) ব্যক্তিদের দেহ এতে আত্মভূত (absorbed) হয়ে যাবে। ফলে এক দেহে দু'আত্মার (two souls) পুনঃস্থাপন (restoration) সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, এখনই (at once) যকৃত, হৃৎপিণ্ড, হস্ত, পদ হিসেবে একই অংশ পুনরুত্থিত হয়ে উঠা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো কোনো আঙ্গিক অংশ (organic part) অন্যের অবশিষ্ট পুষ্টি থেকে তাদের পুষ্টি লাভ করে। হৃৎপিণ্ডের অংশ যকৃতের পুষ্টি সাধনে যোগান দেয় এবং এভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও একে অপরের পুষ্টি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা যদি কোনো বিশেষ অংশকে ধরে নেই যা সকল অঙ্গের জড় বা উপাদান ছিল, তবে কোন্ অঙ্গে তারা প্রত্যাবর্তন করবে। উল্লেখিত প্রথম প্রত্যাখ্যানের অসম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এক মানুষ অন্য মানুষকে খাদ্য হিসেবে আহার করে—এ ধরনের অনুমান বা প্রকল্প (hypothesis) আনয়নের প্রয়োজন নেই। যদি জমির (land) কোনো অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যায় , তবে জানা যায় যে, এরমধ্যে অবস্থিত মৃত্তিকার অংশগুলো মানুষের দেহরূপে ছিল। কালের গতিতে জমিতে যখন সেচকার্য করা হয় এবং কর্ষণ করা হয়, তখন মৃত্তিকা ফল ও শাকসবজিরূপে পরিণত হয়। পশু এবং জীবজন্তু তা খাদ্যরূপে খেয়ে থাকে। তারপর মৃত্তিকা মাংসে পরিণত হয় এবং জীবজন্তু যখন আমাদের দ্বারা ভক্ষিত হয়, মৃত্তিকা তখন পরিণামে আমাদের দেহ হয়ে ওঠে। তাই সকল উপাদনই যা উপাদান নামে অভিহিত তা আসলে মানুষের দেহ। এর পরিবর্তন হচ্ছে। মৃতদেহের মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে মাংস এবং মাংস থেকে সজীব সত্তা। এই ব্যাখ্যার পরিণাম পুনরুত্থানের অসম্ভাব্যতার অন্য একটি কারণ, অর্থাৎ তৃতীয় একটি কারণের উদ্ভব ঘটায়। যথা, দেহ থেকে পরিত্যক্ত আত্মার সংখ্যা অসংখ্য, অথচ দেহ সীমিত। ফলে মানুষের উপাদান যা পুনরুত্থানকালে ব্যবহৃত হবে তা আত্মার সংখ্যার চেয়ে কম হবে।

পরিশেষে তৃতীয় বিকল্প অর্থাৎ কোনো মৃত্তিকা বা উপাদান দিয়ে তৈরি দেহে আত্মার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। এর কারণ দু'টি :

প্রথমত, উপাদান যা সৃষ্টি ও ধ্বংস গ্রহণ করে তা চন্দ্রমণ্ডলের গহ্বরে সীমিত। তাদের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন সম্ভব নয়, তার সংখ্যা সীমিত। অন্যদিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার সংখ্যা অসীম। ফলে আত্মার দ্বারা উপাদানের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, মৃত্তিকা যে পর্যন্ত মৃত্তিকা থাকে সেই পর্যন্ত তা' আত্মা থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে না। এই নির্দেশনা গ্রহণের জন্য উপাদানগুলোর একত্রে মিশ্রণের প্রয়োজন যাতে করে মিশ্রণ বীর্যের গঠন-সদৃশ হয়। কেবলমাত্র কাষ্ঠ বা লৌহ আত্মা থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে না। কিংবা কাষ্ঠ বা লৌহ থেকে মানুষের পুনরাবির্ভাবও অসম্ভব নয়। হাড় ও মাংসের দ্বারা গঠিত জীবদেহ ব্যতীত কোনো মানুষ হতে পারে না। এবং যখনই দেহ ও এর গঠন আত্মাকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে, তখন সত্তা, যা আত্মার প্রদাতা (givers of souls) তা' থেকে আত্মার সৃষ্টিরূপে তারা পরিচিত হয়। পরিণামে এই ধারণা অনুযায়ী দু'আত্মা একই সাথে এক দেহে অবস্থান করবে। কিন্তু এটা অসম্ভব। ফলে এই ধরনের ধারণার প্রত্যাখ্যান হবে পুনর্জন্মের মতবাদেরও প্রত্যাখ্যান। কারণ, এই ধারণাটি হচ্ছে সেই মতবাদেরই অনুরূপ। এটা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে আছে

www.pathagar.com

যে, আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সেই দেহের নিয়ন্ত্রণ পুনর্গ্রহণ করবে যা আদি দেহ ছিল না। পুনর্জন্ম মতবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি সত্য, এই ধারণার বিরুদ্ধেও অনুরূপ যুক্তি একই ভাবে সত্য।

পূর্ব আলোচনার প্রতিবাদের বর্ণনা নিম্নরূপ :

শেষ বিকল্পটি যদি কেউ বেছে নেয় এবং বিশ্বাস করেন যে আত্মা অমর এবং আত্মা একটি আত্ম-আশ্রয়ী দ্রব্য (self-subsisting substance), তবে একে অপ্রমাণ করবে কি করে? এবং এটা ধর্মের সাথেও দ্বন্দ্ব বা বিরোধে আসে না। বিপরীতে, আয়াত : "আল্লাহ্র পথে যাদেরকে নিহত করা হয়েছে তাদেরকে মৃত বলে ভেবো না। পরন্তু; তারা জীবিত। আল্লাহ্র নিকট তাদের উপজীবিকা রয়েছে।" এই আয়াতগুলো এটা প্রদর্শন করে যে ধর্ম আত্মার অমরতার পক্ষে। অধিকন্তু নবি (দঃ) এর বাণীতেও এর প্রমাণ মিলে : "পুণ্য আত্মাসমহূ সবুজ বর্ণের পাখির মধ্যে স্বর্গের নিম্নে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।" অন্য হাদিসেও এর প্রমাণ মিলে। যেমন সৎ কাজের প্রতিদান, মুন্‌কির-নকিরের প্রশ্ন, শাস্তিদান প্রভৃতি। এসবই আত্মার অমরতাকে নির্দেশ করে। একই সময়ে ধর্ম আমাদেরকে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে শিক্ষা দেয়। মৃত্যুর পর জীবনের পুনরুদয় ঘটবে। এবং পুনরুত্থান বলতে দেহের পুনরুত্থানকে অর্থ করে। দেহে আত্মার পুনরায়নের দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে—সেটা আদি উপাদানের অনুরূপে, অন্যদেহের উপাদানের দ্বারা অথবা প্রথমবারের সৃষ্ট উপদানে দ্বারা যাই হোক না কেন। কারণ, এটা কেবল আত্মাই, দেহ নয় যা আমাদেরকে আমরা যা-ই তা' করে তুলে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত আমাদের দেহের সকল অঙ্গের সদা পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন খাদ্য কার্যের দ্বারা সাধিত হচ্ছে। খাদ্যই আমাদেরকে কৃশ বা স্থূল করে তুলছে। এবং এসব পরিবর্তনই আমাদের এক জীবনের গঠনকে অন্যজীবনের গঠন থেকে আলাদা করে রাখছে। কিন্তু তবুও আমরা পূর্বের ন্যায় একই থেকে যাচ্ছি। এটাই হচ্ছে ঐশী সার্বভৌম শক্তির যথার্থ বিষয়। এই হচ্ছে আত্মার প্রত্যাবর্তন। এর যন্ত্র (অর্থাৎ দেহ) বঞ্চিত হওয়ার কারণে এটা শারীরিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি থেকে বাধাগ্রস্ত হয়ে ছিল। এখন যেহেতু অনুরূপ যন্ত্র একে পুনরায় দেয়া হচ্ছে, তাই এই প্রত্যাবর্তন হচ্ছে যথার্থ অর্থে প্রত্যাবর্তন।

অসংখ্য আত্মা এবং সীমিত উপাদান পুনরুত্থানকে অসম্ভব করে তোলে বলে তাদের যে মতবাদ তা উদ্ভট ও ভিত্তিহীন। এটা জগৎ-নিত্যতা এবং আবর্তনমূলক গতির অবিরাম পারম্পর্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যিনি জগৎ-নিত্যতায় বিশ্বাস করেন না, তিনি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার সংখ্যাকে সীমিত মনে করেন যা অস্তিত্বশীল উপাদানের সাথে প্রমেয় (commen surable)। এমন কি যদি এটা স্বীকারও করা হয় যে আত্মার সংখ্যা অধিকতর (larger) তবে, উপাদানের যে কোনো সংখ্যা নতুনভাবে সৃষ্টি করা আল্লাহ্র ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতা বা শক্তিকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে তিনি যে যে-কোনো বস্তুকে অস্তিত্বে আনতে পারেন তা' অস্বীকার করা। এবং জগৎ-উৎপত্তির সমস্যার ক্ষেত্রে এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অসম্ভাব্যতার পরবর্তী কারণ—অর্থাৎ পুনর্জন্ম মতবাদের সাথে এর সাদৃশ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে ভাষার (word) উপর কোনো বিতর্ক না থাকাই বাঞ্ছনীয়। ধর্ম আমাদেরকে যা শিক্ষা দেয়, তাই বিশ্বাস করা উচিত—এমনকি এটা যদি পুনর্জন্ম মতবাদের বিষয়ও হয়। যাই হোক, জগৎ সম্পর্কে আমরা এই মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু পুনরুত্থানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না—এটা পুনর্জন্ম মতবাদের সাথে এক হোক বা না হোক।

তোমাদের বক্তব্য যে প্রতিটি গঠন (constitution) যা আত্মা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, তা' সত্তা (principle) থেকে আত্মা সৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এটা প্রকৃতি (nature), ইচ্ছাশক্তি নয় যা আত্মার উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করে। জগৎ উৎপত্তি বিষয়ক সমস্যাতে এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এখন তোমাদের শুধু এই বলা অবিশষ্ট থাকে : কেন পুনরুত্থানের পূর্বে আমাদের এই পৃথিবীতেই মাতৃগর্ভে এটা গঠন প্রস্তুতির সাথে সংযুক্ত হয় নি? (আত্মা গ্রহণের জন্য)

উত্তর হবে : সম্ভবত বিচ্ছিন্ন আত্মার ভিন্ন প্রকারের প্রস্তুতির দরকার এবং এ ধরনের প্রস্তুতির কার্য পুনরুত্থান কাল না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় না। ফলেএটা অসম্ভব নয় যে, বিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ আত্মার যথার্থ প্রস্তুতি নতুন সৃষ্ট আত্মা যা দেহের পরিচালনায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নি তার প্রস্তুতি থেকে পৃথক। এবং আল্লাহ্ এসব দরকারসমূহকে উপযুক্তরূপে জানেন : জানেন তাদের কারণসমূহ এবং অবগত আছেন তাদের উপস্থিতির কাল সম্বন্ধে। যেহেতু ধর্ম এসব বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং যেহেতু এসব বিষয় সম্ভব—তাই এদেরকে স্বীকৃতি দেয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, তারা বলেন : লৌহকে সুতায় পরিণত করে পাগড়িরূপে ব্যবহার করা একজনের সাধ্যের অতীত। এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না যে পর্যন্ত না লৌহের অংশগুলো উপাদানে ভাঙ্গা হয়। যেসব কারণ যা লৌহকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে প্রথমত সাধারণ উপাদানে পরিণত করতে হবে। উপাদানগুলোকে পুনঃসমন্বয় করে বিভিন্ন স্তর অতিক্রমের মাধ্যমে তুলার আকার প্রাপ্ত হতে হবে। তুলা আবার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে 'সুতার' রূপ লাভ করবে। সুতা আবার একটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে একখণ্ড কাপড়ে পরিণত হবে। এসব স্তর অতিক্রম ব্যতিরেকে লৌহ হতে সুতা নির্মিত পাগড়ি তৈরি হয় এমন ভাবা উদ্ভট।

এটা এমন হতে পারে যে এসব স্তরে কার্য অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সাধিত হয় যা মানুষের কল্পনারও অতীত। পরিণামে সে এমন ভাবতে পারে যে, সমগ্র ক্রিয়াটি যেন আকস্মিকভাবেই ঘটে গেছে।

এটা বোধগম্য হলে এখন বলা যায় যে, যদি পুনরুত্থিত মানুষের দেহ শুধু প্রস্তর, চুনি (ruby) অথবা মুক্তা হয়, তবে সে মানুষ হবে না। এমনকি ধারণাগতভাবেও তাকে মানুষ বলা যাবে না, যে পর্যন্ত না সে একটি বিশেষ আকার ধারণ করে যা অস্থি, স্নায়ু, মাংস, তরুণাস্থি (cartilage), গ্রন্থিরস গঠন থেকে উদ্ভূত। এবং সেসব অযৌগিক অংশ থেকেও যা যৌগিক অংশের পূর্বশর্ত। আঙ্গিক অংশ ব্যতীত কোনো দেহ হতে পারে না। অস্থি, মাংস এবং স্নায়ু ব্যতীত কোনো যৌগিক অংশ হতে পারে না। গ্রন্থিরস

www.pathagar.com

ব্যতীত অস্থি, মাংস এবং স্নায়ুর ন্যায় কোনো অযৌগিক উপাদান হতে পারে না এবং চার রসেরও অস্তিত্ব থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাদের উপাদান খাদ্যের দ্বারা সরবরাহকৃত হয়। জীবজন্তু ও উদ্ভিদ ব্যতীত কোনো খাদ্য হতে পারে না যা মাংস ও শাক-সবজির উৎস। কোনো জীবজন্তু ও উদ্ভিদ হতে পারে না যে পর্যন্ত না চার উপাদান কোনো শর্তের অধীনে একত্রে মিশ্রিত হয়, যা সংখ্যায় এত অধিক যে তা' আমাদের দ্বারা বিশ্লেষিত হতে পারে না। এখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে-পর্যন্ত না এসব বস্তু উপস্থিত থাকছে, দেহের পুনরুদ্ভব যাতে আত্মা প্রত্যাবর্তন করে তা' সম্ভব নয়। এসব বস্তুর কারণ অনেক। আমাদের জিজ্ঞাসা : "একটি শব্দ 'হও' উচ্চারণে মৃত্তিকা কি মানুষ হয়ে উঠে?" না এর জন্য বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে এর ক্রমান্বয়িক রূপান্তরের ক্রিয়াশীল কারণসমূহের উপস্থিতির প্রয়োজন। কারণসমূহ হচ্ছে : (ক) মানুষের দেহের মজ্জা থেকে আগত গর্ভাশয়ে পতিত বীর্যের উর্বরীকরণ, (খ) এই বীর্য সাহায্যপ্রাপ্ত হয় ঋতুস্রাবের দ্বারা এবং ক্ষণিকের জন্য খাদ্যের দ্বারা, (গ) তারপর এটা ঘণীভূত পিণ্ডে পরিণত হয়, (ঘ) এরপর রক্তপিণ্ডে, (ঙ) তারপর ভ্রূণে, (চ) তারপর শিশুতে, (ছ) তারপর যুবায়, (জ) অতঃপর বৃদ্ধে পরিণত হয়। সুতরাং এটা অবোধগম্য যে সমস্ত বিষয়টি কেবলমাত্র 'হও' উচ্চারণেই সাধিত হয়ে যায়। কারণ, কোনো শব্দই মৃত্তিকার প্রতি উচ্চারিত হয় না। এসব স্তরের মাধ্যম ব্যতিরেকে মানুষ হয়ে উঠা ব্যাপারটা অসম্ভব। এবং বিশেষ কারণসমূহের ক্রিয়া ব্যতীত এসব স্তর অতিক্রম করাও অসম্ভব। তাই পুনরুত্থানও অসম্ভব।

প্রতিবাদ :

আমরা স্বীকার করি এসব স্তরের মাধ্যমে ক্রমান্বয়িক রূপান্তরকে। মৃত্তিকাকে যদি মানুষ হয়ে উঠতে হয়, তবে এ প্রক্রিয়া অনিবার্য, যেমন অনিবার্য লৌহকে পাগড়িতে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি। যদি লৌহ লৌহই থেকে যায়, তবে এটা একখণ্ড কাপড় হতে পারে না। এটাকে তুলা হতে হবে, সুতা হতে হবে এবং বুনন করতে হবে। এ রূপান্তর প্রক্রিয়াটি মুহূর্তে সম্পূর্ণ হতে পারে অথবা দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। পুনরুত্থান সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে হবে না এর জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে এ-ব্যাপারে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। হাড়ের সংগ্রহ তারপর মাংসের দ্বারা এর আবরণ এবং সমগ্র ব্যাপারটি ঘটার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। কিন্তু বর্তমানে এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এসব স্তরের মাধ্যমে অগ্রগতি সাধন বিষয়টি কোনো মধ্যবর্তী সাহায্য ব্যতীত কেবল ক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা সাধিত হতে পারে কি না কিংবা প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা সাধিত হতে পারে কি না। আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ই সম্ভব। এটা আমরা পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম সমস্যায় প্রদর্শন করেছি। সেখানে আমরা ঘটনাবলীর নিয়মিত গতির স্বভাবের আলোচনা করেছি। এখানে আমরা দাবি করেছি যে পর্যবেক্ষিত বস্তুসমূহ যা একের সাথে অপর পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত তা' আসল অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত নয় এবং ঘটনার নিয়মিত গতি-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। তাদের কারণসমূহ অস্তিত্বশীল না হওয়ার ফলেও এসব বস্তু আল্লাহর সার্বভৌমের ক্ষমতার দ্বারা সাধিত হতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, যদিও এসব বস্তু একটি কারণের উপর নির্ভরশীল বলে আমরা বলতে পারি, তবুও তাদের জন্য এটা একটা শর্ত নয় যে কারণটি সুপরিজ্ঞাত হতে হবে। বস্তুর ভাণ্ডার যার প্রতি ঐশী শক্তি প্রসারিত হয় তা' রহস্যাত্মক ও বিস্ময়কর বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা মানুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় নি। এসব বস্তুর অস্তিত্বকে কেবল সেই ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন যে-ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে যা দেখেছে কেবল সেই বস্তুই অস্তিত্বশীল। এটা অনেকটা কোনো কোনো লোকের যাদুমায়া, অলৌকিক কৌশল এবং নবি ও সাধুদের কর্তৃক সাধিত রহস্যাত্মক কার্যকে প্রত্যাখ্যান করার ন্যায়। এসব বস্তু প্রতিষ্ঠিত ঘটনা বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত, কারণ তাদের উৎপত্তি বিষয়টি রহস্যাত্মক কারণের মধ্যে অন্তর্নিহিত যা সকল মানুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত হতে পারে না। মনে করা যাক, এমন একজন মানুষ রয়েছে যে চুম্বক কিভাবে লৌহকে আকর্ষণ করে তা দেখে নি। 'কারণ' সে বলবে, "একখণ্ড লৌহ আকর্ষিত হবে এটা অকল্পনীয়, যে পর্যন্ত না এটা সুতার দ্বারা বাঁধিত হয়ে একে টানা হয়।" আকর্ষণ বলতে সে তার অভিজ্ঞতাতে এটাই বুঝে। কিন্তু সে যখন নিজে চুম্বক আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করবে, তখন এটা তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলবে। তখন সে জানতে পারবে কিভাবে তার নিজ জ্ঞান সার্বভৌমের রহস্যাত্মক কার্যাবলীকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অনুরূপে, এসব নাস্তিক যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করেন তারা যখন পুনরুত্থিত হবেন, তখন তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বিস্ময়কর বস্তু অবলোকন করতে সক্ষম হবেন। তারা তখন নিজেরা অনুতাপ করবেন তাঁদের অবিশ্বাসের জন্য—কিন্তু এ অনুতাপ তাদের কোনো কাজে আসবে না। তাদের তখন বলা হবে :"এই হচ্ছে সেই যা তোমরা অবিশ্বাস করতে"—তাদেরই ন্যায় যারা বস্তুর রহস্যাত্মক গুণাবলিকে অবিশ্বাস করে। মনে করা যাক, জন্মের সময়েই একজন মানুষ পূর্ণজ্ঞান নিয়ে জন্মলাভ করেছে। যদি তুমি তাকে বল :

এই বীর্য-ফোঁটা যা অপবিত্র এবং যার অংশগুলো সমরূপ তা' মাতৃগর্ভে বিভিন্ন অংশে বিকাশলাভ করবে যা পরিণামে মাংস, অস্থি, স্নায়ু, উপাস্থি, শিরা ও চর্বিতে পরিণত হয়। এভাবে এর চক্ষু থাকবে যার গঠনের সাতটি বিভিন্ন স্তর থাকবে। এর জিহ্বা ও দন্ত থাকবে যার কোমলতা ও কঠিনতা তাদের এককে অপর থেকে পৃথক করে তুলে, যদিও তারা একত্রে সন্নিহিত অবস্থায় থাকে। এবং এভাবে মানব প্রকৃতির বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে থাকে।

এসব বিষয় শোনার পর এই ব্যক্তি নাস্তিকের চেয়েও আরো দৃঢ়ভাবে এগুলোকে অস্বীকার করবে এবং বলবে, "আমরা যখন পচা অস্থিতে রূপান্তরিত হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবনে ফিরিয়ে আনা হবে?" যে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে সে ভাবে না যে তার স্বীয় পর্যবেক্ষিত অস্তিত্বের কারণসমূহের সম্বন্ধে তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এটা অসম্ভব নয় যে দেহের পুনরুত্থানের পদ্ধতি তার পরিলক্ষিত যে-কোনো বিষয় থেকে পৃথক হতে পারে। কোনো কোনো হাদিস উল্লেখ করে যে, পুনরুত্থানের সময় বৃষ্টি হবে এবং বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বীর্যের ফোঁটার ন্যায় হবে। এসব ফোঁটা মৃত্তিকার সাথে মিশে যাবে এবং মানবদেহ সৃষ্টি করবে। এটা অসম্ভব নয় যে ঐশী

www.pathagar.com

কারণসমূহ এ ধরনের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যা আমাদের দ্বারা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এসব বিষয় দেহের পুনরুত্থানের উদ্ভব ঘটাবে এবং তাদের আত্মার পুনঃ একত্রীকরণ গ্রহণ ক্ষমতা থাকবে। শুধু অসম্ভাব্যতার ধারণা ব্যতীত এ ধরনের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করার কি কোনো ভিত্তি থাকতে পারে?

(৩)

যদি বলা হয় :

আল্লাহ্‌র কার্যের অপরিবর্তনীয় ও পুনঃসংঘটনশীল ছাঁচ (pattern) রয়েছে। এবং এ কারণে তিনি বলেন : "আমাদের লক্ষ্যের বাস্তবায়ন একটি একক কার্য, চক্ষুর পলকের ন্যায়" (the execution of our purpose is but a single act, like the twinkling of an eye)। অধিকন্তু, তিনি বলেন : "তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কোনো পরিবর্তন দেখতে পারবে না।" যদি কারণসমূহ, যা তুমি সম্ভব বলে ধারণা করেছ তা' যদি অস্তিত্বশীল হয়, তবেএটা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠবে যে তারা ক্রিয়া তৎপর হয়ে বারবার আসবে। এই পুনরাবির্ভাব হবে অনন্ত। উদ্ভবে অস্তিত্বশীল পদ্ধতি এবং জগতের বিকাশও অনন্ত হবে। পুনরাবির্ভাব ও আবর্তনকে স্বীকার করে নিলে এটা অসম্ভব হবে না যে, প্রতি সহস্র বৎসরে অন্তত একবার বস্তুর ছাঁচে পরিবর্তন হবে এবং এই পরিবর্তনটিও সর্বদা একইভাবে হবে, কারণ আল্লাহ্‌র কর্মপদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

এখন দেশের (space) কথায় আসা যাক। ঐশীকার্য ঐশী ইচ্ছা থেকে অগ্রসর হয়। ঐশী ইচ্ছার সুনির্দিষ্ট দিক নেই। যদি এর সুনির্দিষ্ট দিক থাকত, তবে দিকের (dimension) বিভিন্নতার কারণে এর পদ্ধতির পরিবর্তন হতো। কিন্তু যেহেতু, ইচ্ছার কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নেই, তাই এ থেকে যা অগ্রসর হয় তা' প্রথম ও শেষকে একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করে—যা আমরা কার্যকারণের ব্যাপারে লক্ষ্য করেছি।

সুতরাং যদি তুমি বর্তমানে পর্যবেক্ষিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে জন্মদান (procreation) ও বিকাশের অবিরতার সম্ভাব্যতাকে স্বীকার কর অথবা দীর্ঘকালের পর এই ছাঁচের (pattern) প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্যতার কথা স্বীকার কর যা পুনরাবির্ভাব ও আবর্তনের বিধিকে অনুসরণ করে, তাহলে তুমি বিচারদিবস, পরকাল এবং এ ধরনের অন্যান্য বস্তু যা পবিত্র বিধি থেকে আগত তাকে 'ব্যাহত' করবে। এতে এটাই প্রমাণিত হবে যে আমাদের অস্তিত্বের পূর্বেও পুনরুত্থানের বহু আবর্তন হয়ে গেছে এবং পরে বহু আবর্তন আসবে এবং আগে পরের এই ক্রমধারা অনন্ত-ক্রমের সাথে ঝুঁকে পড়বে।

কিন্তু যদি তুমি বল ঐশীশক্তির কার্যবালী অন্য বিন্দুতে পরিবর্তন হতে পারে যা সাধারণভাবে ভিন্ন, পরিবর্তিত কার্যাবলী কখনও ফিরে আসবে না। সম্ভাব্যতার স্থায়ীকাল তিনভাগে বিভক্ত হতে পারে, যথা :

১. জগৎ সৃষ্টির পূর্বে যখন আল্লাহ্ ছিলেন এবং জগৎ ছিল না;
২. জগৎ সৃষ্টির পর যা জগতের অস্তিত্বকে আল্লাহ্‌র সাথে একত্রে নিয়ে আসে; এবং
৩. পুনরুত্থানের প্রক্রিয়া যা সম্ভাব্যতার স্থায়ীকালকে পরিণামে নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

তা'হলে এই মতবাদ সকল একতা ও পদ্ধতিকে বর্জন করবে। কারণ এটা ঐশী কার্যাবলীকে পরিবর্তনীয় করে তোলে। কিন্তু এটা অসম্ভব। এটা ইচ্ছার ক্ষেত্রে সম্ভব যা অবস্থার বিভিন্নতার মাধ্যমে পরিবর্তন হয়। কিন্তু চিরন্তন ইচ্ছার এক অপরিবর্তনীয় গতি রয়েছে। ঐশীকার্য ঐশী ইচ্ছার প্রকৃতিতে অংশগ্রহণ করে। এর ক্রিয়ার একরূপতা রয়েছে। ফলে বিভিন্ন অস্থায়ী সম্পর্কের কারণে এটা পরিবর্তন হয় না। এটা (তারা স্বীকার করেন) আমাদের সার্বভৌম শক্তির স্বীকৃতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা অবশ্যই বলি যে আল্লাহ্‌র পুনরুত্থানের, পুনর্জীবনদানের এবং অন্যান্য সকল সম্ভাব্যতার কার্যকর করার ক্ষমতা রয়েছে, এই অর্থে যে তিনি ইচ্ছে করলে তা' সংঘটিত করতে পারেন। আমাদের বক্তব্যের সত্যতার এটা শর্ত নয় যে, তিনি বাস্তবেই তা করেন বা করতে ইচ্ছে করেন। এই বলার অর্থ অনেকটা এরূপ দাঁড়ায় : "কেউ যেন তার স্বীয় ঘাড় মটকিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন অথবা উদর ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা রাখেন।" এই বক্তব্য সত্য এই অর্থে যে এই ব্যক্তি ইচ্ছে করলে তা' করতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি এই ব্যক্তি এমন ইচ্ছা করেন না বা এমন ঘটনা না। এই বক্তব্য পূর্বে বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। কারণ, যুক্তিবিদ্যা ব্যাখ্যা করে যে : নিশ্চয়াত্মক বাক্য প্রাকল্পিক বাক্যের বিরোধাত্মক নয়। আমাদের বক্তব্য : "তিনি করতে পারতেন যদি তিনি ইচ্ছে করতেন"—এই হচ্ছে একটি সদর্থক প্রাকল্পিক বাক্য। আমাদের বক্তব্য : "তিনি কখনও ইচ্ছা করেন নি কিংবা বাস্তবেও করেন নি"—এটা হচ্ছে দু'টি নিশ্চয়াত্মক নঞর্থক বাক্য। নিশ্চয়াত্মক বাক্য সদর্থক প্রাকল্পিক বাক্যকে বিরোধী করে তোলে না।

ফলে যে যুক্তি প্রমাণ করে যে তাঁর ইচ্ছা চিরন্তন ও অভ্রান্ত সেই যুক্তিই প্রমাণ করে যে তাঁর কার্যের গতিও শৃংখলিত। কোনো কোনো সময় যদিও এর পরিবর্তন ঘটে তবে সেই পরিবর্তনটিও সুশৃংখল ও একরূপ। ফলে, পুনরাবির্ভাব ও পুনরায়ন অবিরতভাবে ঘটতে পারে। কারণ, এই পরিবর্তনের জন্য অন্য কোনো ভিত্তি সম্ভব নয়।

উত্তর :

এইমতবাদটি জগৎ নিত্যতা মতবাদের সাথে সম্পর্কিত—যেমন ঐশী ইচ্ছা হচ্ছে চিরন্তন, তাই জগৎও চিরন্তন বা নিত্য। আমরা এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছি এবং দেখিয়েছি যে, যুক্তি তিন স্তরের ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়। যথা :

১. যখন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছিল, জগতের অস্তিত্ব ছিল না।
২. যখন জগৎ সৃষ্টি হলো : প্রথম, বর্তমানে আমরা যে বিন্যাস দেখি এবং তারপর নতুন বিন্যাস যা বেহেশত ও দোজখে অস্তিত্বশীল বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে।
৩. যখন সবকিছু বিলীন হয়ে যায়, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ই অবশিষ্ট থাকেন। এই ধারণা পূর্ণাঙ্গরূপে সম্ভব; যদিও ধর্ম বেহেশত ও দোজখে অনন্ত পুরস্কার ও শাস্তির কথা নির্দেশ করে।

এই সমস্যা যেভাবেই গঠিত হোক না কেন তা' দু'টি প্রশ্নের উপর নির্ভর করে আছে : (ক) জগৎ-উৎপত্তি এর নিত্য থেকে অস্থায়ী নির্গমনের সম্ভাব্যতা এবং (খ) ঘটনার নিয়মিত গতিধারা থেকে বিচ্যুতি (departure) : হয়, কারণ নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

কার্যকারণ সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা নিয়মিত গতিধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে। আমরা উভয় প্রশ্নেরই সমাধান করেছি।

উপসংহার

কেউ যদি বলেন :

এখন যেহেতু দার্শনিকদের মতবাদ বিশ্লেষিত হয়েছে এ থেকে কি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন তাদেরকে ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা যায় এবং তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত?

আমাদের উত্তর হবে :

দার্শনিকদেরকে ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, তিনটি সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে। যথা :

১. জগতের নিত্যতা সমস্যা যেখানে তারা বলেন সকল বস্তুই চিরন্তন।
২. ঐশীজ্ঞান ব্যক্তিক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে না বলে তাদের বক্তব্য
৩. দেহের পুনরুত্থান বিষয়ে তাদের অস্বীকৃতি।

এ তিন মতবাদই ইসলামের ঘোর বিরোধী। তাঁদের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে নবির নবুওয়াতকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের প্রতি আবেদনের জন্য কপটতা ও ভ্রান্তিমূলক কৌশল অবলম্বন বলে আখ্যায়িত করা। এটা মারাত্মক ধরনের এক ধর্মনিন্দা। কোনো মুসলিম দলই একে গ্রহণ করতে পারে না।

অবশিষ্ট সমস্যা (ঐশী গুণাবলি এবং তাদের একত্বের মতবাদ) সম্বন্ধে বলা যায় যে দার্শনিকদের মতবাদসমূহ মুতাযিলাদের মতবাদের খুব কাছাকাছি। অনিবার্য পরিণাম মতবাদে মুতাযিলাগণ যা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তা দার্শনিকদের প্রাকৃতিক কারণসমূহের অনিবার্যতা মতবাদেরই নামান্তর। দার্শনিকদের কর্তৃক প্রদত্ত অন্যসকল মতবাদের ক্ষেত্রেই (অন্যসব সমস্যা) অনুরূপ সত্য প্রযোজ্য। এক বা অন্য মুসলিম সম্প্রদায় এদেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাই, যারা মুসলিম নব-প্রবর্তনকারীকে (innovators) ধর্মদ্রোহী বলে অভিহিত করেছেন তারা দার্শনিকদেরকেও অনুরূপ আখ্যায় আখ্যায়িত করতে পারেন। এবং যারা নব-প্রবর্তনকারী ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেন, তারা দার্শনিকদের ক্ষেত্রেও তা' করতে পারেন। কিন্তু মুসলিম নব-প্রবর্তনকারীগণ মুসলিম কি না এটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। কিংবা অভিনবত্বের কোনো অংশে যুক্তিসংগত এবং কোনো অংশ যুক্তিসংগত নয় এটা অনুসন্ধান করার ইচ্ছাও আমাদের নেই। কারণ, এ বিষয়টি আমাদেরকে এই গ্রন্থের আওতা বহির্ভূত বিষয়ের দিকে নিয়ে যাবে। এবং আল্লাহ্ই (মহান তিনি) সঠিক সত্য অনুসন্ধানের শক্তিদাতা।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী হিসেবে আল-গাযালির ভূমিকার জন্য cf. আবু আল-হাসান আলী : তারিফিহি দাওয়াত-উ-আযামাত, আজমগড়, ১৩৭৫/১৯৫৫, পার্ট-১ পৃ. ১১১-৮১ (উর্দু)।

www.pathagar.com

২. আল-সুবকি (তাজ-অল-দীন) : তাবাকাত আল-শাফিয়া—আল-কুবর, কায়রো, ১৩২৪/১৯০৬, ss: ৪ পৃ. ১০১
৩. আল-গাযারীর জীবনের প্রধান উৎসের জন্য তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ভ্য. ১ (ভূমিকা), পৃ. ২-৫৩ এবং আল-সুবকি op-cit ভ্য. ৪, পৃ. ১০১-৮২,
৪. আল-গাযাল নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো পণ্ডিত এখনও আল-গাযাল ব্যবহার করেন, (যেমন, বার্ট্রান্ড রাসেল : হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলসফি, লন্ডন, ১৯৪৬, পৃ. ৪৭৭)।
৫. তিনি আল-ফারমাদিকে আইনবিজ্ঞান (ফিকাহ্) শিক্ষা দেন বলে কথিত হয়।
৬. cf. আল-সুবকি op cit. ভ্য. ৪, পৃ. ১০২।
৭. Ibid, পৃ. ১০৩, ১০৬।
৮. cf. ইবনে খাল্লিখকন : ওয়াফাত আল-আয়ান (ইংরেজি অনুবাদ দি স্লেন), প্যারিস, ১৮৪২-১৮৭১, ভ্য. পৃ. ১২২।
৯. স্মরণ করা যেতে পারে বাগদাদে তখন ধর্মতত্ত্বই নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনাশাস্ত্রও শিক্ষা দেয়া হতো। প্রথম থেকেই বাগদাদ বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ও চিন্তার স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য বহন করে আসছে।
১০. তিনি নিজেই ফিকাহ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন এবং এর উপর উৎকর্ষ মানের রচনা সংকলন করেন।
১১. কালামের সমালোচনার জন্য আল-গাযালি cf. তাঁর ইলজাম আল-আওওয়াম (এন ইলম-আল-কালাম এবং রিসালা ফি আল ওয়াজ আল-ইতিকাছ)।
১২. দ্রষ্টব্য : আল-'মুনকিদ'।
১৩. তিনি কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া পরিদর্শনের জন্য মিশর গিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।
১৪. আল-গাযালির নির্জনবাসের সময়কাল বারকিয়ারুকের রাজত্বের সময়কালের সাথে মিলে যায়।
১৫. ইহয়্যার বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ ম্যাকডোনাল্ডের স্টাডিজ ইন মুসলিম এথিক্স, লন্ডন, ১৯৫৩, পৃ. ১৫৯-৬৩ cf. এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ান অ্যান্ড এথিক্স্, লন্ডন, ১৯৫৩ ভ্য. ৫, পৃ. ৫০৮ ক; ৫০৯ খ।
১৬. 'আল-মুনকিদ মিন-আল-দালাল' আরবি সাহিত্যে এক অনবদ্য আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বহু অনুবাদ হয়েছে।
১৭. cf. 'আল-মুনকিদ'।
১৮. বুখারি (২৩, ৮০, ৯৩)।
১৯. cf. 'আল-মুনকিদ' (ইংরেজি অনুবাদ ক্লড ফিল্ড : দি কনসেশন অব আল-গাযালি, লন্ডন, ১৯০৯, পৃ. ১৩), হালডেন এবং রস op cit পৃ. ১০১।
২০. cf. ইহয়্যা, কায়রো ১৩৪০/১৯২১, ভ্য. ৪, পৃ. ১৯ গাযালি একটি হাদিস উল্লেখ করেন। মানুষ ঘুমন্ত, মৃত্যুতে তারা জেগে ওঠে। cf. কিমিয়াতে সাদত (উর্দু অনুবাদ, এম. এনায়েত উল্লাহ, লাহের, n. d. পৃ. ৭৩৮, ৭৪৯)
২১. আল-গাযালিকে বুদ্ধিবাদবিরোধী বলে ভুল বুঝার ব্যাপক অবকাশ রয়েছে। ম্যাকডোনাল্ড তাঁর এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে আল-গাযালি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন "He taught that intellect should only be used to destroy trust in itself" ইকবাল বলেন, আল-গাযালি চিন্তার গতিশীল প্রবাহকে রোধ করে দেন (cf. এম. এম. ইকবালস দি রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট্স ইন ইসলাম, অক্সফোর্ড, ১৯৩৪, পৃ. ৪-৬)।

www.pathagar.com

২২. cf. এ. ফখরি, ইসলামিক অকেশনালিজম, লন্ডন ১৯৬৮, পৃ. ২৫-৪৮।
২৩. cf. এম. এম. ইকবাল : দি ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স ইন পারসিয়া, লন্ডন, ১৯০৮, পৃ. ৫৫, ১০০।
২৪. আল-গাযালির রচনার কাল-বিন্যাসের জন্য লুই মেসির্গ রিকুয়েল ডি টেক্সটস, পৃ. ৯৩।
২৫. cf. হেনরিক ফ্রিক : গাযালির সেলব্স বায়োগ্রাফি, লিপজিগ, ১৯১৯, esp. প্র. ৮০।
২৬. দ্রষ্টব্য : এম. এম. শরিফ : এ হিস্ট্রি অব মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৬১৭-২৪।
২৭. খুরাসানে ইসমাইলীয়া বা বাতেনীয়গণ তালেমীয় নামে পরিচিত।
২৮. আল-মুনকিদ, পৃ. ২৯, এবং cf. মাকাদিসদ আল-ফালাসাফা ভূমিকা।
২৯. Ibid, আল-গাযালির উক্তি।
৩০. cf. জি. সারটন : ইন্ট্রোডাকশন টু দি হিস্ট্রি অব সায়েন্স, বাল্টিমোর, ১৯৩১, ভ্য. ২, পৃ. ১৬৯-৭২।
৩১. এই বিভ্রান্তির কারণ হচ্ছে ১৭০০/১৩০০ শতাব্দীতে স্কলাসটিক্সদের মধ্যে প্রচারিত মাকাসিদের ল্যাটিন অনুবাদে আল-গাযালির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ছিল না, যেখানে তিনি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন।
৩২. মরিস বওয়েজিস তাঁর তাহাফুত আল-ফালাসিফার ভূমিকায় নির্দেশ করেন যে, 'অসংগতি কথাটা' তাহাফুতের প্রকৃত অর্থকে নির্দেশ করে না—আল-গাযালি কোনো কোনো সময় দার্শনিকদের কোনো কোনো সময় তাদের মতবাদকে বুঝাতেই এর অর্থ করেছেন।
৩৩. cf. দি আর্টিকল 'দাহরিয়াহ' এনসাইক্লোপেডিয়া ইন ইসলাম।
৩৪. cf. অ্যারিস্টোটলের 'এথিকা নিকোমেকিয়া', সেকশন ৬ পৃ. ১০৯৬ ক ১৫।
৩৫. cf. এম. ইকবাল :দি রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট্স ইন ইসলাম, পৃ. ৩-৪।
৩৬. ৩৭. এম. এম. শরীফ : এ হিস্ট্রি অব মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ৫৯৫।
৩৮. cf. আল-গাযালির তাহাফুত আল ফালাসিফা, ইংরেজি অনুবাদ : সাহিব আহমদ কালামী, লাহের, ১৯৫৮, পৃ. ১-৩।
৩৯. দ্রষ্টব্য : এভারোজের ইংরেজি অনুবাদ : তাহাফুত আল-তাহাফুত, লন্ডন, ১৯৫৪, ভ্য. ২, পৃ. ২১৫।
৪০. cf. ইবনে আসাকির : তাবিয়িন—আল-মুফতারি, দামেসকাস, ১৩৪৭/১৯২৮, পৃ. ১২৮।
৪১. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১২১।
৪২. এম. সাঈদ শেখ : স্টাডিজ ইন মুসলিম ফিলসফি, পৃ. ১২১।
৪৩. তাহাফুত আল-ফালাসিফা, ইংরেজি অনুবাদ এস. এ. কালামী।
৪৪. cf. টি. জে. ডি. ব্যুওর : হি হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইন ইসলাম, লন্ডন, ১৯৩৩, পৃ. ১১৫-১৮; ডি. ই, ল্যাসি ও' লিয়ারী এরাবিক থটস এন্ড ইটস প্লেস—ইন, হিস্ট্রি, লন্ডন, ১৯২২, পৃ. ১৫২-৫৬।
৪৫. তাহাফুত-আল ফালাসিফা ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ১৯৭-২২০।
৪৬. Ibid পৃ. ১৮৫।
৪৭. cf. কোরআন Xiii-৫, xvii-৪৯-৫১, ৯৮, ৯৯।
৪৮. cf. এ. ই. টেলর : "ডেভিড হিউম এন্ড দি মিরাকুলাস" তাঁর ফিলসফিক্যাল স্টাডিজ, লন্ডন, ১৯৩৪, পৃ. ৩৩০-৬৫।
৪৯. মুনকিদ।
৫০. cf. ইহয়্যা, কায়রো, ১৩৪০/১৯২৯, ss-৪, পৃ. ২৫৯।
৫১. তাহাফুত, পৃ. ৮৮।

www.pathagar.com

৫২. কোরআন ii, ১১৭, xvi, ৪০।

৫৩. cf. কোরআন, iii, ১৮৯, ১৯০, vi ১০০.x-৫, ৬, xii, ৩,৪।

৫৪. cf. এম. সাঈদ শেখ : ক্যান্টস ক্রিটিক অব রেশনাল সাইকোলজি অ্যান্ড ইটস প্যারালজিম, লাহোর, ১৯৫৯, পৃ. ১৮৫-৯৩।

৫৫. cf. তাহাফুত, পৃ. ২০০-২০।

৫৬. cf. প্রবন্ধ (আর্টিকল) 'নকস' এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (esp সেকশন ৯৩১০)।

৫৭. দ্রষ্টব্য : ইহয়্যা, কায়রো, ১৩৪০/১৯২১, পৃ. ৫৪, cf. ডি.বি. ম্যাকডোনাল্ড ডেভেলপমেন্ট অব মুসলিম থিওলজি, লন্ডন, ১৯০৩, পৃ. ২৩৪, ২৩৫।

৫৮. দ্রষ্টব্য : কিমিয়া-ই-সাদত, উর্দু অনুবাদ, এম এনায়েত উল্লাহ, লাহোর, n. d. দ্র. ৮, ৩৬।

৫৯. কোরআন xv, ২৯, XXXVII-৭২।

৬০. কিমিয়া-ই-সাদত ইংরেজি অনুবাদ, ক্লড ফিল্ড : দি আলকেমি অব হোপনেস, লাহোর, n. d. পৃ. ১৯, ৩৫।

৬১. দ্রষ্টব্য, কিমিয়া-ই-সাদত, উর্দু অনুবাদ. পৃ. ১০।

৬২. কোরআন xvii-৮৫।

৬৩. Ibid LXXXIX, ২৭-৩০।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মুজাদ্দিস-ই-আল্‌ফ-ই-সানি
(১৫৬৩-১৬২৪ খ্রি.)

ক. জীবনী ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

শেখ আহমেদ শিরহিন্দী একজন মহান মরমি চিন্তাবিদ। তিনি সাধারণত মুজাদ্দিস-ই-আল্‌ফ-ই-সানি নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী হিসেবে তাঁকে অভিহিত করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করার পর তা' একটা ভিন্নরূপ ধারণ করে। এখানে এসে ইসলাম বিভিন্ন ভাবধারার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, ভারত সুফিবাদের সক্রিয় কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এখানে বহু উপদলেরও সৃষ্টি হয়। কালের গতিতে সুফিবাদ মানুষের মনে এত বেশি প্রভাব ফেলে যে তারা ইসলামের সত্যিকার ভাবধারা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে পড়ে। সময়ের অগ্রগতিতে বহু অনৈসলামি ভাবধারা ইসলামে প্রবেশ করে। মুসলমাগণ বহু কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং গূঢ়বাদের বহু সম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটায়। ফলে ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, এমন কি জীবন সম্পর্কে সমগ্র ধারণারও পরিবর্তন হতে শুরু করে।

ইসলামের এহেন অবস্থার মধ্যেই আবির্ভাব ঘটে মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও সুফি মুজাদ্দিদের। তিনি ইসলামি মরমিবাদে নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন এবং মূল ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হন যখন প্রায়োগিক ধর্ম হিসেবে ইসলাম তার মূল প্রাণশক্তি ও গতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সুফি ও সাধারণ মানুষ ইসলামের মূল ভাবধারার চেয়ে এর আচার ও আনুষ্ঠানিকতাকে ঘিরেই জড়িত থাকে। ইসলামের মূল উৎস কোরআন ও হাদিসকে উপেক্ষা করা হয়। অন্ধ ও আচারি ভাবধারা বিরাজ করতে থাকে এবং ইসলামের মূল ভাবধারাকেও খর্ব করা হয়। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতির দুর্বলতার জন্য ইসলামকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার সম্রাট আকবরের[1] নীতিও এ জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। মুজাদ্দিদ তাকলিদ (কর্তৃত্বের অন্ধ অনুকরণ)-এর বিরোধী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় মতবাদের ব্যক্তিগত বোধ ও ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন।

সময়েরই প্রয়োজন ছিল ইসলামের একজন সত্যতা প্রতিপাদনকারী ব্যক্তির আবির্ভাবের। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি তৎকালীন অনৈসলামি ভাবধারার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবংতাঁর পুনরভ্যুদয়ের ক্রিয়া-তৎপরতার দ্বারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। সুফিদের সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি

www.pathagar.com

বলেন, আল্লাহ্ ও জগৎ ভিন্ন, তারা এক নয়। ধর্মতত্ত্ববিদগণের বিরুদ্ধে তিনি বলেন যে, মুসলমানদের কোরআন ও হাদিসে ফিরে যেতে হবে। তৎকালীন দূষিত প্রভাব থেকে ইসলামকে মুক্ত করার জন্য তিনি সুদূর গ্রামাঞ্চলে প্রচারকবৃন্দকে প্রেরণ করেন। তাঁরা সেখানে কোরআন ও হাদিসের মৌলিক শিক্ষা প্রচার করে বেড়ান। যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের সমস্ত মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁর মতবাদের প্রতি আস্থাবান হওয়ার জন্য আবেদন জানান। তিনি জনগণের নিকট থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পান এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা অনুভব করে সম্রাট জাহাঙ্গীর বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং অচিরেই তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মুক্তি পান এবং সম্রাটের বিশেষ পরামর্শক নিযুক্ত হন।

মুজাদ্দিদ কোরআন ও হাদিসের গুরুত্ব পুনরুজ্জীবন করতে সক্ষম হন যা থেকে জনগণ বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। তবে মরমিবাদে তাঁর অবদান ছিল বিপ্লবাত্মক। তিনি আল্লাহ্ ও জগতের অভিন্নতার সর্বেশ্বরবাদীর ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি দ্বৈততা এবং আল্লাহ্র অতিবর্তিতা (Transcendence) প্রতিষ্ঠিত হয়। নবি-প্রত্যাদেশ (ওহি) ও সুফিবাদের ঐশী ভাবোচ্ছ্বাস (ইলহাম) এর মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। ইলমে বাতিন (গূঢ় রহস্যের জ্ঞান) এবং ইলমে জাহির (প্রকাশ্য জ্ঞান)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এই অভিমতও ব্যক্ত করা হয় যে, অজ্ঞাত গূঢ়রহস্যকে জ্ঞাত অভিজ্ঞতাভিত্তিক ঘটনার দ্বারাই জানা যেতে পারে। তবে, ইলমে বাতিন[২] জ্ঞানের জন্য সুফিকে হাদিস পাঠ ও অধ্যয়ন করতে হবে।

তাওহিদ বা আল্লাহ্র একত্ব এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁর এই ধারণা ছিল আল্লাহ্র সম্পর্কে সর্বেশ্বরবাদীর ধারণার বিপরীত। তিনি সুফিদেরকে প্রথমে হাদিস অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তারপর যিকর (স্মরণ) ও ফিকর (অনুধ্যান) অবলম্বন করার পরামর্শ দেন। ফানা অর্জনের জন্য সুফিদের কর্তৃক গ্রহীত সংগীত ও অন্যান্য চর্চাকে নিন্দে করা হয়। অলস অনুধ্যানের চেয়ে সক্রিয় সমাজসেবাকে উৎকৃষ্টতর বলে মনে করা হয়। কোরআন ও হাদিস অনুসরণে সকল প্রকার নব সংযোজন (বিদাত) নিন্দে করা হয়। মুজাদ্দিদ মনে করেন যে, ইমামদের[৩] অন্ধ অনুসরণের ফলেই কালের অগ্রগতিতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামের প্রকৃত ভাবধারা ও উৎস থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছেন।

খ. ধর্ম ও দর্শনে একত্ব প্রসঙ্গ

একত্ব বিষয়ক সমস্যাটি ধর্ম ও দর্শনের মূল সুর। বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল বহু বস্তুর জগৎ স্বভাবতই চিন্তাশীল মানুষকে অন্তর্নিহিত ও স্থায়ী একটা সত্তা সম্বন্ধে ভাবিয়ে তোলে। মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে এই অন্তর্নিহিত স্থায়ী সত্তা সম্বন্ধে ভেবেছেন ও বিভিন্ন রকম ধারণা করেছেন। তবে এইবহুত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত দর্শনের একত্বের ধারণা, ধর্মীয় একত্বের ধারণা থেকে ভিন্নতর। দর্শনের ধারণা হচ্ছে জ্ঞানমূলক (cognitive) অর্থাৎ, দার্শনিক এক-কে আবিষ্কার ও জানার

www.pathagar.com

প্রয়াস চালান। কিন্তু ধর্মীয় ধারণা হচ্ছে ইচ্ছামূলক (conative)। অর্থাৎ জাগতিক অমঙ্গল, পাপ ও দুঃখ-দুর্ভোগের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পূর্ণতা ও আনন্দ লাভের মধ্য দিয়ে পরম সত্তার সঙ্গে প্রেম ও প্রশংসার সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালায়। এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি বিশ্বাস করেন যে, নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান এক সত্তা রয়েছেন যিনি তার প্রয়াসে তাকে পরিচালনা ও সাহায্য করবেন। এই অবস্থায় তার মন ভয় ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তিনি যথার্থ পরিচালনা ও সাহায্যের জন্য তাঁর নিকট আবেদন জানান।

ধর্মীয় ও দার্শনিক একত্বের মধ্যকার পার্থক্য বহুবিধ। প্রথমত, ধর্মীয় একত্বের গুণাবলি রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক একত্বের গুণ নেই। দার্শনিক একত্ব হচ্ছে কেবল একটা অমূর্ত একত্ব, এমন একটা ধারণা যা বস্তুর বহুত্বের অন্তর্নিহিত সারসত্তা (essence)-কে নির্দেশ করে। অপরদিকে ধর্মীয় একত্ব বস্তুগত সত্তাকে নির্দেশ করে। ব্যক্তিক আল্লাহ্ মানব হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য মানুষের আহ্বানে সাড়া দেন। এই ধরনের সত্তা যদিও এক তবুও তার বহু গুণাবলি রয়েছে, কারণ এ গুণগুলো ব্যতীত তিনি মানব মনের চাহিদা পূরণ করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় একত্ব অন্তবর্তী (immanent) অর্থাৎ, এটা বিশেষের মধ্যে ও মাধ্যমে অস্তিত্বশীল। এর প্রকাশিত ঘটনাগুলো হচ্ছে অভিব্যক্তিস্বরূপ। কিন্তু দার্শনিক একত্ব হচ্ছে অতিবর্তী। এটা কেবল বিশেষের মধ্যেই অস্তিত্বশীল নয়। বিশেষের বাইরে ও উর্ধ্বেও এর অস্তিত্ব রয়েছে। একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে এটি বিদ্যমান। এটা আত্ম-অস্তিত্বশীল। এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহ্ ও জগতের মধ্যে দ্বৈততা[৪] (dualism) রয়েছে।

তৃতীয়ত, ধর্মীয় একত্ব ব্যক্তিগত। অন্যদিকে, দার্শনিক একত্ব নৈর্ব্যক্তিক। একমাত্র ব্যক্তিক আল্লাহ্ই আত্মসচেতন, স্বাধীন এবং তাঁর নিজ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর কার্যাবলী নৈতিক নিয়ম দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত যা ধর্মপ্রাণ মানুষকে সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। এ ধরনের সত্তা শুধু নৈতিকই নয়, তিনি মানুষের দুর্যোগ দুর্ভোগ তার আহ্বানেরও সাড়া দেন। তিনিই সেই সত্তা যিনি জগৎ প্রক্রিয়ার সুন্দর নৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। কিন্তু দর্শনে একত্বের ধারণা কল্পনাত্মক এবং পরিমাণগতভাবে এক। কিন্তু ধর্মীয় একত্ব পরিমাণ ও গুণগত উভয়ভাবেই এক। অর্থাৎ, এটা সংখ্যাগতভাবে এক এবং একটা একক সত্তা যা পূর্ণতার সকল গুণের ধারক। দার্শনিক একত্ব হচ্ছে একটা ধারণা (notion)। এর মতানুসারে আল্লাহ্ হচ্ছেন এক কল্পনাত্মক সত্তা যিনি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম নন। জীবনসংগ্রামে মানুষকে পরিচালনা ও সাহায্য করার জন্য তাদের আবেদন পূরণ করতেও তিনি সক্ষম নন। কিন্তু ধর্মীয় একত্ব অনুযায়ী আল্লহ্ মানুষের আবদেনের প্রতি অন্ধ ও বধির নন। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম। ধর্মীয় একত্ব স্বাধীন এই অর্থে যে, এটা নিজ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই কারণে বহির্শক্তি একে কোনো বিঘ্ন ঘটাতে পারে না।

মানুষ তার ধর্মীয় চেতনায় সর্বাত্মক পূর্ণতা লাভে প্রত্যাশী। কিন্তু, সংক্ষিপ্ত জীবনে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে সে এমন এক জীবনব্যবস্থার কথা ভাবে যেখানে তার

www.pathagar.com

প্রত্যাশিত সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে, এবং জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব অকল্যাণ, দুঃখ-দুর্ভোগ অনুপস্থিত থাকবে। এই জগতের সদগুণ ও সুখের, পাপ ও শাস্তির মধ্যকার অসমাঞ্জস্য মানুষকে এমন এক পারলৌকিক জীবন ও জীবনের প্রতি আশান্বিত করে তোলে, যেখানে পুণ্যবানগণ পুরস্কার এবং পাপীগণ শাস্তি লাভ করবে। সুখী, ন্যায়নিষ্ঠ, নৈতিক ও পূর্ণজীবন ব্যবস্থার এই বাসনা ও ব্যাকুলতাই আত্মার মরণোত্তর, অব্যাহত জীবনের এবং এমন এক পরমসত্তার নির্দেশ করে যিনি সেই আদর্শ জীবনব্যবস্থা প্রদানে সক্ষম। দর্শনেও এই পরম সত্তাকে জানার প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু ধর্মে রয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে প্রেম, মিলন, ঘনিষ্ঠতা ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের এক প্রবল ইচ্ছা। ধর্মের এই ভাবধারা জ্ঞানীয় (cognitive) নয়, বরং ইচ্ছামূলক (conative)। ইচ্ছামূলক ভাবধারা মানুষকে সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করে, জ্ঞানীয় ভাবধারা পরিচালিত করে অনুধ্যান ও নিষ্ক্রিয়তার পানে। আবার, দার্শনিক একত্ব জ্ঞানযোগ্য (knowable), কিন্তু ধর্মীয় একত্বের ক্ষেত্রে তা না-ও হতে পারে। পরমসত্তাকে জানতে গিয়ে দার্শনিকগণ একে বিভিন্নভাবে ধারণা করেছেন, যেমন কেউ একে ভেবেছেন আত্মগতভাবে, কেউ দেখেছেন নিয়ন্ত্রণধর্মী ধারণা হিসেবে যার কোনো বাস্তবতা নেই (কান্ট)[৫] কিংবা একে দেখা যেতে পারে একটি নিয়মের একত্ব হিসেবে যা থেকে সবনিয়ম নিঃসৃত করা যায়। কিন্তু, ইতিহাসে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি আত্মসিদ্ধির প্রচেষ্টায় এমন এক পরমশক্তিধর সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন যিনি তাকে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে পরিচালনা ও সহায্য দানে সক্ষম। এই ধরনের সত্তা জ্ঞানযোগ্য কি না-এ অনুসন্ধানে তিনি মাথা ঘামান না এবং আদৌ এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন না।

পরবর্তী সুফিগণ ধর্মীয় একত্বকে দার্শনিক একত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। তাঁরা ধার্মিকভাবে জীবন শুরু করেন, আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁর গুণাবলি ও পরকালের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁরা আল্লাহ্র জ্ঞানলাভে প্রত্যাশী হন এবং প্রত্যক্ষ বোধের মাধ্যমে তাঁকে জানার প্রয়াস চালান। তাঁরা মনে করেন যে, তিনি জ্ঞানযোগ্য, কারণ, তিনি অন্তর্বর্তী (immanent)। অর্থাৎ, তিনি জগতের বিশেষ বস্তুর মধ্যে ও মাধ্যমে অস্তিত্বশীল। তাঁরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রাথমিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (personal experience of God) পেতে চান যা নবিগণ লাভ করেছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তারা মোশাইহিদ[৬] (আত্মিক অনুশীলন) পদ্ধতি গ্রহণ করেন যাতে করে তারা অলৌকিক ঘটনা কিরামাত ঘটাতে পারেন। পরম সত্তাকে জানার প্রয়াসে তাঁরা এমন ধারণারও প্রত্যয়ী হন যে তাঁরা স্বজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞান অর্জনে সক্ষম। এই ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করা হয় এবং আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ দর্শন সম্ভব বলেও স্বীকার করা হয়।[৭]

গ. মরমি অভিজ্ঞাতর স্বরূপ

স্বজ্ঞার সাহায্যে আল্লাহকে জানার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্ভাব্যতা বিষয়ে মুজাদ্দিদ বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, ব্যক্তিন সুফির দ্বারা অর্জিত মরমি অভিজ্ঞতাকে

www.pathagar.com

বিচার করতে হবে নবিদের শিক্ষার আলোকে যাঁরা সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাই, সুফিকর্তৃক অর্জিত মরমিজ্ঞানকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না যে পর্যন্ত না এ অভিজ্ঞতাগুলো নবির শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে। এই কারণে সুফির তন্ময়তা অর্জিত প্রতিটি মরমি জ্ঞানই বৈধ নয়, কারণ এগুলো তার মনে অস্বাভাবিক অবস্থার ফলশ্রুতিতেও হতে পারে। সেই স্বল্পসংখ্যক সুফি অভিজ্ঞতাকেই বৈধ বলে অভিহিত করা যায় যা মহানবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামি মরমিবাদ যখন একটা সুনির্দিষ্ট সর্বেশ্বরবাদীরূপে পরিগ্রহণ করে তখন ধর্মের একত্ব ও দর্শনের একত্বের মধ্যকার পার্থক্যকে উপেক্ষা করা হয়। সুফিগণ সাধারণত বিশ্বাস করেন যে, তন্ময়তার উচ্চতম পর্যায়ে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ব্যক্তিগত চেতনা লোপ পায় এবং পরম চৈতন্যের সঙ্গে মিলনের ও অভেদের অনুভূতি জাগে। এ-ই হচ্ছে 'ওয়াহাদাত-ই-ওয়াদুদ', অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার অভিন্নতা বা একত্ববোধ। এই ধারণার বিরোধিতা করে মুজাদ্দিদ বলেন, ফানার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের চেতনা সাময়িকভাবে চাপা থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এটা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত বা বিনাশ হয়ে যায়, স্বজ্ঞা প্রক্রিয়ায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (knower and the known) এক হয়ে যায় সুফিদের এই ধারণা ভ্রমাত্মক এবং এ বিষয়টি সত্যি নয়। কারণ, জ্ঞেয় বস্তু সর্বদাই জ্ঞাতা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে সুফিগণ আল্লাহ্‌র প্রেমে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত থাকেন। এই বিষয়টি আবেগের গভীরতার মাত্রা অনুযায়ী তাঁদেরকে তাঁদের নিজেদের উপর আপেক্ষিক বা সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব গুণ আরোপ করার দিকে পরিচালিত করে। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরম অহমে নিমগ্ন বা সমাহিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এই নিমগ্নতা কেবল আবেগাত্মক, অস্তিত্বমূলক নয়।

অধিকন্তু, স্বজ্ঞার অনেক স্তর রয়েছে। সূচনা পর্বে মরমিগণ দেখতে পান যে, সসীম অহং সম্পূর্ণ অনস্তিত্বশীল এবং অবাস্তব। কিন্তু এটাই শেষ পর্ব নয়। যখন চূড়ান্ত পর্যায় অর্জিত হয় তখন সুফি আল্লাহকে এক বাস্তব সত্তা হিসেবে অবলোকন করে থাকেন। এটা তাঁকে মানব ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার পানে পরিচালিত করে—ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তিতে নয়। এইভাবে সুফিগণ যখন স্বজ্ঞার সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, জগৎ হচ্ছে পরমসত্তার ছায়া (shadow) বা পরমসত্তার বিকিরণ (emanation)। ফলে এরা এক ও অভেদ নয়।

সর্বেশ্বরবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ইবনুল আরবি প্রথমে জাগিয়ে তোলেন এবং পরে রুমী, জামী ও আল-জিলী কর্তৃক তা বিকশিত হয়। মুজাদ্দিদের প্রধান লক্ষ্য হলো এই সর্বেশ্বরবাদী ধারণার প্রত্যাখ্যান। তাঁর এই মতবাদের সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে ইবনুল আরবির মতবাদের সাথেএর পার্থক্য কোথায় এ বিষয়ে প্রথম অবগত হওয়া দরকার। ইবনুল আরবির মতে, পরম সত্তা হচ্ছে এক এবং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্। বহু বস্তুবিশিষ্ট জগৎ পরমসত্তার বহির্প্রকাশ বা বিকিরণ। এই কারণে জগৎ ও পরমসত্তা এক ও অভিন্ন। আল্লাহ্‌র সারসত্তা (essence) হচ্ছে আত্ম-অস্তিত্ব এবং জগৎ হচ্ছে তার বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। পাঁচটি পারম্পরিক পর্যায়ে আল্লাহ্‌র গুণাবলি এই জগতে প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। প্রথম পর্যায় হচ্ছে তাঁর স্বীয় অস্তিত্বের পরমসত্তায় চৈতন্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে পরমসত্তা তাঁর গুণাবলি সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করে। তৃতীয় পর্যায়ে পরমসত্তা নিজেকে বহু চিদাত্মা বা ফেরেশতায় বিভক্ত করে। চতুর্থ পর্যায়ে এটা জগতকে ধারণারূপে ভাবে এবং শেষ পর্যায়ে এটা নিজেকে জগতের পদার্থিক-বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। এভাবে আল্লাহ্‌র জাত (সারবত্তা) ও সিফাত (গুণাবলি) একীভূত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম 'এক''-এ একত্রিত করা হয়। কারণ, তারা সবই পরমসত্তার বিভিন্ন দিককে নির্দেশ করেন। অনুরূপে, বিভিন্ন গুণাবলীকেও একত্রিত করা হয়। কারণ, এসব গুণাবলিও পরমসত্তারই প্রকাশ। জগৎ ঘটনাবলীর বহুতার মধ্যদিয়ে একক পরম সত্তায় নিজেকে প্রকাশ করে, বস্তুত, নিজেকে বহুতেই বিভক্ত করেন। তাই দেখা যায় যে, জগৎ-সহ আল্লাহ্ হচ্ছে এক। জগতের কোনো স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সুতরাং আল্লাহ্ এ জগতেই আছেন, তাঁকে এখানেই খুঁজতে হবে। কারণ, জগৎ—বহির্ভূত তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই।

ঘ. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক

মানুষ এবং আল্লাহ্‌র মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে এক ও অভিন্নতা, একতা অথবা ন্যূনপক্ষে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক। কোরআনে আল্লাহ্ উল্লেখ করেন, "আমরা তার (মানুষের) জীবন ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী।" অধিকন্তু আয়াত রয়েছে, "আল্লাহ্ তাঁর নিজ প্রতিবিম্বে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" এর অর্থ হচ্ছে মানুষ সম্ভাব্যরূপে কমপক্ষে, আল্লাহ্‌র গুণাবলি অর্জনের ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্ জগতের মধ্য দিয়ে তাঁর গুণাবলিকে প্রকাশ করেছেন এবং মানুষের পূর্ণতার মধ্যে এই বিকাশ সর্বোচ্চ মাত্রা লাভ করে থাকে। মহানবি মোহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন পূর্ণতম মানুষ এবং এই কারণেই তিনি ইনসান-ই-কামিল বলে আখ্যায়িত।[৮]

আল্লাহ্ নিজকে জানার ইচ্ছাই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ। কোরআনে তিনি ব্যক্ত করেন, "আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম। আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে আমি জ্ঞাত হই,তাই আমি বিশ্ব সৃষ্টি করেছি।" নিজকে জানার জন্য আল্লাহ্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জগৎ হচ্ছে তাঁর সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ। আল্লাহ্‌র মধ্যে যেসব গুণ সম্ভাব্যরূপে বিদ্যমান তা জগৎ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিব্যক্ত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সবই ওয়াহাদত-ই-ওয়াদুদ-আল্লাহ্ ও জগতের একত্ব প্রমাণ করে।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জগৎ ও মানুষের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ অস্তিত্বশীল। নিঃসন্দেহে তিনি জগতে অনুস্যূত (immandent)। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, তিনি জগৎ ও মানুষের সাথে অভিন্ন। এই বিষয়টি একজন সুফি কর্তৃক উপলব্ধ হয় তখনই যখন তিনি ওয়াহাদাত-ই-ওয়াদুদ স্তর অতিক্রম করেন। এক উচ্চতর পর্যায়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, জগৎ এবং আল্লাহ্ দ্বৈত[৯] সত্তাবিশিষ্ট—তারা এক ও অনুরূপ নয়। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হলেও জগতের নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ছায়া। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা এক ও অভিন্ন। কারণ একটি বস্তুর ছায়া, স্বয়ং বস্তুটি নয়। তারা স্বতন্ত্র ও পৃথক। জগৎ শান্ত ও

ক্ষণস্থায়ী এবং এই কারণে আল্লাহ্ জগৎ ও মানুষ হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। তিনি মানব প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞার অতীত। সুতরাং আল্লাহ্ সম্বন্ধে মরমিবাদীদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রচেষ্টা অর্থহীন। তিনি অনর্জনীয়। এই জন্যই অজ্ঞাত ও অদৃশ্যকে জানার জন্য বিশ্বাসকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করতে হয়।

অধিকন্তু আল্লাহ্‌র গুণাবলি ও সৃষ্টজীবের গুণাবলির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। এইজন্যই বলা হয় : "তাঁরা আল্লাহ্‌র উপর যে গুণাবলি আরোপ করে, তিনি তার চেয়ে পবিত্রতর।" ফানার পর্যায়ে একজন সুফি তার নিজ সত্তাকে বিস্মৃত হয়ে আল্লাহ্‌র চিন্তায় সমাহিত হতে পারেন। কিন্তু এ থেকে তার আত্মসত্তার বিলুপ্তি প্রমাণিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সূর্য যখন উজ্জ্বল আলো দেয় তখন নক্ষত্রসমূহ দেখা যায় না, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা অস্তিত্বে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনুরূপে, একজন সুফি ফানার পর্যায়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে ভুলে যেতে পারেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্যসব বস্তুর বিলুপ্তি ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্ জগৎ থেকে ভিন্ন কিছু, জগৎ বাস্তবেই অস্তিত্বশীল। আল্লাহ্ হচ্ছে এক অনিবার্য সত্তা। জগৎ হচ্ছে আপেক্ষিক ও শর্তাধীন সত্তা জগতকে যদি সেই কল্পনার ফানুস বলে অভিহিত করা হয়, যার কোনো স্বকীয় স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তবে, মানুষ তার নৈতিকতার বিকাশে এবং অমরত্ব লাভের সংগ্রামের ক্ষেত্র পাবে কোথায়? জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃজনীশক্তি ও ক্রিয়াতৎপরতাকে অস্বীকার করা। জগতের বস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও তা আপেক্ষিক ও শর্তাধীন। অন্যদিকে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনিবার্য ও নিঃশর্ত। জগৎ অস্থায়ী, আল্লাহ্ চিরন্তন। জগত কি এবং কেন—এ প্রশ্নের অধীন, কিন্তু আল্লাহ্ এসবের উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ্ ও জগৎ এক ও অভেদ হতে পারে না। ফানার পর্যায়ে সুফি জগতকে আল্লাহ্‌র সাথে অভেদ বলে অনুভব করে না। কিন্তু, তিনি যখন এই পর্যায়ে অতিক্রম করেন, তখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে এক স্বতন্ত্র সত্তা এবং এই জগতের অতীত। মানুষ তাকে জানতে বা উপলব্ধি করতে পারে না। সর্বেশ্বরবাদী আমাদেরকে বহু ঈশ্বরবাদের দিকে পরিচালিত করে। যেহেতু আল্লাহ্ সবকিছুর ভেতরে রয়েছেন, তাই প্রকৃতির যে কোনো বস্তুকে উপাসনা করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌কে উপাসনা করা। কিন্তু এই ধরনের মতবাদ ইসলামের নীতির পরিপন্থী।

তাদের এটাও সঠিক নয় যে, আল্লাহ্ ও মানুষ সদৃশস্বরূপ। এ মতের সমর্থনে যে আয়াত উদ্ধৃত করা হয় তা এই অর্থ করে যে, আল্লাহ্ এবং মানবাত্মা উভয়ই দেশ-কালের উর্ধ্বে। কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'যে নিজেকে জানে সে তার প্রভুকে জানে'—এই উক্তি আল্লাহ্ ও মানুষের অভেদকে অর্থ করে না। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, আত্মসত্তার সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার চেতনা মানুষের মধ্যে এক উচ্চমূল্যবোধের সৃষ্টি করে যার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন আল্লাহ্। যে ব্যক্তি তার স্বীয় অপূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে পারে না, সে কখনও পূর্ণসত্তার ধারণা করতে পারে না।

ইবনুল আরবি বলেন যে, নিজেকে জানার ইচ্ছার জন্যই আল্লাহ্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তিনি তার সম্ভাব্য শক্তিসমূহকে অভিব্যক্ত ও বাস্তবায়িত করেছেন। এই মত এই অর্থ করে যে, আল্লাহ্ যেন নিজে পুণ্যবান, পূর্ণতা অর্জনের জন্য

তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং উচ্চতর বিকাশ লাভ করেছেন। এই মতের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ বলেন, আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে এ জগতের যে কোনো বস্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং তিনি স্বয়ংপূর্ণ। জগৎ আত্মবিকাশের প্রক্রিয়া নয়। বিপরীতে, জগৎ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কার্য। সুফিরা তন্ময়তায় আত্মসত্তা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যে একাত্মতা দাবী করেন, তা হচ্ছে একটি আত্মগত প্রক্রিয়া—এর কোনো বস্তুগত সত্তা নেই। আল্লাহ্‌র সাথে গভীর প্রেম ও মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সুফির মনে এমন এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকিছুকে সত্য বলে অনুভব করেন না। এই কারণেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো কিছুই অস্তিত্বশীল নয়। জগতের বিভিন্ন বস্তুকে ঐশী সত্তার প্রকাশ বা ছায়া বলে অভিহিত করা হয়। এই একক সত্তার প্রেমে ও ধ্যানে সুফিগণ সর্বদাই নিমগ্ন থাকার চেষ্টা করেন। তাদের মূল লক্ষ্যই হলো আত্মচেতনার অবলুপ্তি এবং একের চিন্তায় সমাহিত হয়ে থাকা। এই ধরনের অবস্থা অর্জনের জন্যই সুফিরা বিভিন্ন পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যেমন, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি। মুজাদ্দিদ অভিমত পোষণ করেন যে, কোনো কোনো সুফি উচ্চতর পর্যায় লাভ করে এই উপলব্ধি করতে পারেন যে, আল্লাহ্ এবং জগৎ হচ্ছে পৃথক সত্তা এবং তাদের সম্বন্ধে অভেদ-বোধ বিষয়টি আত্মগত অভিজ্ঞতা যার কোনো বস্তুনিষ্ঠতা নেই। "আল্লাহ্ মানব প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞা-বোধের অতীত। তাঁর সত্তা বা তাঁর গুণাবলি কোনো কিছুকেই, প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। যে সত্যটি বোধগম্য তা হচ্ছে অজ্ঞাত ও অদৃশ্যে বিশ্বাস।"১০

ঙ. আল্লাহ্‌র গুণাবলি

আল্লাহ্‌র গুণাবলি দু'প্রকার—সদর্থক ও নঞর্থক। কোনো কোনো নঞর্থক গুণ আল্লাহ্‌র সকল অপূর্ণতাকে অস্বীকার করে। অন্যগুলো তাঁকে জানার অতীত বলে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, তিনি মানব প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞা-বোধের অতীত। কিন্তু সদর্থক গুণ তাঁর উপর আরোপ করা হয় এই কারণে যে, তাঁদের বিপরীতগুলো অপূর্ণতাকে নির্দেশ করে—কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র প্রকৃতিকে বর্ণনা করে না। অন্যান্য সদর্থক গুণ তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবকে বর্ণনা করে এবং এই কারণেই এগুলো তার সারসত্তার অংশ গঠন করে। আল্লাহ্‌র সারসত্তা তার গুণাবলির সাথে অভেদ নয়। গুণাবলি সারসত্তার চেয়ে ভিন্ন ও সারসত্তার অতিরিক্ত। জগৎ হচ্ছে গুণাবলির কার্য বা প্রকাশ। সুতরাং, আল্লাহ্‌র সত্তা পূর্ণ। তাই পূর্ণতা অর্জনের জন্য তাঁর গুণাবলি বা তাদের প্রকাশসমূহের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আল্লাহ্ হচ্ছেন আত্ম-অস্তিত্বশীল সত্তা। তাঁর অস্তিত্বের জন্য অন্যকোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। গুণাবলি হচ্ছে তাঁর জগৎ বা সারসত্তার ফল এবং জাত হচ্ছে গুণাবলির ফল। এইস্তর অনুসারে পূর্ণসত্তা থেকে নির্গত হয় অস্তিত্ব, তারপর পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব হয় প্রাপ্ত জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, শ্রবণ দর্শন, কথন এবং সৃষ্টি। প্রাণের গুণই হচ্ছে জগৎ সৃষ্টির কারণ। এভাবে দেখা যায় যে, জগৎ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কার্য (effect) আল্লাহ্‌র প্রকাশের ধরন নয়। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এসব গুণ তাঁর সত্তার অতিরিক্ত। সসীম বস্তুসমূহের মধ্যে বিদ্যমান যে সদর্থক গুণাবলি লক্ষ্য করা যায় তা আল্লাহ্‌র দান (gift)। জগৎ

www.pathagar.com

বাস্তব ততক্ষণ পর্যন্ত যখন এটা পরম বাস্তব আল্লাহ্ থেকে আগত হয়। তবে জগৎ অবভাস (appearance) বৈ কিছু নয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক অভেদাত্মক নয়; সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্র গুণাবলির আভাস বা কার্য। একজন মানুষের কার্যকে তার সমগ্র সত্তার অভেদমূলক কার্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। অনুরূপ, জগৎ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতিফলন বা প্রতিভাস। জগৎ বাস্তব, কারণ, এটা পরম বাস্তবের অবভাস। তবে, জগৎ তার অস্তিত্বের জন্য আমাদের কল্পনার উপর নির্ভরশীল নয়।

চ. আত্মা

আত্মা মানুষের সারসত্তা, আল্লাহ্ একে সৃষ্টি করেছেন। আত্মা বাস্তবে জগতের বিষয় নয়—এটা কালহীন জগৎ থেকে আগত। এই দেশ-কাল জগতের কোনো কিছুর সাথে তাকে তুলনা করা যায় না। আত্মা তাঁর প্রকৃতিগত স্বরূপই ঐশী। কিন্তু দেহের সাথে এর সংযোজনে এর মধ্যে কিছু প্রবণতার সৃষ্টি করছে। একে নিম্নতর অহং বলে অভিহিত করা হয় (called the lower self, নাফস-ই-আম্মারা)[১১]। ফলে, প্রয়োজন পড়ে বিশুদ্ধতার বা আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং উচ্চতর অহং শক্তিশালী করার। সকল অকল্যাণ ও পাপ নিম্নতর আত্মার কারণেই হয়, কল্যাণ ও মহৎ কাজ সাধিত হয় উচ্চতর আত্মার দ্বারা। উচ্চতর আত্মা সর্বদাই নিম্নতর বা জীবাত্মা থেকে মুক্ত থাকতে এবং এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট থাকে। আত্ম অনুশীলনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুফি জীবাত্মার উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম হন এবং কেবল প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হতে পারেন। এই পর্যায়ে তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধান করেন এবং ঐশী ইচ্ছাকে তার নিজ ইচ্ছায় সমাহিত করেন। নৈতিক বিকাশের এই হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায় যা মানুষ তার জীবনে পেতে প্রত্যাশা করে। আধ্যাত্মিক বিকাশের এই পর্যায়কে দিব্য আত্মা (beautific self) বলে অভিহিত করা হয়। এই স্তর অর্জন করাই হচ্ছে মানব জীবনের লক্ষ্য। সে সমস্ত পার্থিব বিষয়ের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পেতে চায় এবং আল্লাহ্র প্রেম ও প্রশংসায় নিমগ্ন থাকতে চায়। আল্লাহ্ প্রেম স্বয়ং লক্ষ্য নয়—এটা হচ্ছে ব্যক্তির পার্থিব বস্তুর দোষণীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার উপায় যা মানুষের আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐশী ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আবার মানুষ এবং আল্লাহ্র মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে উপাসক ও উপাস্যের। মানুষের উচিত তাঁর সমগ্র জীবনকে ঐশী ইচ্ছানুসারে গঠন করা। মানুষ এবং আল্লাহ্র মধ্যে আরো একটি সম্পর্ক আছে : অর্থাৎ, মারেফাত বা গূঢ়জ্ঞানের সম্পর্ক। সত্যিকার মারেফাত হচ্ছে এই উপলব্ধি যে আল্লাহ মানব বোধের অতীত। আল্লাহকে জানার অক্ষমতার উপলব্ধিই হচ্ছে সত্যিকার বোধ। তিনিই পবিত্র যিনি তাঁর সৃষ্টজীবদের জন্য তাঁকে জানার কোনো পথ উন্মুক্ত রাখে নি, সেই পথ ব্যতীত যার মাধ্যমে তারা তাঁকে জানার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে।

যে সুফিবাদ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জীবনের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই আবার দায়ী ছিল ইসলামে বহু অনৈসলামিক ভাবধারার অনুপ্রবেশের জন্য। বস্তুত ইসলাম তার মৌলিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। মুজাদ্দিদই

www.pathagar.com

একে আবার এর মূল বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে আনেন। তাঁর লিখা এবং রচনাবলি বিপ্লবের সৃষ্টি করে। তাঁর ভাবধারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁকে ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বহু প্রখ্যাত সুফি সাধক যেমন শাহ ওয়ালিউল্লাহ্, খাজা মীর নাসির, খাজা মীর দাদ, গোলাম ইয়াহিয়া, শাহ রফিউদ্দিন এবং শাহ আহমেদ বেরলভি ছোটখাট পরিবর্তনসহ মুজাদ্দিদের শিক্ষা ও ভাবধারাকে গ্রহণ করেন। তাঁরা সকলেই মুসলমানদেরকে এই বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন, "প্লটিনাস ও তার সম্প্রদায় থেকে সরে দাঁড়াও এবং মোহাম্মদ (সঃ)-এ প্রত্যাবর্তন কর।"[১২]

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. সাইদুর রহমান : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসিফ, পৃ. ২২৭।
২. ডা. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৪৯।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০।
৫. সাইদুর রহমান : এন ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসফি, পৃ. : ২৩০।
৬. পূর্বোক্ত পৃ. ২৩১।
৭. পূর্বোক্ত পৃ. ২৩১।
৮. পূর্বোক্ত পৃ. ২৩৩।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩।
১০. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি; পৃ. ২৫৫।
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইবনে খালদুন
(১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.)

ক. ভূমিকা

আবু সাঈদ আবুদর রহমান ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮/১৩৩২-১৪০৬) ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠাতা। সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি তাঁর পেশাদারী দার্শনিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ ম্লান করে দিয়েছে। এক অর্থে তিনি দর্শনবিরোধী ছিলেন এবং কান্টের ন্যায় অধিবিদ্যাকে অসম্ভব বলে মনে করেন। তবুও দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর উক্তিগুলো তাত্ত্বিকভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো দর্শনের শিক্ষার্থীর পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অ্যারিস্টোটল ও নব্য প্লেটোবাদী ভাবধারা বর্জন করে ইবনে খালদুন মুসলিম দর্শনে সম্পূর্ণ এক স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার বিকাশ ঘটান। তাঁর পূর্বের কোনো মুসলিম দার্শনিকের দর্শন দ্বারা তিনি অভিভূত হননি। তিনি আল-ফারাবি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ এবং অন্যান্য দার্শনিকের অনুধ্যানপরায়ণ চিন্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত হালকাভাবে আলোচনা করেন। আমরা অবশ্য তাঁকে আল-গাযালির সাথে তুলনা করতে পারি।[১] দর্শনের প্রতি উভয়েরই উচ্চ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। উভয়েই দৃঢ়ভাবে অভিমত পোষণ করেন যে, কেবল প্রজ্ঞার মাধ্যমেই নয়, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরম সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।

আশ্চর্যের সাথে উল্লেখ করা যায় যে, ইবনে খালদুনের দার্শনিক মতবাদ, দর্শনের উপর রচিত তাঁর কোনো নিয়মিত ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় 'ইতিহাস পদ্ধতির উপর 'ভূমিকা' খণ্ডে যা 'মুকাদ্দিমা' নামে পরিচিত। মুকাদ্দিমা রচিত হয়েছে তাঁর মহান সৃষ্টি বিশ্ব-ইতিহাস লেখার পূর্বে। এটা কান্টের ন্যায় সকল ভবিষ্যৎ অধিবিদ্যারই মুখবন্ধ নয়—এ মুখবন্ধ হচ্ছে সকল ভবিষ্যৎ ইতিহাসের। তবুও এর তাৎপর্যের দিক হচ্ছে যে, এর দ্বারা অধিবিদ্যা এবং ইতিহাস উভয়েরই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এটা পাঠে দর্শন শিক্ষার্থী, ইতিহাস শিক্ষার্থীর চেয়ে কম লাভবান হবে না। জ্ঞানবিদ্যা ও অধ্যাত্ম-দর্শনের বিবরণ দেয়ার পূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বা ইতিহাস-দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানে তাঁর অবস্থান নির্ণয় করা আবশ্যক। তারপর আমাদের জানতে হবে এসব বিষয় এবং সমরূপ অন্যান্য বিষয়ের উপর তাঁর অভিমতগুলো কি। তিনি যে ইতিহাস-দর্শনের জনক ও সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা তা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে যথাক্রমে বৃটিশ ইতিহাসবিদ আরনল্ড টয়েনবি, বৃটিশ দার্শনিক রবার্ট ফ্লিট এবং আমেরিকান ইতিহাসবিদ জর্জ সারটনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ অনুধাবন করা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে ইবনে খালদুনের উপর জগতের মহান চিন্তানায়কদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিত্বের প্রশংসামূলক মন্তব্য মাত্র।

১. ..., তাঁর বিশ্বইতিহাসের মুকাদ্দিমা-[৪]তে তিনি ইতিহাস-দর্শনের ধারণা ও এর গঠনপ্রণালী পরিব্যক্ত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। কোনোকালে বা কোনোস্থানে এ ধরনের সৃষ্টি আজও হয়নি...বৌদ্ধিক ক্রিয়ার নির্বাচিত ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নি বলে প্রতীয়মান হয়।' (অরনল্ড টয়েনবি : এ স্টাডি অব হিস্ট্রি, ভল্যুম-৩, পৃ. ৩২২)।

২. '... বিজ্ঞান অথবা ইতিহাস-দর্শন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, আরবি সাহিত্য এক অতি উজ্জ্বল নাম দ্বারা ভূষিত হয়েছিল। ক্লাসিক্যাল বা মধ্যযুগীয় ক্রিশ্চান জগতে ইবনে খালদুনের প্রায় সমরূপ উজ্জ্বলতা কেউ প্রদর্শন করতে পারে নি... ইতিহাসতত্ত্বে কোনো কালে বা কোনো দেশে তাঁর তুল্য কেউ ছিল না...প্লেটো-অ্যারিস্টোটল ও অগাস্টিন তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না এবং অন্যদের নাম তাঁর সাথে উল্লেখ করার মতো নয়। ...মৌলিকতায় ও পাণ্ডিত্যে, গভীরতায় ও বোধে তিনি সমরূপ প্রশংসিত ছিলেন।' (রবার্ট ফ্লিট : হিস্ট্রি অব ফিলসফি অব হিস্ট্রি, পৃ. ৮৬)।

৩. 'ইবনে খালদুন ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী; মানব সম্বন্ধীয় ব্যাপারে একজন গভীর অনুরাগী। বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বুঝার নিমিত্তে তিনি মানবজাতির অতীত বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী ছিলেন... তিনি ইতিহাস-দার্শনিকদের প্রথম একজন এবং ম্যাকিয়াভেলি[৫] বোডিন, ভিকো, কোঁতে এবং কাউরনটের অগ্রদূত।' (জর্জ সার্টন : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি হিস্ট্রি অব সায়েন্স, ভ্য. ৩. পৃ. ১৬৬২)।

ইবেন খালদুনের প্রতিভার প্রশংসা আরো উত্তম হয় যদি আমরা স্মরণ করি তাঁর মহান সৃষ্টি বিশ্ব-ইতিহাসের সেই অংশকে যা তিনি লিখেছিলেন এর ভূমিকাস্বরূপ। তাঁর এই অনন্য রচনার প্রতিভার তুলনায় উপরোল্লিখিত প্রশংসাগুলো ম্লান হয়ে আসে। তাঁর প্রধান রচনা হচ্ছে : কিতাব আল-ইবার, বিশ্ব ইতিহাস। গ্রন্থটি সাত খণ্ডে রচিত।এই রচনার ভূমিকার শিরোনাম 'মুকাদ্দিমা'। মুকাদ্দিমা এত ব্যাপক আকারে লিখা যে, এটা প্রথম খণ্ডের প্রায় সব স্থান জুড়ে আছে। এতে প্রকৃতি ও ইতিহাস[৬] দর্শন প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের অভিমতগুলো সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। মনে হয়, অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই মুকাদ্দিমা নতুন বিষয়সমূহের অবতারণা করেছেন : যেমন বিজ্ঞান বা ইতিহাস-দর্শন এবং সমাজ বিজ্ঞান। এসব বিষয় এমনভাবে আলোচিত হয়েছে যে, তাঁর রচনার অবশিষ্ট বিষয়গুলো ঢাকা পড়ে গেছে। প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যেন মহান তত্ত্ববিদ। সত্যিই মুকাদ্দিমা হচ্ছে তথ্য সরবরাহের এক জ্ঞানভাণ্ডার—বহনযোগ্য এক ধরনের বিশ্বকোষ। এই রচনাতে সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা উৎসাহজনক এবং উপদেশমূলক তথ্য লাভ করি; যেমন, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতিবিদ্যা, নৃবিদ্যা, শিক্ষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা,

www.pathagar.com

দ্বান্দ্বিকবাদ, অধিবিদ্যা, গূঢ়বাদ, ভবিষ্যৎ কথা, মনোবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াবহির্ভূত ব্যাপার বা অবস্থাদি (যথা : ইন্দ্রিয়াতীত প্রক্রিয়ার জ্ঞান জানাজানি, পূর্বাহ্নে লব্ধ জ্ঞান, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষকরণ[৭] চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীতবিদ্যা, কৃষি, রসায়ন, যুক্তিবিদ্যা[৮] প্রভৃতি)।

খ. ইতিহাস দর্শন

ইতিহাসের লক্ষ্য বা মূল্য, এর প্রকারভেদ এবং ঘটনা লিপিবদ্ধ ও তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে ইতিহাসবিদগণ যে ভ্রমে পতিত হন এই আলোচনা দিয়ে ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দিমা'র সূচনা করেন। পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা বা তাঁদের কল্পনার খোরাক যোগানোই ইতিহাসের লক্ষ্য নয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের অতীত বিশ্লেষণ করা যাতে করে সে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বুঝতে পারে। তাঁর নিকট ইতিহাস শুধু রাজরাজাদের কাহিনী বর্ণনা নয়, কিংবা বর্ণনা নয় যুদ্ধ ও চুক্তিসমূহের সময়ানুক্রমিক ধারার বিবরণ। ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার তথ্য বর্ণনা। এটা মূলত বিভিন্ন ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে মানবসমাজের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের লিপিকরণকে নির্দেশ করে।[৯]

ইতিহাস সম্পর্কে ইবনে খালদুনের অভিমত নতুনত্বের দাবিদার। তিনি মনে করেন যে, ইতিহাস মানবজীবনের ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে। ফলে ঐতিহাসিককে বাধ্য হয়েই নিরপেক্ষ ও কুসংস্কারমুক্ত হতে হয়। ঘটনাবলীর মৌল নিয়মগুলো সাধারণত সর্বত্রই অনুরূপ থাকে। প্রতিটি কার্যেরই একটি কারণ থাকে। একই অবস্থায় সর্বদা একই কার্য উৎপাদন করে। প্রকৃতির রাজ্যে ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই কারণেই প্রকৃতিতে নিয়মানুবর্তিতা নীতি লক্ষ্য করা যায়। কালের অগ্রগতিতে যেহেতু মানব প্রকৃতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে না, সেই কারণেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটা এক নিরবচ্ছিন্ন বিরামহীন ঐক্য।

ইতিহাস বলতে বীরপুরুষদের কাহিনীকে নির্দেশ করে না। এর রয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অর্থ হচ্ছে এক ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিপক্কতা। ইতিহাস মানে হচ্ছে জীবন ও কাল বিষয়ক কিছু মৌল ধারণার গভীর উপলব্ধি। জীবন যা সর্বদা প্রবহমান, এই সত্য আমরা তখনই অনুধাবন করতে পারি, যখন আমরা বিশ্ব ইতিহাসের মূল প্রবাহের সাথে এর ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। ইতিহাস একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবন, মানুষের উত্থান-পতনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমাবক্ষয়ের কারণ নির্ণয় করতে সচেষ্ট থাকে। ইতিহাস সামাজিক জীবনের গতি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম-বিধির ব্যাখ্যা প্রদান করে।

অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে ও অভিজ্ঞতার অন্তরালে অবস্থিত সত্তাসমূহ সম্পর্কে আনুমানিক ধারণা ব্যবহার করে প্রকৃতির সেইসব মূর্ত বস্তু বা বাস্তব ঘটনা নিয়ে আমাদের

www.pathagar.com

আলোচনা করা উচিত যা থেকে সাক্ষাৎ সুনির্দিষ্ট ফল লাভ করা যায়। বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির ঘটনাবলীর পাঠ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং দর্শনের সূচনা হয় কারণ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। আসল কথা হচ্ছে, ইতিহাস একটি বিজ্ঞান এবং এটা দর্শনের একটা অংশ। ইতিহাসের রয়েছে দার্শনিক ভিত্তি, নিছক ঘটনাবলীর উল্লেখ ইতিহাস নয়। ঘটনাবলীর কার্যকারণ ও ঐক্যসূত্র অনুসন্ধান করাও ইতিহাসের কাজ। এক কথায় বলা যায় যে, ইতিহাসের গতি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া—এটা কখনও বিচ্ছিন্ন বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ফলে, বর্তমানের যেসব ঘটনার সাথে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেগুলোকে অনুধাবন করতে গিয়ে আমরা অতীত ঘটনাবলীর দিকে ফিরে তাকাতে পারি এবং একই সাথে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা আঁচ করতে সমর্থ হই।

ঐতিহাসিক গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে খালদুন কতগুলো ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন যেখানে ঐতিহাসিকগণ প্রায়শ হোঁচট খেতে পারেন। কোনো বিশ্বাস বা মতবাদের প্রতি অন্ধ অনুকরণ, নিজ প্রতিভার প্রতি অতি বিশ্বাস, ভ্রান্ত নিরীক্ষণ, কাব্যিক অতিরঞ্জন, যথার্থ প্রেক্ষাপটে ঘটনাকে যথার্থ স্থানে উপস্থাপন করার অক্ষমতা, রাজন্য বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বের আনুকূল্য পাওয়ার প্রবণতা, বাহ্যিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে সাদৃশ্যাবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রভৃতি। ইবনে খালদুন মনে করেন যে, মানবসমাজের গঠনপ্রণালি এবং এর পরিবর্তনের নিয়ম-বিধি সম্বন্ধে ইতিহাসবিদদের অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে। ঐতিহাসিকদের পরিবর্তন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আবেদন বোধও থাকতে হবে। প্রকৃতির ঘটনাবলী যথা : ভূমিকম্প, বন্যা, বায়ু-ঝঞ্ঝা ও মহামারীকে অতীতের ন্যায় প্রকৃতির আকস্মিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না—কিংবা ইতিহাসের ব্যাপক পরিবর্তনকে ঐশী হস্তক্ষেপ বলেও ব্যাখ্যায়িত করা উচিত নয়। কোনো অনুধ্যান বা ধর্মীয় বোধ দ্বারা ইতিহাসবিদকে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা চলবে না। প্রকৃতির ঘটনাবলী ব্যাখ্যার জন্য ইতিহাসবিদকে কঠোরভাবে অভিজ্ঞতামূলক সাক্ষ্য তার স্বীয় ও অন্যের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

গ. সমাজ-দর্শন

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কারণসমূহকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইতিহাসবিদকে মানুষের পরিবেশ, ভৌগোলিক ও পেশাগত অবস্থান, তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অবস্থানসমূহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। ইবনে খালদুনের মতে, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমপ্রকৃতির বিজ্ঞান। ইতিহাস পাঠের জন্য সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন অপরিহার্য। তাঁর মতে, যে ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে যথার্থ ইতিহাস রচনা কোনো দিন সম্ভব নয়। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বলে মনে করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর মুকাদ্দিমা শুধু ইতিহাসের নয়, সমাজবিজ্ঞানেরও আদি গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা যায়।

www.pathagar.com

সমাজবিজ্ঞানের সূত্র ধরে ইবনে খালদুন ব্যক্ত করেন যে, কোনো দেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের উপর সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রগাঢ় প্রভাব বিদ্যমান। এইসব পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও সমাজসংস্থার মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা সূচিত হয়। কেবল তাই নয়, এইসব পার্থক্য মানুষের চরিত্র গঠন ও কর্মক্ষমতাকেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্টেস্কু 'দি স্পিরিট অব লজ' গ্রন্থে যা পরিব্যক্ত করেছেন ইবনে খালদুন তার তিনশত বৎসর পূর্বেই 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, 'পৃথিবীর যে অংশ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত সেখানে প্রধান প্রধান কলা ও বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে এবং সেখানে ইতিহাসের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বেরও জন্ম হয়। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া অঞ্চলে সভ্যতা ও সাংস্কৃতি নিম্নমানের হয়ে থাকে। কেবল তাই নয়, মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পৃথিবীর দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং তা মানুষের অভ্যাস ও রীতিনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ... যারা বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করে তারা চরম গ্রীষ্মের কারণে প্রগতি অর্জনের পথে বাধাপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে, আরব, রোমান, পার্সিয়ান ও গ্রিকের ন্যায় যেসব জাতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে; তারা সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে।[১০]

অ্যারিস্টোটলের মতো ইবনে খালদুন মনে করেন যে, মানুষ মূলত সামাজিক জীব। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পথকে অনুসরণ করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং এ থেকে সমাজের উদ্ভব ঘটে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত মানুষ চলতে পারে না। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে এবং পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন থেকে শুরু করে মানুষ ক্রমশ পরিমার্জিত ও পরিশোধিত যৌথ জীবনধারার দিকে ধাবিত হয়। ইতিহাসের উচিত সভ্যতার লগ্ন থেকে বর্তমান সভ্যতা পর্যন্ত সমাজের ধারাবাহিক বিবর্তনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা।

ইবনে খালদুন মনে করেন যে, সমাজজীবন শুরু হয় যাযাবর জীবন থেকে। অতঃপর এটা নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে। মানব জীবনের ক্রমোন্নতির ইতিহাস থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, আদি বা প্রাচীন যুগে মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন শুরু করে। সমাজবদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় একজন শাসকের। নগরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো শাসক ও তাঁর সহযোগীদের অবস্থান হিসেবে। যাযাবর পর্যায়ে মানুষ সাধারণত নিয়োজিত থাকত তার খাদ্য সংগ্রহের কার্যে। বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক অবস্থায় মানুষ বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা তাদেরকে বাধ্য করে একজন নেতা নির্বাচনের যার অধীনে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সুশৃংখলভাবে জীবন যাপন করতে পারে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব।

সমাজ বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি মানুষ তার নিজ নিরাপদ ও নিরাপত্তার জন্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু কালের গতিতে তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয় এক কৃত্রিম বৈষম্যের। এই পর্যায়ে আবির্ভাব ঘটে একশ্রেণির বিলাসী মানুষের যারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য শোষণ করতে থাকে নিম্নশ্রেণির মানুষকে। শুরু হয় শ্রেণীসংগ্রাম। পরবর্তীকালে শ্রেণীসংগ্রাম এমন চরমরূপ ধারণ করে যে, ধর্ম বা আইন কোনোটির সাহায্যেই প্রচলিত সমাজ-কাঠামোর ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। নিম্নশ্রেণির ব্যক্তিবর্গের এই প্রতীতি জন্মায় যে, ধর্ম ও আইন নিম্নশ্রেণির শ্রমের বিনিময়ে উচ্চশ্রেণির সুবিধার্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা অচিরেই ভেঙ্গে পড়েএবং সমাজ পতিত হয় ধ্বংসের মুখে।

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাইর থেকে এমন এক শক্তিশালী যাযাবর জাতির আবির্ভাব ঘটবে, যারা শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে ও কল্যাণে শোষক শ্রেণীকে পরাজিত করে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে। কিন্তু এই নতুন শাসকগোষ্ঠীও কালক্রমে তাদের পূর্বসূরিদের ন্যায়ই জনগণের উপর শোষণ ও নির্যাতন চালাবে এবং এক পর্যায়ে তারাও শাসনব্যবস্থা থেকে সরে পড়বে। ইবনে খালদুনের মতে, এইভাবে ইতিহাসের চাকা বৃত্তাকারে জাতির উত্থান-পতনের গতি নির্ধারণ করে। ইবনে খালদুনের উক্তি, "সমাজের প্রথম বংশধর যা নির্মাণ করে, দ্বিতীয় বংশধর তা রক্ষণাবেক্ষণ করে, পরবর্তী বংশধরেরা তা উপলব্ধি করে এবং সর্বশেষের বংশধরগণ তা ধ্বংস করে।"[১১]

ইবনে খালদুন বিবর্তনের বাস্তব কারণ নির্দেশ করেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত কারণসমূহ যে মানবসমাজ বিকাশের মূলে অন্তর্নিহিত রয়েছে, এই ধারণা ইবনে খালদুনের পূর্বে কেউ করেন নি। তিনি সভ্যতার কারণ অন্বেষায় প্রাকৃতিক বাস্তব কারণের উপর নির্ভরশীল হতে পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, কারণ অগণিত ও সীমাহীন-তবে সর্বশেষে এক পরিণত কারণ রয়েছে এবং তা হলো আল্লাহ্। অভিজ্ঞতার দ্বারা সবকিছু জানা যায় না। তিনি উল্লেখ করেন, মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং জগতের বহু বিষয় সম্বন্ধে মানুষ অজ্ঞ। ইবনে খালদুন বলেন, সচেতন অজ্ঞতাও একধরনের জ্ঞান এবং যতটুকু সম্ভব জ্ঞানানুশীলন করা আমাদের কর্তব্য।

ঘ. রাষ্ট্রদর্শন

রাষ্ট্রের উৎপত্তি : ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দিমা'য় রাষ্ট্রকে "দওলাত" বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে 'সংহতি' (group mind) বা 'আসাবিয়াত'। বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কারণে এই সংহতি সংঘটিত হয়। জীবন-জীবিকার অভাব পূরণ এবং বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার প্রয়োজন অনুভব করে।

অ্যারিস্টোটল রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেন নি। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজকে একই সংগঠন হিসেবে ভেবেছেন। কিন্তু ইবনে খালদুনের চিন্তাধারায় নতুনত্বের আভাস লক্ষ্য করা যায়। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজকে দুটো ভিন্ন ও আলাদা সংগঠন হিসেবে চিন্তা করেছেন এবং অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে অভেদ্য ও পরস্পর নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

যে সংহতির কারণে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়, সেই সংহতির উদ্ভব অন্য একটি কারণেও হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, মানব স্বভাব ও প্রকৃতিতে পশুসুলভ মনোবৃত্তি বিদ্যমান। এই ধরনের মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টির ইন্ধন যোগায়। ফলে, সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয়। সামাজিক সংহতি রক্ষার্থে একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতির প্রয়োজন অনুভূত হত। এই কর্তৃপক্ষ তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যমে অন্যদেরকে দ্বন্দ্ব-কলহ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে। এই ধরনের ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। জনগণের মধ্যে সংহতি রাখার জন্য এই কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন। এই ধরনের সংহতিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে রক্ত বা আত্মীয়তার সম্পর্ক। ইবনে খালদুন সংহতি বা রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলে ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবের কথা অস্বীকার করেন নি।

রাষ্ট্র শাসনের ভিত্তি : মানুষের প্রকৃতিগত পশুসুলভ মনোবৃত্তিকে দমন করার জন্য এককেন্দ্রিক ক্ষমতাশালী সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন রয়েছে বলে ইবনে খালদুন মনে করেন। আমরা জেনে সত্যি আশ্চর্যবোধ করি যে, এর কয়েকশত বছর পর ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবসও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রের সদস্যদের অন্তর্কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বিরত রেখে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য এই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি একান্ত আবশ্যক। এই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি থেকে একজন শক্তিশালী প্রধানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-কলহকেও শান্ত করে। এই ধরনের রাষ্ট্রকে অপরিসীম সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়—এই হচ্ছে সার্বভৌম শক্তি বা সার্বভৌমত্ব। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সের জ্যাঁ বোঁদা সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে আইনগত যে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন, ইবনে খালদুন তা বহু পূর্বেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি এবং এর আয়ুষ্কাল : ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন যে, কোনো দল বা যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন সংহতি সুদৃঢ় হয় তখন ঐ দল বা সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তারা ধীরে ধীরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে নগরসভ্যতা। নগরসভ্যতার প্রভাবে যাযাবর জাতি তাদের সংঘবদ্ধ জীবনকে ভুলতে বসে এবং বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়ে দেয়। সমস্ত কর্তৃত্ব তারা রাজার উপর ন্যস্ত করে। এই অবকাশে রাজা তার ক্ষমতা ও শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে থাকেন। বিদেশী ভাড়াটে সৈনিক ও রাজকর্মচারীদের উপর তাকে নির্ভরশীল হতে হয়। এইভাবে জাতির বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। অনুরূপে, খোদার ইচ্ছায় রাষ্ট্রের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তখন অন্য কোনো সুসংহত জাতির হস্তগত হয়।

ইবনে খালদুন মনে করেন, কোনো রাষ্ট্র তিন জামানার অধিক টিকে থাকতে পারে না। চল্লিশ বৎসর এক জামানা ধরা হয়, অর্থাৎ, কোনো রাষ্ট্র ১২০ বৎসরের বেশি টিকে থাকেনা। ইবনে খালদুন রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল তিনটি পর্বে ভাগ করেন, প্রতিটি পর্বের স্থায়িত্বকাল তাঁর মতে চল্লিশ বছর। প্রথম পর্বে সদস্যদের শৌর্যবীর্য ও আদর্শের আতিশয্যে রাষ্ট্র ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় পর্বে স্বগোত্রীয় সংহতি বেশ হ্রাস পায়, কারণ সদস্যগণ স্থিতিশীল নগরজীবনের ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে তখনও পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্যের রেশ কিছুটা থেকে যায়।

www.pathagar.com

তৃতীয় ও শেষ পর্বে রাষ্ট্রশাসক ও নাগরিকবৃন্দ নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসের প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে সংহতিকে নষ্ট করে দেয়—নিঃশেষ হয়ে যায় ঐক্যবোধ। ফলে রাষ্ট্রের পতন বা বিলুপ্ত ঘটে খোদ আল্লাহ্‌র নির্দেশে।

৬. দার্শনিক মতবাদ

'মুকাদ্দিমায়' কয়েকটি বিক্ষিপ্ত খণ্ডে রচিত 'যুক্তিবিজ্ঞান' 'দ্বান্দ্বিকবাদ', 'দর্শনের বিপদ ও অনুপপত্তিসমূহ' 'অধিবিদ্যা' প্রভৃতি শিরোনাম থেকে ইবনে খালদুনের দার্শনিক মতবাদ ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১. যুক্তিবিদ্যা : জ্ঞানের জগতে ইবনে রুশদ যুক্তিবিদ্যাকে অতি উচ্চস্তরে স্থান দিয়েছেন। সক্রেটিস ও প্লেটো অ্যারিস্টোটলের যুক্তিবিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইবনে খালদুন যুক্তিবিদ্যার ভূমিকাকে অত্যন্ত গৌণ মনে করেন। তিনি যুক্তিবিজ্ঞানকে কেবল সহায়ক বিদ্যা বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, যুক্তিবিদ্যা পাঠের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অযথা অধিক সময় ব্যয় করে। তবে, প্রায়শই এটা একজনকে চতুর ও বিচারবুদ্ধিহীন পণ্ডিতে পরিণত করে। যুক্তিবিদ্যা একজনকে সত্যের অকৃত্রিম অনুসন্ধানকারী করে তোলে না। এর কার্যাবলি মূলত নঞর্থক, যা সত্য তাকে নয় বরং যা সত্য নয় তাকে জানার জন্যই যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে সদর্থক জ্ঞান দান করে না। সদর্থক জ্ঞানের জন্য আমাদেরকে স্বীয় পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা এবং অপরের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়েও একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বা বৈজ্ঞানিক মেধাসম্পন্ন প্রতিভাধারী স্বাভাবিকভাবেই যৌক্তিক উপায়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। অন্যদিকে, যুক্তিবিদ্যায় পণ্ডিত হয়েও একজন তার প্রকৃত চিন্তায় বহু যৌক্তিক অনুপপত্তি ঘটাতে পারেন। পেশাদারী যুক্তিবিদ্যাও এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। আধুনিক পাঠকদের এখানে সহজেই জে. এস. মিলের দৃষ্টান্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে।

২. দ্বান্দ্বিকবাদ : দ্বন্দ্বমূলক জ্ঞান হচ্ছে প্রজ্ঞা ও অলংকারশাস্ত্রের ব্যবহার যা ধর্মবিশ্বাসের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটা এক ধরনের পাণ্ডিত্য দর্শনের ন্যায় (scholastic philosophy)। ইবনে খালদুন মনে করেন দ্বন্দ্বমূলক জ্ঞানও যুক্তিবিদ্যার ন্যায় একটি সহায়ক বিজ্ঞান মাত্র। এটাও নঞর্থক ভূমিকা পালন করে থাকে। মুসলিম চিন্তার বিকাশে ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন, ইলম-আল-কালাম নাস্তিক ও অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আত্মরক্ষার অস্ত্র বা হাতিয়ারস্বরূপ।[১৩] ইবনে খালদুন 'প্রতিরক্ষার অস্ত্র' হিসেবে এর কার্যকারিতা অবশ্যই স্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন যে, ধর্ম মতবাদের বিরুদ্ধ যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করতে দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ সার্থক হলেও, ধর্মের নিজস্ব মতবাদগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই মতবাদ সিদ্ধান্তমূলক কোনো যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে না। দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ দ্বারা আমরা একজন নাস্তিককে স্তব্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু তাকে ধর্মমতের সমর্থনে আনতে ব্যর্থ হই এবং তাকে ধর্মপরায়ণ করে গড়ে তুলতে পারি না। দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ ধর্মের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বলে ভাবা উচিত নয়, কারণ ধর্মের সত্য যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে। এতদ্ব্যতীত,

www.pathagar.com

দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ প্রায়শই অলংকারশাস্ত্রের রূপ ধারণ করে। একজন দ্বান্দ্বিক প্রায়শই শব্দের খেলায় ও সূক্ষ্মতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। তিনি সাধারণত শব্দ বা বাগধারার উপর তাঁর পাণ্ডিত্য ও কৌশল প্রদর্শনে ব্যস্ত থাকেন এবং এইভাবে সত্য অনুসন্ধানের পথ থেকে দূরে সরে পড়েন। সত্য অতিরঞ্জিত ভাষার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

৩. **দর্শনের বিপদ ও অনুপপত্তিসমূহ :**[১৪] 'মুকাদ্দিমা'র সূচনা খণ্ডেই ইবনে খালদুন ধর্মের জন্য দর্শনকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা দেন। দর্শনের বিপদের কারণ হচ্ছে, দার্শনিকদের বিভিন্ন পূর্বানুমান এবং পক্ষপাতমূলক মতবাদ। এগুলো মিথ্যে ও ভিত্তিহীন এবং ধর্মের জন্য তা' ক্ষতিকর। এদের কয়েকটিকে তিনি নিম্নে উল্লেখ করেন :

১. ধর্মের সত্যকে বুঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শন যথেষ্ট বলে দার্শনিকদের ধারণা এবং এইভাবে তারা দর্শনের সাথে ধর্মকে সমন্বয় করার প্রচেষ্টা চালান।

২. কেবলমাত্র দার্শনিক অনুধ্যানের মাধ্যমে মানব আত্মার মুক্তি সম্ভব বলে মনে করেন।

৩. আল্লাহ্ জগৎ থেকে বিকিরণের ক্রমধারায়, আল্লাহ্ কেবল ক্রমের প্রথমটির সাথে, অর্থাৎ প্রথম বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।

(১) দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশ্যই ছিল সমস্ত মুসলিম দার্শনিকের আশা ও প্রত্যাশা। তাঁদের মতে, দর্শন ও ধর্ম একই সত্যের সন্ধান দেয়। দর্শন দেয় অমূর্ত ভাষায়, ধর্ম দেয় রূপক ভাষায় যাতে করে সাধারণের জন্য তা বোধগম্য হয়। দার্শনিকদের ধারণা যে তারা ধর্মকে বিশুদ্ধ ও উত্তমরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম। ইবনে খালদুন মনে করেন যে, এ সবই হচ্ছে দার্শনিকদের পূর্বানুমান বা পূর্বধারণা। ক্যান্টের ন্যায় ইবনে খালদুন দার্শনিকদের সর্তক করে দেন যে, তাঁদের পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তাদের পদ্ধতির ধারণা-গঠন (concept formation) এবং অমূর্ত প্রজ্ঞা (abstract-reason) বৈ আর কিছু নয়। তাঁর মতে-এই পদ্ধতির দ্বারা দার্শনিকগণ কখনও ধর্ম-বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে পরমসত্যে উপনীত হতে পারবেন না। অধিকন্তু, দার্শনিক সত্যের সাথে ধর্মের সমন্বয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না—কারণ, দার্শনিকদের দেয়ার মতো কিছুই নেই। তারাও সত্যের দাবিদার—দার্শনিকদের এই দাবি শেষ বিশ্লেষণের ধোপে টেকে না। তারা ধর্মীয় সত্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ, ধর্মীয় সত্য অধিকতররূপে একটি আভ্যন্তরীণ স্বজ্ঞার বিষয়—অর্থাৎ, অভিজ্ঞতা বিশেষ। এটা দার্শনিকদের অমূর্ত ধারণা বা যুক্তি প্রদর্শন নয়। তাদের পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে শুধু ধর্মের নির্জীব ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দ্বারাই দার্শনিকগণ ধর্মীয় মতবাদের সাথে তাদের দর্শন মতবাদের সমন্বয় সাধন করতে পারেন। এইভাবে দেখানো যেতে পারে দর্শন ধর্মের জন্য কত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

(২) গ্রিক শিক্ষক প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল অনুসরণে মুসলিম দার্শনিকবৃন্দ এই অভিমত পোষণ করেন যে, অমূর্ত দার্শনিক অনুধ্যানের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সত্যিকার সুখ ও মানবাত্মার মুক্তি। কিন্তু ইবনে খালদুন মনে করেন যে, এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপরীত। কারণ, দর্শন হচ্ছে প্রত্যক্ষণ (perceptual) অন্বেষা যার কোনো

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। যতই দর্শন পাঠ করা যায়, ততই উদ্ভব হয় দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ। সুখ ও পরিত্রাণ আনার পরিবর্তে দর্শন আমাদের জন্য নিয়ে আসে দুঃখ ও অভিশাপ। কারণ, এটা আমাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অনেক শিক্ষার্থীই ইবনে সিনার 'শিফা' ও 'আল-নাজাত' অধ্যয়ন করে। তাদের প্রত্যাশা এটা তাদের আত্মার সুখ ও মুক্তি দেবে। কিন্তু পরিবর্তে দেখা যায় যে, এটার দ্বারা তাদের আত্মা দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের আবর্তে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে গেছে যার থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ইবনে রুশদের ভাষ্য অধ্যয়নে বৃথা জীবন ব্যয় করেন। এটা তাঁদেরকে দর্শনের [১৫] জট থেকে বিমুক্ত হওয়ার কঠিন পাকে আবৃত করে রাখে।

(৩) আল-ফারাবি, ইবনে সিনা এবং অন্য দার্শনিকগণ ক্রমবদ্ধন আকারে আল্লাহ্র সত্তা থেকে বুদ্ধি ও আত্মাসমূহের বিকিরণ মতবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ইবনে খালদুন তার মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বা অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তি খুঁজে পান না। তাঁর নিকট এই বিষয়টি দার্শনিকদের ফাঁদ, হালকা তত্ত্ব বলে প্রতীয়মান হয় যা ক্ষুদ্র যুক্তির দ্বারাই প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে কেবলমাত্র প্রথম বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ আল্লাহ্ ও জগতের মধ্যকার বিকিরণের সমগ্র ক্রমবিন্যাসের আল্লাহ্ প্রথম দফার (Item) সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, জগৎ সেই ক্রবিন্যাসের কেবল শেষ দফার (Item)-সাথে প্রতক্ষ্যভাবে সম্পর্কিত। এই ব্যাপারটি আল্লাহ্ ও জগতের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই মতবাদ যদি মুসলিম নব্য প্লেটোবাদীদের উপর আরোপ করা হয়, তবে তারা জড়বাদ সমর্থন করছেন বলে সহজেই বলা যায়। জগৎ প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্র সৃষ্টি ক্রিয়ার ফল নয় বরং বিকিরণ ক্রমবিন্যাসের শেষ দফায় বিকিরণ এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে আদি জড় থেকে জগৎ উদ্ভব হয়েছে এ মতবাদকে স্বীকার করে নেয়া।

চ. অধিবিদ্যা

কান্টের ন্যায় ইবনে খালদুন অধিবিদ্যার অসম্ভাব্যতার কথা বিশ্বাস করেন। অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে তাঁর শক্তিশালী যুক্তি হচ্ছে : মানবজ্ঞান সীমিত এ কথা প্রকাশ করা। মানবজ্ঞান যে সীমাবদ্ধ এ কথা তিনি বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। অবভাসিক জগতের জ্ঞান, শেষ বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রত্যক্ষকারীর জ্ঞান তার ইন্দ্রিয়ক্ষমতা ও সংবেদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দৃষ্টিশক্তি অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে অন্ধলোকের কোনো ধারণা নেই। কিংবা বধির লোকের কোনো ধারণা নেই শ্রবণশক্তির ব্যাপারে। এসব অভিজ্ঞার বাস্তবতা যারা অস্বীকার করেন তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ব্যতিরেকে আর কিছু নেই। অবভাসিক জগৎ সম্বন্ধে আমাদের স্বীয় জ্ঞান অনেক সীমাবদ্ধ।[১৬] পরিধি ও গুণ উভয় দিক থেকে জগতে এমন সত্তার অস্তিত্ব থাকতে পারে যা আমাদের জানা বস্তুর চেয়েও উত্তমরূপে বিন্যস্ত ও সুসজ্জিত।[১৭]

এমন সত্তার অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা ইবনে খালদুন জৈবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বলে মনে করেন। জৈবিক বিবর্তনের তিনি একটা সুস্পষ্ট ও সুবিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। খনিজ থেকে উদ্ভিদ, নিম্নস্তরের উদ্ভিদ থেকে উচ্চস্তরের

www.pathagar.com

উদ্ভিদ, উচ্চস্তরের উদ্ভিদ থেকে নিম্নস্তরের প্রাণী, নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে উচ্চস্তরের প্রাণী এবং উচ্চস্তরের প্রাণী থেকে উচ্চতম প্রাণী বানর, বানর থেকে মানুষের এক অব্যাহত ক্রমিক বিবর্তন রয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে, আমাদের এই গ্রহে কার্যরত এই বিবর্তন প্রক্রিয়াকেই শুধু আমরা জানি। এটা ব্যতীতও আমাদের চেয়ে উচ্চতর বিন্যাসের সত্তার অস্তিত্বও থাকতে পারে। সত্তার যেমন স্তরসমূহ রয়েছে, জ্ঞানেরও তেমনি স্তরসমূহ আছে। উচ্চতর সত্তার জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞানটি আমাদের তুলনায় প্রাণীর জ্ঞানের সদৃশস্বরূপ। তাহলে, দার্শনিকগণ কি তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেন না? তাদের কি এই উপলব্ধি হবে না মানব প্রজ্ঞা বিশ্বের সকল গভীর রহস্য উন্মোচনে অসমর্থ।

তারপর ইবনে খালদুন প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিশক্তির বর্ণনা দেন। প্রজ্ঞা হচ্ছে সেই ধীশক্তি যার মাধ্যমে আমরা কয়েকটি প্রত্যক্ষণ থেকে সম্প্রত্যয় (concept) গঠন করি এবং আমরা কম সম্প্রত্যয় বা ধারণা থেকে অধিকতর সাধারণ ধারণায় উপনীত হই। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা বিশেষ প্রত্যক্ষণ থেকে সাধারণ ধারণা গঠন করি। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আমরা সাধারণ ধারণা থেকে আরো উচ্চতর সাধারণ ধারণায় উপনীত হতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে প্রজাতি (species) থেকে আমরা জাতি (genus) সাধারণ ধারণা গঠন করতে পারি। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, ধারণা যত অধিকতর সাধারণ হয়, তখন এটা ততই সহজতর হয়, কারণ পদের ব্যক্তর্থ বাড়লে তার জাত্যর্থ হ্রাস পায়। পরিণামে আমরা অতি সাধারণ ও সহজতম ধারণায় উপনীত হই, অর্থাৎ, সত্তা, সারসত্তা ও দ্রব্যের ধারণা। এখানেই মানব প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি আবার সীমিত হয়ে পড়ে। কারণ, এসব পরম ধারণার অতীত বুদ্ধি আর যেতে পারে না কিংবা এসব রহস্যের কোনো ব্যাখ্যাও সে দিতে পারে না।

অন্য এক স্থানে ইবনে খালদুন মন্তব্য করেন, বুদ্ধি হচ্ছে সেই শক্তি যার মাধ্যমে আমরা বস্তুর মধ্যে কারণিক সম্পর্কের সন্ধান পাই এবং কার্যকারণের শৃংখল আবিষ্কার করি। ব্যক্তি যতই বুদ্ধিমান হন, ততই তিনি বহুসংখ্যক বিষয় বা ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণের নিয়ম দ্বারা সংযোগ ঘটাতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাবা খেলায় বুদ্ধিমান খেলোয়াড় তার সম্ভাব্য চালের সংখ্যা সম্বন্ধে পূর্বেই সচেতন থাকেন, যেটা কমবুদ্ধিসম্পন্নের জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না। সমগ্য জগৎ হচ্ছে একটা গঠনমূলক সামগ্রিক এবং বস্তুসমূহ কার্যকারণ দ্বারা গ্রথিত। কার্যকারণ সংযোগের সমগ্র বিষয়টি আমাদেরকে পরিণামে প্রথম কারণের ধারণায় নিয়ে আসে। কারণ, কার্যকারণের ক্রম অনন্তভাবে চলতে পারে না। কিন্তু, প্রথম কারণের স্বরূপ লাভে আমরা ব্যর্থ হই। এখানেই বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা পুনরায় সীমিত হয়ে পড়ে। দার্শনিকগণ প্রথম কারণকে আল্লাহ্‌র সাথে শনাক্ত করেন-বেশ ভাল কথা। কিন্তু তাঁরা যখন আল্লাহ্‌র স্বরূপ ও গুণাবলির ব্যাখ্যার প্রয়াস চালান তখনই তাঁদের অযোগ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধির মাধ্যমে এই ধরনের প্রয়াস অসম্ভব ব্যাপার—এটা যেন স্বর্ণকারের তুলাদণ্ডের সাহায্যে পর্বতকে ওজন করার ন্যায়। দার্শনিকগণ কি উপলব্ধি করতে পারছেন যে তাঁরা বুদ্ধির মাধ্যমে সবকিছুকে জানাতে পারেন না?

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ইবনে খালদুন প্রকৃতপক্ষে আল-গাযালির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সারটন তাঁকে আল-গাযালির অনুসারী বলেও উল্লেখ করেন।
ct. ইনট্রোডাকশন টু হিস্ট্রি অব সায়েন্স, বাল্টিমোর, ১৯৪৭, ভ্য, ৩, পার্ট, ২, পৃ. ১৭৭৫।

২. স্পেনিস মুসলিম ইতিহাসবিদ ও চিকিৎসক এবং ইবনে খালদুনের বন্ধু ইবনে আল-খতিব-এর মতে তিনি দর্শনের উপর কয়েকটি স্বাধীন প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছে ইবনে রুশদের কিছু রচনাবলির সংক্ষেপ যার (তালামিস) এবং ফখর আল-দীন আল-রাজির মোহায়সাল (অধিবিদ্যার উপর গ্রন্থ) এবং যুক্তিবিদ্যার উপর কিছু রচনাবলি।

৩. ইবনে খালদুনের জীবনকালে তাঁর গুরুত্ব তেমনভাবে অনুভূত হয় নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম পণ্ডিতগণ তাঁর বিষয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেন। প্রথম যারা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁরা হলেন সুফি।

৪. শব্দটা কি মুকাদ্দামাহ্ না মুকাদ্দিমাহ্ হবে তা ব্যাকরণগতভাবে বিতর্কের বিষয়। বর্তমানে অনেক পণ্ডিত মুকাদ্দিমাহ্ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। রোসানথলের ইংরেজি অনুবাদেও মুকাদ্দিমাহ্ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। নিউইয়র্ক, ১৯৫৮।

৫. ম্যাকিয়াভেলির সাথে ইবনে খালদুনের তুলনার জন্য দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনাম : ইবনে খালদুন, হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক, লাহোর, ১৯৪৯, বুক-২, অধ্যায় ৫.

৬. ইবনে খালদুন, বিশ্ব ইতিহাসের পূর্ণ শিরোনাম : কিতার আল ইবরা দিওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আয়্যাম আল আরব ওয়াল আযম ওয়াল বারবার ওয়ামান আসারা হুম মিন দাউই আল সুলতান আল-আকবর (বুক অব ইনস্ট্রাকটিভ্ একজাম্পেলস অ্যান্ড রেজিস্টার অব অরিজিনস্ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন কনসার্নিং দি হিস্ট্রি অব দি এরাবস পার্শিয়ানস অ্যাণ্ড দি বারবারস অ্যাণ্ড দি সুপ্রিম রুলারস হু ওয়্যার কনটেম্পরারি উইথ দেম।

৭ অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা : মনোবিকার বিদ্যা ও পরা-মনোবিদ্যার উপর ইবনে খালদুনে আলোচনা তাঁর মৌলিক রচনার অংশ যা মুকাদ্দিমাতে স্থান পেয়েছে। (ইংরেজি অনুবাদ: ফ্রাঞ্জ রো সালমান, ভ্য. ১. পৃ. ১৮৪-২৪৫।

৮. ইবনে খালদুন যাদুবিদ্যাকে বিজ্ঞানের অংশ বলে মনে করেন। তবে তিনি বৈধ ও অবৈধ যাদুর মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করেন।

৯. ct. যুদ্ধাহ্ পরকাল ইবনে খালদুনের ফিলসফি অব হিস্টি 'ইসলামিক কালচার,' ১৯৫৪, পৃ. ৪৯২-৫০৮।

১০. ইবনে খালদুন নিঃসন্দেহে সমাজতাত্ত্বিক মনোভাবাপন্ন ইতিহাসবিদ। তাঁর মৌলিকতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি নিজেকে জাতীয় অগ্রগতি ও অবক্ষয়ের নীতি আবিষ্কারক বলে দাবি করেন। দ্রষ্টব্য : মুকাদ্দিমা ইংরেজি অনুবাদ।

১১. "অগ্রগতির কাল অপরিহার্যভাবেই অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথ অনুসরণ করে"—এই ব্যাপারে সারটন ইবনে খালদুনকে স্পেঙ্গলারের অগ্রদূত বলে মনে করেন। (১৮৮০-১৯৩৬) op. cit. পৃ. ১৭৭০।

১২. মুকাদ্দিমা : ইংরেজি অনুবাদ : ভ্য, ৩, পৃ. ২৫৭।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

১৪. ct. ই. আই. জে., রোযানথাল 'ইবনে খালদুনস এ্যাটিচোড টু দি ফালাসোফা' আল আন্দালুস ভ্য : ২০ নং-১, ১৯৫৫।

১৫. মুকাদ্দিমা, ইংরেজি অনুবাদ, ভ্য ৩, পৃ. ২৫৪।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭, ৩৮, ১৫৪।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

সমসাময়িক চিন্তাধারা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করতে পারেন নি। বাধাধরা নিয়ম ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়েই তাঁরা দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। ফলে, কালের অগ্রগতির সাথে তাঁরা তাল মিলিয়ে চলতে পারেন নি। মুসলিম সম্প্রদায়ের এই অনগ্রসরতার কারণ সহজেই অনুমেয়। প্রথমত, ধর্ম মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়ত, ধর্মকে অনুষ্ঠান ও আচারসর্বস্ব করে তোলা। এই দু'টোই ছিল ইসলামের মূল ভাবধারার পরিপন্থী। যে আদর্শ, কর্তব্য ও মূল্য নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব, সেইভাবধারাই হলো উপেক্ষিত ও বিস্মৃত।

ইসলামের মূল শিক্ষা

ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে ইসলাম প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যের দ্বারা মানুষকে বিশ্বজাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। জগৎকে মিথ্যে, অলীক ও স্বপ্ন মনে না করে ইসলাম জগৎকে বাস্তব বলে গ্রহণ করেছে এবং এতে মানুষের স্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা কি তা নির্ধারণ করেছে। অতি-প্রাকৃতিক আবরণমুক্ত হয়ে ইসলাম প্রকৃতির সত্যিকার রহস্য উন্মোচনে প্রয়াস চালায়। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণে এনে মানুষের সেবায় ও কাজে তা সদ্ব্যবহার করার জন্য ইসলাম মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

ইসলাম মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। আত্মসমর্পণ নয়, আত্ম-প্রাধান্য বিস্তারই হচ্ছে মানুষের আদর্শ। আত্ম-অস্বীকৃত, আত্ম-উদাসীনতা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রোধ করে দেয়। আত্ম-স্বীকৃতি, আত্মপ্রত্যয় এবং সক্রিয় আত্ম-উপলব্ধিই মানুষের ব্যক্তিত্বকে সম্প্রসারিত করতে পারে। ফলে, মানুষের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে ক্রিয়াতৎপরতা বা কর্মে প্রবৃত্ত থাকা। ক্রিয়াপরতা ও কর্মপ্রবৃত্তির মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সদগুণ। এই সদগুণ ও উচ্চতর মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে মানুষকে প্রতিকূল শক্তির মুখোমুখি হতে হবে, তাকে থাকতে হবে সদা কর্মতৎপর।

ইসলামের সৌহার্দ্যের আদর্শ অনুসরণেই মানুষ তার যথার্থ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইসলাম মানুষকে বস্তু ও ঘটনাবলির মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ

www.pathagar.com

ব্যবহারে প্রকৃতির উপর তার আধিপত্য বিস্তারে নির্দেশ দেয়। আসলে মানুষই হচ্ছে উচ্চতর মূল্যবোধ সৃষ্টি ও প্রণয়নের সক্রিয় কর্তা। প্রতি মুহূর্তে শুধু মানবজীবনই পরিবর্তিত হচ্ছে না, সমগ্র জগতই সদা পরিবর্তিত হচ্ছে। জগৎ প্রক্রিয়ার এই অগ্রগতিতে মানুষকে অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

আদর্শচ্যুতি : পরের জন্য কল্যাণ বা পরার্থবাদ (altruism) মুসলিম জীবনের এক মহান আদর্শ। কিন্তু কালের প্রবাহে পরবর্তী সময়ে এই আদর্শকে ভুলে গিয়ে মুসলমানগণ জড়িয়ে পড়ে আত্মস্বার্থে। ফলে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে। ইসলাম ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারে ক্রমে ক্রমে আবদ্ধ হয়ে পড়ে কুসংস্কারের আবর্তে এবং ইহলোককে বর্জন করে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে পরকালের উপর। আত্মস্বার্থে জড়িত হয়ে জলাঞ্জলি দেয় প্রকৃতির উপর তার আধিপত্যের অধিকার। পরিবর্তনই জীবনের ধর্ম। কিন্তু মুসলমানগণ এই পরিবর্তনকে স্বীকার না করে পড়ে রইলেন তাদের পুরোনো ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাকে ঘিরে। ফলে সৃষ্টি হয় নি কোনো নতুন মূল্যবোধের। ইসলামের প্রায়োগিক উদ্দীপনা ও গতিশীল মনোভাব ব্যাহত হয়। ধর্ম যখন পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে যেতে পারে না, তখন ধর্মের কার্যকারিতাও আর থাকে না। যে ধর্ম প্রগতিশীল নয়, এবং যে ধর্ম জীবনের কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না তা পরিণামে অকার্যকর হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

পুরনো ধর্মের ধ্যান-ধারণাক আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না, পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মকে পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। ধর্মকে সংযুক্ত হতে হবে অবস্থার উপর নয়, বরং প্রক্রিয়ার উপর। ধর্মকে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় এসেছে। কালের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে মানুষকে উদ্ভাবন করতে হবে নব পদ্ধতি, নব কৌশল। আদর্শ অর্জনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে ধর্মের যান্ত্রিক অনুশীলন মূল্য ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে।

ধর্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আচার-অনুষ্ঠান জীবনের মূল লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুসলমানদের পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে নতুন পথ ও পন্থা আবিষ্কারে আত্ম-প্রয়াস চালাতে হবে। প্রায় ছয় শতাব্দীকাল যাবৎ মুসলমানগণ ছিল প্রায় কর্মবিহীন ও নিষ্ক্রিয়। এই সময় তারা নানা কুসংস্কার ও অশুভ আচরণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে, যা ইসলামি ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুসলমানদের এহেন অবস্থার সুযোগে প্রবেশ করে অদৃষ্টবাদ (fatalism)। ফলে মুসলমানগণ পতিত হয় আরো দুঃখজনক ও অসহায় অবস্থায়।

মরমি সাধকগণ বিভিন্ন ধরনের মরমি অনুশীলনের আশ্রয় নেয়। তাঁদের সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ ব্যক্তি-আত্মাকে ঐশী আত্মার সাথে একীভূত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা নতুন ও অদ্ভুত পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলে। ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা সরে পড়েন বহু দূরে। ধর্মতাত্ত্বিক ও আলেম সম্প্রদায় কোরআন ও হাদিস থেকে সরে এসে নিয়োজিত থাকলেন তাদের ভাষা নিয়ে। ধর্মীয় মনোভাবের এই অধঃপতন

www.pathagar.com

পরবর্তী কিছু মুসলিম চিন্তাবিদকে প্রভাবিত করে ফেলে। তাঁরা অবচেতনভাবেই তাঁদের জীবনে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলিম বিদ্বৎ-সমাজ এক বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন।

ইবনে তাইমিয়া

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ইবনে তাইমিয়া এই আধ্যাত্মিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রথমে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ইসলামের মূল শিক্ষাকে নতুন করে আবিষ্কার এবং ধর্মীয় মতবাদের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিগত বিচার প্রয়োগের অনুপ্রেরণায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষেরই উচিত এসব মতবাদকে নিজের প্রয়াসের মাধ্যমে জানা এবং একে উপলব্ধি করা। যৌক্তিক প্রমাণ ব্যতীত অন্যের কর্তৃত্ব বা প্রাধিকার (authority)-কে স্বীকার করা উচিত নয়। প্রাধিকার থেকে অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মনোভাব পরিহার করার জন্য তিনি সবাইকে সতর্ক করে দেন। তিনি আরোহ পদ্ধতি অনুশীলন, শাস্ত্রের মূল শিক্ষায় গভীর মনোনিবেশ এবং তাদের ব্যঞ্জনা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করার জন্য মানুষকে পরামর্শ দেন।

ওহাবি আন্দোলন

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মোহম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের আবির্ভাব। তিনি তাইমিয়ার শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর আন্দোলন ছিল একটি পুনর্জাগরণের আন্দোলন। কারণ, তিনি সব অভিনবত্ব ও প্রাধিকারকে অস্বীকার করেন এবং ইসলামের মূলে অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানান। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইসলামকে সব বিকৃতির ও বিদেশীয় ধারণা থেকে অবমুক্ত করা।

মুসলিম বিশ্বে এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। অতিরিক্ত কঠোর শুদ্ধাচার (puritanism)-এর ফলে আন্দোলনটি ভেঙে যায়। তবে, দীর্ঘকাল যাবৎ এটা মানুষের মনকে প্রভাবিত করে রাখে। বিশোধিত একেশ্বরবাদী আদর্শ এবং ইসলামে বিদেশী নব ভাবধারার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এর যে প্রক্রিয়া তা প্রায় সব মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

রশিদ রেজা

ওহাবি সম্প্রদায়ের মতাবলীকে যিনি আরো সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলেন তিনি হচ্ছেন সিরিয়ার শেখ রশিদ রেজা। অবশ্য তাঁর কিছু নিজস্ব উগ্র মতবাদ ছিল। তিনি সব প্রাধিকার (তফসিল) অস্বীকার করেন, সব অভিনবত্বের (বিদাত) বিরোধিতা করেন এবং ইবনে তাইমিয়ার মতাবলিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলেন। তিনি সালাফ বা শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষদের দলে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালান। এই আন্দোলনটিকে একটি নব্য ওহাবি আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামী নৈতিক আদর্শের পুনর্স্থাপনই এঁদের মূল লক্ষ্য ছিল।

www.pathagar.com

ইবনে সাউদ

ইবনে সাউদের রাজত্বকালে আরবদেশে অনুরূপ ওহাবি আন্দোলনের পুনরুদ্ভব ঘটে। এই নব্য ওহাবিগণ অধিকতর ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ছিলেন। ইবনে সাউদ আধুনিক আরবের বহু সংস্কার সাধন করেন। তিনি মাজার উপাসনা এবং অন্যান্য অনৈতিক ও অনৈসলামি আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ইসলামের শুদ্ধিকরণের এই নীতি অন্যান্য মুসলিম দেশেও প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে। এ উপমহাদেশের অংশটি 'আহলে হাদিস' অর্থাৎ রসুল (স:)-এর অনুগামী বলে পরিচিত। তাঁরা চারটি রক্ষণশীল সম্প্রদায় (মাযহাব)-এর কর্তৃত্বকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁরা সবধরনের অভিনবত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা মূল ইসলাম অর্থাৎ মহানবি এবং চার খলিফার আমলে ইসলামে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানান। ধর্মীয় আইন ব্যাখ্যায় ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেন।

সেনুসি আন্দোলন

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও সংস্কার বিধানকল্পে আরেকটি আন্দোলনও সক্রিয় ছিল। ধর্মীয় সংস্কারের জন্যও এই আন্দোলনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ছিল সৈয়দ মোহাম্মদ বিন আলী আস-সেনুসি-র সেনুসি আন্দোলন। এই আন্দোলনটি সিরিলিকায় এখনও বর্তমান আছে। প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলন ইসলামি আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কারে ব্যাপৃত ছিল। পরবর্তীকালে তা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে এবং নেতারা দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এদের অনুসারীদের কোথাও কোথাও এখনও পরিলক্ষিত হয়।

জামালউদ্দিন আফগানি

উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন জামালউদ্দিন আফগানি (১৮৩৯-১৮৯৭)। আফগানিস্তানের আসাসাবাদে (মতান্তরে) ইরানের আসাসাবাদে তাঁর জন্ম। তাঁর কর্মস্থান ছিল মিশরে। ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন আধুনিকতায় বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল উৎস ও অনুপ্রেরণা।

তাঁর চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল দু'টি—ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক।

১. ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাধারা : ধর্মীয় শিক্ষা ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোকে আফগানির দার্শনিক চিন্তাধারার মূল ভিত রচিত হয়। তিনি মনে করেন, সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় চিন্তা প্রগতির অন্তরায় নয়, বরং সহায়ক। এই চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি তাঁর সমকালীন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বস্তুবাদী ও জড়বাদী দার্শনিক চিন্তাধারার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি নাস্তিকতাবাদী ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ধর্মই মানুষকে প্রকৃত ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি এনে দিতে পারে। এমনকি মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিও নির্ভর করে তার নৈতিক আচরণ ও সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় অনুশীলনের উপর।

www.pathagar.com

আফগানি সংস্কারমুক্ত ও ধর্মীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, ধর্ম কেবল এক অতি-প্রাকৃতিক (super natural) সত্তায় বিশ্বাসী নয়। তিনি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন যে, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস যথার্থ প্রমাণ ও বিচার-বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ধর্ম বলতে তিনি কোনো কল্পনাপ্রসূত বা বিচার বুদ্ধিহীন চিন্তা বা বিশ্বাসকে অর্থ করেন নি। তিনি বলেন, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বই এখানে যে, ইসলাম মানুষের চিন্তা বা বিচারবুদ্ধির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলাম অর অনুসারীদের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মের সত্যকে উপলব্ধি করার অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ধর্মীয় ব্যাপারে আফগানির মনোভাব অনেকটা মুতাযিলাদের মতবাদের অনুরূপ।

ইচ্ছার স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণবাদ (determinism) বিষয়েও আফগানি মুতাযিলাদের মতবাদের অনুরূপ মতবাদ ব্যক্ত করেন। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে তার ধর্মবিশ্বাস সুসংবদ্ধ হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। স্বাধীন ইচ্ছার কারণেই মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে সংস্কারমুক্ত ধর্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় নৈতিক শক্তি বা অনুপ্রেরণা। স্বাধীন ইচ্ছা মনের চিন্তাশক্তির অভিব্যক্তি ঘটায়। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণবাদ ইসলামের মূল ভাবধারার পরিপন্থী এবং মানুষের চিন্তা বিকাশের পথে অন্তরায়। নিয়ন্ত্রণবাদের অর্থ হচ্ছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণ। মুসলিম চিন্তাধারায় এই ধরনের ভাবধারার অনুপ্রবেশই মুসলমানদের দীর্ঘকাল পশ্চাতমুখি করে রেখেছে বলে আফগানি মনে করেন।

আফগানি ধর্মশিক্ষার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করেন : এক, ধর্মশিক্ষার দ্বারা মানুষ এই উপলব্ধি করতে পারে যে, ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে সে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণ ও গুণের অধিকারী হতে পারে। এবং এই গুণের জন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে অভিহিত করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষার কারণেই মানুষ তার জীববৃত্তিকে দমন করে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সমাজে পারস্পরিক শান্তি ও সহাযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যে দেশ ও জাতি এইসত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে সেই দেশ ও জাতি ততই উন্নতি লাভ করেছে। দুই, ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, সহনশীলতা সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায়ের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন, ধর্ম মানুষকে নৈতিক ও মানসিক গুণাবলি অর্জনে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং এসব গুণ অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত মানুষরূপে সমাজে পরিগণিত হয়।

২. রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা : রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন, উন্নতি ও অবনতির পেছনে ধর্মীয় বিশ্বাস কাজ করে বলে আফগানি মনে করেন। ধর্মবিশ্বাসের ফলেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতি হওয়া সত্ত্বেও গ্রিকগণ পারস্য সমাজকে রোধ করতে ও পরবর্তীতে পরাভূত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু, এরপর গ্রিকদের মেধ্য এপিকিউরীয় বস্তুবাদী ও সুখবাদী ধারণা প্রবেশ করলে গ্রিকদের মধ্যে অবক্ষয় সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে রোমানগণ তাঁদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। অনুরূপভাবে, পারসিকদের ন্যায় আবার রোমানদের পতন হয় এবং আরবদের নিকট নতিস্বীকার করতে হয়। এইভাবে

আফগানি মুসলিম জাতির পতনের মূলে ধর্মীয় ও নৈতিকতার অবক্ষয় কাজ করছে বলে প্রদর্শন করেন। দশ শতকে ইসমাঈলি সম্প্রদায়ের বাতেনি শিক্ষার আড়ালে আবার বস্তুবাদের উদ্ভব ঘটে মুসলিম সমাজে—ফলে ২০০ থেকে ৩০০ বৎসর পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়।

ইউরোপের উত্থান-পতনের মধ্যেও আফগানি বস্তুবাদী চেতনাকে দায়ী করেন। ধর্মবিশ্বাসকে উপেক্ষা করার কারণেই আঠারো শতকে ফ্রান্সে রুশো ও ভলটেয়ারের নেতৃত্বে বিপ্লব সূচিত হয় বলে আফগানি মনে করেন। স্রষ্টার কর্মশক্তির ব্যাপারে অজ্ঞেয়তাবাদী ধারণা পোষণ করার ফলে ফরাসি জাতিকে অবক্ষয় ও অধঃপতনের কলঙ্ক বয়ে বেড়াতে হয়।

আফগানি সাম্যবাদীদের নাস্তিকবাদী ও ধর্মবিরোধী চিন্তাধারাকে মানবজাতির শান্তি ও তার অস্তিত্বের পরিপন্থী বলে মনে করেন। আফগানি বস্তুবাদী সাম্যবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করেন ইসলাম ধর্মেই আদর্শ সমাজতন্ত্রের বীজ অন্তর্নিহিত রয়েছে। ইসলাম ধর্মের যথার্থ অনুশীলনের মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজতন্ত্রের আসল রূপ। ইসলামই মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে আনে এবং সকল মানুষের সকল অধিকার বোধ জাগিয়ে তোলে।

আফগানি একজন প্রগতিবাদী মুসলিম চিন্তাবিদ তবে তিনি ধর্মহীনতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রগতিতে বিশ্বাসী একজন ধর্মপরায়ণ মুসলিম চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁকে অভিহিত করা যায়। আর এই কারণেই বোধ হয় তিনি আধুনিকি ধর্মসংস্কারক ও মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে সুবিদিত। তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলমানদের জন্য এক বিশ্ব কল্যাণ রাষ্ট্রের সৃষ্টি। তাঁর এই আকঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ লাভ না করলেও ঔপনিবেশিক কবল থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্ত করার পথে প্রভূত সহায়তা দান করেছে। "প্রগতিবিরোধী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম এবং পাশ্চাত্য জড়বাদী শক্তিসমূহকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে তিনি যে দার্শনিক যুক্তি ও সুগভীর নীতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা কোনোমতেই উপেক্ষণীয় নয়!" (ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন)। মানব জাতির উন্নতি ও প্রগতির পক্ষে-ধর্মের কার্যকর ভূমিকা প্রশংসিত না হলেও ধর্মের ক্রিয়াশীল ব্যাখ্যায় ও ইতিহাস-দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

মুফতি আবদুহ

জামালউদ্দিন আফগানি প্রদত্ত সংস্কারকর্মের ধারা অব্যাহত রাখেন তাঁর উপযুক্ত অনুগামী মুফতি আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫)। তিনি মিশরের অধিবাসী। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, প্রতিভাবসম্পন্ন লেখক ও বিশিষ্ট সংস্কারক। তাঁর সংস্কার কর্মসূচিকে তিনি চারটি শিরোনামে বিভক্ত করেন : এক, ইসলামকে সমস্ত দোষণীয় প্রভাব ও অশুভ আচরণ থেকে মুক্ত করা; দুই, পরিবর্তিত ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা; তিন, আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে ইসলামি মতবাদসমূহকে পুণর্ব্যাখ্যা করা; এবং চার, বিদেশী সমালোচনা ও প্রভাব থেকে ইসলামকে তাঁর স্বরূপে ফিরিয়ে আনা।

www.pathagar.com

প্রথমত, মুসলিমগণ তাদের আদি ইসলাম থেকে সরে গেছে—এ কথাটা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এই কারণেই ইসলামি মতবাদসমূহকে শুদ্ধিকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যেকোনো উপায়েই হোক পাপ ও অশুভ যা ইসলামে প্রবেশ করেছে তাকে রোধ করতে হবে। ইসলামকে বিশুদ্ধকরণ আন্দোলন রক্ষণশীল দলের সমর্থন লাভ করে। পিরের কার্যকলাপ এবং অন্যান্য অনৈসলামিক আচরণ, যেমন সাধকদের কবরপূজা এবং তাদের উরস পালন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সাধারণভাবে সাধকদের উপর যে অলৌকিত্ব আরোপ করা হয় তা' বহু লোক অবিশ্বাস করতে থাকে। তকলিদ বা কর্তৃত্বকে বিনাবিচারে গ্রহণ করার প্রবণতারও বিরোধিতা করা হয়। এর ফলে আধুনিক মুসলিম যুবসমাজে এক দৃঢ় বিচারমূলক মনোভাব গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, মুফতি দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির পুনর্বিন্যাস ও পুনঃসংস্কারের প্রয়াস চালান। তিনি আধুনিকতার আলোকে ইসলামের মূল্যবোধকে পুনর্ব্যাখা ও পুনর্গঠিত করেন। তিনি অভিমত পোষণ করেন যে, উন্নতিশীল জগতে বাস করে সেকেলে মধ্যযুগীয় ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরে রাখা মুসলমানদের জন্য আত্মহত্যার স্বরূপ। তাই তিনি পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মিশরের শিক্ষাপদ্ধতির পুনর্গঠন করা হয়। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পরিবর্তন করা হয় এবং এতে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়। বিশ শতকের প্রারম্ভে শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম জগতের যুবসমাজ ব্যাপকহারে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রাকশ করে।

তৃতীয়ত, ইসলাম স্থবিরের বিপরীতে গতিশীল মূল্যবোধের স্বীকৃতি দেয়—মুফতি এই ধরনের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির আলোকে পুরাতন মূল্যবোধকে পুনর্ব্যাখ্যা করা প্রতিটি মুসলমানেরই প্রাথমিক দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন। সুতরাং, সময় এসেছে ধর্মীয় মূল্যবোধের এক গতিশীল ও বিবর্তনীয় মতবাদের। কালের অগ্রগতিতে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে, যুগের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে নতুন কৌশল আবিষ্কার করা মুসলমানদের কর্তব্য।

চতুর্থত, ধর্মের যৌক্তিক ভিত্তি অনুসন্ধান করার জন্য মুফতি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন। ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধির জন্য তাদের ইসলামি মতবাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আধুনিক শিক্ষার আলোকে ইসলামকে পুনর্ব্যাখ্যা করার উপর তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যরা ইসলাম সম্পর্কে কি মন্তব্য করে আলেম সমাজ সে বিষয়ে অজ্ঞাত। কারণ, ধর্মতত্ত্ব বিকাশে তারা কোনো অবদান রাখেন নি। কিন্তু পাশ্চাত্যে দেখা যায় যে, ধর্মতত্ত্ব বিকাশের জন্য মিশনারিগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু ইসলামে এই কার্যটিই সাধিত হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নয় গোঁড়া বা রক্ষণশীল আলেমদের দ্বারা নয়। এই পুনর্জাগরণমূলক শুদ্ধাচারবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রসার মুসলমানদের মধ্যে কিছু বুদ্ধিবাদীর আবির্ভাব ঘটিয়েছে। সাম্প্রতিক শিক্ষার আলোকে ইসলামকে আধুনিকীকরণই তাদের লক্ষ্য। রক্ষণশীল শ্রেণীর ন্যায় তারাও বিভিন্ন অনৈসলামি অনুষ্ঠানের বিরোধী।

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে তিন শ্রেণী

অধ্যাপক গিব সমকালীন মুসলমানদের প্রগতিশীল, রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

প্রগতিশীল শ্রেণী

স্বল্পসংখ্যক প্রগতিশীলদের লক্ষ্য হলো বিজ্ঞানের সম্ভাবনাসমূহের সদ্ব্যবহার করে এমন এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক্ষায় থাকা যেখানে সারা বিশ্ব একটি জাতিতে সংগঠিত হবে এবং প্রতিটি ব্যক্তি সমানভাবে ভোগ করবে আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সব অধিকার। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর প্রভুত্ব অর্জন করতে হবে। উচ্চতর মূল্যমান ও মূল্যবোধের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটার জন্যে জগৎকে সংগঠিত করতে হবে। জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ তার চরিত্র, আত্মবিশ্বাস, সংকল্প, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ও কর্মতৎপরতা সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করবে। এক উৎকৃষ্ট জগৎ নির্মাণের কাজে তার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে। ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে মানবতার কল্যাণে কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সমাজ গঠনে তাকে কর্মতৎপর থাকতে হবে। একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা যায় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। শিক্ষা সম্পর্কিত তাদের ধারণা অন্যদের ধারণার চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্নতর। শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র ইসলামের পুরানো আইনসমূহের সঙ্গে নিছক পরিচয়কে বোঝায় না বরং তাদের ধারণায় শিক্ষা এমন একটি স্থায়ী সমাধান পদ্ধতি যা সমকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতির বেলায় প্রযোজ্য। পূর্বজ্ঞাত বিষয়সমূহকে সমাবিষ্ট করার প্রক্রিয়া হিসেবে জ্ঞানের পুরোনো ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে জ্ঞান মাত্রই অজ্ঞাত বিষয়ে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করেছিল যা গৃহীত জ্ঞান ব্যবস্থায় কোনো কিছুকেই পুরানো বলে প্রত্যাখ্যান ও অপ্রমাণ করা চলবে না, এবং আগে থেকেই সত্য বলে গৃহীত কোনো ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এমন কোনো ধারণাকেও সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে না। পুরোনো পদ্ধতিতে জ্ঞানকে যেভাবে একটি বদ্ধ বৃত্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে পরিবর্তিত ধারণাবলির সঙ্গে স্বভাবতই মতানৈক্য দেখা দেয়। প্রগতিশীলরা বলেন জ্ঞান বলতে শুধু তাকেই বোঝায় না যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্বজ্ঞান থেকে অবরোহণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। জ্ঞান বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আরোহ (induction) ও পরীক্ষণকে নির্দেশ করে। প্রথম তিন হিজরি শতকের ইমামগণ কোরআনের মতবাদসমূহকে চিরদিনের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন বলে যে মতবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা সূচিত করেন এর প্রায়োগিক উদ্দীপনা এবং বিভিন্ন অনুশাসন ও যাগযজ্ঞের স্বাধীন বিচারের। তাঁরা মূল উৎসসমূহের নতুন কোনো অনুসন্ধান অনাবশ্যক বলে যে ধারণা ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তা নাকচ করে দেন।

এ মনোভাব আধুনিক মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। ফলে শিক্ষিত মহলে জীবনের পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে পুরানো জ্ঞানসমূহের অনুসন্ধান করার প্রেরণা দেখা দিয়েছে। চিন্তার নতুন প্রসার ও অভিব্যক্তির অনুশীলন ও পর্যালোচনাকে তারা একটি পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করেন। সব নতুন নতুন ধারণা পূর্ব থেকেই কোরআনে বর্তমান ছিল, তারা এ-ও দেখাতে চান।

www.pathagar.com

প্রগতিশীলরা আরও মনে করেন যে, জ্ঞান বলতে শুধু মানুষের জ্ঞাত বিষয়কেই বোঝায় না, বরং এখনো যা মানুষের অজ্ঞাত রয়েছে তাকেও বোঝায়। একে শুধু বই-পুস্তক অনুশীলনের মাধ্যমে নয়, বরং স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারাও জানা যায়। স্বাধীন ও প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে অজ্ঞাতকে জানার প্রচেষ্টা প্রত্যেক মানুষের থাকা উচিত।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গোঁড়ামির অনুকরণ এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালনে যান্ত্রিক মানসিকতাকে ইসলাম সমালোচনা করেছে এবং গোঁড়া কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল শাস্তি হওয়ার জন্য নয়। বিজ্ঞান ও জ্ঞান (বিশ্বের বিজ্ঞান ও পূর্ব বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান)-এর মাধ্যমে নিজেকে পরিচালিত করার শক্তি মানুষের নিজের মধ্যেই ছিল। ইসলাম আমাদেরকে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, সেগুলোর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি থেকে মুক্ত করে এবং দেখিয়ে দেয় যে, সময়ের দিক থেকে শুধু পূর্ববর্তিতা বুদ্ধির প্রামাণিকতা অথবা জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করে না। আবার এ-ও বলে না যে, বিচারশীল দক্ষতায় এবং প্রাকৃতিক ক্ষমতায় পূর্ব ও উত্তরপুরুষেরা একই রকম। এভাবে ইসলাম বুদ্ধিকে সবরকম শৃঙ্খলা থেকে ফিরিয়ে আনে। এবং তাকে সেই স্থানে পুনর্বাসিত করে, যেখানে তা তার নিজস্ব বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অবশ্য তা নিজেকে বিনয়াবনত করবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনে এবং বিশ্বাস নির্দেশিত সীমানায় এসে থামবে। বুদ্ধির অধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদানকারী এ ধরনের রচনা শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে পুরানো মূল্যবোধ পুনঃপরীক্ষার এক নবপ্রেরণা সৃষ্টি করে এবং বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনো বিভাগ থাকার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে তারা বলেন, মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুশীলন এবং এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা। এ মনোভাব আধুনিক শিক্ষিত মহলে প্রায়োগিক ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরুজ্জীবিত ও জোরদার করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্রিষ্টানরা বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে যে চমৎকার অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছিল তার পশ্চাতে ছিল এ ধরনের গতিশীল ও প্রায়োগিক ভাবধারার বিকাশ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুসলমানদের ঐতিহ্যপূর্ণ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কথা, এবং সে সাক্ষ্য থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক মহান ঐতিহ্যের অধিকারী মুসলমানরা পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পুনরায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

রক্ষণশীল শ্রেণী

ধর্মীয় মতাবলীর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে অনাগ্রহী প্রগতিবিমুখ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিপুল সমর্থক আজও পলিক্ষিত হয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ধর্মীয় সত্য সবদেশে সবসময় প্রযোজ্য। রক্ষণশীল শ্রেণী, পরিবর্তিত মতাবদগুলোকে শয়তানের প্ররোচনাধীন পথভ্রষ্ট মনের মিথ্যা কল্পনা বলে মনে করে। হাজার বছর পূর্বে তাদের পূর্বসূরির ও গ্রিকদর্শনের বিপক্ষে তাদের মতবাদ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের দৃঢ় ধারণা এবং বলিষ্ঠ

www.pathagar.com

ঘোষণা, ইসলামের কোনো পুনর্ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এর শিক্ষাসমূহের গতিশীল ব্যাখ্যাও অনাবশ্যক। কারণ, তারা বলে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ স্বর্গীয় জীবনবিধান এবং ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করবে। সুতরাং তারা নিশ্চিত যে, সমকালীন বস্তুবাদী ভাবধারাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

এ ধরনের রক্ষণশীল শ্রেণী আধুনিক বিজ্ঞানের শুধু বস্তুবাদী দিক ও অভিশাপসমূহকে দেখে, কিন্তু এর আশীর্বাদকে উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ, তারা খণ্ডিত শিক্ষা, বিজ্ঞান, ও ইতিহাসের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। অথচ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল ভোগ করতে তারা বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে না। জাগতিক শিক্ষাবিরোধী ওলামা সমাজ আজকাল ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠাচ্ছেন। কারণ এই যে, সম্পদ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে ওল্ড স্কিম (old scheme) মাদ্রাসার স্নাতকরা ভালো চাকুরির সুযোগ পায় না। সময়ের প্রয়োজনে প্রাচীনপন্থী মাদ্রাসাসমূহ সংখ্যায় হ্রাস পেয়ে নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। এ ধরনের নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পরিবর্তিত পাঠক্রমের কল্যাণে পরিস্থিতির মোট প্রয়োজনের অন্তত অর্ধেক হলেও মিটিয়েছে এবং ক্রমশ তাদের পাঠক্রমকে পার্থিব (secular) স্কুল ও কলেজের পাঠক্রমের সঙ্গে সমন্বিত করেছে।

উদারপন্থী শ্রেণী

এই শ্রেণীটির অবস্থান রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের মাঝখানে। অসংজ্ঞায়িত অশ্রেণীবিভক্ত ও স্থিতিস্থাপক তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তারা বিদ্যমান ধর্মীয় চিন্তার প্রতি ছিলেন অসন্তুষ্ট এবং সামাজিক সংস্কারে ছিলেন আশাবাদী। প্রচলিত মতবাদসমূহের প্রতি আস্থাশীল হলেও তারা ছিলেন প্রগতিশীল। এ অর্থে তাদের মধ্যে দ্বৈত মানসিকতা বিদ্যমান। অন্যকথায়, এক মানসিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় তারা প্রগতি সম্পর্কে তাদের ধারণাসমূহকে ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে আলাদা রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তারা কখনো চেষ্টা করেন নি তাদের ধারণাবলী একীভূত ও সম্বন্ধযুক্ত হোক। এবং এ কারণেই তারা এক বিভ্রান্তিজনক অবস্থায় আছেন। তারা ধর্মকে আভ্যন্তরীণ দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা সমর্থন করেন না বরং ধর্মকে তারা অনেকটা বহিরাঙ্গিক বলে মনে করেন। তারা ভেতরে অনুসন্ধান করেন ধর্মীয় মূল্যবোধ আর আধুনিক শিক্ষার অনুশীলন করেন বাইরে। তবে তাদের অনুশীলন যে আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার পরও তারা তাদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন না।

মিশরীয় তুর্কি নবজাগরণ

আরব, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে প্রগতিশীল ভাবধারা কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে পারে নি, কারণ আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন দ্বারা তারা খুব বেশি প্রভাবিত হয় নি। সময় ও জীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থা তাদেরকে ততটা প্রভাবিত করে নি।

মিশরীয় শিক্ষিত যুবকদের মনকে আলোড়িত করেছিল বির্তনবাদ, আপেক্ষিকতা মতবাদ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির ঐতিহাসিক ভাবধারা। এজন্যই সে দেশের যুবসমাজ গতিশীল ধারণা ও নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে পুরানো শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও বিধানসমূহের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াসী। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক শিক্ষা

www.pathagar.com

পদ্ধতির প্রবর্তন করে এবং এর পাঠক্রমে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি সংযোজিত করে পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং পরলৌকিক মানসিকতার স্থলে বস্তুবাদী মানসিকতার উদ্বোধন ঘটায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নব প্রতিষ্ঠিত একটি ওলামা কাউন্সিল প্রামাণিক হাদিস থেকে অপ্রামাণিক হাদিসমূহকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পৃথক করার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়।

একই ভাবধারায় প্রভাবিত তুরস্কে মোস্তফা কামাল শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করে ধর্মের নামে সব অপচিন্তা ও ভুল ধারণার অবলুপ্তি ঘটান। তুরস্কের জাতীয় কবি জিয়া গাক আলপ বলেন, যেহেতু অনেক জিনিস বদলে গেছে এবং মানুষ আজ অনেক নতুন সমস্যায় ও পরিস্থিতির সম্মুখীন, সেজন্যই তার উচিত সময়োপযোগী নতুন পদ্ধতির অনুশীলন করা এবং জীবনে যথার্থ আদর্শ অর্জন করা। বস্তুত আজকের দিনের এক বড় প্রয়োজন নতুন অভিজ্ঞতা ও চিন্তার আলোকে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের পুনর্বিশ্লেষণ করা। সময়ের চাকায় আবর্তিত কোনো আইনকানুনই অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। পুরনো স্থবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে মূল্যবোধ সংক্রান্ত প্রগতিশীল ধারণার প্রবর্তনই স্বাভাবিক ব্যাপার। সমকালীন বস্তুবাদী ভাবধারার আলোকে তালাক ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের নতুন ব্যাখ্যা দেয়া হলো এবং প্রবর্তন করা হলো মাতৃভাষায় নামাজ পড়ার নিয়ম। ইসলামের ইজতিহাদ (বিচার) নীতিতে পুনর্মূল্যায়নের অনুমোদন রয়েছে। একই যুক্তিতে জীবনের নতুন মূল্যবোধের আলোকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুর্ণবিন্যাস করার এক প্রচেষ্টাও সূচিত হয়। তুর্কির এই কবির মতে, নারী-পুরুষ সমমর্যাদাসম্পন্ন নাহলে সমাজের উন্নতি অকল্পনীয়। সুতরাং মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ এবং সর্বাত্মক আধ্যাত্মিক ও পার্থিব প্রগতির লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষার স্বাধীন সুযোগ ও পুরুষদের সমান সুবিধা দিতে হবে। তদের স্বাধীনতা ও সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সমাজের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এ মহান কবি ঘোষণা করেন যে, জীবনের প্রতি স্তরে সত্যের স্বাধীন অনুশীলনকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। একথা স্বীকৃত সত্য যে, ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে হৃদয়ের আধ্যাত্মিকায়ন এবং জৈব প্রবৃত্তিসমূহের স্বর্গীয় গুণাবলিতে রূপান্তরণ। ধর্ম তার ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করে তখন যখন মানুষ সত্যের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করে এবং এর আধ্যাত্মিক ধারণাবলী সজ্জিত থাকে নিজেদের মাতৃভাষায়। অর্থহীনভাবে যাগযজ্ঞের অন্ধ অনুশীলন কিংবা কোরআনের বাণীসমূহের কোনো আবৃত্তি খুব একটা সুফল বয়ে আনে না। এখানে উল্লেখ্য যে, এই একই প্রেরণায় মুসলিম স্পেনের ইবনে আর্তকে (জাতীয়তার দিক থেকে বেবের ছিলেন) অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে কোরআনকে বেবের ভাষায় অনুবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে সময় আযান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজ জনগণের মাতৃভাষায় সম্পন্ন করা হতো।

সৈয়দ আহমদ খান

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ভারতীয় উপমাহদেশ এই প্রগতিশীল মুসলিম আন্দোলনের একটি সক্রিয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) এ

www.pathagar.com

আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। মুসলমানদের ক্রমপতনশীল অনৈসলামি ভাবধারার বিরুদ্ধে একজন দূরদর্শী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তিনি এগিয়ে আসেন। ১৮৭৫ সালে তিনি আলিগড়ে ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে এটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জীবনের গতিশীল পরিস্থিতির জন্য চিন্তা ও আচরণের পুরানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল অপর্যাপ্ত। তাই তার মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় শিক্ষাকে আধুনিক পার্থিব শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা। তার মতে, প্রকৃত ইসলাম প্রগতি ও জীবনের বৌদ্ধিক দৃষ্টির অন্তরায় নয়। তিনি প্রকৃতিকে সব অলৌকিক উপরকণ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস পান। এজন্যই তিনি সম্পূর্ণ নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির পরিবর্তে পুরানো মূল্যবোধকে নতুন মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও সমন্বিত করার প্রচেষ্টা চালান।

দু'টি শিরোনামে তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক মতকে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, তিনি যুক্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ইসলামের একমাত্র নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক হিসাবে কোরআনকে নির্ধারিত করে অন্যসব কিছুকে এর উপর নির্ভরশীল মনে করেন, এবং সে কারণে কোরআনকে তিনি মুখ্য গুরুত্বের অধিকারী বলে মনে করতেন। যে সমস্ত রক্ষণশীল অনৈসলামি ভাবধারাকে কেন্দ্র করে নানারকম অবাঞ্ছিত ধারণা ও আচার ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছিল সেগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে তিনি কোরআনের বিধি-বিধানকে অবলম্বন করে এক নতুন প্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হন এবং যুক্তি ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে আবির্ভূত নতুন মূল্যবোধ আবিষ্কারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাধিকার (তাকলিদ) ও স্থবির মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বিতীয়ত, যুক্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে কোরআনের মিল প্রমাণের কাজে লিপ্ত হলেন। তিনি কোরআনকে ধর্মের ক্ষেত্রে এক সিদ্ধান্তমূলক অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে স্বর্গীয় সত্তার প্রমাণ হিসেবে যে অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক বিষয়াদি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। কোরআনের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সব অপব্যাখ্যা এবং প্রজ্ঞা ও প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের সঙ্গে সমন্বিত করা যায় না এমনসব অনাচারকে অনাবশ্যক উপলেপ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ্‌র বাণীকে আল্লাহ্‌র কাজ দ্বারা ব্যাখ্যা করা। ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যের মানদণ্ড একমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতাই। এজন্যই সৈয়দ আহমদকে প্রকৃতিবাদী বলা হয়। প্রজ্ঞা ও প্রকৃতির সঙ্গে কোআনের সামঞ্জস্য প্রমাণের জন্য তিনি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এভাবেই তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে পার্থিব শিক্ষার পথিকৃৎ এবং প্রগতিশীল ধারণাবলীর অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। প্রথম পর্যায়ে তাঁকে ধর্মবিরোধী বলে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ক্রমশ তিনি জনগণের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হন। কারণ, তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন ধর্ম হিসাবে ইসলাম প্রগতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ইসলাম জীবনের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের পথ ও পন্থা গ্রহণের পক্ষে খুবই উপযোগী। তিনি বলেন, কোরআন আধ্যাত্মিক অগ্রগতি, স্বাধীন

www.pathagar.com

চিন্তা এবং জীবনের গতিশীল ধারণাবলী সংযোজনের পথে কোনো অন্তরায় নয়। বরং কোরআন মানুষকে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব অগ্রগতির জন্য কঠোর পরিশ্রমের নির্দেশ দেয়।

মাহ্দী আলী

সৈয়দ মাহদী আলী (১৮৩৭-১৯০৭) আরেকজন বিশিষ্ট প্রবক্তা ও অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি জীবনের গতিশীল অবস্থার জন্য ইসলামের মতাবলীকে সংগতিপূর্ণ করার জোর প্রায়াস চালান। তিনি মহসিন-উল-মুলক নামে সমধিক পরিচিত। তিনিও অনুপ্রেরণা দেন মুসলমানদের সেইসব পার্থিব শিক্ষার যা অতীতে তাদের পূর্বসূরিদের গৌরবের উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। একমাত্র শিক্ষাই পারে ধর্মের পথ থেকে কুসংস্কার ও অপব্যাখ্যা দূর করতে। এই কারণে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে তিনি জনগণকে অনুপ্রাণিত করেন।

সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলী একজন বলিষ্ঠ মুসলিম চিন্তাবিদ। তাঁর আবির্ভাবকাল ১৮৪৯-১৯২৮। তিনি এতদঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁর পূর্বসুরিদের মতো তিনিও ধর্মের কিছু সংস্কারের সুপারিশ করে বলেন, ইসলামে যেসব কুসংস্কার ও অনৈসলামি ভাবধারা বিরাজমান ছিল সেগুলো ধর্মের মূল বিষয় নয়; বরং এগুলো এমন কিছু অনভিপ্রেত বাহুল্য প্রথা, যেগুলো জনগণের পথভ্রষ্টতার সুযোগে ইসলামে অনুপ্রবেশ করে। তাঁর মতে, ইসলাম এমন একটি সংস্কারধর্মী সরল ধর্ম যার মূল কথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও মোহাম্মদ (স:) এর নবুয়তে বিশ্বাস। মুসলমানরা তখনই ইসলামের গতিশীল মর্ম উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয় যখন তারা আলস্য, অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কাল্পনিক অদৃষ্টবাদে ব্যাপকভাবে বিশ্বস্ত হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য নিয়ত সংগ্রাম আর অনন্ত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। কোরআনেই মানুষকে সে অনুপ্রেরণা প্রদান করে আন্তরিকভাবে সংগ্রাম করার। এভাবেই সৈয়দ আমীর আলী নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসবাদী মনোভাবের পরিবর্তে কর্মবাদ (activism)-কে ইসলামের মূলশিক্ষা বলে প্রচার করেন।

ইসলামের এই সংস্কারধর্মী চিন্তাধারাসমূহ আরো অনেক বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদের রচনায় প্রতিফলিত হতে থাকে। তিনটি প্রধান নীতির উপর তাঁরা তাঁদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমত, ইসলাম একটি প্রগতিবাদী ধর্ম যা মানুষকে সভ্যতার আলোকে আলোকিত করার এক সুমহান শক্তি। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও মহানবি (স:)-কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে বর্ণনা করা হয়। হযরত মোহাম্মদ (স:)-এর মধ্যে মানবীয় সদ্‌গুণাবলির প্রত্যেকটি বর্তমান ছিল এবং তিনি ছিলেন এই পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তৃতীয়ত, ধর্ম হিসাবে ইসলাম প্রজ্ঞা ও প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। ইসলাম অতিপ্রাকৃত কাল্পনিক উপাদানকে কখনোই স্বীকৃতি দেয় না, অলৌকিক কুসংস্কার কোনো শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হতে পারে না।

www.pathagar.com

ইকবাল
(১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রি.)

ক. ভূমিকা

আল্লামা মোহাম্মদ ইকবালের জন্ম পাঞ্জাবের শিয়ালকোট শহরে। তাঁর জন্মতারিখ ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি। তাঁর পূর্বপুরুষ কাশ্মিরি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

ইকবাল ছিলেন একজন মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এফ. এ. পরীক্ষা পাস করেন। উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি লাহোর গমন করেন এবং সেখানে তিনি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ টি. এইচ. আরনল্ড-এর সাহচর্যে আসেন। ১৮৯৭ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লাহোর সরকারি কলেজে ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে তিনি সুবিখ্যাত দার্শনিক ম্যাকটেগার্ট-এর সংস্পর্শে আসেন। তিনি জার্মানির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পারস্য দর্শন সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধ লিখে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর নিবন্ধের নাম ছিল "Development of Metaphysics in Persia" এ সময় তিনি ইসলাম সম্বন্ধে ছয়টি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ব্যারিস্টারিও পাস করেন।

কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তাবিদ ইকবাল একাধারে কবি ও দার্শনিক উভয়ই। ইউরোপে প্রবাসকালে তাঁর ভাব ও চিন্তারাজ্যে যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনের উপর ছয়টি ভাষণ' গ্রন্থে তিনি ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের পুনর্ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। শিক্ষিত সকল মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক তাঁর এ ভাবধারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয় এবং বিপুল সাড়া জাগায়। তিনি তাঁর চিন্তাধারায় এশিয়াবাসীদের ভাবুকতার সাথে ইউরোপীয় কর্মতৎপরতার সংযোগ সাধন করেন। তাঁর দার্শনিক মূল বিষয় ছিল বিশ্ব ইসলামবাদ (Pan-Islamism)।[১] তিনি ইসলামকে সমকালীন দর্শনের সঙ্গে সমন্বয় করার জোর প্রচেষ্টা চালান এবং ইসলাম প্রচারকে তিনি আধুনিক চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করেন। জাড্য নিষ্ক্রিয় ও বৈরাগ্য জীবনের পরিবর্তে তিনি মুসলমানদেরকে

www.pathagar.com

কর্মতৎপর জীবন পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তিনি তাঁদেরকে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠনের পরামর্শ দেন এবং অতীতের অলসতাকে ঝেড়ে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি এমন এক সমাজবাদ প্রচার করেন যা ইসলামি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন একটি আদর্শ সমাজ গঠনই তাঁর লক্ষ্য যার মধ্যে সকল মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিকাশ ঘটাবার সুযোগ পাবে। দু'টো বিশেষ উৎস থেকে তিনি এ প্রেরণা লাভ করেন : এক, পবিত্র কোরআন, হাদিস এবং জালালউদ্দিন রুমির দর্শন; দুই : উইলিয়াম জেম্‌স, নীটশে, বার্গসঁ ও অন্যান্যদের দর্শন। তিনি জাতীয় ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্ব জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন এবং এর নিয়ম-বিধি আবিষ্কার করা হচ্ছে জীবনের আর একটি লক্ষ্য। প্রকৃতির সম্পদকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ইকবাল ছিলেন একজন রহস্যবাদী দার্শনিক এবং বার্গসঁর ন্যায় তিনি স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের প্রধান উৎস বলে মনে করেন।

খ. ইকবালের দর্শনের রূপরেখা[২]

দু'টো স্তরের মধ্য দিয়ে ইকবালের দর্শন বিকশিত হয়েছে। স্বজ্ঞা-পূর্ব স্তর ও স্বজ্ঞা স্তর। প্রথম পর্যায়ে তিনি তাঁর কালের মুসলিম সমাজের অবক্ষয়ের কথা বর্ণনা করেন এবং এ পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বেশ্বরবাদী। পাশ্চাত্যে তাঁর শিক্ষা সমাপ্তির পর তাঁর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে তিনি নিষ্ক্রিয়তা, আত্ম-অস্বীকৃতি ও বৈরাগ্যের পরিবর্তে কর্মবাদ (activism) ও আত্মবিকাশকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। তিনি আত্মার বাস্তব সত্তা এবং ইচ্ছাশক্তিকে মৌল হিসেবে গ্রহণ করেন। সম্যকভাবে তাঁর দর্শন উপলব্ধি করতে গেলে এসব ধারণার অপরিহার্য বিষয়াবলীর সতর্ক ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ইকবালের দর্শনে মূলত চারটি মৌলিক ধারণা রয়েছে : যথা—স্বজ্ঞা, আত্মা, জগৎ এবং আল্লাহ্। তিনি আধুনিক দর্শন দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। কারণ, এরমধ্যে তিনি ইসলামের অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভাবের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি অবশ্য অনুধ্যানপরায়ণ গ্রিক দর্শনের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, জগৎ হচ্ছে বাস্তব। এটা ক্ষণিকের অবাস্তব প্রদর্শনী নয়। উইলিয়াম জেম্‌সের ন্যায় তিনি অভিমত পোষণ করেন যে, জগৎ উৎপাদিত এক শেষ পর্যায়ের বস্তু নয়, এটা এখনও ক্রমবর্ধমান ও বিকাশ প্রক্রিয়ারত। অভিজ্ঞতা হচ্ছে জ্ঞানের অনিবার্য উৎস। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞতামূলক; কিন্তু এটাও নির্বিচারী (dogmatic), কারণ, এটা ইন্দ্রিয়কে একমাত্র সত্তা বলে মনে করে এবং ইন্দ্রিয়ের জগতের উর্ধে কোন বাস্তব সত্তার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে না। ইকবালের মতে, ইন্দ্রিয়ের অতীত এক অতিবর্তী সত্তার জগৎ রয়েছে যা সন্দেহাতীতভাবেই বাস্তব সত্তা, কিন্তু তা-ই একমাত্র বাস্তব সত্তা নয়। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে উচ্চতর এক জগৎ রয়েছে—এ জগৎ হচ্ছে তার নিজস্ব মূল্য সম্বলিত এক আধ্যাত্মিক জগত। আধুনিক বিজ্ঞান তার জড়বাদী ভাবধারার দ্বারা সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে চায়—এমন কি জীবদেহ ও চৈতন্যকে সে যান্ত্রিক উপায়েই ব্যাখ্যা করে। এতে করে জড়বাদীগণ স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন।

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে নৈতিক ও ধর্মীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা হচ্ছে নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের অনিবার্য মূলসূত্র। মানবাত্মা কেবল অবভাস নয়, অবাস্তব ধারণামাত্র নয়, অথবা বাস্তবতাহীন শক্তিসমূহের যান্ত্রিক সমন্বয়ও নয়।

ইকবাল আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আত্মার বাস্তবতা, আত্মার স্বাধীনতা ও অমরতা সমর্থন করেন। তাঁর দর্শন মূলত ধর্মীয় ভাবাপন্ন। তিনি দর্শনকে ধর্মের যন্ত্র বা হাতিয়ার মনে করেন না। তাঁর মতে, ধর্মীয় সত্য হচ্ছে বাস্তব। শুধু অভিজ্ঞতা থেকেই নয়, স্বজ্ঞা থেকেও জ্ঞান লাভ করা যায়। পরমসত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞান, যেমন—আল্লাহ্ ও আত্মা সম্পর্কীয় জ্ঞান কেবলমাত্র স্বজ্ঞার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে, যা মানুষকে সত্তার সমগ্রতা (whole) উপলব্ধি করতে সক্ষম করে তোলে। এটা হচ্ছে এক অনুপম অভিজ্ঞতা যা কেবলমাত্র অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই লাভ করা সম্ভব। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির ন্যায় স্বজ্ঞাও জ্ঞানের একটি বৃত্তি। যদিও স্বজ্ঞা এক ধরনের অনুভূতি (feeling), তবুও এটা সম্পূর্ণ আত্মগত নয়—বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এটা জ্ঞানগত (cognitive)।[৩] ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের ন্যায় এটা আবার বস্তুগতও (objective)। আত্মা সম্পর্কীয় সত্তা পরিণামে পরমসত্তার স্বজ্ঞায় পরিচালিত হয়।

আত্মার আত্মসচেনতার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ কিছু স্বজ্ঞা-জ্ঞান লাভ করতে পারে। বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। শুধু স্বজ্ঞার মাধ্যমেই আত্মার বাস্তব সত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। পরম সত্তাকে জানার জন্য তাত্ত্বিক বুদ্ধির অক্ষমতার কথা কাণ্ট উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কেবলমাত্র ব্যবহারিক বুদ্ধি বা স্বজ্ঞার মাধ্যমেই পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। অভিজ্ঞতাবাদীদের ধারণা অনুযায়ী আত্মা শুধু সদা পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার সংগ্রহণ মাত্র নয়। আত্মার মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার ঐক্যকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। বুদ্ধি আত্মার ধারণাগত ঐক্যকে কেবল উদ্‌ঘাটন করে, বাস্তব সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই দেখা যায়, আত্মা মূলত গতিশীল, ক্রমবর্ধমান, ক্রমবিকাশমান এবং স্বরূপতই সক্রিয়।

আত্মসত্তার সম্পর্কিত স্বজ্ঞা পরিণামে আল্লাহ্‌র স্বজ্ঞায়, তাঁর অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক স্বজ্ঞায় পরিচালিত করে। আল্লাহ্‌র স্বজ্ঞা-জ্ঞান লাভ করেছেন বলে ইকবাল দাবি করেন না। তিনি কেবল এ কথাই উল্লেখ করেন যে, আত্মাসত্তার স্বজ্ঞা পরিণামে আল্লাহ্‌র স্বজ্ঞায় পরিণতি লাভ করে। স্বজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ হচ্ছেন এক সক্রিয় ও গতিশীল সত্তা—অনন্ত জীবন, আত্ম-পরিচালিত ও আত্মসচেতন শক্তি। বাইরে থেকে বস্তুকে দৈশিক বলে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্বজ্ঞায় বস্তুর দৈশিক ও কালিক আকারের উর্ধ্বে অবস্থিত তার স্বরূপকে দেখতে পায়। বিকাশমান ধারায় মানুষ প্রথম তার নিজস্ব অহং বা আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পরিণামে আল্লাহ্ সম্বন্ধে সচেতন হয়। মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অহং বা আত্মাকে বিকশিত করা।

আল্লাহ্ নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়। তাই মানুষ তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। অতিজাগতিক জীবন বলতে কিছু নেই—জীবনের জন্য কেন্দ্রবিন্দুর প্রয়োজন, অর্থাৎ মন। মন হচ্ছে জীবনের নির্দেশক কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নির্দিষ্ট আত্মার অস্তিত্বের নিষেধক নয়। আত্মা সম্পর্কীয় স্বজ্ঞা মানুষকে তার ব্যক্তিগত আত্মার

www.pathagar.com

বাস্তবতাকে তুলে ধরে এবং আল্লাহ্ একে আরো সুদৃঢ় করেন। জগতে অহমের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, কারণ বিভিন্ন মাত্রায় ব্যক্তি নিজ নিজ অহংকে বিকশিত করে। অহংবোধ যত উচ্চতর মানুষের পূর্ণতাও ততোধিক উন্নততর। অহং সম্বন্ধে চেতনা সর্বপ্রথম বিকশিত হয় মানুষের মধ্যে, তারপর এর অভিব্যক্তি ঘটে বস্তুগত জগতের চেতনা ও আল্লাহ্র চেতনাতে। অহং-এর বাস্তবতা নিয়েই ইকবালের দর্শনের শুরু এবং এটাই তাঁর দর্শনের মূল সুর।

ইকবালের দর্শনের মৌল ভাবধারা বর্ণনা করার পর এবার আমরা এর বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। প্রথমে আমরা স্বজ্ঞা[৪] এবং পরে ক্রমান্বয়ে আত্মা[৫], জগৎ[৬] এবং আল্লাহ্[৭] সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিশদ আলোচনায় অবতীর্ণ হবো।

গ. স্বজ্ঞা (Intuition)

ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪)-এর ন্যায় ইকবালও মনে করেন যে, জ্ঞানের পরিসীমা অবভাসিক জগতের (phenomena) মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ জ্ঞান আত্মগত (subjective), দেশ ও কালের আকারে পরিবেশিত এবং অতীন্দ্রিয় জগতের (noumena) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞানের সম্ভাবনা বিষয়ে তিনি কাণ্টের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মানবীয় জ্ঞানের আকার দেশ ও কাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরং মানসিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে এগুলোর অর্থও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, মনোবিকাশের উচ্চতম পর্যায়ে এমন এক ধরনের অস্তিত্ব রয়েছে যা দেশ-কাল নির্ভর স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার স্তরের উর্ধ্বে। এখানে সবকিছু অদৈশিক ও অকালিক। অস্তিত্বের এই স্তরকেই ইকবাল স্বজ্ঞা বলে অভিহিত করেছেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমরা এই স্তরের জ্ঞান লাভ করতে পারি। এ জাতীয় অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষণ বা চিন্তন (preception or thought)[৮] থেকে ভিন্নতর। এটি এমন এক ধরনের অনন্য ও অনুপম অভিজ্ঞতা যেখানে আমরা প্রত্যক্ষণ ও চিন্তনের সীমা অতিক্রম করি। এ ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা এমন এক ধরনের সত্তার সাক্ষাৎ পাই, যা ইন্দ্রিয় বা চিন্তানির্ভর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই না—ইকবাল এ অভিজ্ঞতার নাম দিয়েছেন স্বজ্ঞা। এ জাতীয় অভিজ্ঞতা অসীম এবং অপরিবর্তনীয়—অর্থাৎ এ অভিজ্ঞতা স্থায়ী। স্বজ্ঞাপ্রসূত অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ।[৯]

১. এটা হচ্ছে বাস্তবসত্তার সাক্ষাৎ অব্যবহিত (Immediate) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (direct experience)। এটা বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান থেকে ভিন্ন—বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহিত (mediate) ও পরোক্ষ (Indirect)। কিন্তু স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ। এটা আবার প্রাত্যক্ষিক (perceptual) জ্ঞান থেকেও স্বতন্ত্র। প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান অসম্পূর্ণ (fragmentary) এবং এতে সংবেদনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বজ্ঞাপ্রসূত অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি বাস্তবসত্তার সমগ্রতাকে একসঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে, যদিও সংবেদন বা ইন্দ্রিয় এতে অতি সামান্য ভূমিকা পালন করে।

২. স্বজ্ঞা হৃদয় বা অন্তঃকরণের বিশেষ গুণ এবং এ কারণেই এটা মন বা বুদ্ধির গুণ নয়। মন কেবল অবভাসিক জগতকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু হৃদয় মানুষকে বাস্তব

সত্তার সেই দিকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসে যা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের জন্য উন্মুক্ত নয়। চিন্তনে বস্তু ক্যাটাগরি বা সম্বন্ধের মাধ্যমে জ্ঞাত হয় যা ব্যক্তির দ্বারা আরোপিত। তাই চিন্তনে বস্তুর অবভাসকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তার আসল বা প্রকৃত স্বরূপকে নয়। স্বজ্ঞায় অনুভূতির মাধ্যমে বস্তুর আসল স্বরূপকে জানা যায়। যেহেতু স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই একে অন্যের নিকট পরিবাহিত করা যায় না। স্বজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও আত্মগত অভিজ্ঞতা। যদিও স্বজ্ঞা আত্মগত, তবুও এর একটি জ্ঞানমূলক দিকও রয়েছে। ফলে স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান বস্তুনিষ্ঠও বটে। সুতরাং স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত মরমি অভিজ্ঞতা বাস্তব ও অস্তিত্বধর্মী।

৩. স্বজ্ঞা একটি অবিশ্লেষণযোগ্য সমগ্র (unanalysable whole)। এর মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর (subject and object) পার্থক্য করা যায় না। কারণ, একটি অবিভাজ্য ঐক্য হিসেবে বাস্তব সত্তার সমগ্রতা এখানে উপস্থাপিত হয়।

৪. স্বজ্ঞাজাত অভিজ্ঞতায় বাস্তবসত্তা নিজেকে প্রকাশ করে এক অনুপম আত্মা অথবা ব্যক্তিসত্তা হিসেবে। এই অনন্য আত্মা অভিজ্ঞতামূলক আত্মাকে অতিক্রম করে (transcends)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অহং বা আত্মসত্তা অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয়ই। বিষয় ও বিষয়ীর সাধারণ পার্থক্য এখানে প্রযোজ্য নয়।

৫. স্বজ্ঞাজাত অভিজ্ঞতায় ক্রমিক কাল (serial time)-এর ধারণা বিলুপ্ত হয়, এবং কাল তখন স্থায়ী স্থিতিকাল (abiding duration) হিসেবে প্রকাশিত হয়।

ইকবালের স্বজ্ঞার ধারণা বার্গসঁ-এর স্বজ্ঞার ধারণা থেকে পৃথক। বার্গসঁ-এর স্বজ্ঞা হচ্ছে বৌদ্ধিক সহানুভূতি (Intellectual sympathy)। বার্গসঁ-এর মতে, স্বজ্ঞায় সব স্মৃতিবিষয়ক উপাদানকে বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু ইকবালের অভিমত হচ্ছে এ ধরনের বিয়োজনের অর্থ হবে অহমের অস্বীকৃতি। কারণ, স্মৃতির সমন্বয়ে অহমের ধারণা গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, আত্মসত্তা হচ্ছে অতীত ও বর্তমানের মানসিক অবস্থায় অনন্য আত্মসম্বন্ধ বিশেষ।

ঘ. অহম বা আত্মসত্তা (Self or ego) অথবা খুদি (Khudi) :[১০]

ইকবাল দর্শনের মূল সুর হচ্ছে খুদি, অহম বা আত্মসত্তা। এর উপরই ভিত্তি করে আছে তাঁর দর্শন-চিন্তার সমগ্র কাঠামো। তাঁর মতে, আত্মসত্তা হচ্ছে বাস্তব; এটা শক্তি ও ক্রিয়াতৎপরতার উৎস এবং এটা তাৎপর্যপূর্ণ ঐক্য বা একতা প্রদর্শন করে। আত্মসত্তা অবাস্তব নয় কিংবা বাস্তবতা বিবর্জিত অধ্যাস বা ভ্রমমূলক ধারণাও নয় যা সর্বেশ্বরবাদীগণ মনে করেন। তাঁদের মতে, আত্মসত্তা হচ্ছে চিরন্তন মনের অংশ; এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাহিত হওয়া এবং পরিণামে পরসমত্তায় বিলীন হওয়া। ভাববাদীগণ মনে করেন যে, পরমসত্তার মধ্যে নিজ ব্যক্তিসত্তাকে বিলীন হয়ে নিজ অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তাকে হারিয়ে ফেলে। এসব মত প্রত্যাখ্যান করে ইকবাল বলেন, আত্মসত্তার অস্বীকৃতি অথবা কোনো চিরন্তন সত্তায় এর নিমজ্জন হওয়া মানবজীবনের নৈতিক ও ধর্মীয় লক্ষ্য হতে পারে না। বিপরীতে, মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে কঠোর প্রচেষ্টা চালায় এবং স্বীয় মৌলিকত্ব ও অনন্যতা বিকাশের মাধ্যমে একে শক্তিশালী করে তোলে।

www.pathagar.com

"অহমের অন্বেষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি নয়, ব্যক্তিত্বের সঠিক ও যথার্থ সংজ্ঞায়নই হচ্ছে এর লক্ষ্য। মানবাত্মার সত্যিকার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের অস্বীকৃতি বা অবলুপ্তি নয়, বরং ব্যক্তিত্বের সাহসী স্বীকৃতি ও উপলব্ধি।"

অহংবোধ বা ব্যক্তিত্ব অর্জনের এই প্রবণতা শুধু মানবজীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র জীবজগতে এর প্রকাশ ঘটে চলেছে। "মানুষের মধ্যেএই অহমের পূর্ণ বিকাশ না ঘটা পর্যন্ত সমগ্র সত্তাব্যাপী এর ক্রমোন্নয়ন লক্ষ্যণীয়। জীববিজ্ঞানের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ এই সত্য উদ্ঘাটন করে যে, সজীব জীবদেহ কমবেশি জটিল ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য সংগ্রামরত। মানষের মধ্যে এই সৃজনশক্তি চরমরূপ লাভ করেছে। মানুষ এত শক্তি অর্জন করেছে যে, তার সামনে সীমাহীন বিকাশ ও স্বাধীনতার সম্ভবনা এখন উন্মুক্ত।"[১১] স্বতন্ত্র অহংবোধের অনুভূতি কতটুকু পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে সেই পরিমাপের উপর নির্ভর করে একটি বিশেষ জীবদেহের বাস্তবতার মাত্রা। তারই সত্যিকার অস্তিত্ব আছে যে বলতে পারে, আমি আছি (I am)। সত্তার মানদণ্ডে একটি বস্তুর স্থান নির্ধারিত হয় তার আমিত্ব স্বজ্ঞার মাত্রার উপর। সেজন্যই ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একটি মাত্রার ব্যাপার যা পরিপূর্ণরূপে অর্জিত হয় না—প্রতিটি বস্তুকে তার স্বীয় জীবনকালেই এর বিকাশ ঘটাতে হয়। জগৎ বিবর্তন প্রক্রিয়ারত—এর প্রতিটি বস্তুই পূর্ণতার ও সমৃদ্ধতার ব্যক্তিত্ব অর্জনে সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

অহং অভিজ্ঞতার সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র। তাই এটা বাস্তব। স্বজ্ঞার মাধ্যমে আত্মসত্তাকে উত্তমরূপে জানা ও অনুভব করা যায়। ফলে বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারে না। সিদ্ধান্ত, কর্ম ও অনুভূতির মুহূর্তে অহং সকল কার্যের কেন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষিত (perceived) হয়—তাই অহং সরাসরি প্রত্যক্ষণমূলক, অনুমানমূলক নয় (not inferential)।

অহং মনের পরিবর্তনশীল অবস্থা ও প্রক্রিয়ার স্থায়ী দ্রব্য নয়, কিংবা এদের একত্রীকরণও নয়। মানসিক অভিজ্ঞতাসমূহ পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তারা পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত। সকল অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে স্থায়ী অহমের চেতনা, অভিন্ন আত্মা (Identical self), প্রত্যক্ষণের সংশ্লেষণাত্মক ঐক্য, আমি চিন্তা করি, তাই আমি অস্তিত্বশীল—এ চেতনাবোধ এবং এরউপর নির্ভর করে আছে আমাদের অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা। এটা সকল অভিজ্ঞতাকে একত্র করে এক একক ঐক্যে পরিণত করে। একসূত্রে সংযুক্ত হয়। এভাবে আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোও এক অভিন্ন আত্মার চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত হয়—আমিত্ববোধের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিবর্তন ব্যতীত আমাদের মধ্যে পারম্পর্য রয়েছে। তাই অহম তার প্রকৃত স্বভাবেই মানসিক অবস্থার ঐক্য। এ মানসিক অবস্থাগুলো বিচ্ছিন্ন নয় বরং সম্বন্ধযুক্ত এবং একই অহমের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। দেহের বিভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু মানসিক অবস্থাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। জড়ীয় দেহ দেশে অস্তিত্বশীল, মানসিক অবস্থাগুলো কালে অস্তিত্বশীল। কিন্তু আত্মসত্তা কালে অস্তিত্বশীল হলেও এ কাল ক্রমিক কাল নয়, এ কাল হচ্ছে চিরন্তন প্রবাহ (Eternal duration)—পরিবর্তন ব্যতীত পরম্পরা (succession without change)। "প্রকৃত কাল-প্রবাহ শুধু আত্মসত্তারই থাকে।"[১২]

www.pathagar.com

অহমের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আবশ্যিক নির্জনতা বা গোপনীয়তা। সকল সজীব সত্তার মধ্যে কেবলমাত্র মানুষই অহমের সর্বোচ্চ মাত্রার বিকাশ ঘটাতে পারে। যদিও অহং অন্য অহমের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তবুও এটা আত্মকেন্দ্রিভূত এবং অন্যসব অহমকে বর্জন করে ব্যক্তিত্বের একান্ত পরিবৃত্তের অধিকারী। এই অহমের সমৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে জীবনের পূর্ণতা; অহমের নিবৃত্তিতে নয় যেমন নাকি নির্বাণ ও ফানা মতবাদে ধারণা করা হয়েছে। 'ব্যক্তিত্বের এই অপূরণীয় অনন্যতার দ্বারাই সসীম অহম তার অতীত কর্মের পরিণাম নিজেই দেখতে পারে।' সুতরাং সকল কর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে এই ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় করা এবং অবিরাম প্রচেষ্টার দ্বারা অসীম সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করা। এ কারণেই আত্মসত্তার অস্বীকৃতি ইসলামি জীবনের আদর্শ হতে পারে না।

আত্মসত্তা প্রদত্ত[১৩] কিছু নয়, কিংবা দেহসত্তার আবির্ভাবের পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না। দেহের মধ্যে থেকেই এর উদ্ভব।' তাই আত্মিক জীবনের (soul-life)-এর ভিত্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক। দেহ হচ্ছে ঘটনা বা কার্যের পদ্ধতি বা সিস্টেম, আত্মাও অনুরূপ। তাদের পার্থক্য কেবল মাত্রাগত, আকারগত নয়। অহমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততা (spontaneity)। যেসব ক্রিয়ার দ্বারা দেহ গঠিত, সেই ক্রিয়াবলি নিজেদের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এটা আত্মার অভ্যাস বা সংগৃহীত ক্রিয়া এবং এ কারণেই এটা আত্মা থেকে অবিচ্ছিন্ন নয়। এটা চৈতন্যের স্থায়ী উপাদান। তাই দেহ ও মনের মধ্যকার সম্পর্ক এক আঙ্গিক সম্পর্ক। "দেহ হচ্ছে নিম্নস্তরের উপ-অহম (sub-ego)-এর সমাবেশ যার থেকে সুবিন্যস্ত উচ্চতর অহমের উদ্ভব ঘটে। এর উদ্ভব তখনই ঘটে যখন তাদের অনুসঙ্গ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংগঠনের একটি বিশেষ মাত্রায় উপনীত হয়। এই স্তরে অহম আত্মনির্দেশনার বিকাশসাধন করে যার মধ্যে পরমসত্তা তার নিম্নতর সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়, তবুও উচ্চতর সত্তা নিম্নতর সত্তা থেকে গুণগতভাবে পৃথক। কারণ, উচ্চতর সত্তা উচ্চতর ক্ষমতা ও গুণ অর্জন করে। জৈব বিবর্তন এই সত্য উদ্ঘাটন করে যে, শুরুতে মানসিক সত্তা দৈহিক সত্তার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু, মানসিক সত্তার যখন শক্তি বৃদ্ধি হয় তখন এটা দৈহিক সত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায় এবং পরিণামে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। এই জড়ীয় জগতের সবকিছুই মানসিক এই অর্থে যে এগুলো পরমসত্তার সাথে পরিব্যাপ্ত এবং পরমসত্তা হচ্ছে মানসিক বা মননধর্মী। যে পরমসত্তা উন্মেষের উদ্ভব ঘটায় তা প্রকৃতিতে অন্তর্বর্তী (Immanent in nature)। পবিত্র কোরআনে একে দৃশ্য ও অদৃশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অহং যা বিবর্তন প্রক্রিয়ারত তা' পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত এবং এর উপর নির্ভরশীল-অর্থাৎ দেশ-কাল ও জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং দেশ ও কালের উপর নির্ভরশীল।

অহং যান্ত্রিকভাবে বর্হিপরিবেশে বা আন্তর অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অহং বরং তার ইচ্ছা, আশা এবং আদর্শের দ্বারা পরিবেশকে গঠন করে। এ কারণেই অহং একটি স্বাধীন ব্যক্তিগত কারণস্বরূপ (causality)। এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে অন্যান্য প্রাণী এবং মানুষের মধ্যকার আচরণের পার্থক্য থেকে। নিম্নতর প্রাণী সহজাতভাবে নিজেদেরকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু মানুষ তার স্বীয়

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার পরিবেশকে উপযুক্ত ছাঁচে গঠন (mould) করার প্রয়াস চালায়। পরিবেশকে প্রয়োজনীয় ছাঁচে গঠন করার প্রয়াসে এবং এর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য মানুষ স্বাধীনতা অর্জন ও সম্প্রসারণ করে এবং এর দ্বারা সে তার অহম বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। অহমের ক্রিয়াবলীতে নির্দেশনা ও নির্দেশনামূলক নিয়ন্ত্রণের উপাদান রয়েছে এবংএটাই প্রমাণ করে যে, অহম হচ্ছে স্বাধীন ব্যক্তিগত কার্যকারণ সম্বন্ধ বিশেষ। "অহং পরম অহমের স্বাধীনতা ও জীবনে অংশগ্রহণ করে। পরম অহম সসীম অহং-এর উন্মেষ ঘটানোর পথ প্রস্তুত করে এবং একে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম করে তোলে। ফলে পরম অহম স্বীয় ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সীমিত করে ফেলে।" মানুষের অগ্রগতি ও অধঃপতন যথাক্রমে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার উত্থাপতনের সঙ্গে সম্পর্কিত। জীবন মানদণ্ডের উর্ধ্বারোহণে অহমকে অবিরত ও অহ্রাসকৃত মাত্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এভাবে মানুষের মধ্যে ঐশী গুণের উদ্ভব ঘটানোর জন্য অহংকে সংগ্রাম ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

অহং মূল স্বভাবেই নির্দেশনামূলক। কারণ এটা সর্বদা এর স্বীয় অভিজ্ঞাতাকে মূল্যায়ন করে এবং কোনো দিকে বা লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। ইচ্ছা-ভাবপ্রবনতা (will-attiude) মধ্যে অহংএর জীবন অন্তর্নিহিত। জীবন ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সমার্থক। এই সৃজনীশক্তির ইচ্ছা মানব ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রোথিত। এই অহং উদ্দেশ্যমূলক (purposive)। কারণ, এর কার্যাবলি যান্ত্রিকভাবে বহিঃ বা আভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অহং যে প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হয় তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অহং প্রয়াস চালায় এবং তা করতে গিয়েই এটা এর স্বাধীন ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে অহমের ক্রিয়া বা কার্যাবলিতেই অহং-এর স্বাধীনতার প্রকাশ পায়। কার্যাবলির মাধ্যমেই আমরা আমাদের স্বাধীন কারণএবং স্বাধীন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি।

ভাগ্য বা অদৃষ্ট সম্বন্ধে কোরআনের ধারণা এ ধরনের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না। কারণ, ভাগ্য অহমের জন্য কোনো স্থিরীকৃত কর্মসূচি নয়। অহং তার নিজ ইচ্ছামত নির্বাচন ও কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। "ভাগ্য হচ্ছে অহমের আভ্যন্তরীণ লক্ষ্য ... অহং তার সম্ভাবনা, তার স্বকীয় আশা ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"

আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব প্রদত্ত (given) কিছু নয়। মানুষের মধ্যে ঐক্যনাশ প্রবণতা এবং পরিবেশের বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে একে অর্জন করতে হয়। অহমের জীবন হচ্ছে সংঘাতময় সদৃশ (tension) কারণ অহম কর্তৃক পরিবেশ বা পরিবেশ কর্তৃক অহম আক্রান্ত হয়। তাই অহং এবং পরিবেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা উচিত। পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই অহং পূর্ণতা বা সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। নির্জন ধ্যান ও অনুধ্যানের জীবন মানুষকে পরিবেশ এবং সমাজের উদ্দীপ্ত প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে মানুষ হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক। তার স্বার্থ ও সহানুভূতি হয়ে যায় সীমিত। অর্থ ও পরিবেশের মধ্যকার খাপখাওয়ানোর প্রক্রিয়া হচ্ছে একটি ধারাবাহিক ও অবিরাম প্রক্রিয়া। "শক্তিসমূহের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে জগতের গভীরতর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অংশগ্রহণ করা, নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বিভিন্ন শক্তিকে

www.pathagar.com

ছাঁচে গঠন করা মানুষের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি (fate)। অগ্রগতিশীল পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্ তার সহকর্মী হন এই শর্তে যে, মানুষ নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করে।"[১৪]

"সে যদি উদ্যোগ না নেয়, সে যদি তার সত্তার আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির উদ্ভব না ঘটায়, অগ্রগতিশীল জীবনের অন্তপ্রেরণা সে যদি অনুভব করতে না পারে, তবে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত আভ্যন্তরীণ প্রেরণা পাথরে রূপান্তরিত হয় এবং সে নিজে মৃতবৎ জড়ে পরিণত হয়ে যায়।" ব্যক্তিত্বের বিকাশ হচ্ছে সৃজনমূলক প্রক্রিয়া যার মধ্যে মানুষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অবিরাম উদ্দেশ্যমূলকভাবে সে তার পরিবেশের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। পরিবেশের নিকট তার নিজেকে সমর্পণ করা উচিত নয়।

অহং অমর। কিন্তু সে অমরত্ব অর্জন করতে হবে আত্মবিকাশ ও বিরামহীন কর্মতৎপরতার দ্বারা। ইকবাল বলেন, "অমরত্ব আমাদের জন্মগত অধিকার নয়; ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একে অর্জন করতে হবে।" কেবলমাত্র কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই মানুষ তার স্বীয় আত্মার চৈতন্যকে জাগ্রত ও শক্তিশালী করতে পারে। তাই কর্মের মাধ্যমেই মানুষ অমরত্ব অর্জন করতে সক্ষম। অনেক অলস ব্যক্তি আছেন যারা কাজ করে না; তাদের অহমের চৈতন্য নিস্তেজ হয়ে যায়। এবং এজন্য তারা কখনও স্থায়ী অস্তিত্বের অনুভূতির বিকাশ ঘটাতে পারে না।

ঙ. জড় জগৎ

বর্হিজগৎ মায়া বা অবাস্তব কোনোটাই নয়। বর্হিজগৎ বাস্তব এবং এর অস্তিত্ব আছে। প্রতিটি জ্ঞানীয় ব্যাপারে একজন বিষয়ী ও বিষয় সম্পর্কে অপরিবর্তনীয়ভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈততা প্রতিটি জ্ঞানীয় আকারের মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষ তার কার্যকলাপের মধ্যে কিছু বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে অহম ব্যতীত অন্য (other) কিছুর উপস্থিতি। প্রকৃতপক্ষে, জীবন হচ্ছে অহং ও পরিবেশের মধ্যকার অবিরাম সংগ্রাম। জড়বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনার পর ইকবাল বার্গসঁ-এর ন্যায় যুক্তি দেন যে, জড়ের প্রকৃত স্বরূপ ভাব বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ কোনোটাতেই উপলব্ধি হয় না। কেবল স্বজ্ঞার মাধ্যমেই এ উপলব্ধি হয়।

অ্যারিস্টোটলের সময় থেকেই জগতের স্বরূপকে নিশ্চল ও স্থির বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ইকবাল বদ্ধ, স্থির ও পূর্বনির্ধারিত জগৎ মতবাদের এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, এতে করে এখানে নতুন কিছু ঘটতে পারে না। জগৎ সৃজনী ক্রিয়ার ফল নয়, এর অর্থবহ বাস্তব সত্তা রয়েছে। পরিবর্তনের ঘটনা, অভিনবত্বের উন্মেষ, জগতের ক্রম-বর্ধমান ও অগ্রগতির স্বরূপকে এ পর্যন্ত উপেক্ষা করা হয়েছে। জড় সম্পর্কীয় জ্ঞান অহং-এর জ্ঞানের সদৃশে লাভ করা যেতে পারে। অহমের ন্যায় জড়ের প্রকৃতি স্বভাব কেবলমাত্র স্বজ্ঞার দ্বারাই লাভ করা যায়। স্বজ্ঞা অবস্থায় অহং বিশুদ্ধ স্থিতিকাল-এ(duration) অবস্থান করে বলে পরিলক্ষিত হয়; এটা সকল অবস্থায় পরিবর্তন ও পরম্পরাকে অতিক্রম করে (transcends) এবং 'অনন্ত এখন' (eternal now)-এ স্থায়ীত্ব (abides) লাভ করে। অনুরূপে, জগৎ-প্রক্রিয়ার সব পরিবর্তনের পশ্চাতে বাস্তবসত্তা হচ্ছে একটি জীবন, একটি স্থায়ী প্রাণশক্তি (elan-vital)। ঐশী আত্মার সঙ্গে প্রকৃতি এমনভাবে সম্পর্কিত যেমন নাকি মানবাত্মার সঙ্গে তার চরিত্র

www.pathagar.com

(character) সম্পর্কিত। অহমের অপরিহার্য প্রকৃতি হচ্ছে এর বিরামহীন ক্রিয়াপরতা। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দিয়েই এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তবে মানব প্রবণতার মধ্য দিয়ে এর সর্বোত্তম অভিব্যক্তি ঘটে—মানব প্রবণতার বিকাশ ঘটলেই একে ইচ্ছা (will) বলে অভিহিত করা হয়। সমগ্র জগৎ-প্রক্রিয়া বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে নির্দেশ করে। কিন্তু মানুষের মধ্যেই রয়েছে উত্তমভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। জীবন সংরক্ষণের জন্য মানুষ শুধু প্রচেষ্টাই করে না, সে একে উত্তমরূপেও পরিণত করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মধ্যে রয়েছে উচ্চতর থেকে আরও উচ্চতর স্তর বিকাশের অবিরাম আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে উচ্চতর মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটাবার জন্যে সে সদা ধাবমান। জীবনের স্বরূপ হচ্ছে সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ। ধর্ম, কলা, বিজ্ঞান ও নৈতিকতা শুধু ক্ষমতা অর্জনের কাজেই নিয়োজিত নয়—এদের ভিন্ন উদ্দেশ্যও রয়েছে; অর্থাৎ জীবন সমৃদ্ধিকরণ—আমিত্বের বিকাশসাধন। আমিত্ব হচ্ছে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাকে কেন্দ্র করে জীবনের সকল কার্য পরিচালিত। ব্যক্তিত্ব অর্জন হচ্ছে জীবনের প্রধান লক্ষ্য। 'যা ব্যক্তিত্বকে উৎকর্ষতা দান করে তা উত্তম; যা ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে তা মন্দ।'

সমগ্র বিশ্বে চলছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার প্রয়াস। জগৎ হচ্ছে এক মহান 'আমি'র (great I am) আত্মবিকাশ। 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা থেকে শুরু করে সর্বত্রই রয়েছে এই অহং-এর ক্রমোন্নয়ন ধারা। সমগ্র সত্তাব্যাপী বহমান আমিত্বের বিকাশের সুর—এ সুর অব্যাহতভাবে চলছেই যে পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে এর পূর্ণতা প্রাপ্তি হচ্ছে।' বিভিন্ন বস্তুর মধ্যকার পার্থক্য গুণগত নয়, মাত্রাগত। অর্থাৎ, এটা আমিত্ববোধের বিভিন্ন মাত্রাকে নির্দেশ করে। নিম্নতম পর্যায়ের আমিত্ব থেকে উদ্ভব হয় মনের আমিত্ব। দেহ ও মন বিপরীতধর্মী নয়, তারা একই শৃঙ্খলা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। উচ্চতম পর্যায়ে অহং হয়ে ওঠে আত্ম-ধারক (self-contained), স্বতন্ত্র কেন্দ্র। দেহ হচ্ছে নিম্নতর অহং-এর সমন্বয়। দেহ থেকে মনের উদ্ভব ঘটে। নিম্নতর অহংসমূহের পরিবর্তন হয়, এরা বিকাশ সাধন করে।এরা ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার কার্যের মধ্যে দিয়ে আত্মচৈতন্যের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। কর্মবিমুখতা, অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তা আমিত্বের অভিব্যক্তিকে ব্যাহত করে।

ইকবাল উদ্দেশ্যবাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যবাদ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। উদ্দেশ্যবাদ দূরবর্তী কোনো লক্ষ্য নয় যার দিকে মানুষ ধাবমান ; জীবনের সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতির সাথে সাথে নতুন লক্ষ্য, নতুন উদ্দেশ্য এবং নতুন মূল্যমানেরও অভিব্যক্তি ঘটছে। জগৎ একটি স্থির শেষপর্যায়ের প্রস্তুত বা উৎপাদিত বস্তু নয়;[১৫] জগৎ হচ্ছে একটা অবিরাম বর্ধনশীল জগৎ—এর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটছে। জগৎ হচ্ছে ইচ্ছা, চিন্তা ও উদ্দেশ্যের এক আংশিক ঐক্য। "এটা বিশৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, বিরোধধর্মী বা দুষ্কর্মের প্ররোচক নয়।" এর রয়েছে প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা উভয়ই। এটা একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবমান—কিন্তু সেই লক্ষ্য বর্তমান এবং ভবিষ্যতে একই থাকবে—তাই জগতের শেষ অবস্থা বলতে কিছু নেই।[১৬] "জগৎ সর্বদাই অগ্রসরমান, আত্ম-উৎপাদনশীল ও আত্মপ্রকাশমান—এর বৃদ্ধি সাধন ও বিবর্তনের অন্তর্নিহিত সীমা কখনও নির্ধারণ করা যায় না।"

www.pathagar.com

চ. আল্লাহ্

উপরে বর্ণিত মতানুসারে জগৎ হচ্ছে একটা স্বাধীন সৃজনমূলক ইচ্ছার প্রকাশ।এটা সকল অস্তিত্বের ভিত্তিমূল। এই ইচ্ছাশক্তি বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছে।এই ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, কারণ এটা কোনো বন্ধনে আবদ্ধ নয়। এটা সৃজনমূলক, কারণ এর ভবিষ্যৎ কোনো আদর্শায়িত কর্মসূচির দ্বারা নির্ধারিত নয়। এই সৃজনীশক্তিকে দু'ভাবে দেখা হয়েছে ; প্রথমে একে দেখা হয়েছে একটা উদ্দেশ্য হিসেবে যার বাস্তবায়নে এটা নিয়ত প্রয়াসরত। কিন্তু একে অন্ধ বলে অভিহিত করা যায় না। জগতের সুশৃঙ্খল, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুবিন্যস্ত ঘটনাবলি এ ইঙ্গিত প্রদান করে যে, এগুলো কোনো অন্ধশক্তির কাজ হতে পারে না। অন্যদিকে, আমাদের স্বীয় চৈতন্যও এই সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো বিশৃঙ্খল নয়, বরং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের সকল কার্যই উদ্দেশ্যমূলক। অনুরূপে, জগৎ হচ্ছে প্রজ্ঞা নির্দেশিত একটি সৃজনমূলক জীবন যা কোনো বহিঃসত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই শক্তি জগতের অভ্যন্তরেই আছেন, যিনি হচ্ছেন এক বুদ্ধিমান, উদ্দেশ্যবাদী সত্তা। তাই দেখা যায়, উদ্দেশ্যবাদ বাহ্য নয়, অভ্যন্তরীণ; অর্থাৎ এটা বাইরে থেকে আরোপিত কিছু নয়, বরং ভেতর থেকে এটা উদ্ভূত।[১৭]

স্বয়ং জগৎ হচ্ছে একটা আত্মসত্তা বা অহং। জগতে সর্বত্রই রয়েছে আমিত্বের ইচ্ছা। মানুষের মধ্যে আপেক্ষিক (relative) পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আমিত্বের ক্রমোন্নয়ন সুর পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র জগৎকে একটা অহং—মহান আমি (great I am) বলে অভিহিত করা যায়।এটা ইচ্ছাশক্তি ধারণ করে আছে যা উদ্দেশ্যমূলক আমিত্বের সারবত্তা ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বে এবং নির্দেশমূলক কার্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত। ফলে জগৎ কেবল ঘটনার প্রবাহই নয়,এর একটা সাধারণ কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে এর অহংবোধ।

পরম অহং ও সসীম অহং-এর মধ্যকার সম্পর্ককে তিনটি উপায়ে ধারণা করা যেতে পারে। যথা, (১) পরম অহং হচ্ছে একমাত্র বাস্তবসত্তা। সসীম অহংসমূহের স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তারা পরম অহং-এ নিমজ্জিত। (২) স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে পরম অহং ব্যক্তি অহং-এর ঊর্ধ্বে এবং বাইরে অবস্থিত। (৩)পরম অহং সসীম অহংকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু এতে করে সসীম অহং-এর স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে যায় না।

ইকবাল প্রথম ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ,এটা আমাদেরকে সর্বেশ্বরবাদের দিকে পরিচালিত করে। এটা ব্যক্তির বাস্তব সত্তা অস্বীকার করে এবং মানবজীবনের ধর্মীয় ও নৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্ফল করে তোলে। দ্বিতীয় ধারণাটিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণএটা সসীম ও অসীমের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে। যে অসীম তার মধ্যে সসীমের জন্য কোনো স্থান রাখে না, তা মিথ্যা অসীম। সসীমসমূহের বিরোধিতা করে যে অসীমে উপনীত হওয়া যায়, তা' মিথ্যা। কারণ তা' একদিকে যেমন নিজেকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, অন্যদিকে সসীমসমূহকেও ব্যাখ্যা করতে পারে না। সসীম অহংসমূহ বাস্তব কারণ তা' না হলে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

সসীম জীবনের বাস্তবতা এভাবে প্রমাণ করা যায় যে, এর কার্যাবলি কোনো উচ্চতর বাহ্যশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ এর নিজের তৈরি। অধিকন্তু, সসীম জীবন চিরন্তন, কারণ এর রয়েছে স্বাধীন ক্রিয়াপরতা। মানব জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধকে ভ্রম বলে প্রত্যাখ্যান করা যায় না কিংবা একে সৃজনমূলক ক্রীড়ার প্রতিফল বলেও অভিহিত করা যায় না। জীবনের ঘটনাবলি সুস্পষ্টভাবেই এই সত্য উদ্‌ঘাটন করে যে জীবন হচ্ছে প্রগতি ও বিবর্তনমূলক। অবশ্য নিম্নতর জীবন থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটেছে, তবে তাই বলে এটা বলা ভুল হবে যে, মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার শেষ এবং কালপ্রবাহে মানব থেকে অতিমানবের উদ্ভব ঘটাবে। যদি হঠাৎ করে বিবর্তন প্রক্রিয়া মানুষে এসে থেমে যায়, তবে অধিকতর উন্নতির জন্য মানুষের জীবন-প্রেরণা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে। অগ্রগতি হচ্ছে একটি আপেক্ষিক শব্দ—এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যদি জগৎ এরই মধ্যে বিকাশের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে থাকে, তবে উচ্চতর পূর্ণতার জন্য আমাদের প্রয়াস ও প্রত্যাশা অর্থহীন হয়ে পড়বে। কারণ চিরন্তন পূর্ণতা জগতকে স্থির নিশ্চল ও গতিহীন করে দেয়।

তৃতীয় ধারণা অনুযায়ী সসীম অহংসমূহ বাস্তব এবং তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। পরম অহং তার সত্তার মধ্যে সসীম অহংসমূহকে ধারণ করে আছেন এবং এতে করে সসীম অহং-এর ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায় না।এটা সত্য নয় যে, অসীম অহং-এর কল্পনার আধার হিসেবে সসীম অহং অস্তিত্বশীল। যদি তাই হতো, তবে সসীম অহং-এর ব্যক্তি ও স্বতন্ত্র লোপ পেয়ে যেত। পরমসত্তা অতিবর্তী নন, তিনি অন্তর্বর্তী। কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টিত করে আছেন। কিন্তু তিনি আবার সর্বেশ্বরবাদীদের অর্থে অন্তর্বর্তীও নন, কারণ তিনি কোনো অতিজাগতিক শক্তি নন অথবা সসীম সত্তাসমূহের অন্তর্নিহিত সারবত্তাও নন। তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তার চেয়ে অধিকতর ব্যক্তিত্ব সত্তা। মানুষের ন্যায় তাঁর আমিত্ববোধ আছে, অর্থাৎ স্বীয় আমিত্বের চৈতন্য (consciousness of His own I amness) রয়েছে। তবে তাঁর আমিত্ব মানববোধের অতীত এবং এই অর্থেই তিনি অতিবর্তী। এক কথায়, তিনি অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয়ই।

এতদ্‌সত্ত্বেও, ইকবাল অন্তবর্তিতার চেয়ে অতিবর্তিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর কারণ অন্তবর্তিতা সসীম অস্তিত্বের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। ইকবালের মতে সসীম অস্তিত্বও বাস্তব। সসীম ও অসীমের মধ্যকার সম্পর্কটি হচ্ছে পারস্পরিক ঐক্য ও বিভেদের সম্পর্ক। কিন্তু অন্তবর্তিতা ইকবালের সেই সসীম অহং-এর বাস্তবতাকেই অস্বীকার করে যা দর্শনের মূল সুর। এজন্যই তিনি অতিবর্তিতায় বিশ্বাস করেন যা তাঁর সসীম অহং-এর বাস্তবতা ও অসীম অহং-এর ব্যক্তিত্ব ও আমিত্বকে (egohood) স্বীকার করে। আল্লাহ্ হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে 'অন্যসত্তা' (other being)। অর্থাৎ তিনি সসীম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও অস্তিত্বশীল। আবার তিনি সসীম অহং এবং জগৎকে পরিবেষ্টনও করে আছেন ; তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কিছুই থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বা অহং। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব সসীমত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে না—কারণ, তিনি স্থান-কাল সীমানার অতীত। তাঁর আমিত্ব গভীরতামূলক (intensive), বিস্তৃতিমূলক নয় (not extensive) ।[১৯] সৃজনশীল ক্রিয়াপরতার অনন্ত আভ্যন্তরীণ (infinite inner possibilities) সম্ভাবনার মধ্যেই তাঁর অসীমত্ব অন্তনির্হিত। আমাদের জ্ঞাত জগৎ হচ্ছে এরই একটি আংশিক প্রকাশ মাত্র। পরম অহমের ব্যক্তিত্ব সৃজনশীলতা, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা এবং চিরন্তনতাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পরমসত্তা মূলত একজন সৃজনশীল বাস্তবসত্তা। তাঁর সৃজনশীলতা অফুরন্ত। তিনি এমন পরিকল্পনাকারী (contriver) নন যিনি-পূর্ব-অস্তিত্বশীল জড়ের উপর ক্রিয়া করেন। সৃষ্টিকর্মে তিনি জড়ের সম্ভাবনাকেই উন্মোচন করেন না, তিনি স্বয়ং জড়কে সৃষ্টি করেন। অন্যকিছু হিসেবে-ন-আত্মারূপে (not-self) জড় ও প্রকৃতির অস্তিত্ব অপরের সংঘর্ষে বা বিরোধে উপস্থাপিত হয় না যেমন নাকি সসীম সত্তার ক্ষেত্রে হয়। আল্লাহ্র ন-আত্মা (not-self) হচ্ছে তাঁর জীবনের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত। পরম অহমের জন্য সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর স্বীয় অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার উন্মুক্তকরণ। মানুষের সঙ্গে চরিত্র যেমন সংশ্লিষ্ট তেমনি আল্লাহ্র সাথে প্রকৃতিও সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রকৃতি হচ্ছে একটা আংশিক সমগ্রতা যা নিয়মের একরূপতার দ্বারা কার্যরত। প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে একরূপতা, সামঞ্জস্য ও সংযোগ বিদ্যমান।

সসীম জ্ঞান দু'টো সম্বন্ধকে পূর্বানুমান করে নেয় : বিষয়ী বা অহং (subject : the self) এবং বিষয় বা না-অহং (object ; the not-self)। ন-অহং-এর অস্তিত্বের জন্য অহং-এর উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু ঐশীজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ন-অহং অন্য (other) কিছু নয়। তাঁর মধ্যে জ্ঞানক্রিয়া ও জ্ঞানবস্তু এক ও অভিন্ন। পরমসত্তা সর্বধারণকারী ও সর্বব্যাপী। তাঁর জ্ঞান সৃজনমূলক। জানার জন্য তিনি তাঁর জ্ঞানের বিষয়কে সৃষ্টি করেন। এভাবেই তিনি সর্বজ্ঞাতা এবং তাঁর বাইরে কিছু নেই। প্রত্যক্ষণের এক অবিভাজ্য ক্রিয়ার দ্বারা তিনি ইতিহাসের সমগ্র স্রোত পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর সর্বজ্ঞান এই অর্থ করে না যে, প্রতিটি বস্তুই প্রদত্ত ও স্থিরীকৃত এবং আল্লাহ্ কেবল এগুলোকে প্রত্যক্ষণ করেন। তাঁর প্রত্যক্ষণ তাঁর বাইরে কিছু প্রত্যক্ষণ নয়। তিনি হচ্ছেন সজীব, সৃজনমূলক সত্তা। তিনি যা জানেন তা-ই সৃষ্টি করেন এবং যা সৃষ্টি করেন তা-ই-জানেন। আল্লাহ্র সৃজনমূলক জীবনের মধ্যে আংশিক সমগ্রতায় অবশ্যই ভবিষ্যৎ অস্তিত্বশীল। কিন্তু উন্মুক্ত সম্ভাবনা হিসেবেই এটা পূর্ব-অস্তিত্বশীল, ঘটনার সুনির্দিষ্ট রূপরেখার স্থির বিন্যাস হিসেবে নয়।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। এর অর্থ হচ্ছে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাই বলে তিনি অন্ধ ও খামখেয়ালি নন। এক অর্থে তিনি সীমিত—স্বীয় স্বভাব, বিজ্ঞতা এবং স্বীয় কল্যাণের দ্বারাই তিনি সীমিত। "তাঁর অনন্ত ক্ষমতা নিয়ম, শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়—যথেচ্ছা বা খামখেয়ালিপনাতে নয়।" এই সীমাবদ্ধতা তাঁকে অক্ষম ও শক্তিহীন করে না, কারণ তাঁর শক্তি বা ক্ষমতা তাঁর বিজ্ঞতা ও মঙ্গলময়তার সাথে দৃঢ় সংলগ্নে সংলগ্নিত। ঐশী ইচ্ছা অনিবার্যভাবে কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত। জগতে

www.pathagar.com

বিদ্যমান দুঃখ-দুর্দশাকে তাঁর মঙ্গলময়তার সাথে সংগতিপূর্ণ করা যায়। কারণ, জগৎ হচ্ছে বর্ধনশীল জগৎ যা পূর্ণাঙ্গ অহং-এর বিবর্তনের লক্ষ্যে ধাবমান। দুঃখ ও মন্দ সসীম জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারা উচ্চতর মূল্য অর্জনের জন্য সসীম অহংদেরকে তাদের আশা ও সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতে সহায়তা করে।

আল্লাহ্ চিরন্তন। কিন্তু আল্লাহ্র উপর চিরন্তনতার আরোপের অর্থ হচ্ছে সেই কাল-যার আদি-অন্ত নেই। ঘটনার উপর আরোপিত কাল বলতে বুঝায় এর পরিবর্তন ও পরম্পরা। এটা হচ্ছে ক্রমিক কাল (serial time) কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষেত্রে কাল হচ্ছে বিশুদ্ধ স্থিতিকাল (duration)-অপরিবর্তনশীল কাল। তাঁর ক্ষেত্রে কালের প্রারম্ভ বা শেষ নেই। তিনি হচ্ছেন সর্বধারণকারী একজন অহং যিনি ইতিহাসের সমগ্র স্রোতকে তাঁর আভ্যন্তরীণ জীবনের মুহূর্ত হিসেবে ধারণ করে আছেন। 'ভবিষ্যৎ অগ্রগামী হয়ে থাকছে না, একে এখনও অতিক্রান্ত করা বাকি কিংবা অতীতকে পেছনে ফেলে আসা হচ্ছে না। অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই তার বর্তমানতায় বিদ্যমান।

এ ধরনের পরমসত্তার সাথে সসীম অহংসমূহের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা সংযোগ সম্ভব। এসব সসীম অংহসমূহ বাস্তব। তারা বুদ্বুদ্ সদৃশ নয় যা একবার দেখা দিয়ে পুনরায় ফিরে আসে না। তারা পরম অহমে নিমজ্জিত (absorbed) হবে না এবং তাদের পৃথক সত্তাও বিলুপ্ত হবে না। তারা যদি নিমজ্জিত হয়, তবে এর অর্থ হবে ব্যক্তিত্বের বিনাশ; অর্থাৎ সসীম জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ইকবাল একজন খোদাবাদী (theist)। কিন্তু তাঁর খোদা প্রাচীন খোদাবাদীদের খোদা নন। তিনি 'স্বর্গের খোদা' নন। তিনি হচ্ছেন অন্তর্ব্যাপী এবং সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। তাঁর মধ্যেই সসীম অহংসমূহ তাদের সত্তা খুঁজে পায়। 'মুক্তার ন্যায় আমরা বেঁচে আছি এবং সঞ্চরণ করছি এবং ঐশী জীবনের অব্যাহত প্রবাহে আমাদের সত্তা বিরাজমান।'[২০] ইকবালের আল্লাহ্ দর্শন পরমসত্তার ন্যায়। এ হচ্ছে পরমসত্তা যা নিজের মধ্যে সকল সত্তা এবং সকল সসীম অহংকে ধারণ করে আছেন।

হেগেল আল্লাহ্কে পরমসত্তা হিসেবে ধারণ করেছিলেন। তিনি পার্থক্যকরণের নীতির দ্বারা এক সসীম অহং-এ বিভক্ত করেছিলেন। তাঁরই যুক্তির অনুসরণে ম্যাকটেগার্ট পরমসত্তাকে ব্যক্তির বিপরীতে সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেন। কারণ, তা না হলে সসীম অহং অবাস্তব হয়ে পড়ে। ব্যক্তিক আল্লাহ্র ধারণা সসমীকে তাঁর (পরমসত্তা) ইচ্ছায় নির্ভরশীল করে তোলে এবং তার ফলে অহং-এর স্বতন্ত্র পৃথক অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে যায়। ইকবাল অবশ্য অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অসম্ভব। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যদি শুধু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ই হন, তবে সসীম বিচ্ছিন্ন হয়ে তার কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

পুনরায়, যদি সসীম অসীমের বিভক্তিকরণের ফলই হয়, তবে সসীম সংখ্যায় নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন অহং-এর আবির্ভাব হয়ে পড়ে। কিন্তু অহং-এর অনুষঙ্গ সীমিত নয়। নব নব সদস্যের সদা আবির্ভাব ঘটছে। জগৎ নিশ্চল নয় বা শেষ ক্রিয়াও নয়। সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনও চলছে এবং মানুষ এতে অংশগ্রহণ করছে। অধিকন্তু, যদি সসীম পরমসত্তার অনিবার্য পৃথকীকরণই হয়, তবে এই অনুসঙ্গের মধ্যে স্থায়ী এবং স্থির বিন্যাস ও অভিযোজন নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে না—কারণ জগৎ বাস্তবে বিশৃঙ্খল থেকে শৃঙ্খলার পানে অগ্রসরমান।

www.pathagar.com

ব্যক্তিক আল্লাহ্‌র (personal God)[২১] ধারণা সসীম অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অসীমের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে না। কারণ, ব্যক্তিক আল্লাহ্‌কে অনিবার্যভাবে মানবসদৃশ সত্তা বা বুদ্ধির স্থপতি হতে হয় না যিনি বাইরে থেকে জগতের উপর ক্রিয়া করেন। তিনি সমগ্র জগতকে ধারণ ও পরিবেষ্টন করে আছেন। সসীম অহং তাঁর সারবত্তার অংশ এবং তার সত্তার সাথে আংশিকভাবে যুক্ত। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, এখানে সসীম আমিত্বের বা স্বাধীনতার বিলোপ ঘটছে। তিনি তাঁর স্বীয় ইচ্ছা নিজ জীবনের অংশগ্রহণকারী হিসেবে সসীম অহং-কে নির্বাচন করেছেন। মানব অহং স্থান-কাল বিন্যাসে বেঁচে থাকে, কিন্তু অসীম-অহম স্থান-কালের অতীত এবং অন্যসত্তা হিসেবে অবস্থান করেন; (as an other being)[২২] তাঁর আমিত্ব মানব অহং-এর উর্ধ্বে। তাঁর রয়েছে স্বকীয় ব্যক্তিত্ব।

ছ. ইকবালের[২৩] শিক্ষাদর্শন বা সমাজ ও নীতিদর্শন

ইকবালের দুই বিশিষ্ট সমর্থক ডব্লিউ. সি. স্মিথ এবং কে. জি. সাইয়েদাইন-এর প্রদত্ত রূপরেখা অবলম্বনে ইকবালের শিক্ষা বা সমাজনীতি দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। আধুনিক প্রগতিশীল মুসলিম মনে চিন্তাধারার যে ক্রমোন্নতি কাজ করে যাচ্ছিল ইকবাল সেই ভাবধারারই দৃঢ় সমর্থন করেন। জীবনের নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিমণ্ডলে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় তা অস্তিত্বশীল চিন্তার জগতে বিরাট আঘাত হানে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিপ্লব এত দ্রুত প্রসার লাভ করে যে, অতি রক্ষণশীল একজন ব্যক্তি যিনিএ সম্বন্ধে অবহিত, তিনিও তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য হন। সে সময় গতিশীল জীবনের ধাবমান হওয়ার জন্য একটা সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান কালের শিক্ষিত মুসলিম যুবকবৃন্দ প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগের মতাবলীকে সমালোচনার দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে শুরু করে এবং ধর্মীয় অনুশাসনের পুনর্ব্যাখ্যা আরম্ভ করে দেয়।ইকবালের রচনাবলিতে যুগেরএই ভাবধারাটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনের কাজ গ্রহণ করার সাহস ও ক্ষমতা উভয়ই তাঁর ছিল। ইসলামি শিক্ষার ইজতেহাদ নীতিতে তিনি এ ধরনের পুনর্গঠনের কাজ করার যৌক্তিকতা খুঁজে পান।

অহং বা আত্মসত্তা হচ্ছে ইকবাল-দর্শনের মূল সুর। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে অবিরত কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার বিকাশ সাধন এবং ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধিকরণ। গ্রিক ও ইরানীয় প্রভাবে আত্মসত্তার যে নেতিবাচক ধারণা ইসলামে প্রবেশ করেছিল, তা ইসলামের সত্যিকার ভাবধারার বিপরীত। গতিশীল পরিবেশের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব। জগৎ অস্বীকৃতি, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল এবং নৈরাশ্যবাদী ভাবধারা, যা ইসলামে প্রবেশ করে, তা ছিল আত্ম-অস্বীকৃতি, আত্মতৃপ্তি এবং জগতসংসার বিচ্ছিন্ন হওয়ারই ফলশ্রুতি। ইকবাল নিষ্ক্রিয় জীবনের ভাবধারার ঘোর বিরোধী। তিনি নিশ্চল সংগ্রামহীন জীবন পরিচালনাকে তীব্রভাবে নিন্দেকরেন। নিষ্ক্রিয় মানুষ দ্বারা গৃহীত একজন স্বৈরাচারী স্রষ্টা প্রশাসিত স্থির জগতের

www.pathagar.com

ধারণাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, জগৎ অসম্পূর্ণ এবং নিয়ত প্রকাশমান। মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ্ই এ জগৎকে অগ্রসরমানতার দিকে প্রধাবিত করেছেন। ইকবালের জীবনদর্শন হচ্ছে বিরামহীন কর্মতৎপরতার জীবন। এ জীবন অলস মানুষকে তার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য কর্মচঞ্চল করে তোলার অনুপ্রেরণা যোগায়। জীবন শুধু ধ্যান-অনুধ্যানপরায়ণই নয়—জীবন মানে হচ্ছে উত্তমরূপে[২৫] বেঁচে থাকা।

নৈরাশ্যবাদী ভাবধারাকে ইকবাল প্রত্যাখ্যান করেন। জীবন সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদী ধারণাকে তিনি পাপ বলে মনে করেন। তিনি সনাতন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে, প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগে এ ভাবধারা উপযোগী ছিল সন্দেহ নেই। সেকালে কোনো মানবসন্তান যদি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করত, তবে সে ব্যক্তি তার ভাগ্য বা অদৃষ্টকে দায়ী করতো। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি ভিন্ন। অনুরূপ অবস্থাতে মানুষকে আজ প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয় না—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়তায় মানুষ রোগকে প্রতিরোধ করে বেঁচে থাকার কঠোর প্রয়াস চালাচ্ছে। নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা ও পরজাগতিকতা ভাবধারার দ্বারা সৃষ্ট মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা দেখে ইকবাল ব্যথিত হন। কর্মতৎপরতার দিকে আহ্বান করতে গিয়ে তিনি ক্রিয়াপরতাকে সদ্গুণ বলে প্রশংসা করেন এবং নিষ্ক্রিয়তাকে পাপ বলে নিন্দে করেন। তিনি নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেন যে, সক্রিয় নাস্তিক এবং নিষ্ক্রিয় মুসলিম থেকে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ।

অধিকন্তু, তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দে করেন। যারা সৃষ্টিশীল প্রেমের উর্ধ্বে আচার-অনুষ্ঠানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি তাদের ঘৃণা করেন। ইকবাল ঘোষণা করেন যে, যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তারা নাস্তিক সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা নিজেদের সত্তা ও জীবনের আনন্দকে অস্বীকার করে তারা নাস্তিকের চেয়েও অধম। শুধু কাজের মাধ্যমেই মানুষের উত্থান বা পতন হতে পারে। পুণ্য বা সদ্গুণের সারবত্তা হচ্ছে কর্মতৎপরতা (activity)।

জগৎকে অবাস্তব বা ক্ষতিকর বলে ভাবা উচিত নয়। কারণ, পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব ব্যতীত অহং-এর বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। এ জড়ীয় জগৎ বাস্তব এবং কেবল এখানেই মানুষের উত্থান-পতন ঘটাতে পারে। বিরোধী শক্তির জগৎ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব ঘটায় এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই আত্মসত্তা নিজেকে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে। আত্ম-অস্বীকৃতি পরিবর্তে আত্ম-স্বীকৃতির ভাবধারা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রাকৃতিক জগৎ যাকে মানুষের ক্রমবর্ধমান উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা যায়,তা সসীম জীবনের এক অপরিহার্য অংশ। মানুষ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের আস্থাধিকারী (trustee) ব্যক্তিসত্তা। সে নিজে ঝুঁকি নিয়ে একে গ্রহণ করেছে। এর সফল বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন সে নিজেকে সর্বান্তকরণে জগতের ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-বেদনার সাথে বিজড়িত করে রাখতে পারে। মানুষের পূর্ণতা নিহিত রয়েছে তার আত্ম উপলব্ধির ক্রমবিকাশে, তার অনন্যতায় এবং অহং হিসেবে তার ক্রিয়া-তৎপরতার গভীরতায়। তাই জড় জগতে অহং-এর পূর্ণতম বিকাশই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। আত্মসত্তা সর্বদাই নির্মীয়মান অবস্থায় আছে—এর রয়েছে সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের অনন্ত সম্ভাবনা। এ কারণে জগতের

www.pathagar.com

গঠনমূলক ও সংঘাতময় অভিজ্ঞতার মধ্যে তাকে বাস করতে হয়। যদি সংগ্রাম থেকে সে বিরত থাকে, তবে তার ব্যক্তিত্ব অবিকশিত থেকে যায়। এজন্যই ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন বিরামহীন কর্মতৎপরতা। ফলে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জগতে আল্লাহ্‌র ধারণার সাথে সংযুক্ত হয়েছে অন্যান্য মূল্যসমূহও যথা : পুরস্কার, শাস্তি, আদর্শ এবং ধর্মের লক্ষ্যসমূহ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বাইরে থেকে আরোপিত কিছু নয় যাকে মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে—এটা ভেতর থেকে উদ্‌গত, আত্মভূত এবং ক্রিয়া করার ন্যায় একটা বিষয়।' তার ইচ্ছায় আল্লাহ্ কি ইচ্ছা করেন তা বিলোপ হয়ে যায়। জগৎ প্রক্রিয়ার সৃজনমূলক বিবর্তনে মানুষের ভূমিকা এবং স্থানের উপর ইকবাল জোর সমর্থন জানান। "চারদিকের জগতের গভীরতর আশা-আকাঙ্ক্ষায় অংশগ্রহণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। নিজের এবং জগতের ভাগ্য নির্ধারণ করাও তার পক্ষে সম্ভব—কখনও বা শক্তিসমূহের সাথে নিজেকে খাপখাইয়ে, কখনও বা নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনে শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

এবারে মানব ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের নিমিত্তে যেসব বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা কাজ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। অতীত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সফলতা অর্জনের অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করে অহমের বিবর্তন। কিন্তু অতীতের অন্ধ আনুগত্য অবাঞ্ছনীয়, কারণ এটা ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে দেয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মানুষকে আত্মনির্ভরশীলতার ভাবধারায় উন্নতিবিধান করতে হবে, আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সভ্যতার বর্তমান অবস্থা পুনর্গঠনের জন্য অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বুঝতে হবে এবং একে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

ইকবাল পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের বিরোধী। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যের গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং প্রকৃতির শক্তির ব্যবহার করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। পাশ্চাত্যের মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছে। কারণ, তারা যা পছন্দ করে না, সেই অবস্থা নিয়ে তারা কখনও সন্তুষ্ট নয়; তাদের স্বীয় পছন্দ ও সুবিধা অনুযায়ী অবস্থাকে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তারা তাদের কঠোর প্রয়াসকে অব্যাহত রাখে। তিনি নিষ্ক্রিয়তার নীতি, আত্মতৃপ্তি, আত্ম-অস্বীকৃতি ও অলস সাধনাকে প্রত্যাখ্যান করেন—পরিবর্তে তিনি মানুষকে সাহসী, আত্মনির্ভর এবং কর্মতৎপর হতে উপদেশ দেন যাতে করে জাতীয় ঐতিহ্যের উৎসসমূহ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং মানুষের সৃজনমূলক ক্রিয়াপরতা জীবন্ত হয়ে ওঠে। ইকবালের নিকট একজন ক্রিয়াবিদের উচ্ছ্বাসজনিত পাপ একটি আচারানুগত সদ্‌গুণের চেয়ে উত্তম।" তিনি বলেন, "নির্বোধ তাপস, তুমি জান না যে অন্তকরণের একটি উচ্ছ্বাসজনিত পাপ, শত প্রণতির ঈর্ষার কারণ।" তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, রক্ষণশীলদের স্থবির আচারবাদএবং তাদের নিষ্ক্রিয় ধার্মিকতা শুধু অর্থহীন নয় বরং সদর্থকভাবেই মন্দ এবং অনিষ্টকর।

মানবত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির স্বাধীনতা অপরিহার্যভাবেই প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতার পরিবেশ ব্যতীত জীবন তার সম্ভাবনা কিংবা ব্যক্তি তার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না। স্বাধীনতাই মানুষকে বস্তু ও পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষমতা দান করে।

www.pathagar.com

মানব বির্বতনের ধারা ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা অর্জনের প্রবণতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। এই স্বাধীনতার অবশ্য আনুষঙ্গিক সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। আদম (আ:)-এর পতনের ঘটনার ব্যাখ্যায় ইকবাল মানুষের চেতনার উত্থান লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন,[২৬] আদম (আ:)-এর নির্বাসন ঘটনাটি মানুষের সহজাতিক আকাঙ্ক্ষার আদি স্তর থেকে একটি স্বাধীন আত্মা বা অহং-এর সচেতনতাকে নির্দেশ করে। সমগ্র ঘটনাটি সেই আদি অবস্থাকে নির্দেশ করে যার মধ্যে মানুষ তার পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না এবং পরিণামে চাহিদার তীব্র অনুভূতিও ছিল না। চাহিদার উন্মেষই মানব সভ্যতার উৎপত্তি ঘটায়। মানুষমূলত পাপী বা দুর্বৃত্ত নয়, এটা সত্য নয় যে আদি পাপের জন্য মানুষ এই জগতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। ইকবালের মতে, এ জগৎ হচ্ছে একটা মঞ্চ যেখানে মানুষ বুদ্ধি ও চিন্তনশক্তিতে বলবান হয়ে জীবনের উপর অব্যাহত পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এই স্বাধীনতা হচ্ছে মানব জীবনের বিশেষ গুণ এবং কেবলমাত্র এ বিশেষত্বের কারণেই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আপেক্ষিক পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। এটা মানুষকে অন্যায় করতে অবকাশ দেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা আবার স্রষ্টার সৃজনমূলক জীবনের অংশগ্রহণ করার জন্য তাকে সক্ষম করে তোলে। "কল্যাণ নির্বাচনের স্বাধীনতা কল্যাণের বিপরীত অকল্যাণ নির্বাচনের স্বাধীনতাকেও জড়িত করে। আল্লাহ্র এই ঝুঁকি গ্রহণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর আস্থারই নির্দেশক। স্বাধীনতার বিজ্ঞানোচিত গঠনমূলক সদ্ব্যবহার দ্বারা এর যথার্থতা প্রমাণ করা এখন মানুষেরই দায়িত্ব।" স্বর্গকে এই মহান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল—এটা তা, অস্বীকার করেছে। কিন্তু মানুষ সাহসের সঙ্গে এ দায়িত্বকে গ্রহণ করেছে। তাই তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করা এবং উচ্চতর মূল্য উদ্ভবে পরিবেশকে পূনর্গঠন করা মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। এ কারণেই মানুষকে সৃষ্টির সেরা বলে অভিহিত করা হয় এবং মানুষই হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি।

ইকবাল আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সৃজনশীলতা হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠতম গুণ—এটা মানুষকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে। অন্যদিকে, মৌলিকত্ব (originality) সকল অগ্রগতির পরিবর্তনকে নির্ধারণ করে। সৃজনশীলতা ও মৌলিকত্ব উভয়ের জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন। স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষ মৌলিক হয়ে উঠতে পারে না এবং সৃজনমূলক ক্রিয়ায় তৎপর হতে পারে না। এই অগ্রগতিমূলক পরিবর্তনে আল্লাহ্ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, অবশ্য যদি মানুষ নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করে। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যদি না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন করে।'

সৃজনমূলক কর্মতৎপরতার ফলে যেহেতু মানুষের পরিবেশ অবিরতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই বিরোধী শক্তির সাথে সংগ্রাম করে উত্তমরূপে বাঁচার তাগিদেই মানুষ তার বুদ্ধিকে বিকশিত করতে বাধ্য থাকে। জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হলে চিন্তার নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং জ্ঞানের নতুন দিক উন্মোচন করা আবশ্যক। তাই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক চিন্তার স্বাধীনতা এবং কার্যের মৌলিকতা বিকাশ সাধনেই সার্বিক সাফল্য বয়ে আনবে। মানুষের কার্যাবলি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত। এর অর্থ হচ্ছে মানুষ

www.pathagar.com

বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, শুধু প্রবৃত্তির দ্বারা নয়। "এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ সচেতন বা অচেতনের প্রবণতা হিসেবে তাদের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক, তারা আমাদের সচেতন অস্তিত্বের ভিত্তি (warp) গঠন করে।" সে কারণেই জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বিচারমূলক ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করা যা কোনো কিছুকে বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করে। প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধিক কৌতূহল সত্যের অন্বেষা স্বয়ং সত্যের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান পরিত্যাগ করে, বিস্ময় (wonder) ক্রয় কর; কারণ জ্ঞান অনুমানমূলক (presumtuous), বিস্ময় অন্তর্দৃষ্টি দান করে। কার্যের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে করে একে মানুষের পরিবেশ পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করা যায়। জ্ঞান প্রাণশক্তি সৃষ্টি করবে এবং মানুষকে শক্তিশালী করে তুলবে যাতে করে যথার্থ কারণের জন্য সে সংগ্রাম করতে পারে।

নৈতিক বিকাশের ঐতিহ্যগত ধারণা চাপিয়ে দেওয়া কিছু নৈতিক বিধি-বিধানের অন্ধ আনুগত্য দাবি করে। এ ধরনের ধারণা ব্যক্তিগত চিন্তার ভূমিকাকে নস্যাৎ করে দেয় এবং নস্যাৎ করে দেয় নৈতিক ব্যক্তিত্বের সক্রিয় বুদ্ধির সাফল্যকে। "কল্যাণ (goodness) কোনো বাধ্যবাধকতার বিষয় নয়; এটা হচ্ছে নৈতিক আদর্শে আত্মার স্বাধীন সমর্পণ এবং এর উদ্ভব ঘটে স্বাধীন অহংসমূহের ঐচ্ছিক সহযোগিতায়। যে সত্তার গতি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত তা কখনও শুভ বা কল্যাণ উৎপাদন করতে পারে না। স্বাধীনতা হচ্ছে শুভ বা কল্যাণের শর্ত।" অহমের বিকাশ সাধনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নতুন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য গঠন যাতে করে আমাদের কার্যের দিক (directions) নির্ণীত হয়। সৃজনশীল উদ্দেশ্যের অবিরাম অন্বেষা জীবনকে নতুন অর্থ দান করে যা মানুষের কার্য ও বিকাশমান শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অলভ্যকে লাভ করার বাসনা এবং তা লাভের প্রয়াসই গড়ে তোলে সত্যিকার অহংবোধ। এ জন্যই নতুন বাসনা ও আদর্শকে উৎসাহিত করা উচিত, এগুলোকে দমিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। এ কারণেই যেখানে সব ধর্মবাসনাকে মন্দ বলে দোষারূপে করেছে ইসলাম সেখানে একে সকল কার্যের উৎস হিসেবে প্রধান শুভ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইকবাল বলেন, "তোমার অন্তঃকরণে বাসনাকে সজীব রাখো, নতুবা এর মধ্যে ক্ষুদ্র বালুকণা হৃদয়কে সমাধিতে পরিণত করবে।"

বিদেশী প্রভাবের ফলে বাসনাকে দমন করে রাখার প্রবণতা ইসলামের প্রকৃত ভাবধারার বিরোধী। মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় আত্ম-অস্বীকৃতিতে নয়, আত্ম-স্বীকৃতিতে পাওয়া যায়।[২৭] "মানব ক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুস্থ, মহান ও সমৃদ্ধশালী জীবন লাভ করা।" এ কারণেই ইকবালের দর্শন হচ্ছে সদর্থক মতবাদের পদ্ধতি। এটা সকল প্রকার দ্বৈতবাদের বিরোধী। দেহ ও মন, ভাল ও মন্দ, পবিত্র ও অপবিত্র পারস্পরিক বিরোধী নয়, তারা সম্বন্ধযুক্ত ও একে অপরের সম্পূরক। এ দর্শন বিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ক্রিয়তার বিরোধী। আত্ম-অস্বীকৃতির জীবন নয়, আত্ম-স্বীকৃতির এবং ক্রিয়াপরতার মাধ্যমেই মানুষ তার সকল সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারে এবং নিজেকে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে প্রমাণ করতে পারে।

ইকবালের মতে, বাস্তব ও আদর্শ, জড় ও অধ্যাত্ম, প্রকৃতি ও মনন একে অপরের উপর নির্ভরশীল, তারা পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন নয়। এ জগৎ মায়া বা ভ্রম নয় কিংবা

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক বিকাশের বাধাস্বরূপও নয়। বিপরীতে, জগৎ হচ্ছে আদর্শ বাস্তবায়নের যাত্রাবিন্দু। আত্মসত্তাকে সমৃদ্ধ করতে হলে এর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করতে হবে। জগতের উত্তেজনাকর প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কিংবা নির্জন-অনুধ্যানপরায়ণ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তা কখনও অর্জিত হতে পারে না। পরিবেশের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়েই তা অর্জিত হতে পারে। এ ধরনের সংযোগের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতির শক্তির উপর ক্রমশ প্রভুত্ব অর্জন করেছে, গড়ে তুলেছে বর্তমান সভ্যতা এবং উন্মুক্ত করেছে আরও সাফল্যের সম্ভাবনাকে। সুফিগণ জগৎকে মন্দ বলে ভয় করেন এবং একে বর্জন করার প্রয়াস চালান। কিন্তু ইকবাল ব্যক্ত করেন যে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকিছুকে ভয় করা ধর্মহীনতার নামান্তর। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনেএবং উচ্চতম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনে জড়ীয় জগতের বিভিন্ন সম্পদকে মানুষের নিজ সুবিধার্থে ব্যবহার করা উচিত।

পবিত্র কোরআনের মতানুযায়ী পরমসত্তার স্বরূপ হচ্ছে আধ্যাত্মিকএবং এর জীবন নিহিত জাগতিক ক্রিয়াপরতায়। প্রাকৃতিক ও জড়ীয় বস্তুতে আত্মা তার আত্মবিকাশের সুযোগ পায়। জগৎ হচ্ছে আত্মার ক্রিয়া তৎপরতার একটা মঞ্চ। ফলে জগৎ থেকে দূরে সরে পড়ে সত্তাকে পাওয়া যায় না, জগতের মধ্যে যা কিছু সুপ্ত রয়েছে তার গভীরে প্রবেশ করেই সত্তার অনুসন্ধান করতে হয়। জীবনের মূর্ত সমস্যার সার্থক মোকাবেলা করার প্রচেষ্টার মধ্যেই নির্ভর করে মানুষের অগ্রগতি। ইকবাল যদিও মরমিবাদী তবু তাঁর ভাবধারা পরজাগতিক নয়। তিনি জড় জগতের অশুভ, অবিচার এবং অপূর্ণতাকে উপেক্ষা করেন না। তিনি সাধারণ মুসলিমদের পরজাগতিক ভাবধারাকে নিন্দা করেন।এ জগৎ অশুভ, পরবর্তী উত্তম জীবনের জন্য এ জগৎকে পরিহার করা উচিত— এ ধরনের মানসিকতা অনৈসলামিক ও পাপজনক। সামাজিক অবক্ষয় থেকে উদ্ভূত এই মানসিকতাই মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ। জীবনের সকল মূল্য এই জগতেই যাঞ্চা করতে হবে—স্বর্গে নয়। মৃত্যুর পর উৎকৃষ্টতর জগতের কল্পনা মানব-মনের স্বাভাবিক প্রত্যাশা যেখানে এ জগতের সকল অশুভ অনুপস্থিত থাকবে এবং অপরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা ঘটবে। কিন্তু ইকবাল বলেন, অবিরাম ক্রিয়াতৎপরতার মাধ্যমে এ জগতকে রূপান্তর ও পুনর্গঠন করতে হবে যাতে করে এমন এক জগতের সৃষ্টি হয় যেখানে মানব মনের সকল প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি ঘটতে পারে। বর্তমান জগত যে দুঃখ, রোগ-শোক, অজ্ঞতা, বঞ্চনা ও ক্ষুধার দ্বারা পরিপূর্ণ তা আজ এক স্বীকৃত সত্য। এ ধরনের জগৎ চিন্তাশীল মানুষের মন ভরাতে পারে না,এবং এ কারণেই মৃত্যুর পর সে উত্তম জগতের স্বপ্ন দেখে। মানুষ সাধারণত বিশ্বাস করে যে, সেই উত্তম জগতের অস্তিত্ব এ জগতে না হলেও পরবর্তী জগতে থাকা সম্ভব। ইকবালের মতে, পৃথিবীতে স্বর্গীয় জগত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যে ব্যক্তি তা করে না সে অনৈতিক কাজ করে। সকল শক্তি ও উৎসাহ দিয়ে একটি উৎকৃষ্টতর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

প্রতিটি মুসলিম দেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ।[২৮] অশিক্ষা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, বহিঃশোষণ, রোগ, মৃত্যু ইত্যাদি আজ সর্বত্রই বিরাজিত। এ করুণ

www.pathagar.com

অবস্থাতেও মানুষ তৃপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়টি ইকবালকে ব্যথিত করে। তিনি উল্লেখ করেন, মুসলমানদের পরজাগতিক মানসিকতার কারণেই আজ এ দুদর্শা। এ ধরনের মানসিকতা মানব অগ্রগতির অন্তরায়। এ ধরনের ভাববাদ মানুষের দৃষ্টিকে জীবনের প্রকৃত অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং তাকে এক কল্পরাজ্যে টেনে নিয়ে যায়। এ ধরনের মানসিকতা মরমি ও জগৎ-অস্বীকৃতির প্রবণতার জন্ম দেয় এবং মানুষকে তার যথার্থ কাজকরা থেকে বিরত রাখে। এজন্যই এ জগতের ভাগ্যকে পুনর্গঠন করার নিমিত্তে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে—এটা তার প্রধান নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই জীবনের অশুভ ও দুর্ভোগকে জয় করে সমাজের বর্তমান অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। মানুষ যদি পরজাগতিক মানসিকতাকেই বিকশিত করে যা পরাভব মনোবৃত্তি ও সন্ন্যাসবাদের কারণ, তবে সে এক আঘাতেই উভয় জগৎকে হারাবে।

ইকবাল যদিও জড়ীয় জগতের বাস্তবতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তিনি আধ্যাত্মিক সত্তাকে কখনও অস্বীকার[২৯] করেন নি। আসলে, জড়ীয় জগৎ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে যাওয়ার এক ক্ষেত্রস্বরূপ। "শুধু জড়কে পুনর্গঠন করার মধ্যে মানুষের ক্রিয়াপরতা সীমাবদ্ধ নয়। তার অভ্যন্তরীণ সত্তার গভীরে রয়েছে অসীম ক্ষমতা। এ ক্ষমতাবলে সে এক মহান জগতের সৃষ্টি করতে পারে এবং এর মধ্যেই সে আবিষ্কার করতে পারে তার অফুরন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎস। উচ্চতর মূল্যবোধের অন্বেষায় প্রাকৃতিক জগৎকে উপাদান হিসেবে মানুষ ব্যবহার করতে পারে এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে যাতে করে মানব আত্মার ঊর্ধ্বগতিকে শক্তিশালী করা যায়। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার সম্বন্ধকে সদ্ব্যবহার করতে হবে—আধ্যাত্মিক জীবনের ঊর্ধ্বগতির এ স্বাধীন আত্মসত্তার খ্যাতিরেই তা করা উচিত।

এবারে জগৎ-প্রকৃতি এবং তাতে মানুষের কি ভূমিকা তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ইকবাল স্থির এবং পরিপূর্ণ জগতের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এর মধ্যে নতুন কিছু আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। জগৎ কেবল সৃজনমূলক ক্রিয়ার ফলশ্রুতি নয়—জগৎ হচ্ছে অর্থবহ এক সত্তা—এর সকল সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ-সুবিধাসহ একে গ্রহণ করতে হবে। জগৎ প্রদত্ত তৈরি কিছু নয় যা মানুষকে সর্বকালের জন্য দেওয়া হয়েছে। জগত, প্রকৃতপক্ষে, এক বর্ধনশীল জগত—এর রয়েছে অনন্ত সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির সম্ভাবনা। জগত এক উন্মুক্ত, এক অশেষ সত্তা যা অব্যাহতভাবে পরিবর্তন ও অগ্রগতির মধ্য দিয়ে চলছে। এটা মানুষকে তার স্বাধীন ও সৃজনমূলক ক্রিয়ারপরতার বিকাশ সাধনে সুযোগ দেয় এবং এর মাধ্যমে সে একদিকে প্রকৃতির জগতকে জয় করে, অন্যদিকে সে তার ব্যক্তিত্বের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। "প্রারম্ভে জগত ছিল বিশৃঙ্খল, বন্য পশু এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবাধীন। মানুষই এর মধ্যে শৃঙ্খলা, বিন্যাস, সৌন্দর্য এবং উপযোগিতা আনয়ন করে।" মানুষ তার চতুর্দিকের জগতের অপূর্ণতার দৃশ্য নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং এ অসন্তুষ্টিই তার মনে সৃষ্টি করে উত্তেজনা এবং এই উত্তেজনাই তাকে অনুপ্রাণিত করে পূর্ণতার জন্য কঠোর পরিশ্রমের এবং পরিশ্রমের মাধ্যমেই সে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। তাই মানুষকে সৃজনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

ইকবাল জগতের যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যমূলক মতবাদের বিরোধী। প্রথম মতবাদটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের অভিমত। তাদের মতানুসারে, প্রকৃতির ঘটনাবলি যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। ইকবাল বলেন, এ মতবাদ মানুষের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে এবং জীবনের সকল নৈতিক ও ধর্মীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অর্থহীন করে তোলে। পরবর্তীটি ভাববাদীদের মতবাদ। তাদের মতে, এ জগত হচ্ছে ঐশী মনের ধারণার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। এটা হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াস্বরূপ। ইকবাল বলেন, জগৎকে এভাবে মনে করার অর্থ হচ্ছে অগ্রগতি ও উন্নতি কিংবা নতুন গুণের উন্মেষকে অস্বীকার করা। অন্যদিকে, এ ধরনের মতবাদ অদৃষ্ট বা ভাগ্যকে একটি সীলমোহরকৃত বিষয় বলে মনে করে। এটা মানুষের সৃজনশীলতাকে হনন করে, ইতিহাসের গতি-প্রবাহকে ঘটনার পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করে এবং প্রাণের অভিব্যক্তি ব্যক্তিগত উদ্যমের কোনো অবকাশ রাখে না। বস্তুত মানুষ নিজেই তার স্বীয় ভাগ্যনির্মাতা। "একটি বিষয়ের অদৃষ্ট আরোপ কোনো ভাগ্য নয় যা প্রভুর ন্যায় বাইরে থেকে কাজ করে, এটা বস্তুর অভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে। কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রকৃতির অন্তরতম প্রদেশ থেকে এর সম্ভাবনাসমূহের বাস্তবায়নের শক্তি উদ্ভূত।" তাই প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত সম্ভাবনা হিসেবে অস্তিত্বশীল, কোনো নির্দিষ্ট রূপরেখার স্থির বিন্যাসে বা সত্তা হিসেবে নয়। এ মতবাদ কাল (time)-কে এক সৃজনমূলক উপাদান হিসেবে গণ্য করে এবং মানুষকে স্বাধীন ক্রিয়া ও বিকাশের সুযোগ দান করে। স্বাধীন অহমের প্রতিটি কার্য নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এতে করে আরও সুযোগ ঘটে সৃজনশীল অভিব্যক্তির। জীবন মুক্ত স্বাধীন ও সৃজনমূলক। ফলেএটা জন্ম দেয় নতুনের, মৌলিকতার এবং অদৃশ্য বিষয়সমূহকে। জীবনের প্রকৃত স্বভাব হচ্ছে অব্যাহত ভবন-প্রক্রিয়া (constant process of becoming)।[৩০] এটা হচ্ছে নতুন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের অগ্রসরমান গঠনপ্রক্রিয়া যা মানুষের বিকাশমান ক্রিয়াপরতাকে অনুপ্রেরণা যোগায়।

মানুষের আবির্ভাবের সাথে বিবর্তন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটেছে বলে ইকবাল বিশ্বাস করেন না। মানুষের অভিব্যক্তির অনন্ত সম্ভবনায় তিনি বিশ্বাসী। তিনি আশা পোষণ করেন যে, অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তার অবস্থান অর্জন করতে পারবে এবং অমরতাও লাভ করতে পারে। "অমরতা immortality", তিনি বলেন, "আমাদের জন্মগত অধিকার নয়, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা একে অর্জন করতে হয়।"অমরতার ক্ষেত্রেও আবার সেই ক্রিয়াপরতারই আহ্বান।

ইকবালের মতে, শুভ জীবন হচ্ছে কর্ম ও সংগ্রামের জীবন—সংগ্রামবিমুখ হয়ে থাকা নয়। ক্রিয়াপরতাকে আবার সৃজনমূলক ও মৌলিক হতে হবে। এই গতিশীল সৃজনশীলতার দ্বারাই মানুষ অপরিণত প্রারম্ভ থেকে আজ মহান সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। অগ্রগতির এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে গেলে মানুষকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সক্রিয় সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে এবং তার নিজ উদ্দেশ্যে একে পুনর্গঠন করতে হবে। একজন মহৎ মানুষকে আবার জানতে হবে কি করে প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

শক্তির উপর তার বুদ্ধিকে বর্ধনশীল উপায়ে প্রয়োগ করতে হয়—এতে করে তার মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি আবার নতুন করে সংযোজিত হয়। মানুষ তার বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে না পারলে সে নিজেকে তার চতুর্দিকস্থ বিরোধী শক্তির করুণায় নিমজ্জিত করে ফেলবে।

ইকবাল অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এভাবে অর্জিত শক্তি মানবসেবার প্রয়োজনে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন এটা প্রেম[৩১] দ্বারা পরিচালিত হয়। কারণ, বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান ধ্বংসাত্মক কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। এজন্যেই বুদ্ধি ও প্রেমের মধ্যে একটি আপোষ-মীমাংসার দরকার। মানুষের আচরণ যখন প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পরার্থবাদীর ভাবধারা নিয়ে উচ্চ ও মহৎ আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য প্রভাবিত হয়, তখনই সে তার নির্মাতার সাথে সংযুক্ত হয় এবং তার প্রচেষ্টায় ও অন্বেষায় সে তাঁকে তার সহযোগীরূপে দেখতে পায়। পূর্ণ মানুষ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি তার নিজের মধ্যে ঐশী লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করছেন।

উচ্চতর মূল্যের মহান আদর্শের উদ্ভব ঘটানোর ব্রত নিয়েই মানুষের জীবন শুরু করা উচিত। আত্ম-স্বীকৃতি এবং বিরামহীন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। ক্রিয়াপরতার মাধ্যমেই মানুষ তার আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি ও শক্তির অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে।[৩২] "আভ্যন্তরীণ সম্পদের বিকাশ তাকে অকল্পনীয় অবস্থায় উন্নীত করতে পারে। সেখানে সে নিজে তার ভাগ্যনিয়ন্তা এবং আল্লাহ্‌কে সে পায় তার পরিকল্পনার সহকর্মী হিসেবে।" আল্লাহ্ এক স্বতন্ত্র সত্তা এবং অত্যন্ত সৃজনশীল শক্তি। মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্‌র সদৃশ হওয়া। নবি (স:) বলেন, "নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলি সৃষ্টি কর।" যিনি আল্লাহ্‌র খুব সন্নিকটে আসতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন অতি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। তবে ইকবাল সুফিদের বিরোধী, কারণ তাঁরা ব্যক্তির আত্মাকে—অনন্তে নিমজ্জিত করে ফেলেন। বিপরীতে ইকবাল বলেন, ব্যক্তির আত্মাকে উচিত নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌কে বিলীন করা। সুতরাং মানুষের নৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়া। মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হতে হবে। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত অন্যকোনো কিছুতে সন্তুষ্টি লাভ না করার জন্য ইকবাল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন।

মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য সাহস, ধৈর্য ও বিনয়ের যথার্থ অনুশীলন দরকার। সকল কার্যের প্রেরণাশক্তি আত্মবিশ্বাস ও সাহস (self confidence and courage)[৩৩]। মনুষ্যত্বের মুক্ত বিকাশ এবং মানব অধিকারের যথার্থ প্রয়োগে আল্লাহ্‌ভীতি ব্যতীত সব ধরনের ভয়ভীতিকে বর্জন করতে হবে। সাহসী ব্যক্তিকে অন্যের বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তা ও আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হতে হবে। কারও যাতেএ ধরনের মনোভাব না হয় যে তিনিই জ্ঞান ও সত্যের একমাত্র অধিকারী।তাকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস চালাতে হবে। বিকাশ ঘটাতে হবে অন্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। কিন্তু, শক্তি বা ক্ষমতা অর্জন যেন কোনো মানুষকে গ্রাস না করে ফেলে—জাগতিক আনন্দরসে তিনি যেন মত্ত না হয়ে পড়েন। মানুষকে নিজের মধ্যে এমন এক বৌদ্ধিক জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে অন্যের সেবায় সে তার লব্ধজ্ঞানকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

ইকবাল নিঃসন্দেহে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য এবং পুরানো সমাজব্যবস্থা বদলে দেয়ার উদ্দেশ্যে বুদ্ধির বিকাশ ও প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এমন কি তিনি

www.pathagar.com

এ ধরনের অভিমতও পোষণ করেন যে, জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে জয় করার অর্থ হচ্ছে এক এবাদত বা উপাসনার কার্য করা—তাঁর নিকট প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক হচ্ছেন এক ধরনের মরমি অনুসন্ধানকারী। তবে তিনি নৈতিক মূল্যবোধের বিনিময়ে বুদ্ধির অতি-বিকাশমানের (over-development) বিরোধী। সুতরাং বুদ্ধিকে প্রেম (love) দ্বারা পরিপূর্ণ হতে হবে অথবা প্রেমের অধীন হতে হবে। আমরা যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করি, তা হলে ফলাফল হবে সমানভাবে ভয়াবহ। জীবনের পূর্ণতার ক্ষতিসাধন না করে এ দু'টোকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পূর্ণজীবনের জন্য প্রেম ও বুদ্ধির একীকরণ (integration) অপরিহার্য। পাশ্চাত্যের রয়েছে প্রেমহীন শক্তি, আত্মাবিহীন জ্ঞান। অন্যদিকে প্রাচ্যের রয়েছে জ্ঞানবিহীন প্রেম ও আত্মা। মুসলমানদের উচিত জ্ঞানানুসন্ধানে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করা এবং বর্তমান অবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করা।

ইকবাল পুঁজিবাদ (capitalism)[৩৪] ও সাম্রাজ্যবাদ (imperialism) উভয়ের বিরোধী। কারণ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক দুর্ভোগ আনয়ন করে। সমাজে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এবং এই সমাজেরই উচ্চতর মানুষের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অভাবের কারণে ইকবাল আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের সমালোচনা করেন। তাদের বস্তুবাদী ও অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদী ধারণাই এর জন্য দায়ী বলে তিনি মনে করেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দে করেন, কারণ তিনি এর দোষত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত। তিনি বৌদ্ধিক ধারণার (Intellectual) প্রতিও আকৃষ্ট তবে, তিনি বুদ্ধির চেয়ে প্রেমকে অধিক গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, প্রেমবিহীন বুদ্ধি এবং নৈতিক বিশ্বাস বিবর্জিত অনিয়ন্ত্রক বিজ্ঞানই বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের সকল অমঙ্গলের জন্য দায়ী। তিনি এমন এক সমাজতন্ত্রের সমর্থন করেন যা অধিকতররূপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের উপর নয়। তাঁর মতে, ইসলাম এবং সমাজতন্ত্র উভয়ের লক্ষ্যই এক—সমাজতন্ত্র অবশ্য কিছুটা অর্থনৈতিক সত্যের বাহক। একজন অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রী নিজ অজ্ঞাতেই বহুলাংশে আল্লাহ্‌র কাজ করে থাকেন। ইসলাম এবং সমাজতন্ত্র, তিনি উল্লেখ করেন, দু'টি সম্বন্ধযুক্ত যৌগিক বস্তু এবং একটি আদর্শ সমাজে তাদেরকে যথার্থভাবে সমন্বিত করতে হবে। ইকবাল বলেন, তাঁকে যদি একটি মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক করা হতো, তবে তিনি প্রথমেই সে রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করতেন।

ইকবাল একজন জাতীয়তাবাদী। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিশ্বের সকল মুসলিম সদস্যের এই অনুভব করা দরকার যে তারা সবাই একটি একক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের অবস্থা দেখে গভীর দুঃখবোধ করেন। কারণ, তারা আজ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। তিনি তাঁর কল্পনায় এক বিশ্ব জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেন যেখানে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে কল্যাণ ও সৌভ্রাতৃত্বের লক্ষণ বিদ্যমান। ইকবাল জাতিভিত্তিক ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিরোধী—কারণ, এরা বহুবিধ শোষণ, বঞ্চনা ও অস্থিরতার কারণ। ইকবাল এই উপমহাদেশে মুসলিমদের জন্য একটা আবাসভূমি, একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

www.pathagar.com

সমাজের অন্যান্য সদস্যের সক্রিয় সংস্পর্শে এসে ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। সমাজের প্রেক্ষাপটেই একজনকে সদা ভাবতে হবে। সমাজ বা গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। ব্যক্তিকে আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গির একতাবিধানের প্রয়াস চালাতে হবে। প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন নির্মাণে ব্যক্তিস্বার্থকে সমবায় আদর্শ ও লক্ষ্যে মিশিয়ে নিতে হবে। সমাজই কেবল জীবনের পরিপূর্ণ বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটাবার সুযোগ দান করে। ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে বিরাজমান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি নিজেকে যথার্থভাবে বিকশিত করতে পারে। ইকবালের মতে, নির্জন তাপস ধর্মবিরোধী। ইকবাল এমন এক ধরনের আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেন যেখানে থাকবে না যুদ্ধ, জাতি ও শ্রেণীবিভেদ, থাকবে না কোনো ভিক্ষুক, বেকারত্ব, অনাহার এবং শোষণ। এ সমাজ পরিব্যাপ্ত হবে ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সেবা এবং আধ্যাত্মিক উষ্ণতার দ্বারা। এ সমাজ হবে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ। তিনি মানুষের বর্তমান অবস্থা দেখে অসন্তুষ্ট এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে মানুষের পক্ষে বর্তমানের চেয়ে আরও ভাল হয়ে ওঠা সম্ভব। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি মানুষকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। মানুষের নৈতিক আদর্শ হচ্ছে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠন করা। বিজ্ঞান মূল্যবান, কারণ এটা প্রকৃতির শক্তিসমূহকে কাজে লাগাতে মানুষকে সক্ষম করে তোলেএবং জড় জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। জড়বস্তুও মূল্যবান, কারণ এর মধ্যে মানুষ বিরোধী ইচ্ছার সম্মুখীন হয় যা তার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলে। ধর্মও মূল্যবান, কারণএটা মানুষকে ভীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং তার মধ্যে প্রবেশ ঘটায় সৃজনমূলক শক্তি উদ্যম ও উৎসাহ।

গতিশীল নীতিবিজ্ঞানের পদ্ধতির উদ্ভব ঘটানোর এই প্রবণতা এবং জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এই প্রেরণা প্রগতিশীল মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিকশিত হচ্ছে। তাঁরা ভাবছেন যে সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম হচ্ছে এক ধরনের সমাজতন্ত্র। এর শিক্ষাকে যদি যথার্থভাবে বর্ণনা করা যায়,তবে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হবে যে, আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এর লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই এটা মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থনৈতিক কর্মসূচিসহ বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রও একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে। আধুনিক সমাজতন্ত্রও এমন এক ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রয়েছে। সে এমন এক সময়ের প্রতীক্ষারত যখন যথার্থ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা একটি আদর্শ সমাজ গঠনে সক্ষম হবে—এই সাফল্যের লক্ষ্যে আমাদেরকে সর্বান্তঃকরণে কাজ করে যেতে হবে। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা যে, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত ধর্মবিরোধী। সমাজতন্ত্রের রয়েছে জৈবিক ও মানসিক অপরিহার্যতা। প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষকেই ধর্মের নামে শোষণের বিরোধী হতে হবে।

ইকবালের একজন দৃঢ় সমর্থক হচ্ছেন কে. জি. সাইয়েদাইন।[৩৫] তিনি একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। তিনি ইকবালের দেওয়া যুক্তিবাক্য থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর মতে, একজন মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করা এবং একটা উৎকৃষ্টতর জগত গঠনে সেগুলোকে প্রয়োগ করা। একজন মানুষের স্বভাব তার প্রত্যয় বা সংকল্পের দ্বারা বিবেচিত হয় না, বরং বিবেচিত হয় জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। অর্থাৎ সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশে ব্যক্তি তার প্রজ্ঞা ও শক্তির যথাযথ ব্যবহার করেছে কি না, সেটাই এখানে বিচার্যের বিষয়।

www.pathagar.com

বর্তমানে ধর্মকে উপলব্ধি করতে হবে ভিন্নভাবে। ধর্মপ্রদত্ত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য গতিশীল নীতিবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষকে সদা পরিবর্তনশীল এই জগতেই কাজ করে যেতে হবে।

টীকা ও তথ্যসংকেত

১. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিতি, পৃ. ২০৬।
২. সাঈদুর রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসফি, পৃ. ১৫০।
৩. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৮০
৪. সাঈদুর রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসফি, পৃ. ১৫০।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।
৭ পূর্বোক্ত,পৃ. ১৫০।
৮. ড. রশিদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৫৬৬।
৯. ইকবাল : রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট্স্ ইন ইসলাম. ১৮।
১০. পূর্বোক্ত : মেটাফিজিক্স অব ইকবাল।
১১. সাঈদুর রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসফি, পৃ. ১৫২।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।
১৩. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৮৬।
১৪. সাঈদুর রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসফি, পৃ. ১৫০।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯।
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।
২১. ড. আমিনুল ইসলাম মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ.২৯২।
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২।
২৩. ড. আবদুল হামিদ : মুসলিম দর্শন পরিচিত, পৃ. ২১৭।
২৪. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৯৩।
২৫. সাঈদুর রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসফি, পৃ. ১৬৫।
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭।
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০।
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২।
৩০. ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৯৯, ৩০০।
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০।
৩২. সাঈদুর রহমান : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক কালচার অ্যান্ড ফিলসফি, পৃ. ১৭৬।
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬।
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮।
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০।

www.pathagar.com

উপসংহার

এই গ্রন্থে সংক্ষেপে যা আলোচনা করা হয়েছে তাতে একটা বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম চিন্তাধারার মূল উৎপত্তি ইসলামের শিক্ষা থেকেই—কোনো বহিঃউৎস থেকে নয়। কালপ্রবাহে মুসলিম চিন্তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটায়। সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মুতাযিলা, আশারিয়া এবং সুফি সম্প্রদায়। ইসলাম থেকে এগুলো শুধু উদ্ভূতই হয় নি, তারা ধর্মের দোলনায় প্রতিপালিত ও বিকশিত হয়েছে। শেষেরটি অর্থাৎ হিকমাত সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে হেলেনীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। তবে এখানেও মুসলিম দার্শনিকবৃন্দ তাঁদের ব্যক্তিত্বে এমন ছাপ রেখেছেন যা শতাব্দীর ব্যবধানে এখনও পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায় নি।

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : কিভাবে একই উৎস থেকে প্রায় বিপরীতমুখী মতবাদসহ চিন্তার বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়। পবিত্র কোরআন যদি বুদ্ধিবাদে উৎসাহ দেয়, তবে একই সময়ে এটা কিভাবে স্কলাসটিকস্‌বাদের বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা যোগায়? "ইসলাম ধর্ম যদি মানব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ও আধ্যাত্মিক দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালায়, তবে একই সময়ে একটা কেমন করে মরমিবাদ বা আধ্যাত্মিকবাদের অনুমোদন প্রদান করে।"

যাই হোক, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খুব বেশি একটা জটিল কিছু নয়। ভূমিকাতেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে,ইসলাম হচ্ছে একটি নমনীয় ধর্ম ও এর মধ্যে অগ্রগতির উপাদান অন্তর্নিহিত। এটা সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ঘটনার অগ্রগতির সাথে নিজেকে উপযোগী করে তুলতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে মুসলিম চিন্তাধারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বুদ্ধিবাদের যুগে ইসলাম স্বাধীন চিন্তাবিদদের কারণকে সমর্থন করে এবং স্কলাসটিক্‌সবাদের কালে এটা প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের মধ্যকার সমন্বয়কে উৎসাহ প্রদান করে। মরমি সাধকের নিকট ইসলাম আধ্যাত্মিক পূর্ণতার উপায়স্বরূপ এবং বিজ্ঞানীর নিকট এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধর্ম। ইসলাম সকল শুভ, সকল বুদ্ধি এবং সকল জ্ঞানকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। নবি (স:) বলেন, "বিজ্ঞতা অর্জন কর এবং এটি তোমার ক্ষতি করবে না—যে উৎস থেকেই এটা আসুক না কেন।" ইসলাম হচ্ছে একটি গতিশীল ধর্ম। ধর্মের মূল বিষয়গুলো অনড় ও অপরির্তনীয় থাকে, এর বিশদ বর্ণনাসমূহকেই অবস্থার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়।

আমাদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত জরিপে এটাও সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে, অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যুগটা ছিল উত্থানের যুগ—মুসলিম চিন্তার

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য সাফল্যের যুগ। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে দ্রুতগতিতে মুসলিম চিন্তার অবনতি ঘটতে থাকে। এই অবনতির অনেক কারণ ছিল। এদের মধ্যে আল-গাযালি ও ইবনে রুশদের চরম দর্শন, এবং একদিকে স্বজ্ঞাবাদএবং অন্যদিকে চরম বুদ্ধিবাদ ছিল প্রধান। আল-গাযালি ও ইবনে রুশদের স্বজ্ঞাবাদের প্রভাবের ফলে মুসলিম চিন্তা মরমিবাদের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে যায়। অন্যদিকে, বুদ্ধিবাদের প্রভাবের ফলে পাশ্চাত্য চিন্তা জড়বাদের গহ্বরে পতিত হয়। প্রাচ্য যা ধারণ করে রেখেছিল, প্রতীচ্য তা উপেক্ষ করে চলে এবং প্রতীচ্য যা ধারণ করে রেখেছিল, প্রাচ্য তা উপেক্ষা করে চলতে থাকে—ফলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়েরই অন্তরে থেকে যায় অভাব, দুঃখ। প্রকৃত ও আসল জ্ঞানের জন্য স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞা উভয়ের প্রয়োজন। এমন কি, ঐশী দর্শনের আনন্দ ও তার মূল ও আদি জ্ঞানের জন্য স্বজ্ঞার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। মুসলিম দর্শনের এটাই একটা ভ্রান্তি যে, এটা সম্পূর্ণরূপে একটা অন্যটার উপর নির্ভরশীল হয় অথবা উভয়কেই বিচ্ছিন্ন করে রাখে। প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞা একে অপরের সম্পূরক। এই সত্য অনুধাবনের উপরই নির্ভর করে মুসলিম চিন্তার অগ্রগতি ও বিকাশ।

মুসলিম চিন্তার অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, পরবর্তী শাসকগণের জ্ঞান আহরণের জন্য উৎসাহ প্রদানের অভাব। তারা যদি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু করে থাকেন তবে তা হচ্ছে জ্ঞানের অগ্রগতি রোধ। জ্ঞান ব্যক্তির জন্য বিলাস হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য তা অপরিহার্য। একই সত্য প্রাচীন আরব শাসক এবং বর্তমান বড় বড় দেশের নিকট সুবিদিত থাকলেও তাঁদের নিকট তা অপরিজ্ঞাত ছিল। বাগদাদ পতনের পূর্বপর্যন্ত ইসলামের মহান চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিংবা রাজ-আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, আল-রাজি, সামানিদ মনসুর ইবনে ইসহাক সহ বিভিন্ন রাজদরবারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইবনে সিনা ইস্পাহানের আলা আল-দৌলার আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ইবনে মিসকাওয়াহ সুলতান আদুদ-আল-দৌলার কোষাধ্যক্ষ ও বন্ধু ছিলেন। অনুরূপে, ইবনে তোফায়েল আবু ইয়াকুব ইউসুফ-এর উজির, ইবনে বাজা সারগোসার গভর্নর আমীর মন্ত্রী, ইবনে রুশদ আবু ইয়াকুব ইউসুফের চিকিৎসক ছিলেন। ইবনে খালদুন বিভিন্ন রাজদরবারের সচিব ও রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। পরিতাপের বিষয় যে, বাগদাদ পতনের পর কোনো মুসলিম রাষ্ট্র থেকে এই ধরনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় নি।

মুসলিম চিন্তাধারার পতনের তৃতীয় কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী দেশসমূহ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, গণহত্যা সাধিত হয়, পুস্তক ও গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেলা হয়, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জাতি ক্রমশ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সামাজিক ব্যাধি ব্যাপক হারে সমাজে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ মরমি সাধনায় নিজেদেরকে নির্জনে নিয়োজিত রাখেন এবং তাদের বংশধরগণ নৃত্যশীল দরবেশ, পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষক ও উপাসক হিসেবে অধঃপতিত হয়ে যায়। বিরাট সাম্রাজ্য অংশে, অংশসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ

www.pathagar.com

শ্রেণী ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কালের প্রবাহে চিন্তাধারা শৈত্য-আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়, জীবন শীতল হয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েএবং জ্ঞানের আলোকবর্তিতা মুসলিম প্রাচ্য থেকে ক্রিশ্চান প্রতীচ্যে প্রবেশ করে। মিথ্যে মরমি প্রবণতা প্রাচ্যকে বিজ্ঞানে দেউলিয়া করে ফেলেএবং বিজ্ঞানের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায় সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং এরই সাথে ভেঙ্গে পড়ে অর্জিত সব অগ্রগতি ও সাফল্য। যাহোক, তৎকালীন কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ দ্বারা দার্শনিক ঐতিহ্যকে সজীব রাখা হয়। এইসব দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন কাতেবি, সিরোজি, হিলি, ইস্পাহানি, সদর-আল-দিন সিরাজি, আবদুল করিম জিলি, জুরজানি, তাফ্তাজামি, সারামি, জালাল আল-দিন দাউয়ানি, মোল্লা সাবজাউরিএবং আরও অনেকে। তাঁরা সবাই ছিলেন ইরান এবং মধ্য-এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তুর্কির ছিলেন কোপরিযাদেহ, আরো ছিলেন শেখ আহমেদ সারহিন্দি, শিয়ালকোটি, মির-জাহিদ হাসান বিহারি, শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ ও ফাদল-ই-হক খায়রাবাদি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আবদুল করিম জিলি ব্যতীত অন্যকোনো চিন্তাবিদ উচ্চস্থান লাভ করতে পারেন নি। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলিম চিন্তাবিদের সাথে তুলনা করা যায় এমন একজন চিন্তাবিদ হচ্ছেন আবদুল করিম জিলি। যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অধঃপতন শুরু হয়, তবুও সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীকে এশিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে বর্ণনা করা হয়। রাজশক্তির পতনের সাথে চিন্তা ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ও সামান্তরালভাবে চলতে থাকে।

যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নিকট-প্রাচ্যে জামাল-আল-দিন আফগানি এবং ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক প্রবল বৌদ্ধিক আন্দোলন শুরু হয় এবং সেই আন্দোলনই ইসলামে নবজাগণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাঁদের কাল থেকেই জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট পুনর্জাগরণ ঘটে। দর্শনের ক্ষেত্রে আলোড়নের এই ঊর্ধ্বগতি অন্য যে কোনো স্থানের চেয়ে পাক-ভারতে অধিকতর সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হয়। কবি দার্শনিক ইকবালএর নেতৃত্ব দেন। যদিও তিনি কবি ছিলেন, তথাপি বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে নিরপেক্ষ ও সুশৃঙ্খ জ্ঞান লাভ করা। তবে, দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে বস্তুর পরম স্বভাবের ব্যাপক জ্ঞান এবং মূল্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা। অন্যদিকে, বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগতের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে এবং এর অনুগামীদের প্রকৃতির শক্তির উপর সীমাহীন ক্ষমতা অর্পণ করে—সেটা শুভই হোক বা অশুভই হোক। ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমন্বয় সাধনই এসব শক্তিসমূকে প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থে মানব সেবায় কাজে লাগাতে পারে। কোনো জাতিই ধর্ম ও দর্শন ব্যতীত খ্যাতির শীর্ষে উপনীত হতে পারে না।

ইসলামি জগতে জ্ঞানের এই লক্ষণীয় জাগরণ মুসলিমদেরকে তাদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে সহায়তা করুক এবং জীবন ও চিন্তার সর্বস্তরে তাঁরা তাঁদের পুরনো নেতৃত্ব পুনর্গ্রহণ করুক—এই প্রত্যাশা রইলো।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলম, রশীদুল ড. : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (বগুড়া : সাহিত্য কুটির), পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯১
২. আলী, কে. অধ্যাপক : মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন), দশম সংস্করণ ১৯৮৮
৩. আলী, শাহেদ (সম্পাদিত) : ইসলামে চিন্তার বিকাশ, ঢাকা, ১৯৭৪
৪. ইকবাল, মুহম্মদ ড. : ইসলামে ধর্মীয় পুনর্গঠন, অনুবাদ সম্পাদক
৫. ইসলাম, আমিনুল ড. : মুসলিম দর্শন (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), প্রথম প্রকাশ ২১শে ডিসেম্বর ১৯৮৫
৬. কবীর, মফিজুল্লাহ : মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৭
৭. করিম, আবদুল : বঙ্গে সুফি প্রভাব
৮. বজলুর রশীদ, আ.ন. ম. : আমাদের সুফিসাধক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন) প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৭৭।
৯. বরকতল্লাহ, মুহম্মদ : পারস্য পতিভা
১০. মওদুদ, আবদুল : মুসলিম মনীষা (ঢাকা : ১৯৭৪)
১১. নূরনবী :মুসলিম দর্শনের কথা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৩
১২. রহমান, মমতাজুর, অধ্যাপক (সম্পাদক) : ইতিহাসের দর্শন
১৩. লৎফর রহমান, শেখ মুহম্মদ : (ক) আরব জাতির ইতিহাস (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ), তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৬। (খ) ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ, ঢাকা ১৯৭৭
১৪. শরীফ, আহম্মদ : বাঙলার সুফী সাহিত্য (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, মাঘ ১৩৭৫
১৫. হামিদ, আবদুল ড. ও আবদুল হাই ঢালী, মুহম্মদ, ড. : মুসলিম দর্শন পরিচিতি (ঢাকা : পুথিঘর লি,), প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
১৬. হাশেম, এম, এ. : মুসলিম দর্শনের মূলকথা (চুয়াডাঙা : টিপটিপ স্টেশনার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স), দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৭৫
১৭. হুদা, এম. ড. : মুসলিম দর্শনের মূলতত্ত্ব (ঢাকা : ইউরেকা বুক হাউস), পুনর্মুদ্রণ, মে ১৯৯১
18. Ali, K. A. : An Introduction to Islamic Culture.
19. Ameer Ali, S. : The Spirit of Islam, 1947
20. Arberry, A. J : Revelation and Reason in Islam, 1957
21. Amold, S. T : The Legacy of Islam. Oxford, 1931
22. Boer, T. J. De : The History of Philosophy in Islam (translated by E. R. Jones), London, 1961
23. Enaem, M. A : Decisive Moments in the History of Islam, Lahore, 1951.
24. Gibb, H. A. R. : Moderm Trends in Islam, Chicago. 1947.

www.pathagar.com

25. Goldziher. I : Mohammed and Islam, New Haven, 1917.
26. Guilaume, A : The Traditions of Islam, Oxtord, 1924.
27. Hai, S. A : Muslim Philosophy, Dhaka, 1964.
28. Hakim, M. A : Islamic Ideology, Lahore, 1951.
29. Hanif, Ma A: A Survey of Muslim Institution and Culture, Lahore, 1962.
30. Iqbal A, : The Development of Metaphysics in Persia, London, 1958.
31. —The Reconstruction of Religious thought in Islam, Revised Edition, London, 1934.
32. Lewis, B. : The Arabs in History, London, 1950.
33. Macdonald, D. B : Aspects of Islam, New York, 1911.
34. Margoliouth, D. S, : Mohammed and Rise in Islam, New York, 1905.
35. Moulana, M. Ali : The Religion in Islam, Lahore, 1936.
36. Muir, S. William : The Caliphate, its Rise Decline and Fall, Edinburgh, 1924.
37. Nicholson R. A : Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1964.
38. O Leary D. L : Arabic Thought and its Place in History, London, 1954.
39. Sharif M. M : History of Muslim Philosophy, 1963.
40. Saeed Sheikh : Studies in Muslim Philosophy, 1962.
41. Sayed Abdul Hai : Muslim Philosophy. p. 76, 87.
42. Syed M. Navi : Muslim Thought and its Source. p. 34.
43. Rahman : An Introduction to Islamic Philosophy. p. 117.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ক. আল গাযালি

দার্শনিকেরা কিভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন? এ ব্যাপারে দার্শনিকদের যুক্তিগুলোর প্রতি আল-গাযালি'র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কর।

ভূমিকা : 'Tahafat-al-Falasifa' গাযালির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি রচনার মূলে গাযালির যে প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল তা' ছিল ধর্মীয়। তাঁর নিজের বর্ণনা অনুসারে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কতিপয় দার্শনিকের আক্রমণ এবং ধর্মীয় আচারাদিকে দার্শনিক বুদ্ধির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে তাদের ঘোষণা—এগুলোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মূল উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন। গাযালি তাঁর গ্রন্থে বিশটি সমস্যার উত্তর দিয়েছেন। তার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

"Tahafat-al-Falasifa" আলোচনার প্রারম্ভে গাযালি দেখান যে, মানবজাতি তিন দলে বিভক্ত। যথা :

১. সত্যানুসারী দল : এরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ জগৎ সৃষ্ট। আর তারা নিশ্চিত জানেন যে, সৃষ্টবস্তু স্বয়ং উদ্ভূত হতে পারে না। কাজেই এর সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আছে। তারা সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন।

২. জড়বাদী দল : দ্বিতীয় দলকে জড়বাদী দল বলা হয়। তাদের মতে, এ জগৎ বর্তমান অবস্থাতেই অনাদি। এর সৃষ্টিকর্তা থাকার কোনো প্রমাণ তারা পায় নি। যদিও তাদের বিশ্বাসকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণসমূহ বাতিল করে দেয়।

৩. দার্শনিক দল : এরা মনে করে যে, জগৎ অনাদি। এতদসত্ত্বেও তাঁরা এর একটি সৃষ্টিকর্তা আছে বলে দাবি করে। এ মতবাদ স্ববিরোধী। এ মতবাদ খণ্ডন করার প্রয়োজন নেই।

দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ ইচ্ছাময় সত্তা নন; বরং তিনি হলেন জগতের কারণ। তিনিই প্রথম কারণ এবং তিনি নিজে ব্যতীত অন্যসব সৃষ্টির কারণ। অর্থাৎ তার অস্তিত্বের জন্য কোনো কারণ নেই। তাকে এই অর্থেই সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। এরূপ কারণহীন সত্তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে পারে। দার্শনিকগণ বলেন, জগৎ এবং তন্মধ্যস্থিত বস্তুগুলির হয় কোনো কারণ থাকবে নতুবা থাকবে না। যদি এর কারণ থাকে তবে সেই কারণই এর কারণ অথবা এর কোনো কারণই নেই। এই প্রকার যুক্তি কারণের কারণ সম্বন্ধেও বলা যায়। এরপর হয় (ক) এ অশেষভাবে চলতে থাকবে যা অসম্ভব; নতুবা (খ) একদিকে গিয়ে শেষ হবে। সর্বশেষটিই প্রথম কারণ। এর

www.pathagar.com

অস্তিত্বের জন্য অপর কোনো কারণ নেই। দার্শনিকগণ একে প্রথম কারণ বলেন। আর যদি জগত স্বয়ং বিনা কারণে অস্তিত্ববান হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম কারণ প্রকাশ পেয়েছে। এরদ্বারা কারণহীন অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যতীত আর কিছুই অর্থ করে না। এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে অস্তিত্ববান।

আকাশসমূহ প্রথম কারণ হতে পারে না। কারণ এরা বহুসংখ্যক ও একত্ববাদের প্রমাণ একে বাধা দেয়। কাজেই এর অসারতা প্রথম কারণের গুণের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। কারণহীন সত্তা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত। মতভেদ কেবলমাত্র তাঁর গুণে। একেই দার্শনিকগণ প্রথম কারণ বলেন।

দার্শনিকদের উপরোক্ত যুক্তির উত্তর গাযালি দিয়েছেন নিম্নভাবে :

প্রথমত, দার্শনিকদের মতবাদ প্রতিপন্ন করার জন্য জগতের বস্তুগুলির অনাদি হওয়া দরকার। এ প্রকারে এদের কোনো কারণও থাকবে না। অর্থাৎ কারণকে অস্বীকার করলে, দার্শনিকদের মতে, ফলকেও অস্বীকার করা হয়।

দ্বিতীয়ত, অনুমান দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সৃষ্টির একটি কারণ আছে। এবং কারণের কারণ আছে এবং এর কারণের যে কারণ আছে। এ প্রকারে অশেষ পর্যন্ত; তাছাড়া দার্শনিকদের শেষহীন কারণ খণ্ডনীয়। কেননা এখানে স্বতঃসিদ্ধতার দাবি করার কোনো পথই নেই।

গাযালি দেখান যে, যার শেষ নেই তার যদি সৃষ্টিতে প্রবেশ সিদ্ধ হয়, তবে এদের একটি অপরটির কারণ হতে কোনো বাধা থাকে না। এটা শেষপ্রান্ত হতে এমন ফলে পৌঁছাবে যার আর কোনো ফল নেই। অপরদিক হতে এটা সর্বশেষ কারণহীন কারণে পৌঁছে না। যেমন অতীতকালের শেষ আছে আর তা হলো 'এই মুহূর্ত' এর কোনো আদি নেই। কাজেই দার্শনিকগণ যদি মনে করেন যে, অতীত ঘটনাবলি একত্রে বর্তমানে অথবা সময়ের কোনো এক কালে বা অবস্থায় বর্তমান নেই এবং অস্তিত্বহীনকে সীমা বা সীমাহীনতা দ্বারা বিশেষিত করা যায় না; তাহলে মানুষের দেহ হতে বিচ্ছিন্ন প্রাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, এ ধ্বংস হয় না।

গাযালি বলেন, কারণ হলো স্বাভাবিকভাবেই ফলের পূর্বগামী। যেমন বলা হয়, এটা সত্তা হিসাবে ফলের উপরে, স্থান হিসাবে নয়। যদি এটা কালগত প্রকৃতি 'পূর্ব' সম্পর্কে অসম্ভব না হয়, তাহলে সত্তাগত প্রকৃত 'পূর্ব' সম্পর্কেও অসম্ভব না হওয়া উচিত। দার্শনিকরা স্থান হিসাবে অশেষভাবে একটির উপর আর একটি বস্তু জায়েজ মনে করে না, অথচ সৃষ্টজগতকে সময় হিসাবে অশেষভাবে একটির পর একটি সিদ্ধ মনে করে— এর কোনো ভিত্তি নেই।

দার্শনিকগণ বলেন, কারণের অশেষ অনুগমনের অসম্ভব হওয়া সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ এই যে, কারণসমূহের এককগুলির প্রত্যেকটি এককই নিজে সম্ভব অথবা অবশ্যম্ভাবী। যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে এর কারণের প্রয়োজন নেই। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে সেই সমগ্রই যার অংশ তা সম্ভাব্যতার বিশেষণে বিশেষিত হতে হবে। সমগ্রই সম্ভব; কাজেই সমগ্রের জন্যই এর সত্তার অতিরিক্ত কারণের প্রয়োজন আছে। কাজেই সমগ্রেরও এর বহিঃস্থ কারণ আছে।

www.pathagar.com

গাযালি বলেন, প্রত্যেক বিভিন্ন কারণই এমন অর্থে সম্ভব; সেই অর্থ এই যে, সত্তা ব্যতীত এর সম্ভব নয়। অর্থাৎ সমগ্রের সত্তার বহিঃস্থ কোনো কারণই নেই। কেউ যদি অনাদি সৃষ্টবস্তু সম্ভব বলে মনে করে, যা চারটি উপাদানে গঠিত আকৃতি বিশিষ্ট এবং পরিবর্তনশীল, তাহলে কারণের অশেষ অনুগমন অস্বীকার করার কোনোই সম্ভাবনা থাকে না। এতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই অসুবিধার জন্য প্রথম কারণ প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই। কাজেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাদের ধারণা নিছক কল্পনাপ্রসূত।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, গাযালি আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণে দার্শনিকদের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ককে অস্বীকার করেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং এর যাবতীয় গতি-প্রকৃতি আল্লাহ্ দ্বারা পরিচালিত। আল্লাহ্ 'অতি প্রাকৃত' সর্বশক্তিমান সত্তা। তিনি পরিচালিত তার নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা। প্রাকৃতিক কার্যকরণ ও এর অনিবার্যতা দ্বারা নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই জগৎ ও নভোমণ্ডলের সব সত্তার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে। তাঁর 'সার্বভৌম ইচ্ছায়ই' পরিভ্রমণ করে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং তারই ইচ্ছায় কার্যকর হয় প্রাকৃতিক কার্যকারণ প্রক্রিয়া। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং তিনি প্রাকৃতিক কার্যকারণের অনিবার্যতার অধীন নন—এ থেকে কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, এ মত মেনে নিলে সবকিছুই সম্ভব, এবং কোনো কিছু সম্পর্কেই নিশ্চিত করে কিছু জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছামতো যে কোনো ঘটনা ঘটাতে এবং যে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ তিনি কোনো কার্যকারণ বিধির অধীন নন। উত্তরে গাযালি বলেন, এ ধরনের অদ্ভুত ও উদ্ভট কোনো কিছু ঘটবে বলে মনে করায় তখনি যখন আমরা ভাববো যে, এসব ঘটনার পূর্বাপর অবস্থা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই থাকবে না। কিন্তু এ ধরনের ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন, আর সেজন্যই আমরা এদের সম্ভাব্য বলেই গ্রহণ করতে পারি,প্রকৃত বলে নয়। এরা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে।

আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে আল গাযালির মতবাদের সমালোচনামূলক আলোচনা

আল গাযালির লিখিত গ্রন্থের মধ্যে 'তাহাফাতুলে ফালাসিফা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থটি রচনার মূলে গাযালির যে প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল তা স্পষ্টতই ধর্মীয় বলা যায়। তাঁর নিজের বর্ণনানুসারে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কতিপয় দার্শনিকের আক্রমণ ও ধর্মীয় আচরণাদিকে দার্শনিক বুদ্ধির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে তাদের ঘোষণা; এগুলোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মূল উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেন এ গ্রন্থ। দার্শনিকদের যে সমস্ত অসংগতির কথা গাযালি উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে আল্লাহ্র একত্ব প্রমাণ একটি। তিনি কিভাবে আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কীয় দার্শনিকদের মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেন এবং নিজের মত ব্যক্ত করেন তা আমরা এখানে আলোচনা করব।

আল্লাহ্র একত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণ ও গাযালির মতবাদ :

দার্শনিকরা আল্লাহ্র একত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাদের মতে, আল্লাহ্র কোনো সদর্থক গুণ আরোপ করা যায় না, কারণ তাতে উদ্দেশ্য বিধেয় দ্বৈততা দেখা যায়। আল্লাহ্ চিন্তার সব ক্যাটাগরিমুক্ত। এভাবে ঐশী একত্বে একচ্ছত্র গুরুত্বারোপ এবং

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে সবরকম গুণ বিবর্জিত মনে করার অর্থই হলো তাকে উপাত্তবিহীন একটি নিছক নামে পরিণত করা। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ হয়ে যান অবোধ্য ও অবর্ণনীয়। আর দার্শনিকদের একত্ববাদী রূপান্তরবাদ আল্লাহ্‌কে পরিণত করেছিল ঠিক তেমনই একটা অসার বিমূর্ত সত্তায়। আল্লাহ্ চিন্তাকারী চিন্তা, তিনি যা জানেন তা থেকে সৃষ্টি হয় সবকিছু। কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারেন না। অভাববোধ থেকেই ইচ্ছার উৎপত্তি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোনো অভাববোধ থাকতে পারে না। দার্শনিকরা আল্লাহ্‌র একত্ব ও অদ্বিতীয় এবং কারণহীন দু'টি অবশ্যম্ভাবী সত্তা কল্পনার অসিদ্ধতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যাপারে তাদের যুক্তি দুই প্রকার। যথা—

প্রথমত, দার্শনিকরা বলেন, সৃষ্টিকর্তা দুই হলে এতে অবশ্যম্ভাবী সত্তার জাতি বুঝাবে এবং এর প্রত্যেকটির উপর বর্তাবে। একথা বলা হয় না যে, তিনি অবশ্যম্ভাবী, কাজেই তাঁর সত্তার জন্য অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে এ অপরের জন্য কল্পনা করা যায় না। অথবা অবশ্যম্ভাবীর কারণ থাকলে অবশ্যম্ভাবীর সত্তাই ফল হবে। তাহলে এর ফলও অবশ্যম্ভাবী হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমরা অবশ্যম্ভাবী বলতে ঐ সত্তা ব্যতীত অন্যকিছু বুঝি না। যা অস্তিত্ব কারণ যা অন্যকিছুর সহিত যে কোনো প্রকারেই হোক সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, দার্শনিকগণ বলেন, যদি আমরা দু'টি অবশ্যম্ভাবী সত্তা ধরে নেই, তাহলে ঐ দু'টি পরস্পর সর্বতোভাবে সমান হবে অথবা বিপরীত হবে। যদি সর্বতোভাবে সমতুল্য হয়, তাহলে সংখ্যা বা দ্বৈতকল্পনা করা যায় না। যেমন—কৃষ্ণতা দুই স্থানে অথবা একই স্থানে দুই সময় থাকলে দু'টিই হয়। অথবা কৃষ্ণতা ও গতি একই স্থানে একই সময়ে থাকলেও তাদের সত্তার বিভিন্নতার জন্য এরা দু'টি বস্তু। আর যদি সত্তা বিভিন্ন না হয়, যথা দু'টি কৃষ্ণতা একই স্থানে একই সময়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারেই এই কথা বলা চলত যে,এরা দুই ব্যক্তি বা বস্তু। কিন্তু এদের দু'টির মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।

তবে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, পার্থক্য ব্যতীত কোনো বস্তুর কল্পনা করা যায় না। আর সর্বতোভাবে দুটি সমতুল্য বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। কিন্তু দার্শনিকদের মত, এই শ্রেণীর গঠন প্রথম কারণে অসম্ভব। এ শুধু একটি একতরফা সিদ্ধান্ত। এর কোনো প্রমাণ নেই।

দার্শনিকদের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধি আছে এই যে, প্রথম কারণ যেমন ব্যাখ্যাকারী শব্দ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় না, তেমনি সংখ্যা দ্বারাও হয় না। এই মতবাদের উপরই তাদের আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা আরও মনে করেন যে, সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি না স্বীকার করা যায় যে, আল্লাহ্ সর্বতোভাবে এক। সর্বতোভাবে একত্ব সর্বতোভাবে বহুত্বকে নির্দিষ্ট করে। পাঁচ প্রকার সত্তার উপর বহুত্ব আরোপ হতে পারে।

প্রথমত, কোনো বস্তু কার্যত বা কল্পনা মূলে বিভাজ্য হওয়া। এজন্যই কোনো একটি বস্তু সর্বতোভাবে এক নয়। কেননা এ কেবলমাত্র বস্তুতে অবস্থিত মিলনশক্তি দ্বারাই সুন্দর হয়। তা প্রথম কারণের জন্য অসুন্দর।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, যদি কোনো বস্তু কল্পনায় দু'টি বিভিন্ন ভাব দ্বারা, সংখ্যা দ্বারা নয়, বিভক্ত হয়। যথা—বস্তু উপাদান ও আকারে বিভক্ত। এই দুইয়ের সম্বন্ধে একটি বস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্ সম্পর্কে আকার ও উপাদানের ধারণা কল্পনা।

তৃতীয়ত, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা প্রভৃতির কল্পনা দ্বারা আধিক্য সূচিত হয়। কেননা এই সমস্ত বিশেষণ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে এগুলোর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আর সত্তা ও বিশেষণ পরস্পরের অংশীদার। কাজেই অবশ্যম্ভাবিতায় আধিক্য দেখা দেয় ও একত্ব বিনষ্ট হয়।

চতুর্থত, যুক্তিগত আধিক্য। এটা জাতি ও শ্রেণীর মিশ্রণ দ্বারা পাওয়া যায়। যথা—প্রাণিত্ব যুক্তিগতভাবে মনুষ্যত্ব নহে। কেননা মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণি। প্রাণি জাতি আর 'বাকশক্তিসম্পন্ন" শ্রেণী নিরূপক বিশেষণ। কাজেই 'মানুষ' জাতি ও শ্রেণী নিরূপক বিশেষণ দ্বারা গঠিত। এই শ্রেণী বহু। কাজেই দার্শনিকগণ মনে করেন যে, এটা প্রথম কারণের জন্য নিষিদ্ধ।

পঞ্চমত, বস্তুর প্রকৃতি কল্পনা এবং ঐ প্রকৃতির অস্তিত্ব কল্পনার দিক হতে আধিক্য এসে পড়ে। কেননা মানুষের অস্তিত্বের পূর্ব হতেই এর প্রকৃতি বর্তমান। এই প্রকৃতির সঙ্গেই তার সৃষ্টি সম্পর্কিত হয়। আর যদি অস্তিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে সহ অবস্থিত হতো, তাহলে জ্ঞানে প্রকৃতির অবস্থিতির কথা এর অস্তিত্বের পূর্বে কল্পনা করা যেত না।

দার্শনিকরা মনে করেন এই শ্রেণীর পার্থক্য প্রথম কারণের থাকা উচিত নয়। কাজেই এর সাথে তার অস্তিত্বকে সম্পর্কিত করার প্রশ্ন ওঠে না। এ সত্ত্বেও দার্শনিকরা বলেন যে, 'আল্লাহ্ হচ্ছেন কারণ, অস্তিত্ব বা সত্তামূলক বস্তু, শাশ্বত চিরস্থায়ী, জ্ঞাতা, জ্ঞান, বুদ্ধিমান, চিরজীবী, প্রেমিক, মহানুভব ইত্যাদি। তাঁরা বলেন, এসবই একটি মাত্র ভাবসূচক শব্দগুলো কিভাবে আল্লাহ্র উপর প্রযোজ্য তা আমরা দু'একটি দৃষ্টান্ত থেকে বুঝে নিতে পারি। যেমন (১) আল্লাহ্কে কারণ বলার অর্থ সবকিছু তার থেকে সৃষ্ট। তিনি সবকিছুর কারণ। (২) তাঁকে অস্তিত্ববান বলার অর্থ তিনি সু-প্রকাশিত। (৩) তাকে জ্ঞান বলার অর্থ তিনি বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা। এইপ্রকার গুণসম্পন্ন বস্তুই জ্ঞান। আল্লাহ্তায়ালার সত্তার এটা বিশেষণ অর্থাৎ তিনি উপাদানমুক্ত। কাজেই তিনি জ্ঞানময়। তাকে চিরস্থায়ী বলার অর্থ তা হতে তার পরবর্তী অনস্তিত্বের বিয়োজন অর্থ বুঝায়, যা অন্যান্য অস্তিত্বশীলের বেলায় তার অস্তিত্বের শেষে আসে। এইভাবে প্রত্যেকটি ভাবসূচক একত্বই প্রমাণিত হয়।

দার্শনিকদের উপরোক্ত যুক্তির প্রেক্ষিতে গাযালি বলেন যে, তাঁদের মতবাদ বুঝতে হলে তাঁদের এই ব্যাখ্যা বুঝা দরকার যে, প্রথম কারণের সত্তা এক। কিন্তু বহুত্বের সৃষ্টি হয় এর দিকে বস্তু সংশ্লিষ্ট করে অথবা বস্তুর সঙ্গে একে সংশ্লিষ্ট করে কিংবা তা' হতে কিছু বাদ দিয়ে অথবা বস্তুকে তা হতে বাদ দিয়ে। এই বাদ দেয়া কাজটি দ্বারা নিয়োগকৃত বস্তুতে বহুত্ব বুঝায় না। কাজেই তাঁরা বিয়োজিত ও সম্পর্কিত বস্তুর বহুত্ব দ্বারা বহুত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু এইসমস্ত বিষয় খণ্ডনের ব্যাপারে সবই বিয়োজন ও সংযুক্ত।

www.pathagar.com

গাযালি আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহ্ পরম অস্তিত্বশীল সত্তা। তিনি জগতের চূড়ান্ত কারণ ও সবসত্তার ভিত্তিস্বরূপ। তিনি স্বয়ং অস্তিত্বশীল ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি কোরআনে উল্লিখিত সবগুণের অধিকারী। আল্লাহ্‌র স্বরূপ সহজবুদ্ধি কিংবা যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এসব গুণ আধ্যাত্মিক স্বভাবের এবং সে কারণেই প্রচলিত অভিজ্ঞতার জগতের বস্তু ও ঘটনারাজি থেকেএরা স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে কল্যাণময় পরমসুন্দর এবং তিনি প্রেমের চূড়ান্ত লক্ষ্যস্বরূপ। তিনি সব আলোকের আলোক, অনন্ত প্রজ্ঞা, পরম সৃষ্টিশীল সত্য এবং অনন্ত ইচ্ছাশক্তিস্বরূপ।

দার্শনিকদের কাছে আল্লাহ্ প্রধানত চিন্তা বা বুদ্ধি; কিন্তু গাযালির বিবেচনায় আল্লাহ্ এমন একটি ইচ্ছাশক্তি যা সব সৃষ্টিক্রিয়ার উৎস আকর ও কারণ। স্বর্গে ও মর্ত্যে যা কিছু তাঁর ইচ্ছাবলে। ইচ্ছা থেকেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এ জগৎ, ইচ্ছা দ্বারাই তিনি করছেন এর সংরক্ষণ এবং তারই ইচ্ছায় একদিন তা হয়ে যাবে বিলীন।

গাযালি আল্লাহ্‌কে দেখেছেন একটি অতিবর্তী সত্তা হিসাবে। আল্লাহ্ দেশকালের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে পরম মহিমায় বিদ্যমান; কারণ দেশকালের আবির্ভাবের আগে থেকেই তিনি ছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি জগতের বাইরেই আছেন। আল্লাহ্ দেশকালের পৃথিবীর অন্তর্বর্তীও বটে। তিনি জগতের বাইরে যেমন আছেন, তেমনি আবার জগতেও আছেন। তাঁর অনন্ত বিজ্ঞতা ও পরম সৌন্দর্য অভিব্যক্ত হয় তাঁরই বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আমাদের চারিদিকের সর্বত্র আল্লাহ্‌র স্পর্শ ও প্রকৃতি বিদ্যমান। পরম স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রাণবন্ত। সৃষ্টির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে এবং তা রয়েছে বলেই ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রার্থনা, আরাধনা তথা মরমি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নিকট-সম্বন্ধে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, প্রকৃতি জগতে আমরা যে শৃংখলা নিয়মানুবর্তিতা ও কার্যকারণ নিয়মের উপস্থিতি লক্ষ্য করি, এবং এক ধরনের সত্তা যে তাদের চেয়ে উচ্চতর সত্তার সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয়ে আছে তা যখন উপলব্ধি করি তখন পৃথিবী পরিচালনায় জ্ঞান নামক গুণটির উপস্থিতিও আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ সেই অনাদি ও অনন্তকাল থেকেই এই জ্ঞানের অধিকারী।

মানবাত্মা সম্পর্কে গাযালির ধারণা অথবা গাযালির আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদের আলোচনা

আত্মা একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ—এর স্বপক্ষে দার্শনিকগণ যথার্থ মতবাদ দিতে পারেন নি। গাযালির মতে মানবাত্মা পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিজীব বা বস্তু হতে স্বতন্ত্র। দৈহিক গুণাবলির মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না।

দেহ ও মনের মধ্যে যে সম্পর্ক তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। দেহ ও আত্মা উভয়ই অমর। এইজন্য যে মৃত্যুর পর আবার তাদের পুনরুত্থান হবে। দার্শনিকগণ বলেন যে, কেবল আত্মা অমর ও দেহ নশ্বর। মৃত্যুর পর আত্মা World soul এ গিয়ে

www.pathagar.com

মিলিত হবে। গাযালি বলেন যে, জন্মের সময় শিশুর দেহ-আত্মার যে মিলন মৃত্যুর পরও দেহ আত্মার এ মিলন অস্বাভাবিক নয়।

এ বিষয় আলোচনা করার পূর্বে জৈবিক ও মানবিক শক্তিসমূহ সম্বন্ধে দার্শনিকদের মতামত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। দার্শনিকদের মতে জৈবিক শক্তি দু'শ্রেণিতে বিভক্ত (১) গতি উৎপাদক ও (২) অনুভবকারী।

অনুভবকারী শক্তি আবার দু'প্রকার। ১. বাহ্যিক ও ২ আভ্যন্তরীণ। আভ্যন্তরীণ শক্তি তিনটি। ক. কল্পনাশক্তি খ. বোধশক্তি গ. যে শক্তিকে ইতর প্রাণির মধ্যে ধারণাশক্তি ও মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি বলা হয়।

মানুষের আত্মা বাকশক্তিসম্পন্ন। মাবাত্মার দু'টি শক্তি আছে। ১. জ্ঞানশক্তি, ২. কর্মশক্তি। জ্ঞানশক্তি দ্বারা আত্মা ফেরেশতাদের নিকট থেকে পৃথক জ্ঞান লাভ করে। একে চিন্তাশক্তি বা কিয়াসও বলা হয়। কর্মশক্তি মানবদেহকে কোনো গঠনমূলক কর্মের দিকে উত্তেজিত করে। এই শক্তি হতে যাবতীয় শক্তি শিক্ষা লাভ করে।

আত্মা একটি স্বয়ং আধ্যাত্মিক পদার্থরূপে বর্তমান থাকা যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিকদের এ মতের বিরুদ্ধে গাযালি প্রতিবাদ করেন। দার্শনিকগণ আত্মা সম্পর্কে ১০টি প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

প্রথম প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন যে, মানুষের সীমিত জ্ঞানের মধ্যে অবিভাজ্য একক রয়েছে। ভালবাসা, ভয়ভীতি বা আবেগ এগুলো অবিভাজ্য একক। অর্থাৎ বিভাজ্য নয়। যদি জ্ঞানের স্থান অবিভাজ্য হয় তাহলে জ্ঞানও অবিভাজ্য হবে। অর্থাৎ জ্ঞানের স্থান বস্তু নয়।

আশারীয়াদের মতে জ্ঞানের মধ্যে অবিভাজ্যতা থাকবে এটা গাযালি স্বীকার করেন না। ইতর প্রাণিরা দৈহিক শক্তি দ্বারা জ্ঞান অর্জন করে। দৈহিক শক্তি আবার পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অর্জন করা হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় স্থান সাপেক্ষ। স্থান সাপেক্ষ থাকলেই বিভাজ্যতার প্রশ্ন থাকবে। অভিজ্ঞতার ছাপ প্রাণি মানসে থাকে। এই জ্ঞান হলেই যে তা অবিভাজ্য হবে এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু বিভাজ্য। একটি ছাগল নেকড়ে দেখলে পালিয়ে যায়। অনুভূতি ও নেকড়ের শত্রুতার অভিজ্ঞতার ছাপ তার মনে আছে। এ জন্য গাযালির মতে দার্শনিক যে প্রমাণ দিয়েছেন তা ধারণাকে দূর করে মাত্র কিন্তু নিশ্চিত জ্ঞানরূপে স্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন যে, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞাতার কি ধরনের সম্পর্ক হবে? তাদের মতে জ্ঞানের সাথে জানা বিষয়ের সম্পর্ক হবে নিম্নরূপ (১) হয় সম্পর্কটি জ্ঞানের অংশসমূহের প্রতিটি অংশের সাথে সম্পর্কিত হবে, (২) স্থানের কতক অংশের সাথে সম্পর্কিত হবে কি হবে না, (৩) কোনো অংশের সাথে সম্পর্কিত হবে না।

এ হতে জানা যায় যে, পঞ্চেন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট অনুভূতিগুলো বিভক্ত আংশিক বিষয়ের অনুকৃতি ব্যতীত কিছু নয়; এখানে জ্ঞানের পরিমাণের বিষয় হয়।

গাযালি বলেন, যখন কোনো কিছু থেকে জ্ঞান হয় তখন আ বস্তুর প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইচ্ছা অনুভূতি ছাড়া জ্ঞান হয় না। আমরা হাত দ্বারা লিখি বলেই জ্ঞানটা আমাদের হাতে নেই আছে মস্তিষ্কে। হাত কেটে গেলে জ্ঞান নষ্ট হয় না। তাই

www.pathagar.com

জ্ঞানের পরিমাণ করা যায় না। দার্শনিকগণ বলেন, জ্ঞান কোথায় আছে তা আমরা বলতে পারি না। গাযালি বলেন, যদিও আমরা জ্ঞানের উৎস নির্দেশ করতে পারি না তবুও জ্ঞান যে আত্মা হতে নিঃসৃত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তৃতীয় প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন, মানুষের জ্ঞানী হওয়া একটি মোটামুটি গুণ; এটা বিশেষ জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত নয়। গাযালি বলেন, রহিম ঢাকায় আছে বলে এই নয় যে, সে ঢাকার সবজায়গায় আছে। তিনি বলেন, আত্মা অনুভূতি ও দেহের সাথে সম্পর্কিত। তাই আত্মাই জ্ঞানের উৎস, আত্মা দেহের একটি কেন্দ্রস্থলে রয়েছে।

চতুর্থ প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন, জ্ঞান ও মূর্খতা এক সাথে থাকতে পারে না। একই জিনিস এক সাথে আছে বা নেই তা হতে পারে না। ঠাণ্ডা মেজাজে রাগ থাকতে পারে না। জ্ঞানের বেলায় আলোর সাথে অন্ধকার পাশাপাশি আসতে পারে। তা না হলে আলো অন্ধকারের পার্থক্য করা যায় না।

গাযালি বলেন, জ্ঞান এমন একটা জিনিস যা গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায় না। জ্ঞানের বিভাজ্যতার ছাপ মাঝে মাঝে দেয়া যায়। ইচ্ছাশক্তিকে গাযালি বেশি প্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, এগুলো ছাড়া জ্ঞান হয় না। রহিম ঢাকায় থাকার অর্থ এই নয় যে, সে ঢাকার সব জায়গায় আছে। বাংলা ও ইংরেজি যদিও আলাদা ভাষা তবুও এক ব্যক্তির পক্ষে তা জানা সম্ভব। জ্ঞানের বেলায় দু'টো বিপরীত গুণ পাশাপাশি থাকতে পারে।

পঞ্চম প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন যে, জ্ঞান যদি দৈহিক যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞানগ্রাহ্য বস্তু অনুভব করে তাহলে সে নিজেকে জানতে সক্ষম না। কিন্তু অনুক্রম অসম্ভব। কারণ জ্ঞান নিজেকে জানে। অতএব, পূর্বও অসম্ভব।

গাযালি বলেন, বস্তুকে দেখার সময় অনুভূতি দিয়ে জ্ঞান সৃষ্টি হয়। কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বস্তুর সংযোজনে না আসা পর্যন্ত কার্যকরী হয় না। এসব বস্তুর সংযোজন এসেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর অনুভূতি হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় যেমন একাধিক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তেমনি নিজের সম্বন্ধেও অনুভূতি লাভ করে।

ষষ্ঠ প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন যে, জ্ঞান যদি দৈহিক যন্ত্র দ্বারা অনুভব করত, যেমন দৃষ্টিশক্তি করে, তাহলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তার যন্ত্রকে অনুভব করতে অক্ষম হতো। মস্তিষ্ক, হৃদয় ও অন্যান্য যেগুলোকে তার যন্ত্র বলা হয় তারা সবাই অনুভব করে।

গাযালি বলেন, দৃষ্টির পক্ষে তার স্থানকে দেখা অসম্ভব নয়। মানুষের প্রাণের অনুভূতি তার অজানা নয়। আমরা কেউ নিজ সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ নই। তিনি বলেন, মানুষ সর্বদা প্রাণ দ্বারা নিজেকে অনুভব করে। তবে তার হৃৎপিণ্ড তার আকৃতি, গঠন প্রভৃতি তার অনুভূতির অন্তর্গত নয়। মানুষই নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেয়, তবে ঘ্রাণ অনুভূতির স্থান সে নির্দিষ্টভাবে জানে না।

সপ্তম প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন, দেহের শক্তি বৃদ্ধ বয়সে দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধির চর্চা করলে তা আরো বাড়ে। বেশি মিষ্টি খাওয়ার পর কম মিষ্টি—মিষ্টি লাগে না।

গাযালি বলেন, বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় এ কথা ঠিক নয়। কেননা, অনেক সময় মস্তিষ্কের দুর্বলতার জন্য বুদ্ধি লোপ পায়। কারণ, মস্তিষ্কের সাথে জ্ঞানের যে কোনো যোগ নেই একথা বলা যায় না।

www.pathagar.com

অষ্টম প্রমাণ : এই প্রমাণে দার্শনিকগণ বলেন যে, ৪০ বৎসরের পর মানুষের দেহের যন্ত্রাংশ দুর্বল হতে থাকে। অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণশক্তি ও অন্যান্য শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু জ্ঞানশক্তি ৪০ বৎসর পর বহুক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়।

গাযালি বলেন, শক্তির ক্ষয় ও বৃদ্ধির অসংখ্য কারণ আছে। জ্ঞান অপেক্ষা দৃষ্টি-শক্তির দুর্বলতা আসার অন্যতম কারণ হলো দৃষ্টিশক্তি মানুষের মনের সাথেই হয়, অথচ ১৫ বা ততোধিক বয়স্ক না হলে জ্ঞান পূর্ণতা পায় না। দাড়ির আগে চুল পাকার কারণ হলো চুলের জন্ম আগে।

নবম প্রমাণ : দার্শনিকদের বক্তব্য হলো যে, দেহ তার যাবতীয় গুণসহ কিরূপে মানুষ হয়। দেহ সর্বদা ক্ষয় হয় আর খাদ্য সেই ক্ষয়ের স্থান অধিকার করে। তাদের মতে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব আছে আর দেহ তার যন্ত্রমাত্র।

গাযালি প্রতিবাদ করে বলেন, দেহের যন্ত্রের ক্ষয় হলেও এমন অনেক জিনিস আছে যা ক্ষয় হয় না। মানুষ যদি ১০০ বছর বাঁচে তাহলে নিশ্চিতভাবে তার দেহের পিতৃবীর্যের কিছু অংশ থাকে।

দশম প্রমাণ : অনুভবযোগ্য সূত্রহীন সার্বিকতা জ্ঞানগ্রাহ্য এবং তার জ্ঞানেই বর্তমান। ঐ জ্ঞানগ্রাহ্য সার্বিকতার কোনো নিদর্শন আকৃতি বা পরিমাণ নেই।

গাযালি বলেন, একবার পানি দেখে তার স্মৃতিতে একটা বিশিষ্ট প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার পানি দেখলে অপর অপ্রকৃতির উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেক পানির একবারের জন্য যে প্রতিকৃতি তার স্মৃতিতে হয়ে যায় তাই সঠিক জ্ঞান। গাযালি বলেন, সবকিছু সার্বিকতার পর্যায়ে পড়ে না। বিশেষ কোনো ব্যাপার সার্বিকভাবে জানতে হয়। কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে তার শক্তি প্রবিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ, মানুষের আত্মা ঐশীশক্তির অধিকারী। কোরআনে আরও বর্ণিত আছে যে, যে নিজেকে চিনেছে সে তার আল্লাহ্‌কে চিনেছে। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে গাযালি প্রমাণ করতে চান দেহের সঙ্গে জ্ঞানের বা আত্মার যে কোনো যোগ নেই তা প্রমাণিত হয় না। গাযালি প্রমাণ করতে চান যে, দেহনিরপেক্ষ আত্মার অস্তিত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই।

দার্শনিক ও গাযালির এই বাদানুবাদের মধ্যে উভয়পক্ষেই একটা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিকগণ দেহের সঙ্গে আত্মার কোনো যোগ অস্বীকার করেন। আমাদের মনে হয় উভয় মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্য রয়েছে। মানবাত্মার দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকলেও তার মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় সত্তা রয়েছে। এই স্থান-কাল ও দেহ পেরিয়ে সে নানা বিষয়ে কার্যকরী থাকতে পারে।

দৈহিক পুনরুত্থানে আত্মার দেহে পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দার্শনিকদের অস্বীকৃতি আল গাযালি কিভাবে খণ্ডন করেন

ভূমিকা : দার্শনিকগণ পরকালকে স্বীকার করেন। তবে তারা কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত পরকালে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন, পরকাল হবে আত্মিক ব্যাপার। এতে কোনো দৈহিক ঘটনা সংঘটিত হবে না। পরকালের সুখ-দুঃখ আত্মারই সুখ-দুঃখ বলে তা হবে জ্ঞানগত। দার্শনিকগণ দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেন। তাদের

www.pathagar.com

মতে মাটির দেহটি মাটিতে মিশে গেলে তা আবার নতুন করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কেননা তাদের বুদ্ধিতে এ বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না। গাযালি দার্শনিকদের এ মতের বিরুদ্ধে কতকগুলো কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত যুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন দৈহিক পুনরুত্থান যেভাবেই হোক না কেন আল্লাহ্‌র পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

শরিয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দার্শনিকদের কিছু মতবাদ : দার্শনিকরা পরকাল সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ পোষণ করেন, তাদের কতিপয় মতবাদ শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন :

(১) পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মাগুলো চিরকাল সুখে থাকবে।
(২) জ্ঞানে অপূর্ণতা আত্মাগুলো চিরদুঃখী হবে।
(৩) অস্থায়ী দুঃখ পাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত অথচ পাপী আত্মাগুলো।

পরকাল সম্পর্কে দার্শনিকদের শরিয়তবিরোধী মতবাদ

দার্শনিকগণ পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান, দেহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাছাড়া কোরআন ও হাদিসে পরকালে মানুষের জন্য বেহেশত-দোযখের অফুরন্ত সুখ-দুঃখ, সুস্বাদু ফলরাজি, সুপেয় পানীয়, হুর ইত্যাদির যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে সে সকল নেয়ামতের কথাও দার্শনিকগণ প্রত্যাখ্যান করেন। মৃত্যুর পর আমাদের এই রক্তমাংসের দেহে পুনরায় আত্মার প্রতিষ্ঠাকে দার্শনিকগণ জ্ঞানবিরোধী বলে মনে করেন। দার্শনিকরা মনে করেন দৈহিক ভোগবিলাসের চেয়ে জ্ঞানের মাধ্যমে সুখ লাভ করাই শ্রেষ্ঠতর।

গাযালির অভিমত

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ অপেক্ষা জ্ঞানগ্রাহ্য সুখ যে অধিকতর শ্রেয় গাযালি দার্শনিকদের এ মত সমর্থন করেন। কিন্তুসেই সাথে গাযালি পরকালে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের কথাও স্বীকার করেন। গাযালির মতে জ্ঞানগ্রাহ্য সুখ দুঃখ তো রয়েছে সেই সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখও রয়েছে। গাযালি বেহেশত-দোযখ এবং এসবের সুখ-দুঃখ তথা হুর, সুস্বাদু পানীয়, কঠিন শাস্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোরআন হাদিসের বর্ণনাকে রূপক অর্থে ব্যবহার না করে ভাষাগত অর্থে গ্রহণ করা ওয়াজেব বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

দার্শনিকদের দৈহিক পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির প্রথম মতবাদ :

পরকাল সম্বন্ধে দার্শনিকদের কোনো কোনো মতবাদ শরিয়তের সাথে মিল থাকলেও তারা মনে করেন যে, জ্ঞানের সাহায্যে দৈহিক পুনরুত্থানকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁদের মতবাদ তিনটি পর্যায়ভুক্ত।

১. একটি জিনিস ধ্বংস করে ঐ জিনিসটির উপাদান দ্বারা অন্য আর একটা নতুন জিনিস সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু পূর্বের সেই জিনিসটি সৃষ্টি করা যায় না। যেমন, মোমবাতি গলে গেলে পুনরায় মোমবাতি তৈরি করা যাবে। কিন্তু পূর্বের মোমবাতি তৈরি করা সম্ভব নয়। একইভাবে মানুষের একটি দেহ ধ্বংস হলে পূর্বের দেহের অনুরূপ আর একটি দেহ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তৈরি করতে পারেন; কিন্তু ঐ দেহটিকে তৈরি করা সম্ভব নয়। সুতরাং দৈহিক পুনরুত্থান অসম্ভব।

২. কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মাটি আসমানে চলে যাবার পর যদি তার দেহটিকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো তাহলে দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব হতো। কিন্তু মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহটি কীট-পতঙ্গ ভক্ষণ করে গেলে বাকিটুকু পানি, বাতাস এবং মৃত্তিকার সাথে মিশে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। দার্শনিকদের যুক্তি হলো একতলা দালান ভেঙ্গে ঐ ইট-বালি দিয়ে আর একটি একতলা দালান তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু ঐ ইটবালি যদি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কি পূর্বের সেই দালানটি তৈরি করা সম্ভব? সুতরাং, এখানেও দৈহিক পুনরুত্থান অসম্ভব ব্যাপার।

৩. সাগরের তীরে যদি এক কলসি পানি রাখা হয় এবং কলসিটি যদি ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে পানিগুলো সাগরে চলে যায়। এখন কলসিটি মেরামত করা সম্ভব হলেও তাতে আর পূর্বের পানিটুকু ভরা সম্ভব নয়। কেননা পূর্বের ঐ পানি সাগরের সীমাহীন পানিতে মিশে গেছে। তবুও যদি ভরতে হয় তাহলে সাগরের সমস্ত পানিটুকু ভরতে হয়। কিন্তু এ তো সম্ভব নয়। কাজেই দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

এগুলো হলো দার্শনিকদের যুক্তির বিভিন্ন দিক।

গাযালির প্রতিবাদ

১. দার্শনিকদের এইসব যুক্তির প্রত্যুত্তরে গাযালি ইসলামের মৌলিক আকিদার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মৃত্যুর পরও তার আত্মা বর্তমান থাকে। আত্মা অসীমে বিলীন হয়ে যায় না। বরং, অন্যান্য আত্মা থেকে স্বতন্ত্র থাকে এবং অস্তিত্ববান থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মাই স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ববান থাকে এবং প্রয়োজনবোধে এ আত্মাকে পুনরায় দেহে সংযোজন করা সম্ভব।

২. তাছাড়া দার্শনিকরা মনে করেন যে, কোনো মানুষ মারা গেলে পুনরায় সেই মানুষ সৃষ্টি করা অসম্ভব। একথা ঠিক নয়। ছোট যে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে সে যখন যৌবনে উপনীত হয় তখনক সে অন্যমানুষে পরিণত হয়ে যায়? গাযালির ভাষায় বলা যায় (পুনরুত্থান অবশ্য এরূপ ঘটনা নয়) যে, মৃত্যু ও জীবিত হবার পর ঐ একই ব্যক্তি বর্তমান। তবুও আমরা দাবি করতে পারি কাসেম মারা গেলেও আল্লাহ্ সেই কাসেমকেই পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

৩. দার্শনিকরা বলেন যে, একজন লোক মারা গেলে তার শরীরের যাবতীয় অংশের কিছু কীট-পতঙ্গ ভক্ষণ করে ও বাকিটুকু মাটিতে মিশে যায়। এগুলোকে একত্র করা যায় না। এর উত্তরে বলা যায় যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে চুম্বকের দ্বারাও ধূলিকণার মধ্যে লুক্কায়িত বালুকণা একটা একটা করে পৃথক করা যায়। সুতরাং আল্লাহ্র পক্ষে মানুষের দেহের এ সকল মিশ্রিত জীবকোষগুলো একত্র করা কখনো অসম্ভব নয়। সুতরাং মানবদেহে অবশ্যই পুনরুত্থান যোগ্যতা বিরাজমান। এর উপযুক্ত সময় কিয়ামতের মাঠ।

দার্শনিকগণের দৈহিক পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির দ্বিতীয় মতবাদ

দার্শনিকদের মতে একটি জিনিস থেকে অন্য আর একটি উৎপত্তি হতে হলে যেমন তুলাকে সুতায় পরিণত করা, আবার সুতাকে বয়ন করলে তা থেকে কাপড় পাওয়া যাবে। একইভাবে মানুষ আগুন, পানি, মাটি, বায়ু এই চারটি উপাদান দ্বারা গঠিত হতে হবে। মানুষ সৃষ্টির জন্য এই সকল কারণের উপস্থিতি ঘটতেই হবে। অন্যথায় নয়। সুতরাং 'কুন' বলা মাত্রই মানুষ হয়ে যাবে অথবা ইসরাফিল (আঃ) সিঙ্গায় 'ফু' দেওয়া মাত্রই সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এরূপ বলা অসম্ভব।

গাযালির অভিমত

তুলা থেকে কাপড় হওয়া এবং মাটি থেকে মানুষের শরীর গঠিত হওয়ার জন্য যে নিয়মের প্রয়োজন এ কথা গাযালি স্বীকার করেন। তবে মানুষ সৃষ্টি হবার জন্য যেসব নিয়মের প্রয়োজন হবেই এমন কথা নেই। আল্লাহ্ এসব কারণ ব্যতীত মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ্ মানুষকে পুনর্জীবিত করবেন এবং তাদের লক্ষ্য করে বলবেন এই সেই পুনরুত্থান যা তোমরা মিথ্যা জেনেছিলে (কোরআন ৮৩ : ১৭)। তাছাড়া একটি জিনিস সৃষ্টি করার বা সংঘটিত করার কি শুধু একটি উপায় থাকে? কাজেই গাযালি দার্শনিকদের মতবাদটিকে উপেক্ষা করেন।

দার্শনিকগণের দৈহিক পুনরুত্থানে অস্বীকৃতির তৃতীয় মতবাদ

দার্শনিকগণ মনে করেন যে, আল্লাহ্র কার্যপদ্ধতি একই ব্যবস্থাপদ্ধতি অনুযায়ী চলে, তার কোনো পরিবর্তন নেই। তবে একটি পদ্ধতি নানা প্রকার হতে পারে। যদি বলা হয় আল্লাহ্তায়ালার কর্মপদ্ধতি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে অন্য জাতীয় হয় ও এই কর্মপদ্ধতি কখনো ফিরে আসে না। সম্ভাব্যতা হিসেবে সময় তিন ভাগে বিভক্ত হবে। যথা :

(ক) বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে যখন আল্লাহ্ ছিলেন, আর কিছুই ছিল না;
(খ) বিশ্বসৃষ্টির পর আল্লাহ্সহ বিশ্ব বর্তমানে যেমন আছে; এবং
(গ) দেহের পুনরুত্থানের সময় হতে শেষ পর্যন্ত। তা হলো পুনরুত্থানের কার্যপদ্ধতি।

এই সময় পূর্ব ব্যবস্থাপনা বাতিল হবে এবং আল্লাহ্র কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন আসবে। এটা অসম্ভব। কেননা এটা দ্বারা অবস্থা পরিবর্তনের পৃথক ইচ্ছা সূচিত হয় অথচ আদি ইচ্ছার একই নির্দিষ্ট গতিপথ। তা থেকে বিচ্যুত ঘটতে পারে না। কেননা কার্য ইচ্ছার অনুরূপ, আর ইচ্ছা একই পথে অপরিবর্তিত। কাজেই যদি একবার দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব হয় তাহলে তা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। আল্লাহ্ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাবেন না।

গাযালির মতবাদ : আল্লাহ্তায়ালা একটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন। আল্লাহ্র

www.pathagar.com

ইচ্ছা অনুসারে পুনরুত্থান একবার হলেও তার ইচ্ছানুসারে ঐ পুনরুত্থান বারবার সংঘটিত হবে না। এবং অনন্তকাল ধরে চলতে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

উপসংহার : দৈহিক পুনরুত্থানকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। নাস্তিকেরা অস্বীকার করলেও দৈহিক পুনরুত্থান সংঘটিত হবেই। তবে দার্শনিকরা যেটাকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারেন সেটাকে অসম্ভব বলে মনে করেন। গাযালি কোরআন ও হাদিসের মৌলিক আকিদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, দৈহিক পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটবে। তবে তা কিভাবে ঘটবে সেটা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের দেখতে হবে ইসলামি বিশ্বাসে মৃত্যু মানে কি? কোরআন ও হাদিস অনুসারে মৃত্যু মানে মানুষ একটি পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তন করে আর একটি পারিপার্শ্বিকতায় প্রবেশ করে। উপরোক্ত যুক্তির ফলে আমরা বলতে পারি যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনি আবারও সৃষ্টি করতে পারবেন। সুতরাং দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব।

www.pathagar.com

খ. ইবনে রুশদ

'জগতের অনাদিত্ব' সম্পর্কে দার্শনিক ও ইমাম আল্ গাযালির যুক্তিকে ইবনে রুশদ এর আলোকে আলোচনা।

প্রাচীন ও গাযালির সমসাময়িককালের অনেক দার্শনিক মনে করেন যে, বিশ্ব অনাদি। এর কোনো আদি নেই। অর্থাৎ এ কখনো সৃষ্টি হয়নি। দার্শনিকরা মনে করেন যে, আল্লাহ্ যেমন চিরকাল থেকেই আছেন ও থাকবেন তেমনি বিশ্বজগৎও চিরকাল ধরেই আছে ও থাকবে। একে কেউ সৃষ্টি করেন নি, এবং কখনো ধ্বংস হবে না। দার্শনিকদের মতে, এ বিশ্বজগত আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাথে বর্তমান অর্থাৎ জগতকে আল্লাহ্র সত্তা থেকে পৃথক করা যায় না। দার্শনিকদের এ মতবাদ ইসলামবিরোধী। ইসলামে বিশ্বজগৎকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইবনে রুশদ তাঁর 'তাহাফুতুত তাহফাত' গ্রন্থে জগতের অনাদিত্ব সমস্যাটি চারটি প্রধান যুক্তিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমে তিনি গাযালির যুক্তিগুলোকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁর মতবাদের অসংগতিগুলো প্রমাণ করে নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম আলোচনার প্রথম যুক্তি

দার্শনিকদের মতে এ জগৎ অস্তিত্বশীল হওয়ার পূর্বে তার উপস্থিতির একটা সম্ভাবনা ছিল। কোনো সম্ভাবনাবিহীন বস্তু হঠাৎ এ জগতে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। যেমন— বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বেও মেঘের মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটার অস্তিত্ব নিহিত থাকে। গাযালি মনে করেন, যদি জগৎ সৃষ্টির সম্ভাবনা কোনো একসময় দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে এর সম্ভাবনার পূর্বে কোনো কিছু ছিল না, কারণ তা ছিল আল্লাহ্র অধিকারের বহির্ভূত। যেহেতু আল্লাহ্র অধিকারের বহির্ভূত কোনো কিছু থাকতে পারে না, সেহেতু জগত সৃষ্টির এরূপ সম্ভাবনা নিতান্তই ভিত্তিহীন।

ইবনে রুশদের প্রতিবাদ

ইবনে রুশদ বলেন যে, যারা পৃথিবীর অস্তিত্বের পূর্বে সম্ভাবনার কথা মনে করেন তারা অবশ্যই জগতকে চিরন্তন বলে স্বীকার করবেন। কারণ জগতের চিরন্তনের ধারণা হতে এর ভবিষ্যতের ধারণা করা অযৌক্তিক নয়। যা অস্তিত্বশীল তা অবশ্যই অবিনশ্বর হবে। নশ্বর জিনিস চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব না হলে এটাও সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

জগতের নিত্যতা সম্পর্কে দ্বিতীয় যুক্তি

গাযালির মতে, জগত সৃষ্টির সময় দেশ ও কালকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দার্শনিকেরা বলেন যে, জগত কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে যে, জগত কেন পূর্বে বা পরে সৃষ্ট হলো না। আবার এটা কেন বড় বা ছোট না হয়ে এ আকৃতির হলো। কারণ সৃষ্ট বিষয় যে কোনো সময় যে কোনো আকারে সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং জগতকে যদি সৃষ্ট বলে ধরা হয় তা হলে এটা যে কোনো আকারে গতকালও সৃষ্টি হতে পারত কিন্তু জগত সৃষ্টি এবং কাজেই এরকম হতে পারে।

গাযালির বক্তব্য : তিনি বলেন, জগত সৃষ্টির পূর্বে কাল সৃষ্টি করা হয় নি, কাজেই তখন পূর্বাপর ঐ ধরনের সমস্যার কথা উঠতে পারে না। আবার জগত সৃষ্টির পূর্বে বিস্তৃতিকেও সৃষ্টি করা হয় নি। সুতরাং বিশ্ব ছোট বা বড় আকারের কথা উঠতে পারে না। কোনো শিশুর জন্মের পূর্বে যেমন তার হাত, পা, স্মৃতিশক্তির কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনি বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এর প্রধান দুটি বিষয় দেশ ও কালের কথা ভাবা যায় না। আল্লাহ্ যখন জগত সৃষ্টি করেন তখন দেশ ও কাল সৃষ্টি করেন। কাজেই জগত সৃষ্টির পূর্বে এ ধরনের কোনো ধারণা আমরা করতে পারি না।

ইবনে রুশদ-এর প্রতিবাদ

ইবনে রুশদ গাযালির মতের প্রতিবাদ করে বলেন ইসলামে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধাপ বা স্তরের কথা বলা হয়েছে। আল গাযালি বলেন, পৃথিবীকে তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি এবং আসমানকে সাত স্তরে সজ্জিত করেছেন। কোরআনের এসব আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে আমরা সাধারণ অর্থে ধরে নিতে পারি যে, জগতকে বর্তমান পর্যায় এরূপ আকার ধারণ করতে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। ফলে এমনও হতে পারে যে, দেশ ও কালকে বিশ্ব জগতের পূর্বেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন।

জগতের নিত্যতা সম্পর্কে তৃতীয় যুক্তি

দার্শনিকরা বলেন যে, 'সম্ভাব্যতা' বস্তুর কোনো উপাদান নয় বরং তা একটি গুণ মাত্র। উত্তাপ, শ্বেতত্ব, কৃষ্ণত্ব ইত্যাদি যেমন বস্তুর গুণাবলি তেমনি সম্ভাব্যতা বিষয়টিও বস্তুর গুণ মাত্র। আর গুণ কখনো সৃষ্ট বস্তু হতে পারে না। যেমন—দয়া গুণটি কোনো বস্তু নয়। আবার গুণ যদি সৃষ্টবস্তু না হয় তবে সম্ভাব্যতা গুণের আধার বিশ্বজগতও সৃষ্ট হতে পারে না। কাজেই দার্শনিকদের মতে জগৎ অনাদি।

গাযালির প্রতিবাদ

দার্শনিকদের সম্ভাব্যতা কথার ব্যাখ্যাকে গাযালি ভ্রমপূর্ণ বলেছেন। দার্শনিকেরা যে সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা বলেন তা শুধু কল্পনা সিদ্ধান্ত মাত্র। বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই। কল্পনায় আমি ধরে নিতে পারি যে, সক্রেটিসের সময় আমার জন্মলাভ করার

সম্ভব ছিল, কিন্তু বাস্তবে যে তা সম্ভব নয়, আমরা সেভাবেই জানি। অনুরূপভাবে দার্শনিকেরা যে বলেন, এ বিশ্বজগত সৃষ্টি হওয়ার পিছনে পূর্বেও এর অস্তিত্ব সম্ভাবনাময় ছিল, এটা নিছক কল্পনার ব্যাপার।

গাযালির বিরুদ্ধে ইবনে রুশদ

ইবনে রুশদ বলেন, গাযালির মতবাদ অনুসারে আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যাব যেখানে সম্ভাবনার পর সম্ভাবনা বাস্তবের পর বাস্তব আমাদের অস্তিত্বের পথে নিয়ে যাবে। ইবনে রুশদ মনে করেন যে, কোনো কিছুকে সম্ভাব্য মনে করলেই যে এর বাস্তব কিছু থাকতে হবে এমন কোনো যুক্তি নেই। দার্শনিকরা শুধু এটুকু বলেন যে, জগত বর্তমান আকারে সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও আল্লাহ্ একে যখন ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারতেন। অর্থাৎ এ অর্থে এ পৃথিবী নূতন সৃষ্টি নয়, পৃথিবী অনাদি। সুতরাং সম্ভাব্য দার্শনিকদের এ মতের প্রতিবাদে গাযালির যুক্তি সার্বিক নয়।

জগতের নিত্যতা সম্পর্কে চতুর্থ যুক্তি

জগৎ অনাদি নয়—সৃষ্ট, গাযালির এ মতবাদের প্রতিবাদে দার্শনিকরা বলেন, জগত অনাদি না হলে তিনটি জিনিসের কথা কল্পনা করতে পারি। অনিবার্য, সম্ভব ও অসম্ভব। অনিবার্য স্বয়ং ঈশ্বর। জগতের অস্তিত্ব এর সৃষ্টির পূর্বে সম্ভব এবং অসম্ভব এর মধ্য থেকে সম্ভাব্যতার যুক্তি কখনও নিঃসৃত হতে পারে না।

গাযালির প্রতিবাদ

আল্লাহ্ স্বয়ং Omnipotent, omniscient and omnipresent। সুতরাং তিনি শূন্য থেকেই যে কোনো জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন। ঈশ্বর নিজেই স্বয়ংসত্তা। তিনি অনাদি এবং একমাত্র অনাদি।

ইবনে রুশদ ইমাম গাযালির প্রতিবাদে বলেন, অনাদি ঈশ্বরের সাথে সাথে জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। শুধু আকৃতিরও উপাদানের পরিবর্তন হয় মাত্র। মৌলিক উপাদানের পরিবর্তন হয় না।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে ইবনে রুশদ-এর বক্তব্য
অথবা
ইবনে রুশদ-এর তাহাফুতুত-তাহাফুত অনুসরণে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন

শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Tahafut-al-Tahafut'-এর চতুর্থ আলোচনায় ১৫৬ থেকে ১৬৮ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। চতুর্থ আলোচনায় প্রথমদিকে ইবনে রুশদ আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী দার্শনিকদের এবং ইমাম আল-গাযালির বক্তব্যকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরবর্তীতে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(ক) আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে দার্শনিকদের বক্তব্য।

(খ) আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আল-গাযালির বক্তব্য।

(গ) আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে ইবনে রুশদের বক্তব্য।

(ক) ইবনে রুশদ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কিত দার্শনিকদের আদি কারণ মতবাদ সম্পর্কে (First cause argument) কিছু আপত্তি তোলেন। তাঁর মতে 'কারণ' পদটি একার্থবোধক নয়, এটা দ্ব্যর্থবোধক। কারণ পদটির চারটি অর্থ হতে পারে। "আকার, উপাদান, নিমিত্ত ও পরিণতি বা চরম কারণ।"

—(এরিস্টোটলিয়ান কারণতত্ত্ব)

কারণ অর্থে কর্তা, আকার, উপাদান, উপাস্য, কিন্তু মুসলিম দার্শনিকরা কারণ অর্থে কোনটিকে নির্দেশ করেছেন, তা ব্যাখ্যা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে এই কারণ চতুষ্টয়ের প্রতিটির একটি আদি কারণ থাকতে পারে। কিন্তু দার্শনিকদের ব্যাখ্যায় একে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। নভোমণ্ডলে প্রাথমিক স্তর যা পুরোপুরি জনবিবর্জিত তা আদি কারণ হতে বাধা কোথায়? নবমদলের প্রাথমিক স্তর বা অন্যকিছুকে আদি কারণ হিসেবে মেনে নেয়া যদি অসংগত হয়, তাহলে কি কারণে তা অসংগত দার্শনিকদের এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। সুতরাং দার্শনিকদের আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের আদি কারণের যে ব্যাখ্যা তা সন্তোষজনক নয়।

(Ibn-Sina's concept of possible and necessary existence)

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে ইবনে সিনা সমগ্র জগৎকে আবশ্যিক ও সম্ভাব্য অস্তিত্ব (necessary and possible existence) এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু ইবনে রুশদ বলেন জগৎকে এ দু'ভাগে বিভক্তকরণের নীতি যুক্তিযুক্ত নয়।

ইবনে সিনা দু' প্রকার অস্তিত্বের সত্তা (existence) নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং আবশ্যিক বা নিশ্চয়াত্মক অস্তিত্ব (possible and Necessary existence)। সম্ভাব্য অস্তিত্ব হলো এমন অস্তিত্ব, যা অন্যকোনো অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। সম্ভাব্য অস্তিত্ব স্বনির্ভর নয়। এটা অন্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন, জগৎ। আবশ্যিক অস্তিত্ব এমন অস্তিত্ব যা অন্যকোনো অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা স্বনির্ভর অর্থাৎ নিজের উপর নির্ভরশীল। নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল। এই জগতে বা স্বর্গে যা কিছু আছে সবই সম্ভাব্য অস্তিত্ব। সত্তা এবং এই সম্ভাব্য অস্তিত্ব আবশ্যিক অস্তিত্বের নির্দেশ করে। এই আবশ্যিক সত্তার অস্তিত্ব ও গুণ এক ও অভিন্ন। এই সত্তা এক। বহুত্ব এই সত্তা হতে অনুসৃত হতে পারে না। সেটা হলো আবশ্যিক সত্তা বা অস্তিত্ব। এই আবশ্যিক সত্তা বা অস্তিত্বকেই বলা হয় আল্লাহ্। ইবনে সিনা জগৎকে (world) সম্ভাব্য অস্তিত্ব হিসেবে ধরেছেন। আর আল্লাহ্‌কে আবশ্যিক বা নিশ্চয়াত্মক অস্তিত্ব হিসেবে ধরেছেন। জগৎ সম্ভাব্যভাবে অস্তিত্বশীল। আর আল্লাহ্ আবশ্যিকভাবে অস্তিত্বশীল। জগতের সম্ভাব্য অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র আবশ্যিক অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

সম্ভাব্য সত্তার বা অস্তিত্বের কারণ থাকা অত্যাবশ্যক, যা তার পূর্বগামী। সম্ভাব্য সত্তার পূর্বগামী কারণ হলো আল্লাহ্‌র আবশ্যিক অস্তিত্ব। ইবনে রুশদ বলেন যে, ইবনে সিনার বক্তব্য আরো বোধগম্য ও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত ছিল।

সম্ভাব্য অস্তিত্বের কারণ হিসেবে সে পূর্বগামী কারণেরও আরো একটা কারণের প্রয়োজন। এই কারণেরও আর একটা কারণ থাকবে। অর্থাৎ আদি কারণের ব্যাখ্যায় অনবস্থাদোষে পতিত হলে প্রকৃতপক্ষে আমরা কোনো কারণেরই নির্ণয় করতে পারি না। এক্ষেত্রে কোনো সম্ভাব্য বস্তু কারণ ছাড়াই অস্তিত্বশীল হয়ে পড়ে। অতএব এই আদি কারণ পরম্পর একটা বিশেষ কারণে উপনীত হয়। যা অন্য কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা স্বনির্ভর এবং এই স্বনির্ভর আদি কারণই হলো God বা আল্লাহ্।

অতএব ইবনে সিনার আদি কারণের উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট না হওয়াতে তা সবার কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় না।

আল-ফারাবির মতে জগতের সমুদয় বস্তু দু'টি স্তরে বিভক্ত : সম্ভাব্য বস্তু ও নিশ্চয়াত্মক বস্তু (Possible and Necessary being)।

প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তু একটি কারণের নির্দেশ করে। যা হতে সে বস্তু উদ্ভূত হয়। এই কারণটি আবার একটি পূর্ববর্তী কারণের পরিণতি; এভাবে পশ্চাদগতিতে চলতে চলতে আমরা আদি কারণে উপনীত হই, যে কারণের পরে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। এখানে আমরা নিশ্চয়াত্মক সত্তাকে অনুমান করতে বাধ্য হই। এই সত্তা শর্তহীন, অনোদ্ভূত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অপরিবর্তনীয় ও পরিপূর্ণ। এই আদি কারণের মধ্যে চিন্তা ও বস্তুর, কর্তা ও কর্মের প্রভেদ লোপ পায়। আবার এই আদি কারণ বা পরম সত্তা প্রমাণসাপেক্ষ নয়—এটা সমুদয় প্রমাণের ভিত্তি। এটা এমন নিশ্চয়াত্মক সত্তা, যার অস্তিত্বের উপর অপর সব অস্তিত্বশীল বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এই সত্তা একক এবং একমাত্র সত্তা। এটা একাধিক হলে অন্যান্য শক্তির দ্বারা এই সত্তা সীমায়িত হবে। এই আদি কারণ বা পরম সত্তাকে আমরা আল্লাহ্ বলি।

সৌরজগৎ ঘূর্ণন অনাদি ও অনন্ত। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি সৌরজগতের প্রান্তীয় স্তরের উপর নির্ভরশীল, যা আবার অনাদি এবং অনন্ত, এভাবে সব গতির মূল উৎস আদি কারণ আল্লাহ্। এ গতিকে প্রত্যাহার করা হলে জগত স্থবির হয়ে যাবে এবং জগতের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং জগতের এই অস্তিত্বের পশ্চাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বর্তমান।

জগতের আদি সত্তা তথা মূল কারণ ও পরিচালক রুশদের মতে একাধিক নয়, তা এক ও অদ্বিতীয়। একাধিক পরিচালক হলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অসম্ভব। যেমন, একাধিক সেনাপতির মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিয়মশৃংখলা বজায় রাখা যায় না।

সুতরাং জগতের এই নিয়মশৃংখলা বজায় রাখার পেছনে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও পরিচালনা সক্রিয়।

ইবনে রুশদ-এর আল্লাহ্ সম্পর্কে যে মতবাদ তা গাযালি-পূর্ব দার্শনিকদের মতবাদের সাথে খুব একটা অভিন্ন না হলেও পুরোপুরি যে ভিন্ন তা বলা যায় না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি মুসলিম দার্শনিকদের কিছু মতবাদকে সংশোধনের মাধ্যমে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে জগত অনাদি, অনন্ত ও

www.pathagar.com

অবিনশ্বর হওয়া সত্ত্বেও তা টিকে থাকার জন্য এবং তার অস্তিত্বের সংরক্ষণের জন্য আর একটি এজেন্টের প্রয়োজনীয়তা সর্বদা আবশ্যিকভাবে অনুভূত হয়। কেননা ইবনে রুশদ মনে করেন এই জগত স্বনির্ভররূপে অনাদি, অনন্ত ও অবিনশ্বর নয়। বরং এর অস্তিত্বের জন্য আর একটি কর্তার প্রয়োজন আছে। ইবনে রুশদ-এর মতে কর্তা দু'ধরনের।

১. যে কর্তা কোনো বস্তু সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টির সময়কালে সেই বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখেন মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বাড়ি নির্মাণের সময় কর্তা কেবলমাত্র বাড়িটির সাথে সংশিষ্ট থাকেন। কিন্তু নির্মাণের পরে বাড়ির সাথে কর্তার আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

২. কর্তা কোনো বস্তুকে কেবল সৃষ্টিই করেন না, সৃষ্টির পরবর্তীকালে তাকে সংরক্ষণও করেন। এ কর্তা প্রথম কর্তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, কারণ তিনি এখানে দু'টি কর্ম সম্পাদন করেন—(ক) সৃষ্টি, (খ) সংরক্ষণ। এই দ্বিতীয় কর্তাই হলেন আল্লাহ্ ("Agent") জগৎ তার অস্তিত্বের জন্য দ্বিতীয় কর্তার উপর নির্ভরশীল এবং এই দ্বিতীয় কর্তা যিনি জগৎকে সংরক্ষণ করে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যিনি সমস্ত সৃষ্টি ও জগতের উৎস। ইবনে রুশদ বলেন, জগত এই কর্তার উপর এমনই নির্ভরশীল যে, যদি এ কর্তা মুহূর্তমাত্র জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জগতের সংরক্ষণ করা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে জগতের ধ্বংস অনিবার্য।

অতএব, জগতের অস্তিত্বের জন্য একজন কর্তা আছেন। আর এই কর্তা হলেন আল্লাহ্।

ইবনে রুশদের বক্তব্যের মূল্যায়ন

ইবনে রুশদ গ্রিক দর্শন, বিশেষ করে এরিস্টোটলের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মূলত ইবনে রুশদ ছিলেন দার্শনিক। তাই তিনি যুক্তিবাদিতার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ্ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। একজন ধর্মতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বের চেয়ে একজন দার্শনিক হিসেবেই তাঁর পরিচিতি ব্যাপক। সুতরাং অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকের ন্যায় তিনিও গ্রিক দর্শনের প্রভাব থেকে নিজেকে পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত রাখতে পারেন নি। অন্যান্য দার্শনিকের মতো তিনিও তাঁর নিজের চিন্তাধারার আলোকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রকৃতি বা চরিত্রের দিক থেকে অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকের বক্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গির মিল বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ্র একত্ব বা

ইবনে রুশদ কিভাবে আল্লাহ্র একত্ব প্রমাণ করেছেন তার মতবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা

গাযালির মতবাদ অনুসারে দার্শনিকেরা আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহ্ এক এবং স্বয়ম্ভু। পৃথিবীর দু'টো ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। একসঙ্গে দুটি কারণবিহীন কারণ সত্তার অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

www.pathagar.com

দার্শনিকরা এ প্রসঙ্গে দু'টো প্রমাণ পেশ করেছেন। প্রথমত, যাকে অনিবার্য অস্তিত্বশীল বলা যায় তার অনিবার্য অস্তিত্বকে প্রজাতির (species) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যার মধ্যে অনিবার্য আছে তাকে অন্যকিছুর মাধ্যমে কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ যার অস্তিত্ব একটি কারণের মধ্যে সম্ভবপর হয়। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় অনিবার্য অস্তিত্ব একটি কার্য এবং তার কারণের দ্বারাই তার অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে দেখা যায়। তবে দার্শনিকেরা বলে তারা অনিবার্য অস্তিত্ব বলতে এমন কোনো সত্তাকে বোঝেন যার সঙ্গে কারণের কোনো সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা বলেন, যখন জাহেদ ও আমর উভয়কে মানুষ বলে অভিহিত করা হয় তখন উভয়ের মধ্যে মানবতা রয়েছে বলে স্বীকার করা হয় না। কারণ জাহেদকে যখন মানুষ বলে স্বীকার করা হয় তখন তার মধ্যেই মানবতা রয়েছে বলে স্বীকার করলে আমাদের মধ্যে মানবতা আছে বলে স্বীকার করা যায় না। এজন্য বলতে হবে জাহেদ এবং আমরের মানুষ অন্যকোনো কারণের ফল।

মানুষের মধ্যে যে বিভিন্নতা দেখা দেয় তার মূলে রয়েছে মানবতার পটভূমিতে বিরাজমান জড়পদার্থ। সেই বিভিন্নতা মানুষের সারসত্তার মধ্যে বিরাজমান নয়, এজন্যই প্রত্যেকটি অনিবার্য অস্তিত্বের মধ্যে পৃথকভাবে এই গুণটি থাকা উচিত। যদিও কোনো কারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে তাকে অনিবার্য অস্তিত্ব বলা যায় না। কাজেই অনিবার্য অস্তিত্ব বলতে একটি মাত্র অস্তিত্বকে বোঝায়।

এসব উক্তির প্রতিবাদে গাযালি বলেন, অনিবার্য অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে দু'টো বিষয় থাকতে পারে। হয় সে আপনাতে স্বয়ম্ভু কিংবা কোনো কারণের দ্বারা স্বয়ম্ভু। তবে দু'টি পদ পরস্পর বিরোধী এজন্য অনিবার্য অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ধারণা। একটা বিষয়ের অস্তিত্বের মূলে তার স্বয়ম্ভু প্রকৃতি, অথবা কোনো কারণ বিদ্যমান। এই উক্তিগুলো মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। হয় তাকে পুরোপুরি স্বয়ম্ভু বলতে হবে, না হয় তাকে কোনো কারণের উপর নির্ভরশীল বলতে হবে। কিন্তু কারণের উপর নির্ভরশীল হলে সে অনিবার্য হতে পারে না। গাযালি বলেন, অনিবার্যতার ধারণা হলো যার ভিত্তিমূলে তার সারসত্তার কোনো কারণ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি কালো রং-এর মূল ধরে নেয়া হয় দু'টো সম্ভাব্য বিষয় বর্তমান তার সারসত্তা অথবা কোনো কারণ। তা হলে যদি তার সারসত্তা থেকে তার কালো রং-এর উৎপত্তি হয় তাহলে লালকে কোনো রং বলা যায় না কারণ সেই সারসত্তা থেকে কেবল কালো রং-এরই উৎপত্তি হয়, অপরদিকে যদি কালো রং-এর উৎপত্তি মূলে কোনো কারণ থাকে, তা হলে তাতো কালো রং না হওয়াই সম্ভবপর। কেননা আমরা ধারণা করতে পারি যে, কালো রং-এর কালোত্ব অন্যকিছুর সংস্পর্শে এসে দেখা দিয়েছে অন্যকোনো অবস্থা এই কালো রং হয় তার সারসত্তা থেকে উৎপত্তি বলা যায় না।

গাযালির অপর যুক্তি হচ্ছে দার্শনিকদের স্বীকৃত মতের দু'টো অনিবার্য সত্তার কোনো সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি অনিবার্য সত্তা দু'টো হয় তাহলে হয়ত তারা অনুরূপ হবে নতুবা ভিন্নরূপ হবে। যদি তারা সর্বতোভাবে অনুরূপ হয় তাহলে তাদের মধ্যে দ্বৈত বা বহুত্ব রয়েছে বলে ধারণার কোনো অর্থই হয় না। অপরদিকে যদি তারা সর্বতোভাবে অনুরূপ না হয় তা হলে তাদেরকে বিভিন্ন বলা যায়। তবে তাদের ধারণা

www.pathagar.com

এই বিভিন্নতা সারগতই বলতে হবে, কারণ তাদের মধ্যে সমন্বগত বা স্থানগত বিভিন্নতা নাও থাকতে পারে। যে কোনো দু'টো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলে তাদের মধ্যে কোনো এক বিষয়ের ঐক্য থাকতে পারে না। অর্থাৎ কোনো এক বিশেষ বিষয়ে তাদের যোগাযোগ সম্ভাব্য হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে দ্বিতীয়টি সম্ভবপর নয়, কারণ এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, তাদের অস্তিত্বের মধ্যে কোনো যোগ নেই। এবং তারা কোনো বস্তুতে আশ্রিত নয়। যদি তাদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে ঐক্য এবং কোনো কোনো বিষয়ে অনৈক্য থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যে বিষয়ে ঐক্য আছে এবং যে বিষয়ে ঐক্য নেই, সেই দু'টো বিষয়ের মধ্যে অনৈক্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। ঐক্য অনৈক্যকে মানসিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। অনিবার্য অস্তিত্বের মধ্যে সে জাতীয় কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাকে সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন বিভক্ত করা যায় না, তেমনি চিন্তার দিক থেকেও বিভক্ত করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জীব ও যুক্তিবাদী এ দু'টো শব্দ যখন উচ্চারণ করা হয় তখন বুঝতে হবে মানসিক সারসত্তার জীববৃত্তি ও যুক্তিবাদীতা উভয়ই রয়েছে তবে যখন কোনো অনিবার্য অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা ধারণা করি তখন এরূপ কোনো দ্বৈতবাদ থাকে না। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যেসব বিষয়ের পার্থক্য রয়েছে তাদের মধ্যে কেবল দ্বৈতবাদ আরোপ করা হয়। যদি দ'টো বিষয়ে পুরোপুরি ঐক্য থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে কোনো দ্বৈতবাদের সমাবেশ হতে পারে না।

দার্শনিকদের একটি সুপরিকল্পিত মতবাদ এই যে, আদি নীতিকে বুদ্ধির দ্বারা যেমন বিশ্লেষণ করা যায় না, তেমনি সংখ্যার দিক থেকেও বিভক্ত করা যায় না। এজন্যই বলা হয় আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।

গাযালির অপর অভিযোগ হচ্ছে, আল্লাহ্কে এক ও অদ্বিতীয় প্রমাণকালে তাদের মতবাদ অনুসারে দু'টি কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত ছিল। প্রথমত, তাদের মধ্যে সারসত্তার দিক থেকে আল্লাহ্র একত্ব প্রমাণ করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, তাদের পক্ষে প্রমাণ করা উচিত ছিল আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে বহুত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই। বহুত্ব বস্তুর মধ্যে পাঁচভাবে দেখা যায়। যথা,

১. যাতে বাস্তব জগতেই অথবা কল্পনাতে বিভাগ দেখা দেয়। তারমধ্যে বহুত্ব আছে বলা যায়। যেমন, আমাদের দেহ তাকে একদিকে যেমন বাস্তব জগতে বিভক্ত করা যায় তেমনি কল্পনাতেও বিভক্ত করা যায়। আল্লাহ্র মধ্যে এরূপ বিভাগের কোনো সম্ভাবনা নেই।

২. কোনো বিষয়কে সংখ্যাগতভাবে বিভক্ত না করে চিন্তার দ্বারা বিভক্ত করা যায়। যেমন জড় ও আকার এই উভয়ের মধ্যে পৃথকভাবে অবস্থানের সম্ভাবনা নেই। তারা উভয়ে একত্রিত হলেই একটা দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ কোনো জড় পদার্থের মিশ্রণজাত সৃষ্টিকে বাস্তব জগতে ও কল্পনায় বিভক্ত করা যায়। আল্লাহ্ জড় পদার্থের মিশ্রণ হতে পারে না। কারণ জড় পদার্থের জন্য আকারের প্রয়োজন। যেহেতু তিনি সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ সেহেতু তার অস্তিত্বের পক্ষে অন্যকিছুর সাথে মিলিত হবার প্রয়োজন নেই। তেমনি তিনি আকারও হতে পারেন না। কারণ আকারের জন্য জড় পদার্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

www.pathagar.com

৩. গুণগত দিক থেকে বহুত্ব অর্থ হচ্ছে জ্ঞান ও স্বকীয় ইচ্ছার সমাবেশ। যদি উপরোক্ত গুণগুলো অনিবার্য হয় তা হলে সারসত্তার মধ্যে বহুত্ব দেখা দেবে। কাজেই তার একত্ব অস্বীকৃত হবে।

৪. জাতি ও প্রজাতির সংযোগের মধ্যে বহুত্ব প্রমাণিত হয়। যেমন, কালো রং-এর একটি প্রজাতি যখন বলা হয় তখন সেই প্রজাতির সঙ্গে রং-এর জাতি এসে যুক্ত হয়। দার্শনিকরা এজন্য বহুত্বের প্রাথমিক নীতিকে অস্বীকার করেন।

৫. যেমন কোনো কোনো বিষয় আছে যাদের অস্তিত্বের মূলেও তাদের একটা সম্ভাবনা রয়েছে সেরূপ বিষয়ের মধ্যে বহুত্ব দেখা যায়। যেমন একটি ত্রিভুজের ঐক্য থাক বা না থাক আমরা তার একটা অবস্থান ধারণা করতে পারি। দার্শনিকেরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বেলায় এরূপ বহুত্ব অস্বীকার করেছেন। তারা মনে করেন, ত্রিভুজের সম্ভাবনার পক্ষে তার অস্তিত্ব যেমন প্রয়োজনীয়, কোনো অনিবার্য বিষয়ের সম্ভাবনার পক্ষেও তার অস্তিত্ব তেমনই প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যদি কোনো অনিবার্য অস্তিত্বের সম্ভাবনার পক্ষে তার অস্তিত্ব প্রয়োজনীয় হয় তা হলে বলতে হবে যে তার সারসত্তা এবং অস্তিত্ব তা থেকে অনুসৃত এবং সেই অস্তিত্বের দ্বারা তার সারসত্তা অনুসৃত হয় নি।

গাযালির এ ধরনের সমালোচনার বিরুদ্ধে ইবনে রুশদ নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছেন। ইবনে রুশদ বলেন, দার্শনিক বলতে গাযালি যেসব চিন্তাশীল ব্যক্তির উল্লেখ করেন তা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণকল্পে দার্শনিকের যুক্তি বলে গাযালি যে বক্তব্য রেখেছেন তা প্রকৃতপক্ষে ইবনে সিনা সম্বন্ধেই সত্য। অন্যান্য দার্শনিক সম্বন্ধে সত্য নয়। গাযালি দেখিয়েছেন অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব বলতে যা বোঝায় তা তার নিজের সারসত্তা থেকেই অনিবার্য কিংবা অন্যকারণ থেকেই উদ্ভূত। এভাবে যদি বলা হয় অনিবার্য অস্তিত্বের অনিবার্যতা তার নিজের সারসত্তা থেকে উদ্ভূত কিংবা অন্যকোনো কারণ থেকে উদ্ভূত, তাহলে এরূপ বক্তব্যের অর্থ থাকতে পারে না। এ বাক্যের অর্থ প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এর অর্থ হচ্ছে অনিবার্য সততার প্রকৃতিতে এমন কিছু রয়েছে যাতে সে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একটি সাধারণ গুণের অধিকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,যখন আমরা বলি, আমর একজন মানুষ কারণ জায়েদের সাথে তার সাধারণ প্রকৃতি ঐক্যবদ্ধ এজন্য সে মানুষ। তাহলে বুঝতে হবে যদি সে আমর বলেই মানুষ হয় তা হলে মানবতা কেবল আমরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, অন্য কারো মধ্যে নয়। অপরদিকে যদি সাধারণ প্রকৃতি আছে বলেই তাকে মানুষ বলে ধারণা করা হয় তা হলে তারমধ্যে দু'টি প্রকৃতি রয়েছে বলেই তার ধারণা করতে হবে। একটি সাধারণ প্রকৃতি অন্যটি বিশেষ প্রকৃতি এবং আমর এই দুই-এর সমাবেশের ফল। অনিবার্য অস্তিত্বের কোনো কারণ নেই, এভাবে ব্যাখ্যা করলে ইবনে সিনার বক্তব্যেও কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় না।

গাযালির অপর বক্তব্য হচ্ছে absolute non entity-এর কোনো কারণ নেই। সে তার নিজের সারসত্তা থেকেই অস্তিত্বশীল কিংবা অনস্তিত্বশীল কিছুই বলা যায় না। গাযালি বলতে চান এরূপ সংযোগ বাক্য সদর্থক গুণ সম্পর্কেও সত্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, যদি দু'টো পদ কালো, রঙিন নেয়া হয় তাহলে যখন আমরা বলি

www.pathagar.com

কোনো একটি বিষয়ে কালো রং-এর উৎপত্তি সারসত্তা থেকে। এ দু'টো তার সম্পর্কে সত্য হতে পারে না। কারণ যদি কালো রং তার সার থেকেই উৎপন্ন হয় তাহলে লাল কোনো রং হতে পারে না। যদি কালো রং অন্যকোনো কারণ থেকে উদ্ভূত হয় তাহলে তার সারের সঙ্গে রং যুক্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, তার সঙ্গে পরে যুক্ত বিষয় ছাড়াও প্রতিপাদ্য হতে পারে। অর্থাৎ কালো রং-এর উৎপত্তি তার সার (essence) থেকে, রং থেকে নয়। ইবনে রুশদ বলেন, তবে একটি অসম্ভব; কারণ গাযালি 'সার' এবং 'কারণ'কে দু'অর্থে ব্যবহার করেছেন। যদি সারকে আপাতত বিরুদ্ধপক্ষীয় পদরূপে ধরা হয়, তাহলে কালো রং-এর উৎপত্তি তার প্রকৃতির থেকে, এ উক্তি সত্য।

তেমনি বলা হয় কালো রং-এর মূলে একটি কারণ রয়েছে এবং সে কারণটি হলো কালো রং বহির্ভূত। তাহলে কালোকে রংবিহীন বলে প্রকাশ করার অর্থ হয় না। কারণ হাতি কোনো এক বিশেষ রং-এর সাথে যুক্ত হয় বলেই ধারণা করতে হবে এবং সে বিশেষ গুণকে জাতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যাবে না। সেগুলোকেই সার (essence) ব্যতীত প্রকাশ করা যেতে পারে, কাজেই এভাবে ব্যাখ্যা করলে ইবনে সিনার বিকল্পগুলোকে ভুল বলা যায় না।

অনিবার্য অস্তিত্বের মধ্যে বহুত্ব থাকতে পারে কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যদিও দার্শনিকেরা এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন, তথাপি গাযালি এ সম্বন্ধে দীর্ঘআলোচনা করেছেন। দার্শনিকদের মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তখনই প্রমাণিত হতে পারে যখন তার মধ্যে সম্ভাব্য বহুত্বের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

ইবনে রুশদ বলেন, গাযালি এ ক্ষেত্রে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। কোনো বিষয়কে চিন্তার দ্বারা বিভক্ত করা গেলেও তার মধ্যে বাস্তব জগতে কোনো বিভাগ নাও থাকতে পারে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মধ্যে অসংখ্য গুণ থাকলেও তারা এমনভাবে রয়েছে যে বাস্তবে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তাদের মানসিক বিভাগ করতে পারি কিন্তু বাস্তবে সেরূপ বিভাগ নেই। কাজেই গাযালি যে বলেন আল্লাহ্‌র গুণাবলি স্বীকার করতে দার্শনিকেরা অনিবার্যভাবে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন তা সত্য নয়।

গাযালি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন, genus ও প্রজাতির (species) মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে এরূপ কোনো সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র মধ্যে থাকতে পারে না, দার্শনিকেরা তা স্বীকার করেন। যেমন, মানুষ ও জীবের এরূপ কোনো সম্বন্ধ নেই। কারণ, আল্লাহ্‌ এক অদ্বিতীয় তার মধ্যে জাতি ও প্রজাতি বলেও কোনো কিছু নেই।

গাযালির এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে ইবনে রুশদ বলতে চেয়েছেন, গাযালির এসব অভিযোগ অত্যন্ত অমূলক; কারণ বিভাগ (division) ক্রিয়াটাই জড়বস্তুর উপর প্রযোজ্য। যারা আদি সত্তাকে জড় পদার্থ বলে ধারণা করে না, তাদের উপর এই অভিযোগ আরোপিত হতে পারে না।

গাযালির অপর অভিযোগ হচ্ছে, গুণগত দিক থেকে গুণগত অনিবার্য অস্তিত্ব সর্বদাই অজড় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, সেই আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে আপতিক

www.pathagar.com

(accidental) বিষয় হিসাবে গুণগুলো অবস্থিত নয়। সেই গুণগুলো আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গাযালি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে এসব অমূলক অভিযোগে এ সকল যুক্তির অবতারণা করেছেন। দার্শনিকেরা কখনও আল্লাহ্কে জড় পদার্থের সঙ্গে তুলনা করেন নি। তাদের ধারণা মতে তিনি (God) আধ্যাত্মিক এবং তারমধ্যে কোনো বিভাগ হতে পারে, তিনি এরূপ কোনো জড় পদার্থ নন। আধ্যাত্মিক সত্তার কোনো বিভাগ নেই, বিভাগ হয় না। কারণ আধ্যাত্মিক সত্তার কোনো জড় দেহ নেই। তেমনি সেই আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে যে গুণাবলি রয়েছে সেগুলোও তার সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। সেগুলোকেও তার সত্তার থেকে পৃথক করা যায় না। কাজেই এক্ষেত্রে জাতি ও প্রজাতির যে প্রশ্ন তিনি তুলেছেন তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

আত্মার অমরত্ব বিষয়ে ইবনে রুশদ-এর অভিমত

মানবাত্মার প্রকৃতি ও স্বরূপের আলোচনায় ইবনে রুশদ আত্মার অমরত্বের প্রতি ইঙ্গিত দান করেছেন। রূপগতভাবে আত্মা এবং ব্যক্তিগতভাবে আত্মা বহু। ইবনে রুশদ-এর এই বিখ্যাত আত্মাতত্ত্ব আত্মার অমরত্বের কথা ব্যক্ত করে। এ প্রসঙ্গে ইবনে রুশদ বলেন, একটি মানুষের জন্মকালে আত্মা তার আদি উৎস্থল থেকে মানবদেহে সাময়িকভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু মৃত্যুর পর দেহাবসানে আত্মা তার পূর্ব ঠিকানায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। আত্মপ্রকৃতি আলোচনায় ইবনে রুশদ আত্মা যে অনাদি অবিনশ্বর এ মত পোষণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রুশদ-এর বিখ্যাত উক্তি প্রণিধানযোগ্য। উক্তিটি নিম্নরূপ :

"This entity (human soul of intellect) must be eternal and incorruptible and is not distroyed by the disappearance of one of the individuals in which it exists."

অতএব, ইবনে রুশদ-এর মতে আত্মা যে শুধু অবিনশ্বর তাই নয়, তাঁর মতে এটি অনন্তকালব্যাপী বিরাজিত। আত্মা প্রসঙ্গে ইবনে রুশদ-এর এই অভিমত পূর্বসূরি ইবনে সিনার মতের অনুরূপ নয়। কেননা, ইবনে সিনা আত্মা দেহের সাথে সাথে নিজেও জন্মলাভ করে—এই মত পোষণ করেন।

রুশদীয় মতানুসারে জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী নির্বিশেষে যা কিছু গতিশীল ও পরিবর্তনযোগ্য তার এই গতি ও পরিবর্তনশীলতার উৎস বা কারণ যদি আত্মা হয়, তবে কি সব আত্মাই কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা প্রাণীর মৃত্যুর পরেও টিকে থাকে? মানবেতর আত্মা ধ্বংস প্রসঙ্গে যেমন উদ্ভিদ-আত্মা বা প্রাণী-আত্মা যা তার কার্যাবলীর জন্য দেহের উপর নির্ভরশীল, ইবনে রুশদ দ্বিমত পোষণ করতেন না। আত্মার রহস্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইবনে রুশদ এই মানবেতর আত্মা সম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা করেন নি। ইবনে রুশদ-এর আলোচনা মানবাত্মা প্রসঙ্গেই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মানবাত্মার স্বরূপ আলোচনায় ইবনে রুশদ মানবাত্মাকে সক্রিয় প্রজ্ঞা তথা নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞায় ভাগ করেছেন, সেখানে আমরা আত্মার অমরত্বের প্রতি ইবনে রুশদ-এর বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখতে

www.pathagar.com

পাই। ইবনে রুশদ মনে করেন আত্মার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় আত্মায় এই বিভাজন নিঃশেষে বিভাজন নয়। নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞা সক্রিয় প্রজ্ঞারই সুপ্ত রূপ। সক্রিয় প্রজ্ঞার সংস্পর্শে নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞা সক্রিয়তায় পর্যবসিত হয়। আত্মার অপরাপর কার্যবলী দেহাবসানে লোপ পেলেও মানবীয় প্রজ্ঞা যা এই সক্রিয় প্রজ্ঞাসজ্ঞাত এবং যা দেহনিরপেক্ষ তা দেহের অবসানে লোপ পায় না। সক্রিয় আত্মার এই অবিনশ্বরতা আত্মার অমরত্বের প্রতি ইবনে রুশদ-এর বিশ্বাসই প্রকাশ করে।

ইবনে রুশদ আত্মার অমরত্বের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ উপমার সাহায্যে প্রদান করতে চেষ্টা করেছেন। মানবাত্মাকে সূর্যরশ্মির সাথে তুলনা করে ইবনে রুশদ বলেন যে, সূর্যরশ্মি বিভিন্ন বস্তুতে প্রতিফলিত হলে যেমন বহু ও বিভিন্ন দেখায় কিন্তু সেই বস্তুগুলোর অবসানে অথবা আলোকিত বস্তুগুলির অপসারণে সূর্যরশ্মি আবার এক ও অভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মানবদেহের মৃত্যুতে আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। কেননা মানবাত্মা একটি দেহনিরপেক্ষ অধ্যাত্ম সত্তা যা কোনো জড়ীয় উপাদানে গঠিত নয়। কেননা যা জড় যা জড়ীয় উপাদানে গঠিত তাই ধ্বংস হয়। কিন্তু দেহনিরপেক্ষ অধ্যাত্ম সত্তার ধ্বংস হয় না। মৃত্যুর পর মানবাত্মার দেহত্যাগ ও তার ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তি ও একটি সমগ্র বিশ্ব আত্মায় তার প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে ইবনে রুশদ-এর নিম্নরূপ উক্তিতে প্রকাশমান : if then soul does not die when the body die, it causes and immortal element in it, when it has left the bodies, from a numerical unity.

অতএব এটি স্পষ্ট যে, ইবনে রুশদ-এর মৃত্যুহীন আত্মা একটি ব্যক্তি আত্মা হিসাবে বিরাজ করে না। অর্থাৎ ব্যক্তি আত্মা অমরত্ব অর্জনের খাতিরে মৃত্যু পরবর্তীকালে তার ব্যক্তিসত্তা ত্যাগ করে। কারণ দেহের অবর্তমানে আত্মা তার ব্যক্তিসত্তা ধারণ করতে অপারগ। কেননা,ইবনে রুশদ-এর মতে আত্মার ব্যক্তিত্ব দেহবিশেষের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন মাত্র প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।

দেহের মৃত্যুতে মানবাত্মার ব্যক্তিসত্তার অবলুপ্তি তথা বিশ্ব আত্মার পরিপূর্ণ একত্বতার রুশদীয় এই ধারণায় বেশ কিছু ধর্মতাত্ত্বিক বিপত্তি ও জটিলতার সৃষ্টি করে। আত্মা তার ব্যক্তিসত্তার পরিচয় হারিয়ে ফেললে পরকালে মহাবিচার দিবসে তার বিচার কাজ কিভাবে সম্পাদিত হবে আর কিরূপেই বা তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে? ইতোপূর্বে ইবনে সিনার আত্মা দর্শনের সমালোচনায় ইমাম গাযালি অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ইবনে রুশদ-এর মতো ইবনে সিনাও এই মত পোষণ করতেন যে, দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতেই কেবল আত্মার ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত হয়। গাযালি বলেন, এ মত গ্রহণ করলে ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে দেহনির্ভর হয়ে পড়ে। গাযালির সমালোচনার জবাবে এবং দেহোত্তর কালে ব্যক্তি আত্মা কিভাবে অবস্থান করে এ প্রসঙ্গে ইবনে রুশদ বলেন, দেহের মৃত্যুর পরে আত্মার অতি সূক্ষ্ম অপ্রত্যক্ষীয় এক বায়বীয় তথা অধ্যাত্ম বস্তু ধারণ করে টিকে থাকে।

কিন্তু এই অপ্রত্যক্ষীয় সূক্ষ্ম বস্তুটি আসলে কি? ইবনে রুশদ বলেন এই অপ্রত্যক্ষীয় সূক্ষ্ম বস্তুটি এক ধরনের জৈব উষ্ণতা, এটি সৌরমণ্ডলে জ্যোতিষ্করাজি থেকে নিঃসৃত এক

www.pathagar.com

ধরনের অগ্নিবৎ কিন্তু অগ্নি নয়। ইবনে রুশদ-এর বিশ্বাস, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই উষ্ণতায় আত্মার বাস এবং এখান থেকেই আত্মা বিভিন্ন দেহে স্থানান্তরিত হয় ও সাময়িক আশ্রয় নিয়ে থাকে।

মৃত্যু-পরবর্তীতে আত্মার এই অধ্যাত্ম বস্তু ধারণ বিষয়টি ইবনে রুশদ-এর একটি দুর্বল মতবাদ। তাঁর আত্মা তত্ত্বে যখন তিনি মত পোষণ করেন যে, দেহের মৃত্যুর পরে আত্মা বিশ্ব আত্মায় একীভূত হয়ে থাকে তখন একই অবস্থায় আবার তার অধ্যাত্ম বস্তু ও ব্যক্তিসত্তা ধারণ ও ব্যক্তিসত্তা বজায় রাখার তত্ত্বটি স্ববিরোধী। যা অধ্যাত্ম তা আবার বস্তু বা পদার্থ হয় কিভাবে? অধ্যাত্ম পদার্থ সম্প্রত্যয়টি একটি স্ববিরোধী তত্ত্ব। অতএব, মৃত্যু-পরবর্তী আত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিআত্মা নয়, ব্যক্তিসত্তা রহিত বিশ্বআত্মা, এ সম্পর্কে ইবনে রুশদ-এর ধারণা অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য ইবনে রুশদ একটি উপমার সাহায্যে আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। দৈহিক মৃত্যুকে তিনি নিদ্রার সাথে তুলনা করে বলেন যে, নিদ্রাকালে মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত থাকে কিন্তু তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি হয় না। অনুরূপভাবে দৈহিক মৃত্যুতে দেহ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপস্থিতিতে দৈহিক কার্যাবলী লোপ পেলেও আত্মা, যা দেহ-নিরপেক্ষ, টিকে থাকে। অপর একটি উপমাতে তিনি বলেন, প্রেমিক ও প্রেমিকার মাঝে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যেমন একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু হয় না, তেমনি দেহ ও আত্মার অনুরূপ নিবিড় সম্পর্কের কারণে দেহের অবসানে আত্মার বিলুপ্তি হয় না।

ইবনে রুশদ-এর "দৈহিক পুনরুত্থান" : বক্তব্য ও মূল্যায়ন

মুসলিম দার্শনিকগণ গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় পদার্থের অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেছেন। তাদের মতে জড় পদার্থের কোনো ধ্বংস বা লয় নেই। মানবাত্মার সঙ্গে দেহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় দেহের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবাত্মাও লয় প্রাপ্ত হয়। তবে ইবনে রুশদ প্রমুখ দার্শনিকগণ এ পৃথিবীতে বিশ্ব আত্মা এবং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি কার্যকরী রয়েছে বলে ধারণা করতেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে আমাদের আত্মার কোনো অংশই লয়প্রাপ্ত হয় না। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের ধারণা ছিল, মানুষের আত্মার মধ্যে বুদ্ধির যে অংশ থাকে তাই কেবল স্থায়ী থাকে। জৈবিক অংশগুলো দেহের সঙ্গে সঙ্গে লয়প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বুদ্ধির অংশগুলো দেহের সঙ্গে সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়। ইবনে রুশদ দার্শনিকদের এ মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা প্রচার করে বলেন যে, নিষ্ক্রিয় বুদ্ধির অংশগুলো লয়প্রাপ্ত হয় না। তারা বিশ্ব আত্মার মধ্যে লীন হয়।

অপরদিকে ইসলামের সাধারণ নিয়মানুসারে মানবাত্মা কিছুতেই লয়প্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পর মানবাত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করে এবং রোজহাশরে আল্লাহ্ যখন বিচারক হয়ে বসবেন তখন সেই আত্মাগুলোর বিচার হবে এবং তারা হয় বেহেশতে না হয় দোযখে যাবে। আত্মাগুলো যদি বিশ্ব আত্মার সঙ্গে মিশে যায় তাহলে তাদের পুনরুত্থানের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এ ধারণা অনুসারে কেবলমাত্র আত্মাই চিরজীবী নয়। আত্মার সঙ্গে দেহেরও পুনরুত্থান হবে, দেহ ব্যতীত আত্মা শূন্যে অবস্থান করতে পারে না। সুতরাং রোজ কেয়ামতে দেহধারী আত্মারই বিচার হবে। দেহ পঞ্চভূতে মিশে

www.pathagar.com

যায়, আপাতদৃষ্টিতে তার কোনো পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই রোজ হাশরে দেহধারী আত্মার পুনরুত্থান মোটেই সম্ভব নয়। এজন্য দার্শনিকগণ আত্মার দেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন।

তাদের মতে, ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহ এবং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি যা বিশ্ব আত্মার মধ্যে স্থান পেয়েছে তাদের পুনর্মিলন মোটেই সম্ভবপর নয়। তার তাদের মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেছেন। আত্মার দেহে প্রত্যাবর্তনের ধারণার তিনটি বিকল্প রয়েছে।

১. প্রথমত, মানবদেহে জীবনের সমষ্টি, জীবন দেহের একটা আকস্মিক গুণ আর যে আত্মা স্বয়ং বর্তমান এবং দেহ পরিচালনাকারী, তারা কোনো অস্তিত্ব নেই। মৃত্যুর অর্থ জীবনের সমাপ্তি। অর্থাৎ সৃষ্টি হতে স্রষ্টার বিরত হওয়া। কাজেই তা যখন অস্তিত্বহীন হয়, দেহও তখন অস্তিত্বহীন হয়। সুতরাং পুনরুত্থানের অর্থ হবে :

(ক) আল্লাহ্ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহ পুনঃনির্ধারণ।

(খ) তাকে অস্তিত্বে পুনরায় আনয়ন।

(গ) তাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

২. দ্বিতীয়ত, আত্মা বর্তমান আছে এবং মৃত্যুর পরও থাকবে। প্রথম দেহের অংশগুলোকে একত্র করে তাতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হবে।

৩. তৃতীয়ত, কোনো দেহে আত্মা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ দেহে হয় পূর্ববর্তী দেহের অংশগুলো নিয়ে অথবা অপর কিছু নিয়ে গঠিত। সুতরাং এই দেহ সেই দেহই হবে। কেননা আত্মা সেই পূর্ববর্তী আত্মাই। উপাদানের দিকে লক্ষ্য করবার কোনো দরকার নেই। কারণ মানুষ আত্মার জন্যই মানুষ।

প্রথম প্রকার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তা প্রকাশ্যতই অসম্ভব। কেননা জীবন ও দেহ যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তখন তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে অনুরূপ বস্তুর উদ্ভব। কিন্তু তাহলেও ঠিক সে বস্তুর পুনরুত্থান নয়। এর অর্থ হলো নব পর্যায়ে উদ্ভব হওয়া। যেমন বলা যায় যে, অমুক ব্যক্তি পুনরায় দান করলেন, অর্থাৎ দাতা বর্তমান ছিল কিন্তু দান কর্মটি ছিল স্থগিত। এভাবে যদি পুনরাগমন ধারণা করা হয় তাহলে আমাদের ধারণা করতে হবে যে কোনো সত্তার অস্তিত্বের ধারণায় প্রত্যাবর্তন ঘটে এরূপ ধারণা অসম্ভব।

দ্বিতীয় প্রকার বিকল্প সম্বন্ধে দার্শনিকদের বক্তব্য এই যে, এতে আত্মার বর্তমান থাকা এবং হুবহু সেই দেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবার পর দেহ পরিচালনার্থে পুনরুত্থান কিন্তু অসম্ভব। কেননা মৃত ব্যক্তির দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। তাকে কীটাদি কিংবা পক্ষীগণ ভক্ষণ করে ফেলে। অতঃপর তা পানি, বাষ্প ও বায়ুতে পরিণত হয় এবং তা জগতের বাষ্প ও বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়, তাকে আবার পৃথক করা বা যুক্ত করা অসম্ভব।

তৃতীয় বিকল্প সম্বন্ধে বলা যায়—(ক) প্রথমত, মানবদেহে ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কারণ কোনো বস্তু সসীম হলে তার উপাদানগুলোও সসীম ও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রাণ অসীম। আর তাই তাকে আবার সসীম দেহের মধ্যে

www.pathagar.com

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

(খ) দ্বিতীয়ত, মৃত্তিকা থাকা অবস্থায় প্রাণের পরিচালনা করে না। এতে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে মিশ্রিত করতে হয় যাতে সে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মাংস, অস্থি, রক্ত, পিত্ত, কফ এবং গ্রন্থি প্রভৃতিতে বিভক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ, মানুষ পদবাচ্য হয় না। কাজেই মৃত্যুর পরে আবার মানবদেহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়।

অপরদিকে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা ও একনিষ্ঠ সেবক আল-গাযালি বলতে চান রোজ কেয়ামতে দেহধারী আত্মারই পুনরুত্থান হবে। কেননা এক ফোঁটা পানি থেকে যদি এ বিরাট দেহের সৃষ্টি তথা বিকাশ লাভ হতে পারে তাহলে আল্লাহ্ কেন পুনরায় মৃত্তিকায় বিলুপ্ত দেহ থেকে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না। এটা তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজসাধ্য।

সমালোচনা

ইবনে রুশদের মতের প্রতিবাদে বলা যায়, মানুষের প্রত্যাবর্তন বলতে সেই মানুষের হুবহু প্রত্যাবর্তন বোঝায় না। মানুষের দেহের উপাদান নানাবিধ জিনিস থেকে গ্রহণ করা হয়। কেবলমাত্র মাটি থেকে মানুষের দেহ সৃষ্টি হয় না। আর তাই বলে আমরা ভালভাবে ধারণা করতে পারি যে, তার উপর মানুষের দেহের আকার লুপ্ত হলেও তার উপাদান লুপ্ত হয় না। কাজেই সেই উপাদানের প্রত্যাগমন তথা পুনরাগমনকে অসম্ভব বলে ধারণা করার কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিকল্পের প্রতিবাদে বলা যায় দার্শনিকগণ নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করতেন অথচ কোরানুল কারিমের এক মহাবাণীকে অস্বীকার করেছেন। যার অর্থ হচ্ছে "যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছেন তাদের মৃত মনে করিও না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রভুর নিকট তারা খাদ্য প্রাপ্ত হয়।" (আল-কোরআন—৩ : ৬১)।

রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "সৎ ব্যক্তিদের আত্মাসমূহ সবুজবর্ণ পক্ষীর মধ্যে থাকে। ঐ সমস্ত পক্ষীর বাসস্থান আরশের নিচে দোদুল্যমান রয়েছে।" এতদ্ব্যতীত রুহসমূহের সৎকার্যের প্রতিদান, মুনকির-নকীরের প্রশ্ন, কবর আজাব প্রভৃতির অনুভূতি সম্বন্ধে যে সমস্ত হাদিস আছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আত্মাকে কোনো আকারে তা প্রথম দেহের উপাদান অপর কোনো উপাদান অথবা পরে সৃষ্ট নূতন কোনো উপাদান দ্বারা সংস্থাপন করা সম্ভব। কেননা মানুষ আত্মা দ্বারা অথবা দেহ দ্বারা গঠিত নয়। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার দেহের উপাদানসমূহ পরিবর্তিত হতে থাকে। এ ছাড়া তার খাদ্য এবং স্বভাবও পরিবর্তিত হতে থাকে। এতদসত্ত্বেও সে হুবহু সেই মানুষই থাকে। এটা আল্লাহ্র শক্তির অন্তর্গত। তার প্রত্যাবর্তন সে আল্লাহ্রই প্রত্যাবর্তন। কেননা যন্ত্রের অভাবে সে দৈহিক সুখ বা দুঃখ অনুভব করতে অক্ষম। তাকে পূর্বের ন্যায়ই একটি যন্ত্র পুনরায় প্রদান করা হয়। তাকেই বলে পনরুত্থান।

www.pathagar.com

পরিভাষা

অহং : Self or Ego.

ইকবালের দর্শনের মূল সুর হচ্ছে অহং, আত্মসত্তা বা খুদি। অহম বা খুদির ধারণার উপরই ইকবালের সমগ্র দর্শনসৌধ নির্মিত। তাঁর মতে, অহম বা আত্মসত্তা বাস্তব। এটা সকল ক্রিয়াতৎপরতার উৎস এবং আপন সত্তায় বিরাজমান। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমরা এই সত্তার সাক্ষাৎ লাভ করে থাকি। খুদির স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতার বাস্তবতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আস্থা রাখতে সহায়তা করে। স্বজ্ঞার মাধ্যমে শুধু খুদির অস্তিত্ব সম্পর্কেই জানা যায় না—এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। স্বজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞাত খুদি মূলত নিয়ামক, স্বাধীন ও অমর। মানুষ তার মৌলিকতা ও অনন্যতা ক্রমান্বয়ে বিকাশের মাধ্যমে নিজ ব্যক্তিত্বকে সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করতে নিত্য প্রয়াসী। ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ নয়, বরং ব্যক্তিত্বের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশই অহমের যাবতীয় অনুসন্ধানের লক্ষ্য।

আক্ল : Aql.

আক্ল অর্থ প্রজ্ঞা। জ্ঞানের বিভিন্ন উৎসের উপর বিভিন্ন ধরনের গুরুত্ব আরোপের কারণে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ইসলাম নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ ছাড়াও জ্ঞানের আরো তিনটি উৎসের নির্দেশ করে। এগুলো হচ্ছে (১) প্রজ্ঞা (আকল), (২) সামাজিক প্রথা (নকল), (৩) অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (কাশফ)। হযরত মোহাম্মদ (দ:) তাঁর অনুসারীদেরকে জীবনসমস্যা সমাধানের জন্য কিছু ঘটনাকে প্রজ্ঞা, কিছু ঘটনাকে সামাজিক প্রথা এবং কিছু ঘটনাকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার পরামর্শ দেন। জীবন-সমস্যাবলির পরিপূর্ণ উপলব্ধি এবং জীবন ও জগতকে বুঝার নিমিত্তে এ-তিন জ্ঞানের উৎসকেই সমান গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কালের গতিতে মুসলিম চিন্তাবিদগণ প্রজ্ঞা, সামাজিক প্রথা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর সমান গুরুত্ব আরোপ না করে কেউ প্রজ্ঞা, কেউবা সামাজিক প্রথা আবার অন্যরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্ঞানের উৎসের উপর গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যেসব মুসলিম চিন্তাবিদ্গণ আকল বা প্রজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করে জীবনসমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালিয়েছেন এবং প্রজ্ঞাকেই জ্ঞানের নিমিত্তে উৎস বলে ভেবেছেন তাঁরাই মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটান।

www.pathagar.com

আদল : Adal.

আদল শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ণতা। আল্লাহ্ পরম করুণাময় এবং ন্যায়পরায়ণ। তিনি কখনও অন্যায় করতে পারেন না। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে আল্লাহ্ মানুষের উপর এমন বোঝা চাপান না যা সে বহন করতে পারে না। মানুষ তার কৃতকর্ম অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি লাভ করবে। এ সত্যকে মুতাযিলাগণ যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যতাকে স্বীকৃতি দান করেন। তাঁদের মতে মানুষের কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী—মানুষ নিজেই তার কর্মপন্থা নির্বাচন করে। তাই ভাল কাজের জন্য মানুষ পুরস্কৃত হবে এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পাবে। এভাবে মুতাযিলাগণ আল্লাহ্‌র ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতা প্রতিপন্ন করতে হলে ইচ্ছার স্বাধীনতা অনস্বীকার্য। আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুতাযিলাদেরকে আহ্‌লুল আদল বলা হয়।

আল্লাহ্ দর্শন : Beatific vision.

পরকালে আল্লাহ্‌র দর্শন সম্ভব নয় বলে মুতাযিলাগণ মনে করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, যদিও কোরআনে পরিব্যক্ত হয়েছে যে, বিশ্বাসীরা পরকালে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে, তবুও তা জৈবিক অর্থে চর্মচক্ষু দ্বারা সম্ভব নয়। এ-সত্যকে গ্রহণ করতে হবে শুধু আধ্যাত্মিক অর্থেই। তারা বলেন যে, পুণ্যাত্মারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে—তবে তা' হবে আধ্যাত্মিক ভাবে, হৃদয়ের চোখে অন্তরাত্মা দিয়ে। অপরপক্ষে, আশারীয়াগণ রক্ষণশীল মতামত সমর্থন করে বলেন যে, পরকালে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে। তাঁরা আল্লাহ্‌র দর্শনকে দৈহিক অর্থেই বিশ্বাস করেন। তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেন যে, শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করবেন—সেদিন আল্লাহ্ ও বিশ্বাসীদের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকবে না। চর্মচক্ষুতেই আল্লাহ্ দর্শন বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্চিত বলে তাঁরা মনে করেন।

আশারীয়া : Asharites.

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে মুতাযিলা সম্প্রদায় সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুতাযিলাদের দর্শনের অভিনবত্বের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আশারীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব। ইমাম আবুল হাসান-আল-আশারীর' নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় আশারীয় সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় মুতাযিলা মতবাদের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে কালামের (যুক্তিবিজ্ঞান) আশ্রয় নেন এবং প্রজ্ঞা ও ওহির মধ্যে সমন্বয় সাধনের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। কালাম হচ্ছে এক ধরনের যুক্তিবিজ্ঞান (science of reason) এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় কানুনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সত্যে উপনীত হওয়া। এই কারণে আশারীয় অনুসারীদেরকে 'মুতাকাল্লিমিন' বলা হতো। আশারীয়গণ দর্শন ও গোঁড়া, ধর্মমতের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ধর্মকে সাধারণ মানুষের নিকট বোধগম্য করে তোলার প্রয়াস

www.pathagar.com

চালান। তাঁদের আন্দোলন ছিল রক্ষণশীল সূক্ষ্মতাত্ত্বিক আন্দোলন (orthodox scholastic movement)। মুতাযিলা ও আশারীয়া সম্প্রদায় উভয়ই যুক্তিবাদী ছিলেন, কিন্তু মুতাযিলাগণ যুক্তির প্রাধান্য দিয়েছেন অধিক, অন্যদিকে আশারীয়গণ প্রাধান্য দেন প্রত্যাদেশ বা ওহির উপর।

আহলুস সুফ্ফা : Ahli-Suffa.

এর অর্থ হচ্ছে চত্বরবাসী। একদল নিঃস্ব মোহাজির হযরত (সা:) এর সঙ্গে সর্বদা থাকতেন এবং পরে তাঁরা মদিনায় হিজরত করেন। বাসস্থানের অভাবে মদিনার নবনির্মিত মসজিদের চত্বরে তাদেরকে আশ্রয় দেয়া হয়। তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কালক্রমে হযরত (সা:) দরিদ্র মোহাজিরদেরকে পুণর্বাসন করেন। এতদসত্ত্বেও আহলুস সুফ্ফা একটা মর্যাদাপূর্ণ আখ্যারূপে থেকে যায়। কেউ কেউ মনে করেন আহলুস সুফ্ফা শব্দ হতে সুফি শব্দ উদ্ভব হয়েছে।

ইচ্ছার স্বাধীনতা : Fredom of will.

মুতাযিলাগণ মানুষের ইচ্ছার ও কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, যদি মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয় তবে মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব অর্থহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু আশারীয় চিন্তাবিদগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ্ই সকল কর্মের কারণ, সকল কর্মের নিয়ন্ত্রক, তিনিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্ মানুষের মধ্য কর্মশক্তি সৃষ্টি করেন, অতঃপর ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পরিশেষে তাদের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করান। অর্থাৎ আল্লাহ্ই মানুষের মধ্য দিয়ে কাজ করেন।

আশারীয়গণ কাশফ বা অর্জন মতবাদ বিশ্বাস করেন। এর সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো, পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর অসীম করুণায় মানুষকে কার্যের ধারা নির্বাচনের ক্ষমতা দিয়েছেন, ফলে এ ধারা নির্বাচনের মধ্য দিয়েই মানুষ তার কৃতকর্মের দোষ-গুণ অর্জন করে থাকে। অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের ফলাফল তার অর্জনপ্রসূত।

আশারীয় এই মতবাদটি অত্যন্ত দুরূহ ও বোঝা বেশ কঠিন। তবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, তাঁরা মুতাযিলাদের স্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও গোঁড়া অদৃষ্টবাদের মধ্যবর্তী একটি সমন্বয়ধর্মী মতবাদ প্রচার করেন।

ইনসান-ই-কামিল : Insan-i-Kamil.

ইনসান-ই-কামিল-এর শাব্দিক অর্থ পূর্ণ মানব। সুফিদের পরিভাষায় যে উন্নত মানব আল্লাহ্র সাথে আত্মিক একত্ব লাভ করেছেন তাঁকে ইনসান-ই-কামিল বলা হয়। আবু য়াযীদ আ-বিসতামী (মৃ. ২৬১/৮৭৪)'র কথায় দেখা যায় আল-ইনসান-ই-কামিল এমন ব্যক্তি যিনি কয়েকটি স্বর্গীয় নামে ভূষিত হবার পর নামগুলো থেকে অতিক্রান্ত হয়ে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ (আল-কামিল-আল-তাম্ম) মানব পর্যায়ে উপনীত হন।

www.pathagar.com

ইবাদত : Ibadat.

ইবাদত এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দাসত্ব করা। ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে দাসত্বের তাগিদে যেসব অনুষ্ঠান পালন এবং সৎকর্ম সাধন করতে হয় সমষ্টিগতভাবে এদেরকে ইবাদত বলে। ইসলামি ফিকাহ গ্রন্থসমূহের প্রথমদিকে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের আলোচনা থাকে। যথা : তাহারাত, সালাত, যাকাত, সাও, হাজ্জ এবং সময় সময় জিহাদও।

ইলম : Ilm.

ইলম আরবি শব্দ। এর অর্থ 'জ্ঞান'। গল্ডজিয়র তাঁর ফিকাহ প্রবন্ধে শব্দটির একটি ব্যবহারিক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। 'ইলম' প্রথম দিকে নির্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞানকে বোঝাত, যথা—কোরআনের ইলম, তাফসিরের ইলম ইত্যাদি। অর্থের সম্প্রসারণতার দরুন ইলম (ব.ব. উলুম) "বিজ্ঞান" এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে যায়। 'কালাম' শব্দেরও অর্থ সম্প্রসারিত হয়েছে। এমন জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লব্ধজ্ঞানের অধিকারীকে 'আলিম' বলা হয়।

ইলহাম : Ilham.

ইলহাম-এর অর্থ অনুপ্রেরণা বা ঐশী ইঙ্গিত। ইলহামের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার সুফিদের মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ দু'ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন : ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো মানুষের অন্তরে নিক্ষিপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে এবং সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ জনগণের কল্যাণে নবিদের নিকট প্রেরিত সংবাদের মাধ্যমে। প্রথমটি ইলহাম, দ্বিতীয়টি ওহি। সুফিদের অন্তকরণ অপবিত্রতা মুক্ত, তা-ই ইলহামের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁরাই ইলহাম পেয়ে থাকেন।

ইজমা : Ijma.

ইজমার অর্থ একমত হওয়া। মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজতাহিদগণের একমত হওয়াকে পরিভাষাগতভাবে ইজমা বলা হয়। যে প্রশ্নের সমাধান সরাসরি কোরআন ও হাদিসে পাওয়া যেত না মুজতাহিদগণ কোরআন ও হাদিসের আলোকে ব্যক্তিগত বিচারের সাহায্যে তার সমাধান করতেন। মুজতাহিদগণের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ইজমা নামে পরিচিত।

ইহতিহসান : Ihtihsan.

ইহতিহসান-এর অর্থ অগ্রাধিকার। সমষ্টিগত কল্যাণ বা ন্যায়পরতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত রায় প্রদান করা। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী যখন কোনো রায় সমষ্টিগত কল্যাণের পরিপন্থী হয়, তখন ইসতিহসান প্রয়োগ করা হয়। এর সাহায্যে কিয়াস বা সাদৃশ্যমূলক অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্তের পরিবর্তে একটি নিয়ম বা আইন গ্রহণ করা হয় যা সমষ্টির কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসতিহসানের এ পদ্ধতি ইমাম আবু হানিফা (র:) গ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

ইসতিসলাহ : Istislah.

ইসতিসলাহ ইসতিহ্‌সানের ন্যায় একটি পদ্ধতি। মালেকি মাযহাবের লোকগণ সাধারণত এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। এটাও জনহিতকর প্রেক্ষিতে কোনো নিয়ম বা আইনকে অনুমোদন দান করে। ইসতিসলাহ ও ইসতিহ্‌সান মূলত একই পদ্ধতি।

ইয়াহিয়া উলম আল-দীন : Yahya ulum al-din.

ইয়াহিয়া উলম আল-দীন আল-গাযালির শ্রেষ্ঠ রচনা। আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থটি চারখণ্ডে বিভক্ত। অনেক পণ্ডিতের মতে, "যদি সকল মুসলিম চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয় এবং শুধু ইয়াহিয়া সংরক্ষিত থাকে, তবে ইসলামের পক্ষে সে ক্ষতি সামান্য মাত্র।" গ্রন্থটির নাম ইয়াহিয়া উলম আল-দীন অর্থাৎ ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস সার্থক হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে জ্ঞানের ক্রমোন্নতি, প্রজ্ঞার উৎকর্ষ, ইসলাম বা ঈমানের পার্থক্য প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে নফস, রুহ (Spirit), কালব (Heart), আকল (reason)-এর স্বরূপ ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। এই খণ্ডেই আল-গাযালির সুফিতত্ত্ব পূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে। অপর দু'টো খণ্ডে ইসলামের নৈতিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঈমান : Iman.

ঈমান-এর অর্থ দৃঢ়বিশ্বাস। ইসলামি পরিভাষায় মোহাম্মদ (দ:) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে কিতাব প্রাপ্ত হন এবং তিনি যে পথ প্রদর্শন করেন তাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। এক শ্রেণীর আলিমের মতে অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে এর মৌখিক উচ্চারণ করাই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। মতান্তরে, অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আমল এ তিনের সমন্বয়ে হয় ঈমান।

ওয়াসিল-বিন-আতা : Wasil-bin-Ata.

ওয়াসিল-বিন-আতা মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রখ্যাত ইমাম হাসান-আল-বসরীর একজন প্রধান শিষ্য। তিনি ছিলেন মুক্ত বিচারবুদ্ধির একজন একনিষ্ঠ সাধক। তিনি প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধিকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন। মুসলিম দর্শনে মুক্ত বুদ্ধির প্রসার ও প্রচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। স্বীয় উস্তাদ হাসান আল-বসরীর সাথে কোনো বিষয়ে তাঁর মতভেদ দেখা দিলে তিনি হাসান আল-বসরীর দল ত্যাগ করেন এবং তখন হতে মুতাযিলা মতবাদের সূচনা হয় বলে কথিত আছে।

ঐশী ন্যায়বিচার : Divine justice.

মুতাযিলাগণ এই মতবাদে বিশ্বাস করেন যে, অপরিহার্যভাবেই শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌ পাপীকে শাস্তি এবং পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করবেন। সৎকার্যের জন্য পুরস্কার, অসৎ কার্যের জন্য শাস্তি আল্লাহ্‌র বিচারের অমোঘ বিধান। অন্যদিকে আশারীয়গণ

www.pathagar.com

অভিমত ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ্ যা খুশি তা-ই করতে পারেন। তিনি কোনো বিধি-বিধান বা ন্যায়পরায়ণতার অধীন নন। তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কার দিবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। অবশ্য পুণ্যবানদের পুরস্কার ও পাপীদেরকে শাস্তি দেবার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আশারীয়গণ উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী; তার উপর কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় না।

কাদারিয়া : Qadarites.

কাদারিয়া শব্দটি আরবি 'কদর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। কদর-এর অর্থ হচ্ছে শক্তি। কাদারিয়া সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত। মানুষ স্বাধীন কর্মশক্তির অধিকারী-বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ কোনো বাধ্যবাধকতার অধীনে কাজ করে না। কাদারিয়াগণ মানুষের নৈতিক দায়িত্বের উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা আল্লাহ্কে সকলপ্রকার অপবিত্রতা ও দোষ হতে মুক্ত রাখেন। মানুষ নিজেই তার কার্যের কর্তা। তাই ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত হবে, মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে, রয়েছে নীতিজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ।

কালাম : Kalam.

আশারীয়গণ পবিত্র কোরআন ও হাদিসের সমর্থনে যুক্তির আশ্রয় নেন—প্রবর্তন করেন 'কালাম'। কালাম-এর অর্থ হচ্ছে যুক্তিবিজ্ঞান। কালাম এমন এক যুক্তিবিজ্ঞান যা ধর্মের অনুশাসনের সাথে সমতা রক্ষা করে সত্য নির্ধারণে সহায়তা করে। ও' লিয়ারির মতে ধর্মের ব্যাখ্যা ও রক্ষার জন্য যে দার্শনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা' কালাম নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, আশারীয় চিন্তাবিদগণ এ কালাম পদ্ধতি ব্যবহার করেন বলেই তাঁদেরকে মুতাকাল্লিমুন বা যুক্তিবাদি বলে অভিহিত করা হয়।

কাশ্ফ : Kasf.

কাশ্ফ-এর অর্থ উন্মোচন, অন্তর্দৃষ্টি বা গুপ্ত ব্যাপার দর্শন। ভাবাবেগপ্রধান ধর্মীয় জীবনে (তাসাউফ) এটা সুফির নিকট আধ্যাত্মিক রহস্য উন্মোচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক ব্যাপক শব্দ। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই সুফি সাধকগণ আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এ সময়ে ঐশী সত্তার গোপন রহস্যের দ্বার সুফিদের নিকট উন্মোচিত হয়। সুফির তন্ময়তা বা ফানাফিল্লাহ্ অবস্থায় কাশ্ফ-এর এই অনুভূতি আসে।

কিয়াস : Quias.

কিয়াস ইসলামি কানুনের একটি উৎস। কিয়াস বলতে তুলনামূলক বিচার বা অনুমানকে বোঝায়। কোরআন হাদিস ও ইজমার ভিত্তিতে কোনো নতুন সমস্যার সাদৃশ্যমূলক

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তের নাম কিয়াস। যেসব বিষয় কোরআন, হাদিস ও ইজমার অন্তর্ভুক্ত হয় নি, সেসব বিষয় কিয়াসের মাধ্যমেই মীমাংসিত হয়।

খারেজি সম্প্রদায় : Kharijites.

খারেজি শব্দের অর্থ দলত্যাগ। অন্যান্য মুসলমানদের দল পরিত্যাগ করায় খারেজিগণ এই নামে অভিহিত হন। সিফিনের যুদ্ধের ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে হযরত আলীর একদল সমর্থক খারেজি নামে একটি স্বতন্ত্র দলে সংগঠিত হয়। তাঁরা হযরত আলীর মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। খারেজিরা ইসলামের একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক সম্প্রদায় (religio-political sect)। প্রথমে এই সম্প্রদায় রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু অবশেষে তাঁদের আন্দোলন ধর্মীয় রূপ লাভ করে। খারেজিদের মতবাদ সর্বত্র এক ও অভিন্ন ছিল না। তাদের মধ্যে যত দল, তত মতবাদও ছিল।

গাযালি : Ghazali.

আল-গাযালি ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্যদেশীয় খুরাসানের অন্তর্গত তুস নগরীর নিকটবর্তী গাযালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যুগস্রষ্টা একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন একজন মহা-মনীষী। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও সুফিবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে তাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। অনেকে তাকে ধর্মীয় সংস্কারক বলে মনে করেন। তিনি সংস্কারের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'ইয়াহিয়া উলম আল-দীন' আল-গাযালির শ্রেষ্ঠ রচনা। আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থটি চারখণ্ডে বিভক্ত। এ গ্রন্থটি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয় যে 'যদি সকল মুসলিম চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয় এবং শুধু ইয়াহিয়া সংরক্ষিত থাকে, তবে, ইসলামের পক্ষে সে ক্ষতি সামান্য মাত্র।' ইমাম গাযালির মতে, একমাত্র ওহির জ্ঞান দ্বারাই সত্যের সন্ধান লাভ করা সম্ভব। তিনি প্রচলিত দার্শনিক মতবাদগুলোকে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে যে জ্ঞান তা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ধর্ম, দর্শন ও সুফিবাদের পক্ষে মৌলিক অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

জাবারিয়া : Jabarites.

মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যে অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাসই জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কারণ। 'জবর' শব্দের অর্থ বাধ্যতা, নিয়তি, অদৃষ্ট। জাবারিয়াগণ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে, মানুষের ইচ্ছার কোনোও স্বাতন্ত্র্য নেই এবং তার কার্য নির্বাচনেরও ক্ষমতা নেই। মানুষ আল্লাহ্‌র ক্রীড়নক মাত্র, সে সম্পূর্ণ অসহায়-সকল কার্য আল্লাহ্ হতে নিঃসৃত। মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাশক্তির অধীন। তিনি তাকে দিয়ে যা করান, মানুষ তাই করে। ফলে, মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয় বলে জাবারিয়াগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের মতবাদ কাদারিয়া মতবাদের বিপরীত। জাবারিয়া মতবাদের প্রসিদ্ধ প্রবক্তা হচ্ছেন জাহম ইবনে সাফওয়ান।

www.pathagar.com

জাবারুত : Jabarut.

মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থান নিরূপণের জন্য আল-গাযালি তিনটি জগতের অস্তিত্বের উল্লেখ করেন : (১) আলম-আল-মুলক, (২) আলম-আল-মালাকুত, (৩) আলম-আল-জাবারুত।

আলম-আল-মুলক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা পরিদৃশ্যমান জগৎ। এ-স্তরে আত্মা ইন্দ্রিয়-জগতের বাইরে অবস্থান করে না।

আলম-আল-মালাকুত শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল জগৎ। আল-গাযালির মতে এটাই প্রকৃত ও আসল জগৎ।

আলম-আল-জাবারুত জগৎ হচ্ছে উপরোক্ত দুই জগতের মধ্যবর্তী জগৎ। এই স্তরে মানবাত্মা উপরোক্ত দুই জগতেই অবস্থান করে। দৃশ্যত এই স্তরে আত্মা আলম-আল-মুলকে অবস্থান করলেও কার্যত আত্মা আলম-আল-মালাকুতের অন্তর্ভুক্ত। স্বপ্নে বা ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মা এইস্তরে আমাদের দেহ ত্যাগ করে আলম-আল-মালাকুতের জগতে বিচরণ করে।

জহম : Jahm.

জাহম ইবনে সাফওয়ান একজন মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ। ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে তিনি কিছুটা স্বাধীন মত পোষণ করতেন। ঈমান যে অন্তরের ব্যাপার মুরজিয়াদের এ ধারণার সাথে তাঁর মতৈক্য ছিল। মুতাযিলাদের ন্যায় তিনি আল্লাহ্র উপর কোনো মানবীয় গুণ আরোপের বিরোধী—আবার অন্যদিকে জাবর (বাধ্যবাধকতা জাবারিয়াদের)-এর ঘোর সমর্থক।

তওবা : Tauba.

তওবার অর্থ হলো অনুতাপ বা অনুশোচনা। কৃত পাপকার্যের জন্য অনুশোচনা করা এবং উক্ত পাপকার্য পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্পই হলো তওবা। তওবার প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যসকল বস্তু হতে নিজেকে ফিরিয়ে নেয়া অর্থাৎ জগতের সকল বস্তু হতে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন।

তাওহিদ : Tawhid.

ধর্মীয় পরিভাষায় এই শব্দটি আল্লাহ্র একত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কিত বিজ্ঞানকেই ইলম আল-কালাম বা ধর্মতত্ত্ব বলা হয়। এটা ইসলামে ঈমান ও বিশ্বাসের যাবতীয় নীতির মূল ভিত্তি। কিন্তু মুতাযিলাগণ উপরোক্ত সংজ্ঞা হতে আলাহ্র গুণাবলিকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর সত্তার একত্বকেই ইলম আল-তাওহিদরূপে গ্রহণ করেন। মুতাযিলা চিন্তাবিদগণ আল্লাহ্র সত্তা হতে স্বতন্ত্র গুণাবলি অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ্র গুণাবলি তাঁর সত্তা হতে পৃথক নয়। কারণ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়—তাঁর সত্তা ব্যতিরেকে পৃথক গুণাবলি হতে

www.pathagar.com

পারে না। মুতাযিলাগণ বলেন, আল্লাহ্‌র গুণাবলি তাঁর সত্তার মধ্যে অবস্থিত নয়, তবে তাঁর সত্তা সাথে অভিন্ন। আল্লাহ্‌র গুণাবলি আল্লাহ্‌র সত্তারই নামান্তর। আল্লাহ্‌র সত্তায় কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করার অর্থ হলো তাঁর অসীমত্বকে সসীম করা। কিন্তু তা হতে পারে না—আল্লাহর একত্ব অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, এজন্য মুতাযিলাগণ নিজেদেরকে আহ্‌ল-আল-তাওহিদ বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র তাওহিদ বা একত্বের সংরক্ষক।

তাশ্‌বিহ্‌ : Tasbih.

তাশ্‌বিহ্‌-এর অর্থ হচ্ছে আত্মস্থকরণ, সদৃশ-বস্তুতে পরিণতকরণ (মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র) তুলনাকরণ। আল্লাহ্‌র প্রতি মানবসদৃশ দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির আরোপণ। অপরপক্ষে, তা'তীল-এর অর্থ হচ্ছে (আল্লাহ্‌কে সমুদয় গুণাবলি হতে) বিমুক্তকরণ। এই শব্দদ্বয় আল্লাহ্‌র স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামে প্রচলিত বিপরীত দু'টি মতবাদ। সুন্নী ইসলামে এই দুই মতবাদই কুফরের অন্তর্ভুক্ত এবং গুরুতর পাপরূপে বিবেচিত হয়।

তাহাফাতুল-ফালাসিফা : Tahafatul Falasifa.

দার্শনিকদের বিনাশন। দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের সমস্যাবলিকে শুধু বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালান। আল-গাযালি দার্শনিকদের এ মতবাদ খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, প্রজ্ঞার দ্বারা যথার্থ সত্তার স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। তিনি মুতাযিলা চিন্তাবিদদের মতবাদেরও বিরোধিতা করেন। চরমপন্থী মুতাযিলাসহ দার্শনিকবৃন্দ এরিস্টোটলের মতবাদের সাথে কোরআনের শিক্ষার সামঞ্জস্যতা বিধানে প্রয়াসী হন। আল-গাযালি এই প্রচেষ্টাকে নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করেন। তিনি তাঁর 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' (দার্শনিকদের খণ্ডন বা বিনাশন) গ্রন্থে দার্শনিকদের সমালোচনায় অবতীর্ণ হন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি দার্শনিকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—জড়বাদী, অতিবর্তী খোদাবাদী এবং খোদাবাদী সম্প্রদায়। অতঃপর তিনি একে একে সব সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন এবং স্বজ্ঞার উপরই যে পরম সত্তার জ্ঞান নির্ভর করে সে সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাসাওউফ : Tasawuf.

তাসাওউফ শব্দটি 'সুফ' শব্দ হতে উৎপন্ন। সুফ অর্থ পশম, আর তাসাওউফের অর্থপশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। মরমি তত্ত্বের সাধনায় কারো জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজেকে এইরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন, ইসলামের পরিভাষায় তিনি সুফি নামে অভিহিত হন।

দরবেশ : Darvish.

দরবেশ-এর আভিধানিক অর্থ দরজা অনুসন্ধান করা, অর্থাৎ, সংসারবিরাগী ধর্মানুসন্ধানী। দরবেশ সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত : এক সম্প্রদায় ব্যা-শারা অর্থাৎ,

www.pathagar.com

ইসলামের বিধানের অনুসারী, তাঁরা ইসলামের আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ মেনে চলেন। অপর সম্প্রদায় বেশারা বা নিয়ম-কানুন বিবর্জিত, অর্থাৎ তাঁরা ইসলামের আনুষ্ঠানিক এবং নৈতিক নিয়ম-কানুন মেনে চলেন না।

ধর্মতত্ত্ব : Theology.

পাশ্চাত্য দর্শনে ধর্মতত্ত্ব বলতে বোঝায় পরম সত্তা বা স্রষ্টা সম্পর্কীয় আলোচনা। এই ধর্মতত্ত্ব দু'প্রকার : (১) প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব, (২) প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব। বিশ্বজগৎ ও মানবাত্মার প্রকৃতি লক্ষ্য করে পরম সত্তার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই হলো প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব। এই ধর্মতত্ত্ব বিচারসম্মত। অন্যদিকে, আল্লাহ্ বা স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ নিরূপণ করা হলো প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব। এই প্রত্যাদেশকে ইসলামে ওহি বলা হয়।

নফ্স : Nafs.

নফ্স পদ এর অর্থ আত্মা। প্রাথমিক যুগের আরবি সাহিত্যে নফ্স শব্দটি আত্মা বা ব্যক্তি বোঝাবার জন্য আত্মঘটিত ও ব্যক্তিরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কোরআন শরিফেও নফ্স আত্মা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং রূহ বিশিষ্ট স্বর্গীয় দান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী যুগের সাহিত্যে নফ্স এবং রূহ শব্দ দু'টি একটির পরিবর্তে অপরটি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয়ই মানুষের আত্মা এবং ফিরিশতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোরআন অবতীর্ণ হবার পর নফ্স এবং রূহের ব্যবহারে খ্রিষ্টান এবং নব্য প্লেটোবাদী ভাবধারার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এরিস্টোটলের মনো-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আরবের প্রাথমিক দর্শনশাস্ত্রে আল-কিন্দি আত্মা সম্বন্ধে নব্য-প্লেটোবাদী মতবাদ প্রবর্তন করেন। মুসলিমগণ তখনই জানতে পারেন যে, মানবাত্মা আদিকারণ হতে নির্গত হয়েছে। মানবাত্মা বিশ্ব-আত্মারই অংশ। এই মতবাদ পরবর্তী মুসলিম সুফিবাদেরও বিষয়বস্তু। আত্মা এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ক যে মতবাদ মুসলিমদেরকে প্রভাবান্বিত করেছে তা তর্কশাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়।

নক্‌ল : Naql.

সামাজিক প্রথা। মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে জীবনের কিছু ঘটনাকে প্রজ্ঞা (আকল), কিছু ঘটনাকে ঐতিহ্য (নকল), কিছু ঘটনাকে স্বজ্ঞার (কাশ্‌ফ) দ্বারা ব্যাখ্যা করার উপদেশ দেন। এ তিন উৎস থেকে মানবজ্ঞান উদ্ভব হয় এবং পরিপূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করতে হলে এদের প্রত্যেকেরই বিবেচনায় আনা উচিত। কিন্তু এ তিন উৎসের যে কোনো একটির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। যেমন : মুতাযিলাগণ প্রজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালান। অপরপক্ষে, আশারীয়গণ ঐতিহ্য বা সামাজিক প্রথার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

www.pathagar.com

নূর : Noor.

নূর-এর অর্থ জ্যোতি। "আল্লাহ্ই জ্যোতি এবং তিনি স্বীয় জ্যোতিতে সমস্ত বিশ্বে এবং মানুষের নিকট প্রকাশিত হয়ে থাকেন।" এই মতবাদ বহু প্রাচীন এবং প্রাচ্যের ধর্মসমূহে এবং গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে পরিব্যাপ্ত।

ফানা : Fana.

ফানা সুফিবাদের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ বিলোপপ্রাপ্তি বা ধ্বংসপ্রাপ্তি। যিনি পরিপূর্ণ সুফি স্তর লাভ করেন, তিনি অবশ্যই নিজের সত্তার বিলোপ সাধনরূপ অবস্থায় উপনীত হন। ফানার অর্থ মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছাতে বিলুপ্তকরণ। প্রকৃত সুফি বলতে তাঁকেই বোঝায় যার নিজস্ব বলতে কিছু নেই এবং তিনি নিজেও কারোর মালিকানাধীন নন। এটাই আত্মবিলুপ্তি ফানা-এর সারমর্ম।

বাকা : Baqa.

সুফি সাধনার সর্বশেষ স্তর। সুফি সাধনার পূর্ণতা ঘটে ফানা ফিল্লাহর মাধ্যমে বাকা বিল্লাহর স্তরে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ফানার অর্থ আত্মবিলোপসাধন। এই স্তরে সুফি সাধকগণ তন্ময়তার মাধ্যমে নিজের জাগতিক কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে ঐশী সত্তায় প্রদীপ্ত হন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত করেন আল্লাহ্র ধ্যানে ও প্রেমে। এই ফানার স্তরের পরই সূচিত হয় বাকা স্তর। এই পর্যায়ে সাধক আল্লাহ্র চেতনায় স্থায়িত্ব লাভ করেন এবং আল্লাহ্র চিরন্তন সত্তায় অবস্থান করেন।

বাতিনিয়া : Batinia.

কতগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য একটি নাম। বাতিন (আভ্যন্তরীণ) শব্দ হতে উদ্ভূত বলে এটা সেসব দলগুলোকে নির্দেশ করে যারা কোরআনের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করে এর আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক অর্থের অনুসন্ধান করে। তারা তা' (তাফসির দ্র.) নামক রূপক ব্যাখ্যা পদ্ধতি অবলম্বন করে। কারমাতিয়া ও ইসমাইলিয়া দলগুলোকে বাতিনিয়া আখ্যা দেয়া হয়।

বিলা কায়ফা : Bila Kaifa.

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলিম চিন্তাবিদগণ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন—বুদ্ধিবাদী ও গোঁড়া রক্ষণশীল। বুদ্ধিবাদীগণ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী। ধর্মীয় নীতিসমূহের ব্যাখ্যায় তাঁরা প্রজ্ঞা নির্ভর ছিলেন, প্রত্যাদেশের স্থান তাঁদের নিকট ছিল গৌণ। অন্যদিকে গোঁড়া রক্ষণশীলগণ প্রজ্ঞার শক্তিতে আস্থা শীল। ধর্মীয় ব্যাপারে কোরআন ও হাদিসই ছিল তাঁদের একমাত্র ভরসা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই গোঁড়া ইসলামপন্থীদের নেতৃত্ব

www.pathagar.com

দেন। তিনি 'বিলা কায়ফা' নীতিতে (বিনা প্রশ্নে কোনো কিছু গ্রহণ করা) বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে, কোনো প্রশ্ন করা ছাড়াই কোরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর অনুসারিগণ ঘোষণা করেন যে, ধর্মের অনুশাসনগুলো অন্ধভাবে অনুশীলন করতে হবে, বর্জন করতে হবে স্বাধীন চিন্তাকে।

মাতরুদি : Mathrudhi.

আল-মাতরুদি সমরখন্দের ধর্মতত্ত্বের মাতরুদি শাখার প্রধান। এই শাখা এবং আশারি শাখা উভয় শাখাই সমভাবে আহ্‌ল-আল-সুন্নাহ্ ওয়া-আল জামা-এর অন্তর্ভুক্ত। আল-মাতরুদির জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি ৩৩৪/৯৯৪ সালে সমরখন্দে মৃত্যুবরণ করেন। ঠিক মুতাযিলা মতাবলম্বীদের ন্যায় যুক্তিবাদী তর্ক-বিতর্কের সাহায্যে তিনি ইসলাম সমর্থন করেন।

মুরজিয়া : Murjites.

'মুরজা' শব্দ আরবি 'আরজা' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে স্থগিত রাখা। মুরজিয়া বলতে এমন একজন চিন্তাবিদকে বোঝায় যিনি শেষ বিচারের দিনের পূর্বপর্যন্ত পাপী মুসলমানদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রায় স্থগিত রাখার সমর্থক। খারেজিয়া ও শিয়া সম্প্রদায়ের আক্রমণ হতে উমাইয়াদের রক্ষা করার জন্য এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। খারেজিয় ও শিয়া সম্প্রদায়ের লোকগণ উমাইয়া শাসকগণকে দুর্বৃত্ত ও কাফের বলে অভিহিত করেন। এই সময় উমাইয়া রাজবংশের সমর্থক কতিপয় চিন্তাবিদ এক নতুন নীতি নিয়ে আগমন করেন। এটা হলো সহনশীলতার নীতি। তারা ব্যক্ত করেন যে, একজন মুসলমানের অন্য একজন মুসলমানকে কাফের বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র বিচারের পূর্বপর্যন্ত তাদের সম্পর্কে ধর্মীয় নৈতিক রায় প্রদান স্থগিত রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত। কে মুসলমান কে কাফির সে সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার খারেজিদের নেই। আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন সেই রায় ঘোষণা করবেন এবং সেই পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা বা সহনশীল হয়ে থাকতে হবে।

মুতাযিলা : Mutazilites.

মুতাযিলা চিন্তাবিদগণ ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী সম্প্রদায়। কাদারিয়া সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণায় খারেজিদের উগ্রমতবাদ এবং মুরজিয়াদের নৈতিক শৈথিল্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মুতাযিলাগণ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে জ্ঞানের যথার্থ উৎস বলে মনে করেন। প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ হাসান-আল-বসরীর শিষ্য ওয়াসিল-বিন-আতা (মৃত্যু-৭৪৮ খ্রি.) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মুতাযিলাগণ মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে কোরআন ও হাদিসের জীবন দর্শনের বিচার করেন। তাঁরা ইসলামের স্বাধীন চিন্তাবিদ হিসেবে ভূষিত হলো এবং প্রকাশ্যে বুদ্ধির আলোচনার সূত্রপাত করেন। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির অনুসারী হিসেবে তাঁরা মুসলিম দর্শনে অত্যন্ত সুপরিচিত।

www.pathagar.com

মিহ্না : Mihna.

মিহ্না শব্দ সাধারণত মুতাযিলাদের প্রবর্তিত অনুসন্ধান এবং ২১৮-২৩৪/৮৩৩-৮৪৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিরুদ্ধবাদীগণের নিপীড়ন বোঝায়। উক্ত শব্দ হতে ব্যুৎপন্ন ক্রিয়া 'ইমতাহানা' এর অর্থ পরীক্ষা করা, পীড়ন করা, হয়রান করা, যন্ত্রণা দেয়া প্রভৃতি।

যুহদ : Juhud.

মুসলিম মরমিয়া তত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা। প্রথমত পাপ হতে, আধিক্য হতে, যা কিছু আল্লাহ্ হতে দূরে সরিয়ে রাখে তা' হতে, হৃদয় বিচ্ছিন্ন করত সকল নশ্বর বস্তু হতে বিরত থাকা। যুহ্দের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সুফিদের জীবনীতে লক্ষণীয়।

রাহ্বানীয়া : Rahbania.

বৈরাগ্য, সন্যাসী, রাহিব শব্দ হতে উৎপন্ন। তাফসিরকারদের মতে বৈরাগ্য একটি মানবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। অধিকন্তু কদাচারীরা একে কলংকিত করেছে।

বৈরাগ্য ইসলামে কখনও স্বীকৃত হয়নি। মানবসমাজে থেকে সংসারধর্ম পালন করা, পার্থিব সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট না হয়ে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত এবং কল্যাণময় জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করাই ইসলামের আদর্শ। ইসলাম বৈরাগ্য পরিহার করতে এবং তার পরিবর্তে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতে মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করে।

শাফায়াত : Shafaat.

সুপারিশকরণ, মধ্যস্থতাকরণ। মুতাযিলা সম্প্রদায় মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং আল্লাহ্র ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাসী। তাদের ধারণা, ন্যায় কাজ করলে পুরস্কার এবং অন্যায় কাজ করলে শাস্তি লাভ করা নির্ধারিত। সুতরাং, এ নিয়ে কারোর সুপারিশ বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। এই যুক্তির অবলম্বনে তারা মহানবির (দ:) মধ্যস্থতা বা সুপারিশের ধারণা (theory of intercession) অস্বীকার করেন। কিন্তু আশারি সম্প্রদায় পরকালে মহানবি (দ:)-এর মধ্যস্থতায় বিশ্বাসী। তাদের মতানুসারে সকল মুসলমানের দোযখের আযাব হতে মুক্তিলাভের জন্য রাসুল (দ:)-এর মধ্যস্থতা বা সুপারিশের প্রয়োজন আছে।

শিয়া : Shiates.

মুসলমানদের কতগুলো সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বৃহৎ সম্প্রদায়ের নাম। রাসুল (দ:)-এর মৃত্যুর পর আলী (রা:) ন্যায়ত খলিফা হওয়ার যোগ্য দাবিদার—এ মতবাদের উপর ভিত্তি করেই উদ্ভব হয় এই সম্প্রদায়ের। তাঁদের অভিমত হলো, আহ্ল বায়ত (নবির পরিবার) অর্থাৎ, আলী ও ফাতিমা (রা:)-এর বংশোদ্ভূতগণই ইমামতের অধিকারী,

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী ইমাম তাঁর উত্তরাধিকারী পরবর্তী ইমামের মনোনয়ন দান করবেন। আলীর নাম হতে সংক্ষেপে 'শিয়া' নামের প্রচলন হয়।

সবর : Sabar.

সুফি সাধকগণ জীবনের মূলনীতি হিসেবে সবর বা ধৈর্য অনুশীলন করে থাকেন। জীবনের শোক-দুঃখ, বেদনা ও যন্ত্রণায় মনের ভারসাম্য রক্ষা করে চলার নামই হচ্ছে সবর বা ধৈর্য। সুফিদের মতে রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা ও বিপদ-আপদ দ্বারা আল্লাহ্ মানুষের ধৈর্যশক্তিকে পরীক্ষা করে থাকেন। সকল ব্যথা-বেদনা অতিক্রম করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র প্রেমে নিমগ্ন থেকে আত্মশক্তির অনুশীলন করার নামই ধৈর্য। ইমাম গাযালি বলেন, সবর বা ধৈর্য বলতে বোঝায় মনের কু-প্রবৃত্তি সম্পর্কে আল্লাহ্র সতর্কবাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ধৈর্য মনকে সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে এবং মন সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি এবং আসক্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

সিফাত : Sifat.

সিফাত শব্দের অর্থ হচ্ছে গুণ। আল্লাহ্র সিফাত (গুণাবলি) তাঁর নাম (আসমা) হতে পৃথক। কোরআনে প্রদত্ত নামগুলো বর্ণনামূলকভাবে তাঁর প্রতি প্রয়োগকৃত বিশেষণ বিশেষ, এরূপ বিশেষণ প্রাচীন কাব্যে বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু, তাঁর সিফাত মোটেই বিমূর্ত নয় (abstract) এ ভাবাত্মক গুণ যা এ সকল বিশেষণের মধ্যে নিহিত আছে। যেমন, কাদিরের পশ্চাতে কুদরা, আলিমের পশ্চাতে ইলম। এই সকল সিফাতের সম্পর্ক। দীর্ঘ বিতর্কের পর শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এরা শাশ্বত, তাঁর সত্তাতে চিরবিরাজমান এবং এই গুণগুলো তাঁর সত্তা নয়, আবার তাঁর সত্তার বাইরেও নয়। আকায়েদবেত্তাগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হলো তার তিনটি দিক (dimension) রয়েছে : (১) আল্লাহ্র সত্তার একত্ব অক্ষুণ্ন রাখা, (২) কোরানে আল্লাহ্র বর্ণনামূলক কথাগুলোর সম্যক ব্যাখ্যা করা, যাতে এটা আল্লাহ্র সত্তার ঐক্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, (৩) আল্লাহ্র সিফাতের মধ্যে কোনোগুলো আল্লাহ্র সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং কোনোগুলো বস্তুজগতের সাথেও সম্পর্কযুক্ত তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা। এ সমস্যা ঘোরতর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল।

হাকিকত : Hakikat.

এ হচ্ছে ধর্মের মূল বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। সুফির যাত্রাপথের শেষ স্তর। এইস্তরে সুফি সত্য উপলব্ধি করেন। এইস্তরে সুফি শৃংখলা-অনুরাগ, প্রেম, ভক্তি, সংযম, সৎকর্ম এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরম সত্যকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। এই স্তরকে বলা হয় ফানাফিল্লাহ বা আল্লাহ্র মধ্যে আত্মবিলোপ এবং পরম সত্তায় এক নতুন ও চিরন্তন অস্তিত্ব লাভ। হাকিকত পর্যায়ে সুফির নিজের কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আল্লাহ্র পরম ইচ্ছায় তাঁর ইচ্ছা সমর্পিত হয়। এইরূপ সাধনায় শুদ্ধ আত্মার

www.pathagar.com

প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ, "হে, প্রশান্ত আত্মা—তুমি প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং বেহেশতের বাগানে প্রবেশ কর। (সুরা ৮৯ : আয়াত ২৭)

আল-হাল্লাজ : Al-Hallaj.

মনসুর আল-হাল্লাজ একজন পারস্যবাসী সুফি এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর হাতে সুফিবাদ সর্বখোদাবাদে পরিণত হয়। মনসুর আল-হাল্লাজ আল্লাহ্‌র প্রেমে এত বিভোর হয়ে যান যে, তিনি 'আনাল হক' অর্থাৎ 'আমিই খোদা' বলে ঘোষণা করেন।

এই ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল : একজন সুফি যখন আল্লাহ্‌র সাথে একাত্ম হয়ে যান, তখন তাঁর এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এইরূপ একাত্ম অবস্থায় সুফির পৃথক কোনো সত্তা থাকে না। আল্লাহ্ স্বয়ং সুফির মুখ দিয়ে কথা বলেন। তৎকালীন আলেমগণ তাঁকে 'আনাল হক'-এর পরিবর্তে 'হুয়াল হক' অর্থাৎ 'আমিই খোদা'-এর পরিবর্তে 'তিনিই খোদা' বলার জন্য পরামর্শ দিয়ে ব্যর্থ হন। ফলে তাঁকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

হাসান-আল-বসরী : Hasan-al-Basri.

ইমাম হাসান আল বসরী একজন প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ। মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় জগতে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ইসলামের তাত্ত্বিক ও আনুষ্ঠানিক উভয় জ্ঞানেরই পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় ব্যাখ্যায় বুদ্ধির প্রয়োগের সমর্থক ছিলেন। মানুষের সীমিত ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সুফিগণ তাঁকে একজন প্রথম যুগের সুফি হিসেবে গণ্য করেন এবং সুন্নিদের ন্যায় তাঁরাও, প্রায়শ তাঁর মত উদ্ধৃতি করেন। মুতাযিলাগণও তাঁকে তাঁদের অন্যতম নেতা। বলে গ্রহণ করেন, কারণ ওয়াসিল-বিন-আতা তাঁর শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য ওয়াসিল-বিন-আতা তাঁর নিকট থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েন। ইসলামের অধিকাংশ ধর্মীয় আন্দোলনের মূল উৎসরূপে হাসানকে চিহ্নিত করা হয়। ৯৩৫ খ্রী: তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম : Hujjatul Islam.

ইসলামের সংরক্ষক। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে আল-গাযালি এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ইসলামের সমস্ত অভিনবত্ব (বেদাত) খণ্ডন করে আল্লাহ্‌র কোরআন এবং রাসুলের হাদিসের অনাবিল শিক্ষার উপর ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এই মহান কীর্তির জন্য তাঁকে হুজ্জাতুল ইসলাম বা ধর্মের সংরক্ষক বলে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

হুলুল : Hulul.

দেবত্বারোপণ। আল্লাহ্‌র সত্তায় অধিষ্ঠিত থেকে থাকা অবস্থায় মনসুর হাল্লাজ ঘোষণা করেন, আনাল হক অর্থাৎ আমিই পরম সত্য। তাঁর মতে, মানুষ স্বরূপেই স্বর্গীয়, কারণ, আল্লাহ্ নিজ প্রতিবিম্বেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহ্‌র সেই অনন্ত প্রেমের প্রতিচ্ছবি যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ নিজেকে দর্শন করে থাকেন। মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, কারণ মানুষই সৃষ্টির সেরা। এজন্যই আল্লাহ্ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আদম (আ:)-কে সেজদা করার জন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এ ধরনের ধারণার সমর্থন মানুষকে দেবত্বের মর্যাদায় নিয়ে আসে আর এ কারণেই ধর্মবিরুদ্ধ মতের জন্য হাল্লাজকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রফেসর মোঃ আবদুল হালিম বর্তমানে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে তিনি অবসরে যান। সুদীর্ঘ পয়ত্রিশ বৎসর তার সরকারি চাকুরির কাল। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রি লাভের পর ১৯৬৫ সালে তিনি প্রভাষক হিসেবে সরকারি কলেজে যোগদান করেন- তার কর্মস্থল ছিল ঐতিহ্যে লালিত সেই এম.সি. কলেজ, সিলেট। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রফেসর হালিমের সমগ্র চাকুরিকাল সিলেট এম.সি. কলেজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। ১৯৭৭-এ তিনি সহকারি অধ্যাপক, ১৯৮৪-এ সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৯২-এ প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৯৭-এ তিনি এম.সি. কলেজের উপাধ্যক্ষ এবং একই সালের অগাস্টে তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন।

প্রফেসর হালিমের মূল বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা থানার অন্তর্গত হাতুরা বাড়ি গ্রামে। তার পিতা মৌলভী আবদুল রশিদ আরবি ও ফার্সি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। প্রফেসর হালিম-রা দুই ভাই, এক বোন। বড় ভাই মোঃ আবদুল হাফিজ, বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে কয়েক বছর পূর্বে অবসরে যান। বড় বোন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গার্লস স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বর্তমানে গৃহিনী। প্রফেসর হালিমের প্রয়াত স্ত্রী মিসেস সাহওয়ার আহমেদ চৌধুরী সিলেট মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। একমাত্র কন্যা দিনীয়া আদিব বর্তমানে বৃটিশ কাউন্সিল টিচিং সেন্টারে একটি কোর্স করছেন।

প্রফেসর হালিম-এর বিভিন্ন লেখা বাংলা একাডেমী পত্রিকা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি রোড নং ১১/এ, হাউজ নং ৮৩, ধানমণ্ডি, ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

www.pathagar.com

ISBN 984 483 123 7
9 789844 831230

a Dibyaprakash book

Text (Philosophy)

A Collection of essays on Muslim Philosophy by Md. Abdul Halim.

First Dibyaprakash Edition: September 2002
Cover design : Dhrubo Esh
Price : Tk. 230

www.pathagar.com